স্বর্গ
মর্ত্ত
পাতাল

ক্লাশক :
শ্রীসুধাংশুশেখর দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩/১বি মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা ৭০০ ০০৯

ক :
শশিকান্ত হাটই
ধার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৬ বিধান সরণি
কলিকাতা ৭০০ ০০৬

চ্ছদ চিত্রণ ও অলংকরণ :
রায়

মুদ্রণ :
দত্ত
প্রেসন হাউস
সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কাতা ৭০০ ০০৯

পি ভি সি জ্যাকেট মুদ্রণ :
রঞ্জিত বসু
ইন্দু প্লাসটিক্স
৩ ম্যাঙ্গো লেন
কলিকাতা ৭০০ ০০১

ধাণ :

ার্কস

অষ্টম সংস্করণ :
—শ্রাবণ, ১৩৬৩

'I am willing to believe that at the beginning you did not realise what was happening, later, you doubted whether such things could be true, but now you know, and still you hold your tongues. The blinding sun of torture is at its zenith, it lights up the whole country Under that merciless glare, there is not a laugh that does not ring false, not a face that is not painted to hide fear or anger, not a single action that does not betray our disgust, and our complicity'

Jean-Paul Sartre

in his Preface to

THE WRETCHED OF THE EARTH

লেখকের জবানবন্দি

আমার প্রথম ট্রিলজি উপন্যাস সম্পর্কে কিছু জবাবদিহি প্রয়োজন।

শ্রদ্ধেয় শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বলতেন, 'যা এক কথায় বলা যায় তার জন্যে কখনও তিন কথা খরচ করবে না।' যে-বক্তব্য একখানা উপন্যাসে পেশ করা উচিত, তার জন্যে কেন তাহলে ট্রিলজি উপন্যাস?

আমার এক রসিক বন্ধুর বক্তব্য: তিনের প্রতি বহুজনেরই বিশেষ দুর্বলতা থাকে। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর, গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী, ত্রিনয়ন, ত্রিভুবন, ত্রিকাল – ত্রয়ীর প্রতি মানব-মানবীর এক বিচিত্র আকর্ষণ নাকি আমাদের দেশে ইতিহাসের ঊষালোক থেকেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে। শুধু ভারতবর্ষ নয়, পৃথিবীর সর্বত্র ত্রিকোণ, ত্রিস্তর ও ত্রিভুজের জয়-জয়কার! গ্রীক, লাতিন, রুশ থেকে শুরু করে সুইডিশ, আইরিশ, ইংলিশ সর্বত্রই ত্রিসংখ্যার ত্রিগম্ভীর উপস্থিতি আমার এই বহু-ভাষাবিদ বন্ধুটি লক্ষ্য করেছেন। এই বন্ধুর কাছেই জানলাম, যুগে-যুগে ত্রয়ীর দুর্বার আকর্ষণ কবি, শিল্পী ও সঙ্গীতজ্ঞের ত্রিতন্ত্রীতে সাড়া জাগিয়েছে। সুর, সাহিত্য ও শিল্পের অঙ্গনে ত্রিযামা যামিনী, ত্রিপদী ছন্দ ও ত্রিবর্ণের নিত্য আনাগোনা। মানব-মানবীর নিবিড় সম্পর্কের ত্রিসীমাতেও ত্রয়ীর নিঃশব্দ উপস্থিতি—তিনকন্যা, তিনসঙ্গী, ত্রিবলিত নাভি; প্রেমের ত্রিভুজ, মিলন-বিচ্ছেদ-বিরহের সোনালী ত্রিকোণ অথবা স্বর্গ মর্ত পাতালের ত্রিজগৎ।

বোঝা যাচ্ছে, যতদিন চন্দ্র-সূর্য-তারা উঠবে ততদিন ত্রিমোহ থেকে মানুষের মুক্তি নেই। বই-পত্তর ঘেঁটে বন্ধু আরও খবর দিলেন, যুগে-যুগে লেখকরাও এই ত্রিমোহে মুগ্ধ হয়েছেন। ইউরোপীয় সাহিত্যের আদিতে গ্রীক নাট্যকার ইসকাইলাস সেই যে ট্রিলজি রচনার ফাঁদে পা দিলেন দু হাজার বছর পরেও লেখকরা তার থেকে মুক্তি পেলেন না।

যথাসময়ে এসব জেনে-শুনেও 'ত্রিলজি' থেকে শেষ পর্যন্ত নিজেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখতে পারলাম না—প্রয়োজন হলো এই 'স্বর্গ মর্ত পাতাল' রচনার।

একের মধ্যে তিন এবং তিনের মধ্যে এক এই উপন্যাসত্রয়ীর সূত্রপাত ১৯০০-এর গোড়ায়। এর পিছনে পুরো একদশকের চিন্তা-ভাবনাও জড়ো হয়ে আছে। এদেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্তর অপর নাম চাকরিজীবী। চাকরিভিত্তিক কর্মজীবনে যে নিঃশব্দ বিপ্লব ঘটে যাচ্ছে, যে সুখ-দুঃখ

ন্যায়-অন্যায় ও মান-অপমানের অকথিত কাহিনী [illegible]
পাথরের মতো জমা হয়ে আছে সে-সম্বন্ধে [illegible]
জন্যই প্রথম এই কাজে হাত দিই। বিরাট বিচিত্র এই [illegible]
চোখে দেখানো সুবিধাজনক মনে না-হওয়ায় শেষ পর্যন্ত [illegible]
তিনখানি উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দুতে বসাতে হলো।

সময়সূচী অনুযায়ী প্রথম লেখা হয়েছিল ‘সীমাবদ্ধ’, তারপর ‘আশা আকাঙ্ক্ষা’ এবং সবার শেষে ‘জন-অরণ্য’। কিন্তু একত্রে গ্রন্থবন্দী করতে গিয়ে ‘জন-অরণ্য’র কর্মহীন সোমনাথকেই প্রথমে টেনে আনতে ইচ্ছে হচ্ছে। সেই অনুযায়ী, সোমনাথের জীবন দিয়েই এই ত্রয়ী-উপন্যাসের সূচনা হলো— অর্থাৎ স্বর্গ মর্ত পাতালের সিঁড়ি ভাঙা স্বর্গ থেকে শুরু না করে পাতাল থেকেই আরম্ভ হলো।

আমাদের এই সমাজ আদর্শের স্বর্গ থেকে ক্রমশঃ নরকে অধঃপতিত হচ্ছে এমন এক নিরাশার কথা কেউ-কেউ তুলছেন। কেউ-কেউ আবার সমসাময়িকতার উত্তেজনায় অসত্যের স্লিপিং পিল খেয়ে স্বপ্ন দেখছেন, আমরা সবাই এখন স্বর্গলোকের সুখী বাসিন্দা। আমার মনে হয়, স্বর্গ মর্ত পাতাল সিঁড়ি বেয়ে বিভিন্ন লোক বিভিন্ন দিকে গমনাগমন করছেন; এবং অনেকে অচেনা পথের তেমাথায় এসে গন্তব্যস্থানের ঠিকানা হারিয়ে স্তব্ধ হয়ে রয়েছেন। সত্যসন্ধানী পাঠক-পাঠিকারা তাঁদের পরিচিত পথভ্রষ্টদের জটিল জীবনে একবার দৃষ্টিপাত করলে আমার এই চেষ্টা সফল মনে করবো।

উৎসর্গ

জন-অরণ্য ও সীমাবদ্ধর
বিশ্ববন্দিত চলচ্চিত্রকার
শ্রীসত্যজিৎ রায় শ্রদ্ধাস্পদেষু

প্রকাশকের নিবেদন

জন-অরণ্য, সীমাবদ্ধ ও আশা আকাঙ্ক্ষা—শংকরের এই তিনখানি নাগরিক উপন্যাসকে কেন্দ্র করে সম্প্রতি বাংলা সাহিত্যে বিপুল প্রশংসা ও আলোচনার ঝড় উঠেছে। বিগত বিশ বছরে আর কোনো ট্রিলজি উপন্যাস এইভাবে পাঠক-পাঠিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি বলাটা অত্যুক্তি হবে না।

অবিশ্বাস্য দামে এই তিনখানি উপন্যাস প্রকাশের উদ্যোগে যাঁরা আমাদের বিশেষ সাহায্য করেছেন তাঁদের সকলকে এই সুযোগে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। আধুনিক সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ফসলকে নামমাত্র মূল্যে বাংলার ঘরে-ঘরে পৌঁছে দেবার এই দুঃসাহসিক প্রচেষ্টায় আমরা আপনার মতামত, শুভেচ্ছা, সহযোগিতা ও আশীর্বাদ প্রার্থনা করি। প্রথম উদ্যোগ সফল হলে, আমরা অবশ্যই বৃহত্তর দায়িত্ব নিতে সাহসী হবো।

এই লেখকের :

সম্রাট ও সুন্দরী
এক যে ছিল
যেখানে যেমন
এপার বাংলা ওপার বাংলা
চৌরঙ্গী
নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরি
বোধোদয়
পাত্র পাত্রী
এক দুই তিন
স্থানীয় সংবাদ
রূপতাপস
সার্থক জনম
মানচিত্র
যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ
পদ্মপাতায় জল
যা বলো তাই বলো
কত অজানারে

আজ পয়লা আষাঢ়। কলকাতার চিৎপুর রোড ও সি আই টি রোডের মোড়ে একটা বিবর্ণ হতশ্রী ল্যাম্প পোস্টের খুব কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে সোমনাথ। পুরো নাম — সোমনাথ ব্যানার্জি।

রিকশা, ঠেলাগাড়ি, বাস, লরি, ট্যাক্সি এবং টেম্পোর ভিড়ে চিৎপুর রোডে ট্রাফিকের গোলমেলে জট পাকিয়েছে। এরই মধ্যে একটা পুরানো ট্রামের বৃদ্ধ ড্রাইভার লালবাজার থেকে বেরিয়ে বাগবাজার যাবার উৎকণ্ঠায় টং টং করে ঘন্টা বাজাচ্ছে। সোমনাথের মনে হলো প্রাগৈতিহাসিক যুগের এক জরাগ্রস্ত বিশাল গিরগিটি নিজের নিরাপদ আশ্রয় থেকে বিতাড়িত হয়ে কেমনভাবে কলকাতার এই জন-অরণ্যে আটকা পড়ে কাতর আর্তনাদ করছে।

আকারে বৃহৎ হওয়া সত্ত্বেও উদ্বাস্তু গিরগিটিটার জন্যে সোমনাথের একটু মায়া লাগছে। পৃথিবীতে এত রাজপথ থাকতে কোন ভাগ্যদোষে বেচারা কলকাতার এই রবীন্দ্র সরণিতে এসে পড়লো? কয়েক বছর আগে হলেও সোমনাথ এই জ্যামজমাট জটিল পরিস্থিতি থেকে কবিতার উপাদান সংগ্রহ করে নিত। পকেটের ছোট্ট নোট বইয়ে এই মুহূর্তের মানসিকতা নোট করতো, তারপর রাত্রে কবিতা লিখতে বসতো। হয়তো নাম দিত জন-অরণ্যে প্রাগৈতিহাসিক গিরগিটি। নতুন-লেখা কবিতাটা পরের দিনই তপতীকে পড়াতো। কিন্তু এসব কথা এখন ভেবে লাভ কী? সোমনাথের জীবন থেকে কবিতা বিদায় নিয়েছে।

টেরিটি বাজারের কাছে সোমনাথ ব্যানার্জি কী জন্যে দাঁড়িয়ে আছে? সে কোথায় যাবে? কেন? এই মুহূর্তে কোনো পরিচিত জন এইসব প্রশ্ন করলে সোমনাথ বেশ বিব্রত হয়ে পড়বে। অন্য যে-কোনোদিন হলে, মিথ্যা কিছু বলে দেওয়া যেত। কিন্তু সোমনাথের পক্ষে ভোলা সম্ভব নয়—আজ ১লা আষাঢ়। আষাঢ়ের এই প্রথম দিবসকে কবেকার কোন কবি নির্বাসিত এক যক্ষের বিরহবেদনায় স্মরণীয় করে তুলেছিলেন। ২রা, ৩রা, ৫ই, ১৩ই, ১৫ই—আষাঢ়ের যে-কোনোদিনেই তো মহাকবি কালিদাস বিরহী যক্ষের মর্মব্যথা উদ্ঘাটন করতে পারতেন—তাহলে এই ১লা তারিখটা সোমনাথ একান্তভাবে নিজের কাছে পেত।

১লা আষাঢ় সোমনাথের জন্মদিন। চব্বিশ বছর আগে এমনই একদিনে সোমনাথ যে-হাসপাতালে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল তার নাম সিলভার জুবিলী মাতৃসদন। পঞ্চম জর্জের রাজত্বের রজতজয়ন্তী উপলক্ষে মহামান্য সম্রাটের অনুগত ভারতীয় প্রজাবৃন্দ নিজেদের উৎসাহে চাঁদা তুলে সেই হাসপাতাল তৈরি করেছিল। সিলভার জুবিলী হাসপাতালের বেবির নিজেরই সিলভার জুবিলী হতে চললো —সোমনাথ মনে মনে হাসলো।

চিৎপুর রোডের চলমান জনস্রোতের দিকে তাকিয়ে মায়ের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে সোমনাথের। মা বলতেন, জন্মদিনে ভাল হবার চেষ্টা করতে হয়। কাউকে হিংসে করতে নেই, কারুর ক্ষতি করতে নেই, এবং মিথ্যে কথা বলা বারণ। ১লা আষাঢ়ের এই জটিল অপরাহ্ণে রবীন্দ্র সরণিতে দাঁড়িয়ে সোমনাথ তাই মিথ্যে কথা বলতে পারবে না। কেউ প্রশ্ন করলে সোমনাথকে স্বীকার করতে হবে, সে চলেছে মেয়েমানুষের সন্ধানে।

চমকে উঠছেন? বিব্রত বোধ করছেন? ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না? ভাবছেন, শুনতে ভুল করলেন? না, ঠিকই শুনেছেন। ভদ্র, সভ্য, সুশিক্ষিত তরুণ সোমনাথ ব্যানার্জি চলেছে মেয়েমানুষের সন্ধানে—এই শহরে যাদের কেউ বলে বেশ্যা, কেউ-বা কলগার্ল।

সোমনাথের বাবার নাম কয়েক বছর আগে একবার খবরের কাগজে বেরিয়েছিল। কাগজের কাটিংটা সোমনাথ নিজেই কেটে রেখেছিল, তারপর কমলা বউদি পারিবারিক অ্যালবামে আঠা দিয়ে এঁটে রেখেছেন। দ্বৈপায়ন ব্যানার্জি নিঃস্বার্থ দেশসেবার জন্যে সরকারী প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। সেই অবসরপ্রাপ্ত সরকারী গেজেটেড অফিসার দ্বৈপায়ন ব্যানার্জির ছেলে সোমনাথ ব্যানার্জি রাস্তায় অপেক্ষা করছে—এখনই সে নারী সন্ধানে বেরুবে।

কালের অবহেলায় মলিন রবীন্দ্র সরণির দিকে আবার তাকালো সোমনাথ। এই গলিতনখদন্ত জরদ্গব চিৎপুর রোডকে নামান্তরিত করে চিরসুন্দরের কবির নামের সঙ্গে জড়িয়ে দেবার কুৎসিত বুদ্ধিটা কার মাথায় এলো? কলকাতার নাগরিকরাও কেমন? কেউ কোনো প্রতিবাদ করলো না? বড়বাজারের আবর্জনায় মহাত্মা গান্ধীকে এবং চিৎপুরের পূতিগন্ধময় অন্ধকূপে রবীন্দ্রনাথকে নির্বাসিত করেও এরা কেমন আত্মতুষ্টি অনুভব করছেন।

উত্তেজনায় সোমনাথের দুটো কান ঈষৎ গরম হয়ে উঠছে। মিস্টার নটবর মিত্র এখনই এসে পড়বেন। মেয়েমানুষের ব্যাপারে নটবর মিত্র অনেক খবরাখবর রাখেন। কিন্তু কোথায় নটবর? তিনি কেন এত দেরি করছেন?

বিব্রত সোমনাথ মুখ তুলে একবার আকাশের দিকে তাকালো। কোথাও এক টুকরো মেঘের ইঙ্গিত নেই। যদি আকাশে অনেক কালো মেঘ থাকতো; যদি বলা যেত 'আসন্ন আষাঢ় ঐ ঘনায় গগনে'—তাহলে বেশ হতো। বাধাবন্ধহীন বর্ষার প্রবল ধারায় সোমনাথ যদি নিজের অতীতকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলতে পারতো তাহলে মন্দ হতো না।

কিন্তু অতীতকে ভোলা তো দূরের কথা, সোমনাথের অনেক কিছু মনে আসছে। অতীত ও বর্তমান মিলে মিশে একাকার হয়ে সোমনাথের মানস-আকাশকে বর্ষার মেঘের মতো ছেয়ে ফেলছে। সোমনাথ পথেই দাঁড়িয়ে থাকুক। চলুন, আমরা ততক্ষণ ওর অতীত সম্পর্কে খোঁজখবর করি—ওর পারিবারিক জীবনের সঙ্গে কিছুটা পরিচয় হোক আমাদের।

যোধপুর পার্কে জলের ট্যাঙ্কের কাছে লাল রঙের ছোট্ট দোতলা বাড়িটার একতলার ঘরে ভোরবেলায় সোমনাথ যখন বিছানায় শুয়ে আছে তখনই ওকে ধরা যাক।

একটু আগেই তার ঘুম ভেঙেছে। কিন্তু নীল স্ট্রাইপ দেওয়া পাজামা আর হাতকাটা জালি গেঞ্জি পরে সোমনাথ এখনও পাশবালিশ জড়িয়ে চোখ বন্ধ করে চুপচাপ শুয়ে আছে।

সোমনাথের ঘরের বাইরেই এ-বাড়ির খাবার জায়গা। সেখানে চা তৈরির ব্যবস্থাও আছে। ওইখান থেকে চুড়ির টুং ঠাং আওয়াজ ভেসে আসছে।

এই আওয়াজ শুনেই সোমনাথ বলে দিতে পারে, বড় বউদি অন্তত আধঘণ্টা আগে ঘুম থেকে উঠে পড়ে সংসারের কাজকর্ম শুরু করেছেন। কমলা বউদি এই সময় মিলের আটপৌরে শাড়ি পরেন, তাঁর পায়ে থাকে বাটা কোম্পানির লাল রঙের রবারের স্লিপার। চায়ের কাপ নামানোর আওয়াজ ভেসে আসছে —সুতরাং লিকুইড পেট্রলিয়াম গ্যাসের উনুনে বউদি নিশ্চয় চায়ের কেটলি চাপিয়ে দিয়েছেন।

ভোরবেলায় এই বাড়ির চা দু'বউ-এর একজনকে তৈরি করতে হবে। কারণ, দ্বৈপায়ন ব্যানার্জি দিনের প্রথম চায়ের কাপটা ঝি-চাকরের হাত থেকে তুলে নিতে পছন্দ করে না।

এ-বাড়ির অপর বউ দীপান্বিতা ওরফে বুলবুলের ওপরও মাঝে-মাঝে চা তৈরির দায়িত্ব পড়ে। সোমনাথের ছোটদা একদিন বড় বউদিকে বলেছিল, "তুমি রোজ রোজ কেন ভোরবেলায় উঠবে ? বুলবুলও মাঝে মাঝে কষ্ট করুক।"

কমলা বউদি আপত্তি করেননি, কিন্তু মুখ টিপে হেসেছিলেন। হাসবার কারণটা সোমনাথের অজানা নয়। ছোটদার বউ বুলবুল বেজায় ঘুমকাতুরে। ঘড়ির মান-সম্মান বাঁচিয়ে ভোরবেলায় বিছানা থেকে উঠে চা তৈরি করা ওর পক্ষে বেশ শক্ত ব্যাপার।

আজ তো সোমবার ? সুতরাং বুলবুলেরই চা তৈরি করার কথা। কিন্তু চুড়ির আওয়াজ তো বুলবুলের নয়। বিছানায় শুয়ে শুয়েই, ব্যাপারটা বুঝতে পারলো সোমনাথ। ছোটদার শোবার ঘরের দরজা খোলার শব্দ পাওয়া গেল এবার। সেইসঙ্গে বুলবুলের হাতের চুড়ির আওয়াজও পাওয়া যাচ্ছে।

বুলবুলের গলার স্বর একটু চড়া। এবার তার কথা শুনতে পাওয়া গেল। "কি লজ্জার ব্যাপার বলুন তো ! ঘুম থেকে উঠতে পনেরো মিনিট দেরি করে ফেললুম !"

কমলা বউদির কথাও সোমনাথের কানে আসছে। তিনি বুলবুলকে বললেন, "লজ্জা করে লাভ নেই। বাথরুমে গিয়ে চোখ-মুখ ধুয়ে এসো।"

স্বামীর প্রসঙ্গ তুলে বুলবুল বললে, "ও আমাকে ডেকে না দিলে এখনও ঘুম ভাঙতো না বোধ হয়।"

"ঠাকুরপো তোমাকে তাহলে বেশ শাসনে রেখেছে ! ভোরবেলায় একটু ঘুমোবার সুখও দিচ্ছে না !" কমলা বউদির রসিকতা সোমনাথের বিছানা থেকেই শোনা যাচ্ছে। ছোট দেওর যে এই সময় জেগে থাকতে পারে তা ওরা দুজনে আন্দাজ করতে পারেনি।

বুলবুলের বেশীদিন বিয়ে হয়নি। এ-বাড়ির কর্তৃপক্ষ সম্পর্কে একটা স্বাভাবিক লজ্জাবোধ এখনও আছে। কমলাকে সে বললে, "ভাগ্যে আপনি উঠে পড়েছেন। না-হলে কি বিশ্রী ব্যাপার হতো! চায়ের অপেক্ষায় বাবা বারান্দায় চুপচাপ বসে থাকতেন।"

চায়ের কাপ সাজানোর আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। কমলা বউদি বললেন, "অনেকদিনের অভ্যেস তো—ঠিক পৌনে ছ'টায় ঘুম ভেঙে গেল। ছ'টা দশেও যখন কেটলি চড়ানোর আওয়াজ পেলাম না, তখন বুঝলাম তুমি বিছানা ছাড়োনি।"

বুলবুল বললে, "ভোরের দিকে আমার কী যে হয়! যত রাজ্যের ঘুম ওই সময় আমাকে ছেঁকে ধরে।"

কমলা বউদি অল্প কথার মানুষ—কিন্তু রসিকতা বোধ আছে পুরোপুরি। বললেন, "ঘুমের আর দোষ কি? রাত দুপুর পর্যন্ত বরের সঙ্গে প্রেমালাপ করবে, ঘুমকে কাছে আসতে দেবে না। তাই বেচারাকে শেষ রাতে সুযোগ নিতে হয়!"

কমলা বউদির কথা শুনে সোমনাথেরও হাসি আসছে। বুলবুলের সলজ্জ ভাবটা নিজের চোখে দেখতে ইচ্ছে করছে। হাজার হোক কলেজে একসময় বুলবুল ওর সহপাঠিনী ছিল। বুলবুল বলছে, "বিশ্বাস করুন, দিদিভাই, কাল সাড়ে-দশটার মধ্যে দুজনে ঘুমিয়ে পড়েছি। এখন তো আর নবদম্পতি নই।"

কমলা বউদি ছাড়লেন না। "বলো কি! এখনও পুরো দুবছর বিয়ে হয়নি, এরই মধ্যে বুড়ো-বুড়ী সাজতে চাও?"

"কী যে বলেন!" বুলবুল আরও কিছু মন্তব্য করতে যাচ্ছিলো, কিন্তু তার কথা আর শোনা গেল না। সোমনাথের কাছে বুলবুল যতই স্মার্ট হোক, গুরুজনদের কাছে সে বেশ নার্ভাস।

কমলা বউদি বললেন, "এ-নিয়ে লজ্জা পাবার কিছু নেই। বিছানায় শুয়ে শুয়ে বরের সঙ্গে মনের সুখে গল্প করবে এটা তোমার জন্মগত অধিকার। তাছাড়া, ভোরবেলায় ঘুম ভাঙলেও ঠাকুরপোর হয়তো তোমাকে ছাড়তে ইচ্ছে করে না! বরের রিলিজ অর্ডার না-পেলে তুমি কী করবে?"

"দাদা নিশ্চয় আপনাকে সকালবেলায় ছাড়তে চান না?" বুলবুল এবার পাল্টা প্রশ্ন করলো।

কমলা বউদি উত্তর দিতে একটু দেরি করছেন। বোধহয় চায়ের কাপগুলো শুকনো কাপড় দিয়ে মুছছেন—কিংবা লজ্জা পেয়েছেন। না,

কমলা বউদি সামলে নিয়েছেন। অল্পবয়সী জা-কে ভয় দেখালেন, "বম্বেতে আজই প্রশ্ন করে পাঠাচ্ছি। লিখবো তোমার ভাদ্দর বউ জানতে চাইছিল।"

সোমনাথের চোখে আবার ঘুম নেমে আসছে। বাইরের কথাবার্তায় সে আর মনোযোগ করতে পারছে না। কিন্তু কমলা ও বুলবুল তাদের আলাপ চালিয়ে যাচ্ছে।

দাদাকে চিঠি লেখার প্রসঙ্গে বুলবুল বেশ অস্বস্তিতে পড়ে গেল। সন্ত্রস্ত হরিণীর মতো মুখভঙ্গি করে বুলবুল বললে, "লক্ষ্মীটি দিদিভাই। দাদা এসব শুনলে, আমি ওঁর সামনে লজ্জায় যেতে পারবো না। আপনার কাছেও মাপ চাইছি, কাল থেকে সময়মতো উঠবোই···"

আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলো বুলবুল। কিন্তু কমলা চাপা অথচ শান্ত গলায় জায়ের বক্তব্যের শূন্যস্থান পূরণ করলো, "তার জন্যে যদি রাত্রিবেলায় বরের সঙ্গে প্রেম বন্ধ রাখতে হয় তাও!"

এবার কেটলি নামিয়ে কমলা মেপে-মেপে কয়েক চামচ চা চীনে মাটির পটে দিলো, আর একটা বাড়তি চামচ চা দিলো পটের জন্যে। কমলা তারপর বুলবুলকে বললো, "ছোটবেলা থেকে আমার সকালে ঘুম ভেঙে যায়। সুতরাং তোমাকে কষ্ট করতে হবে না। সকালে বাবাকে আমিই চা করে দেবো।"

বুলবুলের মুখে কৃতজ্ঞতার রেখা ফুটে উঠেছিল। তবু সে আপত্তি জানাতে যাচ্ছিলো। কিন্তু কমলা বললো, "বাথরুমে গিয়ে চোখে মুখে জল দিয়ে এসো। ঘুম-ভেঙে বউ-এর চোখে পিঁচুটি দেখলে বর মোটেই খুশী হবে না!"

বুলবুল বাথরুমে চলে গেল। কমলা চটপট এককাপ চায়ে দুধ মেশালো। তারপর মাথায় ঘোমটা টেনে, শাড়ির আঁচলটা ঠিক করে নিয়ে, একটা প্লেটে দু'খানা নোনতা বিস্কুট বার করে শ্বশুরমশায়ের উদ্দেশে দোতলায় চললো।

দোতলায় মাত্র একখানা ঘর। সেই ঘরে একমাত্র দ্বৈপায়ন ব্যানার্জি থাকেন। ভোরবেলায় কখন যে তিনি ঘুম থেকে উঠে পড়েছেন কেউ জানে না।

সকালবেলার প্রাত্যহিক হাঙ্গামা সেরে দক্ষিণের ব্যালকনিতে দ্বৈপায়ন শান্তভাবে বসে রয়েছেন। বাড়ির পূর্ব দিকটা এখনও খোলা আছে। সেদিক থেকে ভোরবেলার মিষ্টি রোদ সলজ্জভাবে উঁকি মারছে। বাবা সেই দিকে চুপচাপ তাকিয়ে রয়েছেন। কমলার ধারণা, বাবা এইসময়ে মনে-মনে ঈশ্বরের আরাধনা করেন।

চায়ের কাপ নামিয়ে সনত্র কমলা বাবাকে প্রণাম করলো। পায়ের ধুলো নিতে গেলে গোড়ার দিকে বাবা আপত্তি করতেন—এখন মেনে নিয়েছেন। বধূমাতাকে তিনি প্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন।

কমলা বললো, "সকালবেলায় একটু বেড়ানো অভ্যাস করুন না।"

দ্বৈপায়ন ব্যানার্জি বললেন, "করবো ভাবছি। কিন্তু শরীরে ঠিক জুত পাই না।"

শ্বশুরের উত্তরে সন্তুষ্ট হতে পারলো না কমলা। তাঁকে মনোবল দেবার জন্যে সে বললো, "আমার বাবাও প্রথমে বেরোতে চাইতেন না। এখন কিন্তু সকালে বেড়িয়ে খুব আরাম পাচ্ছেন। বাতের ব্যথা কমেছে। খিদে হচ্ছে।"

দ্বৈপায়ন বললেন, "দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বসো না বউমা।"

এক সময় শ্বশুরমশায় গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। কারুর সঙ্গে বড় একটা কথা বলতেন না। কিন্তু স্ত্রী বিয়োগের পর কী যে হলো—বেশ পাল্টে গেলেন। এখন বড় বউমার সঙ্গে অনেক কথা বলেন—প্রায় আড্ডা জমিয়ে ফেলেন মাঝে-মাঝে।

আট বছর আগেও এই বাড়ির সর্বময়ী কর্ত্রী ছিলেন প্রতিভা দেবী। কাজে কর্মে ও প্রাণোচ্ছল কথাবার্তায় তিনি একাই ব্যানার্জি পরিবারের সমস্ত কিছু পরিপূর্ণ রেখেছিলেন। দ্বৈপায়ন ব্যানার্জি নিজেই কমলাকে বলেছিলেন. "তোমার শাশুড়ী যে বলতেন এ-বাড়িতে তিনিই ভাগ্যলক্ষ্মীকে এনেছেন তা মোটেই মিথ্যে নয়।"

এর পরেই শ্বশুরমশায় ডুবে যেতেন পুরানো দিনের গল্পে। কমলাকে বলতেন, কেমন করে ওঁদের বিয়ে হলো—ছোটবেলায় প্রতিভা কী রকম একগুঁয়ে ছিল—দ্বৈপায়নের সঙ্গে ঝগড়া হলে শাশুড়ীর কাছে কী ভাবে স্বামীর নামে লাগাতেন।

আজও বাবা বোধ হয় বউমার সঙ্গে একটু কথা বলতে চান। আর এই ভোরবেলাটাই ওঁর যত কথা বলার সময়। চায়ে চুমুক দিয়ে দ্বৈপায়নের খেয়াল হলো বউমার নিজের হাতে চায়ের পেয়ালা নেই। ব্যস্ত হয়ে তিনি বললেন, "ওহো তোমাদের চা বোধ হয় নিচের টেবিলে ঠাণ্ডা হচ্ছে। আমার মনে থাকে না যে প্রথমে আমার জন্যে বিনা-চিনিতে চা তৈরি করো। তারপর অন্যদের চা-এ চিনি মেশানো হয়। তুমি বরং চায়ের হাঙ্গামা শেষ করে এসো বউমা। ইচ্ছে করলে নিজের কাপটা এনে এখানে বসতে পারো।"

কমলা বললো, "না-হয় একটু দেরি হবে। এখনও তো কেউ ওঠেনি।"

বাবা রাজী হলেন না। বললেন, "না, মেজ বউমা নিশ্চয় তোমার জন্যে বসে আছে। তোমার শাশুড়ী এই জন্যে আমাকে বকাবকি করতেন। বলতেন, সংসারটা কেমনভাবে চলছে তুমি মোটে খোঁজ রাখো না। তুমি নিজের খেয়ালেই বুঁদ হয়ে থাকো।"

শ্বশুরের কথা অমান্য করতে পারলো না কমলা। বাবাকে যে কমলা খুব ভালবাসে তা ওর ভাবভঙ্গি থেকেই বোঝা যায়। বাড়ির সবার সঙ্গেই দ্বৈপায়নের একটু দূরত্ব আছে—যে একজন কেবল খুব কাছাকাছি চলে আসতে পারে সে কমলা।

আরামকেদারায় অর্ধশায়িত অবস্থায় দ্বৈপায়ন ব্যানার্জি অপস্রিয়মাণ কমলার দিকে সস্নেহে তাকিয়ে রইলেন। শুধু নামে নয়, আসল কমলাকেই একদিন প্রতিভা পছন্দ করে এই বাড়িতে নিয়ে এসেছিল। প্রতিভা বোধ হয় জানতো সে এখানে চিরদিন থাকবে না।

যোধপুর পার্কের পুব-পশ্চিমমুখো রাস্তাটা এই বারান্দা থেকে পুরো দেখা যায়। দু-একজন পথচারী গভরমেণ্টের দুধের বোতল হাতে এই পথ দিয়ে যেতে যেতে ব্যালকনির আরামকেদারায় সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বৈপায়নকে লক্ষ্য করছে। এই বাড়ির মালিককে তারা বোধ হয় হিংসে করছে। বাড়িটা ছোট হলেও ছিমছাম —সর্বত্র রুচির পরিচয় ছড়িয়ে আছে। সে-কৃতিত্ব অবশ্য দ্বৈপায়ন ব্যানার্জির নয়—প্রতিভা এবং বড় ছেলে সুব্রতর। আই-আই-টিতে এক মাস্টারমশায়কে দিয়ে সুব্রত নকশা আঁকিয়েছিল। দ্বৈপায়ন ব্যানার্জি ভেবেছিলেন বিলেত-ফেরত আর্কিটেক্টের ওই নকশা অনুযায়ী বাড়ি করতে অনেক খরচ লাগবে—রাজ্য সরকারের সাধারণ চাকরি করে এত টাকা কোথায় পাবেন তিনি?

প্রতিভা কিন্তু দ্বৈপায়নের কোনো আপত্তি শোনেননি। নির্দ্বিধায় স্বামীকে মুখ-ঝামটা দিয়েছিলেন। ওঁরা তখন থাকতেন টালিগঞ্জের একটা সরকারী রিকুইজিশন-করা ফ্ল্যাটবাড়িতে। প্ল্যান দেখে দ্বৈপায়ন ব্যানার্জি বলেছিলেন, "ভোম্বল, এসব বাড়ি বিলেত আমেরিকায় চলে। কলকাতা শহরে জমিই কিনতে পারতাম না—নেহাত সরকারী কো-অপারেটিভ থেকে জলের দামে আড়াই কাঠা দিলো তাই। সে দামটাও তো শোধ করেছি মাসে-মাসে মাইনে থেকে।"

প্রতিভা বলেছিল, "তুমি এসব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছো কেন? আমি আর ভোম্বল যা পারি করবো। ভোম্বল তো তোমার মতো আনাড়ি নয়—ভালভাবে আই-আই-টি থেকে পাস করেছে।"

কমলার তখন সদ্য বিয়ে হয়েছে। তখন থেকেই সে একটু শ্বশুরের দিকে ঝুঁকে কথা বলে। সে বলেছিল, "টাকাটা তো বাবাকেই বার করতে হবে।" শাশুড়ীকে বলেছিল, "বাবার কত অভিজ্ঞতা। কত আদালতে কত লোককে দেখেছেন।"

বউমার সঙ্গে প্রতিভা একমত হতে পারেননি। জোরের সঙ্গে বলেছিলেন, 'শুধু বস্তা বস্তা রায় লিখেছে কোর্টে বসে—কিন্তু কোনো কাণ্ডজ্ঞান হয়নি। সারাজন্ম আমাকেই চালিয়ে নিয়ে আসতে হয়েছে তোমার শ্বশুরমশায়কে। যোধপুর পার্কের এই জমিটুকুও কেনা হতো না—যদি না পুলিন রায়ের কাছে খবর পেয়ে আমি রাইটার্স বিল্ডিংস-এ ওঁকে পাঠাতাম। উনি সব ব্যাপারেই হাত গুটিয়ে বসে আছেন। জীবনে করবার মধ্যে একটা কাজ করেছিলেন, রিপন কলেজ থেকে আইনের ডিগ্রি নিয়ে বি-সি-এস পরীক্ষায় বসেছিলেন।"

দ্বৈপায়ন ব্যানার্জির মনে আছে স্ত্রীর কথা শুনে প্রথমে তিনি মিটমিট করে হেসেছিলেন। তারপর বউমার সামনেই স্ত্রীকে জেরা করেছিলেন, "প্রতিভা, আর কোনো কাজের-কাজ করিনি?"

গৃহিণী সস্নেহে কিন্তু প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন, "পরীক্ষায় পাস-দেওয়া ছাড়া সারাজীবনে তুমি আর কিছুই করোনি!"

আড়চোখে নববিবাহিতা পুত্রবধূর দিকে সকৌতুকে তাকিয়ে দ্বৈপায়ন বলেছিলেন, "বউমাকে আমি সালিশী মানছি।"

তারপর আস্তে আস্তে অর্ধাঙ্গিনীকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, "চাকরির জন্যে পরীক্ষায় পাস করা ছাড়াও আর একটা কাজ করেছিলাম—তোমাকে এ-বাড়িতে নিয়ে এসেছিলাম।"

কমলা আন্দাজ করেছিল, বাবার এই সগর্ব ঘোষণায় মা খুব খুশী হবেন। হয়তো পুত্রবধূর সামনে লজ্জা পাবেন। কমলা তাই কোনো একটা ছুতোয় সেখান থেকে সরে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু শ্বশুর শাশুড়ী কেউ যেতে দিলেন না। তাঁদের মেয়ে নেই—তাই কমলার ওপর স্নেহ একটু বেশি।

চোখে-মুখে আনন্দের ভাবটা ইচ্ছে করে চাপা দিয়ে প্রতিভা দেবী ঝগড়ার মেজাজে বলেছিলেন, "একেবারে বাজে কথা।" তারপর কমলার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, "এঁর কোনো কথা বিশ্বাস কোরো না বউমা। তুমি জেনে-রাখো যদি কারুর জন্যে এ-বাড়ির বউ হয়ে থাকতে পারি, সে আমার পুঁটেমামার জন্যে। দেড় বছর মামা ওঁর পিছনে লেগেছিলেন, আর উনি নানান ছুতোয় মামাকে অন্তত ভুগোবার চেষ্টা করেছেন! পুঁটে মামার অসীম ধৈর্য না-থাকলে

আমার বিয়েই হতো না। আমি তখনই ঠিক করেছিলাম, আমার ছেলের বিয়ের সময় মেয়ের বাবাকে একেবারেই ঘোরাবো না।"

"করেওছেন তো তাই," কমলা এবার শাশুড়ীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিল। এ-বাড়িতে বধূ হিসাবে মেয়েকে পাঠাতে তার বাবা-মাকে মোটেই কষ্ট করতে হয়নি। সামান্য এক সপ্তাহের মধ্যে সব কথাবার্তা পাকাপাকি হয়েছিল।

প্রতিভা দেবী বলেছিলেন, "তোমার বিয়ের ব্যাপারে উনি অবশ্য কথার অবাধ্য হননি। ভোম্বল একবার আপত্তি তুলতে গিয়েছিল, একটু সময় দাও, ভেবে দেখি। কিন্তু এমন বকুনি লাগিয়েছিলাম যে আর কথা বাড়াতে সাহস পায়নি। কলেজে অমন শক্ত-শক্ত সব পরীক্ষায় উত্তর লিখতে তিন ঘণ্টার বেশি সময় দেয় না—আর সামান্য একটা বিয়ের ব্যাপারে মতামত জানাতে হাজার দিন সময় কেন চাই?"

"বিয়েটা সামান্য নয়, প্রতিভা," দ্বৈপায়ন ব্যানার্জি পুত্রবধূর সামনেই গৃহিণীর সঙ্গে রসিকতা করেছিলেন।

প্রতিভা এবার অরিজিন্যাল বিষয়ে ফিরে এসেছিলেন। বলেছিলেন, "বিয়ের তিরিশ বছর পরে রহস্যটা বুঝে তো লাভ নেই, এখন বাড়ি সম্বন্ধে যা-বলছি শোনো। তোমাকে এসব নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। তোমার ব্যাঙ্কের পাস বই আমার কাছেই আছে। প্রভিডেন্ট ফাণ্ড এবং ইনসিওর থেকে কত টাকা পাবে তাও আমি পুলিনকে দিয়ে হিসেব করিয়েছি। ভোম্বলের নকশার মতোই বাড়ি হবে। ছোট বাড়ি হোক, লোকে যেন দেখলে খুশী হয়। বউমাকে তুমি যতই নিজের দলে টানো, আমি আর ভোম্বল যা করবো তাই হবে। তোমার কোনো কথায় কখনও কান দিইনি, এখনও দেবো না।"

দ্বৈপায়ন হেসে বলেছিলেন, "ঠিক আছে। বাড়িতে যখন আমার কোনো কথাই চলবে না, তখন বাড়ির বারান্দায় বসে যাতে নিজের কথা ভাবতে পারি এমন ব্যবস্থা যেন থাকে।"

"রিটায়ার করে তুমি যাতে নিজের খেয়াল মতো বসে থাকতে পারো তার ব্যবস্থা তো রাখা হয়েছে—বারান্দা নয়, দোতলায় রীতিমতো ব্যালকনি তৈরি হবে তোমার জন্যে।" প্রতিভার কথাগুলো এখনও কানে বাজছে দ্বৈপায়নের। সেই বাড়ি উঠলো, সেই ব্যালকনি রয়েছে—শুধু প্রতিভা নেই। দ্বৈপায়নের রীতিমতো সন্দেহ হয়, এমন যে হবে প্রতিভা জানতো। তাই আগে থেকে সব ব্যবস্থা করে রেখেছিল।

ব্যালকনি থেকে দ্বৈপায়ন আবার যোধপুর পার্কের রাস্তায় [illegible]।

পথচারীরা ওঁর দিকে নজর দিয়ে হয়তো কত কী ভাবছে। আন্দাজ করছে, বৃদ্ধ ভদ্রলোক সব দিকে সফল হয়ে এখন কেমন নিশ্চিন্ত মনে স্বোপার্জিত অবসরসুখ ভোগ করছেন।

এ-রকম ভুল বুঝবার যথেষ্ট অবকাশ আছে। বিশেষ করে বাড়ির সামনে সুদৃশ্য বোর্ডে নামের তালিকা দেখলে। নেমপ্লেটে প্রথমেই দ্বৈপায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম লেখা—সকলেই জানে তিনি পশ্চিমবঙ্গ সিভিল সার্ভিস থেকে অবসরপ্রাপ্ত। তারপরেই সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, খড়্গপুরের এম-ই। তারপর অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, চাটার্ড অ্যাকাউনটেণ্ট। এখন তো চাটার্ড অ্যাকাউনটেণ্টদেরই যুগ। হিসাবেই তো শিব! অভিজিতের পরে সোমনাথের নামটাও ওখানে লেখা আছে।

ছোটছেলে সোমনাথের কথা মনে আসতেই দ্বৈপায়ন কেমন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। যোধপুর পার্কের এই ছবির মতো সুখের সংসারে ছোট ছেলেটাই ছন্দপতন ঘটিয়েছে। সুব্রত ও অভিজিৎ দুজনেই স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় ভাল ফল করেছিল। সুব্রত তো অঙ্কে লেটার পেয়েছিল। অভিজিৎ ছোকরার নাম যে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় স্কলারশিপ-লিস্টে উঠবে তা দ্বৈপায়ন বা প্রতিভা দেবী কেউ কল্পনা করতে পারেননি। অথচ অভিজিৎ সম্বন্ধেই প্রতিভার বেশী চিন্তা ছিল—ছোকরা মাত্রাতিরিক্ত আড্ডা দিত, সময়মতো পড়াশোনায় বসতো না, বুঁদ হয়ে রেডিও সিলোনে হিন্দী সিনেমার গান শুনতো।

অভিজিৎকে প্রতিভা বলতেন, "তোর কপালে অনন্ত দুর্গতি আছে। গেরস্ত বাঙালীর ঘরে 'পড়াশোনার জোরটাই একমাত্র জোর—আর কিছুই নেই তোদের। তুই এখন লেখাপড়া করছিস না, পরে বুঝবি।"

অভিজিৎ, ওরফে কাজল, ফিকফিক করে হাসতো। কোনো কথাই শুনতো না। পরীক্ষার রেজাল্ট যখন বেরুল তখন প্রতিভা বিশ্বাসই করতে পারেন না, কাজল স্কলারশিপ পেয়েছে। ছেলেটা একটু দূরে দাঁড়িয়ে সেই পুরানো কায়দায় ঠোঁট টিপে হাসছিল।

প্রতিভা বলেছিলেন, "দূরে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? আয় কাছে আয়।" তারপর ছেলেকে জড়িয়ে ধরে একটা চুমু খেয়েছিলেন। লজ্জা পেয়ে কাজল তখন মায়ের আলিঙ্গন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল। প্রতিভা বলেছিলেন, "শুধু শুধু আমাকে এতদিন ভাবিয়ে কষ্ট দিলি।"

সেই সব দিনের কথা ভেবে দ্বৈপায়নের মনে হাসি আসছিল। প্রতিভার খুব বিশ্বাস ছিল ছোট ছেলের ওপরে। সোমনাথ মায়ের কথা শুনতো। ছোট

বয়স থেকেই সোমনাথ খুব শান্ত। পড়ায় বসাবার জন্যে মাকে কখনও বকাবকি করতে হতো না। সন্ধ্যা হওয়া-মাত্র হাত-পা ধুয়ে পড়ার টেবিলে চলে যেত খোকন। নিজের মনে পড়ে যেত, মা ডাকলে তবে উঠে এসে চায়ের পেয়ালা নিত। রাত্রে খাবার তৈরি হলে প্রতিভা ডাকতেন, বই-পত্তর গুছিয়ে রেখে খোকন খেতে বসতো। প্রতিভা বলতেন, "খোকনকে নিয়ে আমাকে একটুও ভাবতে হবে না।"

হাসলেন দ্বৈপায়ন। এখন যত ভাবনা সেই খোকনকে নিয়েই। তবে প্রতিভা এক দিকে ঠিকই বলেছিল। সোমনাথের ভাবনা প্রতিভাকে একটুও ভাবতে হচ্ছে না। সমস্ত দায়-দায়িত্ব দ্বৈপায়নের ওপর চাপিয়ে দিয়ে সে অসময়ে বিদায় নিয়েছে।

ওপরের ব্যালকনিতে চায়ের কাপে দ্বৈপায়ন যখন চুমুক দিলেন তখন সোমনাথ একতলায় নিজের বিছানায় আর একবার পাশ ফিরে শুলো।

সোমনাথেরও এই মুহূর্তে মায়ের কথা মনে পড়ে গেল। মা সত্যিই আদরের ছোটছেলের ওপর অগাধ আস্থা রেখেছিলেন। মায়ের ভরসা ছিল, ছোটছেলে বাড়ির সেরা হবে। তাই সেবার যখন সেই দাড়িওয়ালা শিখ গণৎকার টালিগঞ্জের বাড়িতে যা-তা ভবিষ্যদ্বাণী করে গেল তখন মা ভীষণ চটে গেলেন। সেই তারিখটা সোমনাথ বলে দিতে পারে—কারণ সেদিন ছিল সোমনাথের জন্মদিন। হাতে কিছু কাগজপত্তর নিয়ে শিখ গণৎকার তাদের দরজায় এসে কলিং বেল টিপেছিল।

বাড়িতে তখন মা এবং সোমনাথ ছাড়া আর কেউ ছিল না। দাদারা কলেজে বেরিয়েছে, বাবা অফিসে। সোমনাথ শুধু ইস্কুলে যায়নি—জন্মদিনে মায়ের কাছে আবদার করেছিল, "আজ তোমার কাছে থাকবো মা।" মা এমনিতে বেজায় কড়া কিন্তু ছোটছেলের জন্মদিনে নরম হয়েছিলেন। বেল বাজানো শুনে মা নিজেই দরজা খুলতে এসে গণৎকারের দেখা পেলেন।

মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে গণৎকার চটপট বললে, "তুই গণনায় বিশ্বাস করিস না। কিন্তু তোর মুখ দেখে বলছি আজ তোর খুব আনন্দের দিন।"

সেই কথা শুনেই মায়ের খানিকটা বিশ্বাস হলো। গণকঠাকুরকে বাইরের ঘরে বসতে দিলেন। বললেন, "আমার হাত দেখাবো না। আমার ছেলের ভাগ্যটা পরীক্ষা করিয়ে নেবো।" এই বলে, মা সোমনাথকে ডাকলেন।

মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে, বিড়বিড় করে কী সব হিসেব-পত্তর করে শিখ

বললে, "বেটী, তোর তিনটে ঘড়া আছে।" ঘড়া বলতে গণকঠাকুর যে ছেলেদের কথা বলছেন তা মায়ের বুঝতে দেরি হলো না। গণনা মিলে যাচ্ছে বলে একটু আনন্দও হলো। কিন্তু এবার গণৎকার চরম বোকামি করে বসলো। বললে, "তোর প্রথম দুটো ঘড়া সোনার—আর ছোটটা মাটির।"

শোনা মাত্রই মায়ের মেজাজ বিগড়ে গেল। ইতিমধ্যে সোমনাথ সেখানে এসে পড়েছে। কিন্তু মা তখন গণকঠাকুরকে বিদায় করছেন, বলছেন, "ঠিক আছে আপনাকে আর হাত দেখতে হবে না।"

গণকের কথা মা বিশ্বাসই করতে চাননি। তাঁর ধারণা, তাঁর তিনটে ঘড়াই সোনার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কী হলো?

সোমনাথ আর একবার পাশ ফিরলো। একটা মশা পায়ের কাছে জ্বালাতন করছে। অনেকগুলো দুশ্চিন্তা মাথার ভিতর জট পাকাচ্ছে এবং মাঝে মাঝে মশার মতো পোঁ পোঁ আওয়াজ করছে। চাকরির বাজারে কী যে হলো—এত চেষ্টা করেও সামান্য একটা কাজ জোটানো গেল না।

সোমনাথ হয়তো বড়দা এবং ছোটদার মতো ব্রিলিয়াণ্ট নয়, হয়তো সে স্কুল ফাইনালে ওদের মতো ফার্স্ট ডিভিসন পায়নি। কিন্তু যেসব ছেলে সেকেণ্ড কিংবা থার্ড ডিভিসনে পাস করেছে তাদের কি এদেশে বাঁচবার অধিকার নেই? তারা কি গঙ্গার জলে ভেসে যাবে?

গত আড়াই বছরে অন্তত কয়েক হাজার চাকরির অ্যাপ্লিকেশন লিখেছে সোমনাথ—কিন্তু ওই আবেদন-নিবেদনই সার হয়েছে। আজকাল, সত্যি বলতে কি চাকরির ব্যাপারটা আর ভাবতেই ইচ্ছে করে না সোমনাথের। কোনো লাভ হয় না, মাঝখান থেকে মেজাজটা খারাপ হয়ে যায়।

আবার একটু ঘুমের ঘোর আসছে সোমনাথের।

সোমনাথের মনে হচ্ছে চাকরির উমেদারি এবার শেষ হলো। ধবধবে সাদা শার্ট-প্যাণ্ট এবং নীল রঙের একটা টাই পরে সোমনাথ প্রখ্যাত এক বিলিতী কোম্পানির মিটিং রুমে বসে আছে। দিশী সায়েবরা ইণ্টারভিউ নিচ্ছেন। তাঁরা একের পর এক প্রশ্নবাণ ছাড়ছেন, আর সোমনাথ অবলীলাক্রমে সেই সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছে। একজন অফিসার তারই মধ্যে বললেন, "মিস্টার ব্যানার্জি, আপনি থিচুন পেপারে ফরেন ক্যাপিটাল সম্পর্কে খুব সুন্দর উত্তর লিখেছেন। এ-বিষয়ে আরও দু-একটা কথা আপনার কাছ থেকে জানতে চাই।" ভদ্রলোকের প্রশ্নে সোমনাথ একটুও ভয় পাচ্ছে না। কারণ [illegible] ক্যাপিটাল সম্পর্কে

ইন্টারভিউ শেষ করে সৌজন্যমূলক ধন্যবাদ জানিয়ে সোমনাথ বেরিয়ে যাচ্ছিলো। এমন সময় সুন্দরী এক অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সেক্রেটারী মিটিং রুমের বাইরে ওর পথ আটকালো। বললে, "মিঃ ব্যানার্জি, আপনি চলে যাবেন না— রিসেপশন হলে একটু অপেক্ষা করুন।"

মিনিট পনেরো পরে সোমনাথের আবার ডাক হলো। পার্সোনেল অফিসার অভিনন্দন জানালেন এবং করমর্দনের জন্যে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "বুঝতেই পারছেন, আমরা আপনাকেই সিলেক্ট করেছি। দু-একদিনের মধ্যেই জেনারেল ম্যানেজারের সই করা চিঠি পাবেন। অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার পাওয়া মাত্রই আমাদের জানিয়ে দেবেন, কবে কাজে যোগ দিতে পারবেন!"

সেই চিঠিটার জন্যেই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে সোমনাথ। কখন কমলা বউদি ঘরে টোকা দেবেন, হাসিমুখে বলবেন, "নাও তোমার চিঠি, এই মাত্র পিওন দিয়ে গেল।"

সত্যিই দরজায় টোকা পড়ছে। সোমনাথের ঘুম ভেঙে গেল। চুড়ির আওয়াজেই সোমনাথ বুঝতে পারছে কে ধাক্কা দিচ্ছে। তাহলে এই ইণ্টারভিউ-এর ব্যাপারটাই মিথ্যা—ভোরবেলায় সোমনাথ এতক্ষণ ধরে স্বপ্ন দেখছিল।

সোমনাথ দরজা খুলে দিলো। মেজদার বউ বুলবুল দাঁড়িয়ে রয়েছে। বুলবুলের সঙ্গে সোমনাথের একটু রসিকতার সম্পর্ক। ওরা এক সঙ্গে চার বছর কলেজে পড়েছে। বুলবুল বললে, "গুড মর্নিং। পাখি সব করে রব, রাত্রি পোহাইল। আর কতক্ষণ ঘুমুবে?"

মুখ গম্ভীর করে সোমনাথ শুয়ে রইলো। মনে মনে বললে, "বেকার মানুষ, সকাল-সকাল উঠেই বা কী করবো?"

বুলবুল বললে, "দিদির হুকুম, সোমকে তুলে দাও।"

"বউদি কোথায়?" সোমনাথ জিজ্ঞেস করলে।

"বউদি এখন নিজের কাজে ব্যস্ত।"

সোমনাথ একমত হলো না। "বউদির একমাত্র ছেলে পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলে রয়েছে। বউদির কর্তাটি বেশ কিছুদিন অফিসের কাজে কলকাতার বাইরে। সুতরাং বউদি এখন নিজের কাজে কী করে ব্যস্ত থাকবেন?"

বুলবুল ঠোঁট বেঁকিয়ে বললে, "দাঁড়াও, দিদিকে রিপোর্ট করছি। কর্তা ছাড়া আমাদের বুঝি আর কোনো কাজকর্ম নেই?"

সোমনাথ অধৈর্য কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, "আঃ! বলো না বউদি কোথায়?"

বুলবুল হেসে বললে, "আমিও তো তোমার বউদি।"

সোমনাথ বললে, "তোমাকে তো আমি এখনও বউদি বলে রেকগনাইজ করিনি। দাদার বউ হলেই বউদি হওয়া যায় না, বুঝলে?"।

"তবে কী হওয়া যায়?" সহাস্য বুলবুল চোখ দুটো বড় বড় করে জানতে চাইলো।

"সে সব তোমাকে বোঝাতে অনেক সময় লাগবে," সোমনাথ উত্তর দিলো। "সময় মতো বলা যাবে। এখন বলো বউদি কোথায়?"

বুলবুল বললে, "দিদি দোতলার ব্যালকনিতে বসে বাবার সঙ্গে কথা বলছেন। মাথায় অনেক দায়িত্ব, হাজার হোক বাড়ির বড় গিন্নী তো।"

সোমনাথ জিজ্ঞেস করলো, "তোমার কর্তা ঘুম থেকে উঠেছে?"

"কোন সকালে উঠে পড়েছে। অফিসে কী সব জরুরী মিটিং আছে, এখনই গাড়ি আসবে। তাই বাথরুমে ঢুকেছে।"

বুলবুল বললে, "ওর অফিসে কী যে হয়েছে! শুধু কাজ আর কাজ। লোকটাকে খাটিয়ে খাটিয়ে মারছে।" সোমনাথের জন্যে বুলবুল এবার চা আনতে গেল।

অফিসে এই খাটিয়ে মেরে ফেলার প্রসঙ্গটা সোমনাথের ভাল লাগলো না। চাকরি পেলে অফিসে খুব খাটতে হাজার-হাজার বেকারের মোটেই আপত্তি নেই। চাকরিওয়ালা লোকগুলো বেশ আছে। চাকরি করছো এই না যথেষ্ট—তবু মন ওঠে না কাজেও আপত্তি।

চা খেয়ে সোমনাথ চুপচাপ বসেছিল। কী করবে ভেবে ঠিক করতে পারছিল না। হাত-পা গুটিয়ে চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া বেকারদের কীই বা করবার আছে?

কমলা বউদি ওপর থেকে ইংরিজী খবরের কাগজখানা নামিয়ে আনলেন। সোমনাথ দেখলো, বাবা ইতিমধ্যেই কয়েকটা চাকরির বিজ্ঞাপনে লাল পেন্সিলের মার্কা দিয়েছেন। বাবার এইটাই প্রাত্যহিক কাজ। খবরের কাগজে প্রথম পাতায় চোখ না বুলিয়ে বাবা সর্বপ্রথম দ্বিতীয় পাতায় 'চাকরি খালি' শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনগুলো পড়ে ফেলেন। প্রয়োজন মতো লাল দাগ মারেন। বিজ্ঞাপনগুলো তখন কাটেন না, বাড়ির অন্য লোকেরা কাগজ পড়বে। দুপুরে আবার

পর কমলা বউদি আবার খবরের কাগজগুলো বাবার কাছে পৌঁছে দেন। বাবা নিজের হাতে ব্লেড দিয়ে বিজ্ঞাপনগুলো কেটে সোমনাথের কাছে পাঠিয়ে দেন।

কমলা বউদির ইচ্ছে নয় সোমনাথ চুপচাপ বাড়িতে বসে সময় কাটায়। তাই প্রায় জোর করেই ওকে একবার গড়িয়াহাট বাজারে পাঠালেন। বললেন, "তোমার দাদা নেই—শ্রীমান ভজহরির ওপর প্রত্যেকদিন নির্ভর করতে সাহস হয় না। বেশী দাম দিয়ে খারাপ জিনিস নিয়ে আসে। ওর দোষ নয়, গরীব মানুষ দেখলে আজকাল দোকানদারও ঠকায়।"

পাজামার ওপর একটা পাঞ্জাবি গলিয়ে সোমনাথ বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লো। হাতে থলে নিয়ে যে-সোমনাথ গড়িয়াহাট বাজার থেকে পুকুরের বাটা মাছ কিনছে তাকে দেখে কে বলবে বাংলার লক্ষ-লক্ষ হতভাগ্য বেকারদের সে একজন? জিনিসপত্তর কিনতে-কিনতে অনেকে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে অফিসে যাবার মতো যথেষ্ট সময় আছে কিনা দেখে নিচ্ছেন। সোমনাথের কীরকম অস্বস্তি লাগছে—ওর যে অফিসে যাবার তাড়া নেই তা লোকে বুঝুক সে মোটেই চায় না।

কলেজে পড়বার সময়ে সোমনাথ কতবার বাজার করেছে। কিন্তু কখনও এই ধরনের অস্বস্তি অনুভব করেনি। পরিচিত কারুর সঙ্গে বাজারে বা রাস্তায় দেখা হলে তার ভালই লেগেছে। কিন্তু এখন দূর থেকে কাউকে দেখলেই সে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে। কারণটা আর কিছু নয়, লোকে বেমালুম জিজ্ঞেস করে বসে, "কী করছো?" যতদিন কলেজের খাতায় নাম ছিল, ততদিন উত্তর দেবার অসুবিধা ছিল না। যত মুশকিল এখনই।

যেখানে বাঘের ভয় সেখানে সন্ধ্যে হয়। বাজারের গেটের কাছেই সোমনাথ শুনতে পেল, "সোমনাথ না? কী ব্যাপার তোমার অনেকদিন কোনো খবরাখবর নেই!"

সোমনাথ মুখ তুলে দেখলো অরবিন্দ সেন। ওদের সঙ্গেই কলেজে পড়তো। অরবিন্দ নিজেই বললে, "ইউ উইল বি গ্ল্যাড্ টু নো বেস্ট-কীন-রিচার্ডসে ম্যানেজমেণ্ট ট্রেনি হয়েছি। এখন সাতশ' টাকা দিচ্ছে। গড়িয়াহাট মোড় থেকে মিনি-বাসে কোম্পানির ফ্যাক্টরিতে নিয়ে যায়। এখানে সাড়ে-সাতটার সময় আমাকে রোজ দেখতে পাবে। রাস্তার ওপারে দাঁড়াই—সিগারেট কেনবার জন্যে ভাগ্যিস এই পারে এসেছিলাম তাই তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।"

সোমনাথ দেখলো অরবিন্দের হাতে গোল্ড ফ্লেক সিগারেটের প্যাকেট।

"চলবে নাকি একটা?" অরবিন্দ প্যাকেট এগিয়ে দিলো।

সোমনাথ সিগারেট নিলো না। অরবিন্দ হেসে ফেললো। "তুমি এখনও সেই ভাল ছেলে রয়ে গেলে? মেয়েদের দিকে তাকালে না, সিগারেট খেলে না, অশ্লীল ম্যাগাজিন পড়লে না।"

অববিন্দ এবাব জিজ্ঞেস কবে বসলো, "তুমি কী করছো?"

সোমনাথ অত্যন্ত লজ্জা বোধ কবছে। দিস্তে দিস্তে চাকবির অ্যাপ্লিকেশন লেখা ছাডা সে যে আব কিছুই কবছে না তা জানাতে মাথা কাটা যাচ্ছে সোমনাথেব। কোনোবকমে আমতা আমতা কবে বলতে যাচ্ছিলো, "দেখা যাক, ধীরে সুস্থে কী কবা যায়।"

কিন্তু তাব আগেই অরবিন্দ বললে, "চেপে বাখবাব চেষ্টা করছো কেন ভাই? শুনলাম, ফবেনে যাবাব প্রোগ্রাম কবে ফেলেছো? তা ভাই, ভালই কবছো। আমবা এই ভোব সাড়ে-সাতটাব সময় বাড়ি থেকে বেবিয়ে, পাঁচ বছর কাবখানাব তেল কালি মেখে বেস্ট কীন-বিচার্ডসেব জুনিযাব অফিসাব হবো। আব তুমি তিনবছব পবে ফবেন থেকে ফিবে এসে হযতো বেস্ট-কীনেই আমাব বস্ হয়ে বসবে।"

ফবেন যাবাব কথাটা যদিও পুবোপুবি মিথ্যে, তবুও সোমনাথের মন্দ লাগছে না। "কে বললো তোমাকে?" সোমনাথ প্রশ্ন কবলো।

"নাম বলতে পাববো না—তবে তোমাবই কোনো ফ্রেণ্ড," অরবিন্দ উত্তর দিলো।

"গার্ল ফ্রেণ্ডও হতে পাবে," এই বলে অববিন্দ এবার বহস্যজনকভাবে হাসলো। "বেশ গোপনে কাজটা সেবে ফেলবাব চেষ্টা কবছো তুমি," বললে অববিন্দ।

দূব থেকে বেস্ট-কীন-রিচার্ডসেব ঝকঝকে মিনি-বাস আসতে দেখে অববিন্দ বললে, "তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে। দু-একদিনের মধ্যেই তোমাব সঙ্গে দেখা কববাব প্রযোজন হবে। সামনেব ববিবাবে বিকেলটা ফ্রি রেখো। কারণটা যথা সময়ে জানতে পাববে। তোমার বাডিব নম্বব?"

সোমনাথ বাড়ির নম্বরটা বলে দিলো। অরবিন্দ ততক্ষণ ছুটে গিয়ে মিনি-বাস ধরে ফেলেছে।

বাজারের থলিটা বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে নিজের ঘরে বসে সোমনাথ ভাবছিল ফরেন যেতে পারে শুনে অরবিন্দ সেন বেশ খাতিব করে কথা বললো। ওর বাবা কেন্দ্রীয় সরকারের বড় অফিসার। ছোট একটা গাড়ি ড্রাইভ করে [illegible] আসতো। সোমনাথের সঙ্গে তেমনভাবে মিশতো না অরবিন্দ। কিন্তু

বিদেশে যাবার এই গল্পটা কে বানালো? দু-একজন পরিচিত মহিলার মুখ মনে পড়ে গেল। কয়েকটা ছবি সরাবার পর হঠাৎ তপতীর মুখটাও চোখের সামনে ভেসে উঠলো। তপতীই হয়তো অস্বস্তি এড়াবার জন্য রত্নাকে গল্পটা বলেছে। কলেজে রত্নার সঙ্গে তপতীর খুব ভাব ছিল। অরবিন্দ যে রত্নার সঙ্গে জমিয়ে প্রেম করছে এ-খবর কারুর অজানা নয়।

কিন্তু তপতী জেনেশুনে কেন এইভাবে বন্ধু মহলে সোমনাথকে অপ্রস্তুত করতে যাবে? সোমনাথ আরও কিছু ভাবতে যাচ্ছিলো, কিন্তু তার চিন্তায় বাধা পড়লো। বাইরে ইলেকট্রিক কলিং বেল বাজছে।

কমলা বউদি খবর দিলেন সুকুমার এসেছে। রোগা, কালো, বেশ লম্বা, মিষ্টি স্বভাবের এই ছেলেটি সম্পর্কে কমলা বউদির একটু দুর্বলতা আছে। ও-বেচারাও বেকার। ওর উজ্জ্বল অথচ অসহায় চোখ-দুটোর দিকে তাকালে মায়া হয় কমলার।

বাইরের ঘরে সোমনাথ ঢুকতেই সুকুমার বললে, "তোর হলো কী? সাড়ে-আটটা বেজে গেছে, এখনও বিছানার মায়া কাটাতে পারিসনি?"

সোমনাথ যে ইতিমধ্যে বাজার-হাট সেরে ফেলেছে তা চেপে গেল। বললে, "বেকারের কী আর করবার আছে বল?"

"ফের আবার ওই অশ্লীল কথাটা মুখে আনলি। তোকে বলেছি না, 'বিধবার' মতো 'বেকার' কথাটা আমার খুব খারাপ লাগে। আমরা চাকরি খুঁজছি, সুতরাং আমাদের চাকুরি-প্রার্থী বলতে পারিস।"

"তুই যে আবার প্রথম ভাগের গোপাল হবার পরামর্শ দিচ্ছিস—কানাকে কানা, খোঁড়াকে খোঁড়া, বেকারকে বেকার বলিও না," সোমনাথ মন্তব্য করলো।

সুকুমার বললে, "দাঁড়া মাইরি। কড়া রোদ্দুরে যাদবপুর কলোনি থেকে হাঁটতে-হাঁটতে এই যোধপুর পার্কে এসেছি। গলা শুকিয়ে গেছে, একটু খাবার জল পেলে মন্দ হতো না।"

কমলা বউদি ঠাণ্ডা জল নিয়ে এলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "চা খাবে তো, সুকুমার?"

সুকুমার খুব খুশী হলো। বললে, "বউদি, যুগ যুগ জিও।'

বউদি চলে যেতে সুকুমার বন্ধুকে বললে, "তুই মাইরি খুব লাকি। যখন-তখন চায়ের অর্ডার দেবার সিস্টেম আমাদের বাড়িতে বন্ধ হয়ে গিয়েছে বাই অর্ডার অব দি হোম বোর্ড।" সুকুমারের কিন্তু সেজন্যে কোনো অভিমান

নেই। ফিক করে হেসে, বন্ধুকে জানিয়ে দিলো, "দাঁড়া, একখানা চাকরি যোগাড় করি। তারপর বাড়িতে আমূল বিপ্লব এনে ছাড়বো। যখন খুশী চায়ের জন্যে একটা ইলেকট্রিক হিটার কিনে ফেলবো। চা চিনি দুধের খরচ পেলে বাড়িতে কেউ আর রাগ করবে না।"

সুকুমারটা সত্যিই অভাগা। ওর জন্যে সোমনাথেরও কষ্ট হয়। শুনেছে, যাদবপুরে একটা টালির ছাদের কাঁচা বাড়িতে থাকে। ওর তিনটে আইবুড়ো বোন। টাকার অভাবে বিয়ে হচ্ছে না। গতবছর সুকুমারের বাবার রিটায়ার হবার কথা ছিল। সায়েবের হাতে-পায়ে ধরে ভদ্রলোক এক বছর মেয়াদ বাড়িয়ে নিয়েছেন। কিন্তু তিন মাস পরেই চাকরি শেষ হবে। তারপর ওদের কী যে হবে। সুকুমারই বড়। আরও দুটো ভাই ছোট, ক্লাসে পড়ে। এই ক'মাসে একটা কাজ যোগাড় না-হলে কেলেঙ্কারি। বাবার পেনসন নেই। প্রভিডেন্ট ফাণ্ড থেকেও টাকা ধার নেওয়া আছে। তার ওপর কো-অপারেটিভ সোসাইটিতে কিছু দেনা আছে বাবার। বড়দির বিয়ে দিতে গিয়ে সেবার ধার না-করে উপায় ছিল না। এ-সব বাদ দিয়ে সুকুমারের বাবা হয়তো হাজার ছয়েক টাকা পাবেন। তিনি ভাবছেন তিনভাগ করে তিন মেয়ের নামে দু হাজার করে লিখে দেবেন। সুকুমারের বাবা অবশ্য জানেন, দু হাজার-টাকায় আজকাল বস্তির ঝিদেরও বিয়ে হয় না। কিন্তু মেয়েরা যেন না-ভাবে, বাবা তাদের জন্য কিছুই করেননি।

সুকুমারকে এ-বাড়ির সবাই জানে। সোমনাথের সঙ্গে সে একই কলেজে পড়েছে। সোমনাথের মতোই সেকেণ্ড ডিভিসনে পাস করেছিল সুকুমার। তারপর সোমনাথের-মতোই সাধারণভাবে বি-এ পাস করেছে। সুকুমার হয়তো আর একটু ভাল করতে পারতো। কিন্তু পরীক্ষার ঠিক আগে মায়ের ভীষণ অসুখ করলো। এই যায় এই যায় অবস্থা—ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্ত দিয়ে, সারা রাত জেগে রোগীর সেবা করে সুকুমারকে পরীক্ষায় বসতে হয়েছিল। মেজ বোন কণা বকাবকি না করলে সুকুমারের হয়তো পরীক্ষাই দেওয়া হতো না।

চায়ের কাপ নামিয়ে কমলা বউদি জিজ্ঞেস করলেন, "কেমন আছ, সুকুমার?"

এক গাল হেসে সুকুমার উত্তর দিলে, "খারাপ নই, বউদি। সামনে অনেকগুলো চাকরির চান্স আসছে।"

কমলা বউদি সস্নেহে বললেন, "চা বোধ হয় খুব কড়া হয়নি। তুমি তো আবার পাতলা চা পছন্দ করো না।"

সুকুমার দেখলো চায়ের সঙ্গে বউদি দুখানা বিস্কুটও দিয়েছেন। হাত দুটো দ্রুত ঘষে সুকুমার বললে, "বউদি, ভগবান যদি আপনাকে ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের পার্সোনেল ম্যানেজার করতেন !"

বুঝতে না-পেরে সোমনাথ প্রতিবাদ করলে। "কেন রে ? বউদি কোন দুঃখে ব্যাঙ্কের চাকর হতে যাবে ”

সরল মনে সুকুমার বললে, "বউদির একটু কষ্ট হতো স্বীকার করছি। কিন্তু তোর এবং আমার একটা হিল্লে হয়ে যেত। দুজনে বউদির অফিসঘরে ঢুকে পড়লে বউদি শুধু আদর করে চা খাইয়ে ছাড়তেন না—সঙ্গে সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দিয়ে দিতেন।"

সুকুমারের কথা শুনে কমলাও হেসে ফেললো। দুই বেচারার মুখের দিকে তাকিয়ে কমলার মনে হলো ওরকম একটা বড় পোস্ট থাকলে মন্দ হতো না। অন্তত এদের মুখে একটু হাসি ফোটানো যেত।

সুকুমার কিন্তু চাকরির আশা এখনও ছাড়েনি। সব সময় ভাবে, এবার একটা কিছু সুযোগ নিশ্চয় এসে যাবে। চা খেতে-খেতে সে সোমনাথকে বললে, "আর ক'টা দিন। তারপর হয়তো দেশে বেকার বলে কিছু থাকবেই না।"

সোমনাথ নিজেও একসময় এই ধরনের কথা বিশ্বাস করতো। এখন ভরসা কমেছে।

সুকুমার বললে, "একেবারে ভিতরের খবর। রেল এবং পোস্টাপিসে ছ হাজার নতুন পোস্ট তৈরি হচ্ছে। মাইনেও খুব ভাল—টু হানড্রেড টেন। সেই সঙ্গে হাউস রেন্ট, ডি-এ। তারপর যদি কলকাতায় পোস্টিং করিয়ে নিতে পারি, তাহলে তো মার দিয়া কেল্লা। ঘরের খেয়ে পুরো মাইনেটা নিয়ে চলে আসবো, অথচ ক্যালকাটা কমপেনসেটরি অ্যালাউন্স পাবো মোটা টাকা।"

সোমনাথ এবার একটু উৎসাহ পেল। জিজ্ঞেস করলো, "কিন্তু এই 'ক্যালকাটা কমপেনসেটরি' ব্যাপারটা কী রে ?"

সুকুমার হেসে ফেললো। "ওরে মূর্খ, তোকে আর কী বোঝাবো ? চাকরি করবার জন্যে কলকাতায় থাকতে তো আমাদের কষ্ট হবে—তাই মাইনের ওপর ক্ষতিপূরণ ভাতা পাওয়া যাবে।"

এই ব্যাপারটা সোমনাথের জানা ছিল না। "বারে ! চিরকালই তো তুই আর আমি কলকাতায় আছি—এর জন্যে ক্ষতিপূরণ কী ?" সোমনাথ বোকার মতো জিজ্ঞেস করে। কাল্পনিক চাকরির সুখস্বপ্নে এবং মাইনে [illegible]

বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা করতে ওদের দুজনেরই ভাল লাগে।

সুকুমার বিরক্ত হয়ে বললে, “বেশ বাবা, তোর যখন এতই আপত্তি, চাকরিতে ঢুকে তুই অ্যালাউন্স নিস না।”

এবার দুজনেই হেসে ফেললো। একসঙ্গে দুজনেই যেন হঠাৎ বুঝতে পারলো ওরা জেগে স্বপ্ন দেখছে, এমনভাবে কথা বলছে যেন চাকরিটা ওদের পকেটে।

সারাদিন টো টো করে সমস্ত শহর চষে বেড়ায় সুকুমার। এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ, রাইটার্স বিল্ডিংস, ক্যালকাটা কর্পোরেশন, বিভিন্ন ব্যাঙ্ক, কারখানা, অফিস কিছুই বাদ দেয় না। তাছাড়া বিভিন্ন দলের বেশ কয়েকজন এম-এল্-এ এবং দুজন কর্পোরেশন কাউনসিলর-এর সঙ্গেও সুকুমার ভাব জমিয়ে এসেছে।

সুকুমার বললে, “ক’দিন আগে বাবা হঠাৎ আমার ওপর রেগে উঠলেন। ওঁর ধারণা আমি চাকরির জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করছি না। ভাইবোনদের সামনে চীৎকার করে উঠলেন, ‘হাত পা গুটিয়ে চুপচাপ বাড়িতে বসে থাকলে কোলের ওপর চাকরি ঝপাং করে পড়বে না।’ সেই থেকে এই ‘ঘুরঘুরে’ পলিসি নিয়েছি। দিব্যি কেটেছি, দুপুরবেলায় বাড়িতে বসে থাকবো না।”

সোমনাথ অজানা আশঙ্কায় চুপ করে রইলো। সুকুমারের সংসারের কথা শুনলে ওর কেমন অস্বস্তি লাগে। যে-সুকুমার দুঃখ ভোগ করছে, সে কিন্তু মান-অপমান গায়ে মাখছে না। বেশ সহজভাবে সুকুমার বললে, “আমি ভেবেছিলুম মা আমার দুঃখ বুঝবে। কিন্তু মা-ও সাপোর্ট করলে বাবাকে। আমি ভাবলুম, একবার বলি, কলকাতা শহরে ঘোরাঘুরি করতে গেলেও পয়সা লাগে। যাদবপুর থেকে ডালহৌসি স্কোয়ার তো দুবেলা হেঁটে মারা যায় না।”

সুকুমারের কথাবার্তায় কিন্তু কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ নেই। অপমান ও দুঃখের বোঝাটা সে বেশ সহজভাবেই মাথায় তুলে নিয়েছে।

সুকুমারের সান্নিধ্য আজকাল সোমনাথের বেশ ভাল লাগে। কলেজে একসঙ্গে পড়েছে, তখন কিন্তু তেমন আলাপ ছিল না। সুকুমারকে সে তেমন পছন্দ করতো না—নিজের পরিচিত কয়েকজন বন্ধু ও বান্ধবীদের নিয়েই সোমনাথের সময় কেটে যেত। চাকরি-বাকরির দুঃস্বপ্ন যে এমনভাবে জীবনটাকে গ্রাস করবে তা সোমনাথ তখনও কল্পনা করতে পারেনি।

কিন্তু বি-এ পরীক্ষায় পাসের পর আড়াই বছর আগে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের লাইনে দুই সহপাঠীতে দেখা হয়ে গেল। সাড়ে-পাঁচ ঘণ্টা ধরে দুজনে একই লাইনে দাঁড়িয়েছিল। বাদাম ভাজা কিনে সুকুমার ভাগ দিয়েছিল।

সোমনাথকে। একটু পরে ভাঁড়ের চা কিনে সোমনাথ বন্ধুকে খাইয়েছিল। লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে সোমনাথের মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল। এই ধরনের অভিজ্ঞতা আগে কখনও হয় নি। সোমনাথের মনের অবস্থা সুকুমার সহজেই বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু সুকুমারের মনে তখন অনেক আশা। বন্ধুকে উৎসাহ দিয়ে সে বলেছিল, "ভাবিস না, সোমনাথ। দেশের এই অবস্থা চিরকাল থাকতে পাবে না। চাকরি-বাকরি আমাদের একটা হবেই।"

দুজনে ঠিকানা বিনিময় করেছিল। কয়েকদিন পরেই সুকুমার যোধপুর পার্কের বাড়িতে সোমনাথের খোঁজ করতে এসেছিল। সোমনাথের সাজানো-গোছানো বাড়ি দেখে সুকুমার খুব আনন্দ পেয়েছিল। কথায়-কথায় সুকুমার একদিন বলেছিল, "আমাদের মাত্র দেড়খানা ঘর। বসতে দেবার একখানা চেয়ারও নেই। চাকরি-বাকরি হলেই ওসব দিকে একটু নজর দিতে হবে। দুটো চেয়ার একটা টেবিল, জানলার পর্দা—কিনতেই হবে। আমার বোন পর্দার রঙ পর্যন্ত ঠিক করে রেখেছে, কোন দোকান থেকে কিনবে তাও ঠিক, শুধু আমার চাকরি হবার অপেক্ষা।"

ওদের বাড়িতে যাবার মতলব করেছে সোমনাথ। কিন্তু সুকুমার উৎসাহ দেয়নি। সোজাসুজি বলেছে, "চাকরিটা হোক, তারপর একদিন তোকে নেমন্তন্ন করে নিয়ে গিয়ে খাওয়াবো। এখন যা বাড়ির মেজাজ, তোকে নিজে থেকে এক কাপ চা পর্যন্ত দেবে না। ঘরের মধ্যে বসাতে পারবো না, বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলতে হবে।"

সুকুমার বিব্রত হবে ভেবেই সোমনাথ ওদের বাড়িতে যাবার প্রস্তাব তোলেনি। কিন্তু দুই বন্ধুতে প্রায় দেখা হয়েছে। যোধপুর পার্ক থেকে গল্প করতে করতে ওরা কখনও সেলিমপুরের মোড়ে চলে গেছে। দুজনে সমব্যথী, সুখ দুঃখের কত কথা হয় নিজেদের মধ্যে।

আজও সুকুমার বললে, "বাড়িতে বসে থেকে কী করবি? চল একটু ঘুরে আসি।"

বাড়ি থেকে বেরোবার সুযোগ পেয়ে সোমনাথ রাজী হয়ে গেল। ট্রাউজারের ওপর একটা বুশ শার্ট গলিয়ে নিয়ে সুকুমারের সঙ্গে সে পথে বেরিয়ে পড়লো।

রাস্তায় সকালের জনপ্রবাহ দেখে সোমনাথ নিজের দুঃখের কথা ভাবে। পৃথিবীটা যে কত নিষ্করুণ তা সে বোধ হয় এখনও পুরোপুরি বুঝতে পারেনি। বাড়িতে দাদা বউদি বাবা সবাই এত ভালবাসেন, এত তার প্রতিপত্তি—কিন্তু

বাড়ির বাইরে এই জন-অরণ্যে তার কোনো দাম নেই। অন্যের সঙ্গে লড়াই করে একটা সামান্য দশটা-পাঁচটার চাকরি পর্যন্ত সে যোগাড় করতে পারছে না।

সুকুমার জিজ্ঞেস করলো, "কী হলো তোর? গম্ভীর হয়ে গেলি কেন?"

সোমনাথ বললে, "ভাবছি, বাড়ির ভিতরের সঙ্গে বাড়ির বাইরের কত তফাত।"

"মারো গুলি! কবিতা ছাড়," সুকুমার এবার বকুনি লাগালো। "তুই ভাগ্যবান। বেশীর ভাগ লোকের ভেতর-বাইরে দুই-ই কেরোসিন! আমার অবস্থা দেখ না। জুলাই মাস থেকে বাবার চাকরি থাকবে না। বাড়ির বড় ছেলে, অথচ সংসারে কোনো প্রেস্টিজ নেই।"

"কেন?" সোমনাথ জিজ্ঞেস করে।

"চাকরি থাকলে প্রেস্টিজ হতো। এখন বাবা মা ভাই বোন সবাই বলে, গুড ফর নাথিং। অনেক ইয়ং ম্যান নাকি এই বাজারেও চাকরি ম্যানেজ করছে। শুধু আমিই পারছি না। বাবা মাঝে মাঝে বলেন, 'ভস্মে ঘি ঢেলেছি। সুকুমারকে বি-এ পড়িয়ে কী ভুলই যে করেছি।' বিদ্যে না-থাকলে আমি নাকি কারও বাড়িতে চাকর-বাকর হয়ে নিজের পেটটা চালাতে পারতাম।"

সোমনাথ কোনো উত্তর না দিয়ে চুপচাপ গড়িয়াহাটের দিকে হাঁটতে লাগলো। বাঁ হাতের দুটো আঙুল মটকিয়ে সুকুমার বললে, "আমিও কী ভুল যে করেছি! মা কালীকে পুজো দিয়ে ইস্কুল ফাইনালে যদি ফার্স্ট ডিভিসন বাগাতে পারতাম, তাহলে এতদিনে চাকরি কাকে বলে দেখিয়ে দিতাম।"

সোমনাথ বললে, "শুধু শুধু কষ্ট পাচ্ছিস কেন? তোর আমার সেকেণ্ড ডিভিসন কাঁচিয়ে তো আর ফার্স্ট ডিভিসন করা যাবে না।"

সুকুমার বললে, "বড় দুঃখু লাগছে মাইরি। ব্রেবোর্ন রোডের একটা ব্যাঙ্কে ইস্কুল ফাইনালে ফার্স্ট ডিভিসন হলে কেরানির চাকরি দিচ্ছে—মিনিমাম ৬৪% নম্বর দেখাতে হবে।"

সোমনাথ আপসোস করলে না। সে আজকাল অবিশ্বাস করতে শুরু করেছে। বললে, "ওটাও এক ধরনের চালাকি।"

সুকুমার বললে, "চালাকি বললেই হলো! ব্যাঙ্কের নোটিস বোর্ডে ঝুলিয়ে দিয়েছে।

"যে-ছেলে ইস্কুল ফাইনালে শতকরা ৬৪ নম্বর পেয়েছে, সে কোন্ দুঃখে লেখাপড়া কুলুঙ্গিতে রেখে ব্যাঙ্কে ঢুকতে যাবে?" সোমনাথ বেশ ঝাঁঝের সঙ্গে জানতে চাইলো।

"এ-পয়েন্টটা আমার মাথায় আসেনি। সাধে কি আর বাবা বলেন, আমার মাথায় গোবর ছাড়া কিছু নেই!" সুকুমারের মুখটা মলিন হয়ে উঠলো।

হাঁটতে হাঁটতে ওরা গোলপার্কের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। সকালবেলার অফিস টাইম। অনেকগুলো প্রাইভেট মোটর গাড়ি হুস হুস করে বেরিয়ে গেল। বাসে, ট্যাক্সিতে, মিনি-বাসে তিল ধারণের জায়গা নেই। সুকুমার হাঁ করে ওই ব্যস্ত জনস্রোতের দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ বললে, "না ভাই, আর তাকাবো না। শেষ পর্যন্ত কারও চাকরিতে শনির দৃষ্টি লেগে যাবে। মনকে যতই শাসন করবার চেষ্টা করছি, বেটা ততই পরের চাকরিতে নজর দিচ্ছে। লোভের নাল ফেলতে ফেলতে ভাবছে—এত লোকের চাকরি আছে অথচ সুকুমার মিত্তির কেন বেকার?"

সোমনাথ বললে, "যত লোককে অফিস যেতে দেখছি, এরা প্রত্যেকে ফার্স্ট ডিভিসনে ইস্কুল ফাইনাল পাস করেছে বলছিস?"

সুকুমার বেশ চিন্তিত হয়ে উঠলো। মাথা চুলকে বললে, "খুব ডিফিকাল্ট কোশ্চেন করেছিস। তোর বেশ মাথা আছে। হাজার হোক ছোটবেলায় দুধ ঘি খেয়েছিস। তুই কেন পড়াশোনায় সোনার চাঁদ হলি না, বল তো?"

মন্দ বলেনি সুকুমার। পড়াশোনায় দাদাদের মতো ভাল হলে, সত্যিই সোমনাথের দুঃখের কিছু থাকতো না। নিজের মনের কথা সোমনাথ কিন্তু প্রকাশ করলো না। সুকুমারের যা স্বভাব, হয়তো কমলা বউদিকেই একদিন সব কথা বলে বসবে। সোমনাথ তাই পুরানো প্রসঙ্গ তুলে বললে, "শক্ত-শক্ত কোশ্চেন অনেক মাথায় আসে, কিন্তু উত্তর খুঁজে পাই না।"

সুকুমার মাথা চুলকোতে-চুলকোতে বললে, "তোর কোশ্চেনটা আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। দাঁড়া একটু চিন্তা করে দেখি।"

দূরে একটা পাঁচ নম্বর গড়িয়া-হাওড়া বাসে বাদুড়-ঝোলা অবস্থায় সুকুমারের বাবাকে মুহূর্তের জন্যে দেখা গেল। জনা-পঞ্চাশেক লোক হাঁই হাঁই করে সেই দিকে ছুটে গেলেও বাস থামলো না, নিপুণভাবে আরও দু'খানা বাসকে পাশ কাটিয়ে মুহূর্তের মধ্যে পালিয়ে গেল। সুকুমার সেই দিকে তাকিয়ে বললে, "আমার বাবার কথাই ধর না। থার্ড ডিভিসনও নয়। প্লেড-আপ টু-ম্যাট্রিক। অফিসে কেরানি হয়েছে তো?"

সোমনাথ বললে, "ও সব ইংরেজ আমলের ব্যাপার। তখন তো আমরা স্বাধীন হইনি।"

সুকুমার ছেলেটা সরল, একটু বোকাও বটে। সংসারের ঘাটে ঘাটে অনেক

ধাক্কা খেয়েও একেবারে সিনিক হয়ে ওঠেনি। সে বললে, "তাহলে তো ইংরেজরাই ভাল ছিল। নন-ম্যাট্রিকও তাদের সময়ে অফিসে চাকরি পেত—আর এখন হাজার হাজার গ্র্যাজুয়েট বাড়িতে বসে রয়েছে।"

"তোর চাকরির জন্যে তাহলে ইংরেজকে ফিরিয়ে আনতে হয়," সোমনাথ টিপ্পনী কাটলো।

"আমি ভাই তোকে ফ্র্যাঙ্কলি বলছি—সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা এসব কিছুই বুঝতে চাই না। যে আমাকে চাকরি দেবে, আমি তার দলে—সে মহম্মদ আলী জিন্নাহ্, মাও-সে-তুং হলেও আমার আপত্তি নেই।"

"আস্তে! আস্তে!" সুকুমারকে সাবধান করে দিলো সোমনাথ। "কেউ শুনলে বিপদ হবে। পাকিস্তানের স্পাই বলে চালান করে দেবে।"

বেজায় রেগে উঠলো সুকুমার। "মগের মুলুক নাকি! চালান করলেই হলো? অ্যারেস্ট করলে জেলের মধ্যে বসিয়ে রোজ খিচুড়ি, আলুচচ্চড়ি খাওয়াতে হবে। তার থেকে একখানা অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পাঠিয়ে সমস্যা সমাধান করে ফেলো না, বাবা! চাকরি পেলে তোমাদের কোনো হাঙ্গামা থাকবে না। তখন জিন্নাহ্, নিক্সন, মাও-সে-তুং, রানী এলিজাবেথ কারোও নাম মুখে আনবো না—একেবারে সেণ্ট পারসেণ্ট স্বদেশী বনে যাবো। এখনও দিল্ হ্যায় হিন্দুস্থানী!"

"সি-আই-ডি কিংবা আই-বির লোকরা যদি এসব শোনে কোনোদিন তোর সরকারী চাকরি হবে না। জানিস তো, অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার ইস্যু করবার আগে পুলিসে খোঁজখবর হয়—দুজন গেজেটেড অফিসারের চরিত্র সার্টিফিকেট লাগে।" সোমনাথের বুকনিতে সুকুমার এবার ভয় পেয়ে গেল।

বললে, "যা বলেছিস, মাইরি। হাটের মধ্যে দাঁড়িয়ে রাজনীতির গোবর ঘেঁটে লাভ নেই। বহু ছেলে তো ওই করে ডুবেছে। তারা পলিটিকস করেছে, দেওয়ালে-দেওয়ালে পোস্টার মেরেছে, রাস্তার মোড়ে-মোড়ে পার্টি ফাণ্ডের জন্যে চাঁদা আদায় করেছে, ঝাণ্ডা তুলেছে, মিছিলে যোগ দিয়েছে, স্লোগান তুলেছে, মনুমেণ্টের তলায় নেতাদের বক্তৃতা শুনেছে—ভেবেছে এই সব করলেই সহজে চাকরি পাওয়া যাবে। এখন অনেক বাছাধন ভুল বুঝতে পেরে আঙুল চুষছে।"

সোমনাথ গম্ভীর হয়ে বললো, "এক এক সময় মনে হয়, একেবারে কিছু না করা থেকে, যা হয় কিছু করা ভাল। তাতে ভুল হলেও কিছু এসে যায় না।"

সুকুমার তেড়ে উঠলো। "তিন মাস পরে যাদের পেটে ভাত থাকবে না তাদের এসব কথা মানায় না। আমাদের দলে টেনে নিয়ে স্বার্থসিদ্ধি করছে

কত ছেলেধরা যাদবপুরে ঘোরাঘুরি করছে—তাদের পকেটে কত রকমের পতাকা। কোনোটা একরঙা, কোনোটা তিনরঙা। তার ওপর আবার কতরকমের ছাপ! আমি ওসব ফাঁদে পা দিই না বলে, ছেলেধরাদের কী রাগ আমার ওপর। আমার সোজা উত্তর, আমার বাবার তিন মাস চাকরি আছে, আমার পাঁচটা নাবালক ভাইবোন। দেশোদ্ধার করবার মতো সময় নেই আমার।"

অফিসটাইমের যাত্রীদের দিকে সুকুমার আবার তাকিয়ে রইলো। তারপর বললো, "যে যা করছে করুক, আমার কী?"

কয়েক মিনিট ধরে সুকুমার নিজের মনে কী সব ভাবলো। তারপর সোম-নাথের পিঠে আঙুলের খোঁচা দিয়ে আবার আরম্ভ করলো, "তুই যা বলছিলি—এই যে পিঁপড়ের মতো পিলপিল করে লোক অফিসের থামে মোড়া টিফিন কৌটো হাতে হাজরি দিতে চলেছে, এরা সবাই তো ইংরেজ আমলে চাকরিতে ঢোকেনি। ওই ছোকরাকে দেখ না—ইংরেজ রাজত্বে তো ওর জন্মই হয়নি। অথচ অফিস বেরুচ্ছে।"

সুকুমার এবার এক কেলেঙ্কারি করে বসলো। নিখুঁত ইস্ত্রি করা শার্ট ও প্যান্ট পরে এক ছোকরা বাসে উঠছিল; ঠিক সেই সময় ছুটে গিয়ে সুকুমার তাকে জিজ্ঞেস করলো, "দাদা, আপনি কি ফার্স্ট ডিভিসনে পাস করেছিলেন?"

অতর্কিত প্রশ্নে ভদ্রলোক চমকে উঠেছিলেন। ব্যাপারটা ঠিক মতো মাথায় ঢোকবার আগেই বাস ছেড়ে দিলো। বিরক্ত ভদ্রলোক চলন্ত গাড়ি থেকে সুকুমারের দিকে অগ্নিদৃষ্টি বর্ষণ করলেন—তার রসিকতার অর্থ বুঝতে পারলেন না।

সুকুমার বোকার মতো ফুটপাথে ফিরে এলো। বললে, "আমি ভাই রসিকতা করিনি। ওঁর পিছনেও লাগিনি—স্রেফ জানতে চাইতাম কী করে চাকরিটা যোগাড় করলেন।"

সোমনাথ বললে, "ও-রকম করিস না সুকুমার। কোন দিন বিপদে পড়ে যাবি। ভদ্রলোক হয়তো পড়াশোনায় আমাদেরই মতো। তাহলে রেগে যেতে পারতেন।"

সুকুমার ক্ষমা চাইলো। তারপর কী ভেবে ওর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বললে, "সোম, তুই ঠিক বলেছিস। ওইভাবে জ্বালাতন করাটা আমার উচিত হয়নি। ভদ্রলোক যদি আমাদের মতো সেকেণ্ড কিংবা থার্ড ডিভিসনের [illegible] [illegible] চাকরি পেয়ে থাকেন তাহলে নিশ্চয় সিডিউল্ড কাস্ট।"

বন্ধুর ব্যাপার-স্যাপার সোমনাথ বুঝতে পারছিল না। সুকুমার গম্ভীরভাবে বললে, "ভদ্রলোকের নাকটা কি একটু চ্যাপ্টা ছিল?"

"তাতে কী এসে যায়?" বিরক্ত সোমনাথ প্রশ্ন করলো।

"খুবই এসে যায়। সিডিউল্‌ড কাস্টরাও এখন চাকরি পাচ্ছে না। ভদ্রলোক সিডিউল্‌ড ট্রাইব হতে পারেন। চাকরির বিজ্ঞাপনে প্রায়ই লেখে তপসিলীভুক্ত উপজাতি হলে অগ্রাধিকার পাবে। ইণ্ডিয়াতে সিডিউল্‌ড ট্রাইব গ্র্যাজুয়েট বোধ হয় কেউ বসে নেই।"

দাঁত দিয়ে ডান হাতের কড়ে আঙুলের নখ কাটলো সুকুমার। তারপর সোমনাথকে বললে, "তোর বাবা তো অনেকদিন আদালতে ছিলেন। একবার খোঁজ করিস তো, কী করে সিডিউল্‌ড ট্রাইব হওয়া যায়।"

"আবার পাগলামী করছিস? তুই হচ্ছিস সুকুমার মিত্তির! মিত্তির কখনো সিডিউল্‌ড ট্রাইব হতে পারে না।" সোমনাথ বন্ধুকে বোঝাবার চেষ্টা করে।

সুকুমার বুঝলো না। বললে, "আমাকে হেল্প করবি না তাই বল। চেষ্টা করে বিশ্বামিত্র যদি ক্ষত্রিয় থেকে ব্রাহ্মণে প্রমোটেড হতে পারে, তাহলে আমি কায়স্থ থেকে সিডিউল্‌ড ট্রাইব হতে পারবো না কেন?"

"ওদের দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণার কথা আমরা জানি না বলেই রসিকতা করতে পারছি। ওদের বড় কষ্ট রে," সোমনাথ সরল মনে বললো।

সুকুমারও গম্ভীর হয়ে উঠলো। "তুই ভাবছিস আমি জাত তুলে ব্যঙ্গ করছি। চণ্ডালের পায়ের ধুলো জিভে চাটতে পর্যন্ত আমার আপত্তি নেই। কিন্তু জুলাই মাসের মধ্যে আমার একটা চাকরি যোগাড় করতেই হবে।" বন্ধুর চোখ-দুটো যে ছলছল করছে তা সোমনাথ বুঝতে পারলো।

একটু দুঃখও হলো সোমনাথের। বন্ধুকে উৎসাহ দেবার জন্যে বললে, "জানিস সুকুমার, চাকরির কথা ভেবে ভেবে আমার মনটাও মাঝে-মাঝে খারাপ হয়ে যায়। আধবুড়ো হয়ে গেলাম, এখনও একটা কিছু যোগাড় হলো না। কতদিন আর বাবার হোটেলের অন্ন ধ্বংসাবো? বউদি অত যত্ন করে ভাত বেড়ে দেন, দাদাদের যে-সাইজের মাছ দেন, আমার জন্যে তার থেকেও বড়টা তুলে রাখেন। জিজ্ঞেস করেন, আর কিছু নেবো কিনা। তবু তেতো লাগে।"

এবার রেগে উঠলো সুকুমার। "রাখ রাখ বড় বড় কথা। পাকা রুই মাছের টুকরো পাতে পড়লে বেশ মিষ্টি লাগে। ওই তেতো লাগার ব্যাপারটা তোর মানসিক বিলাসিতা। আমার কিন্তু আজকাল খেতে বসলে সত্যি তেতো লাগে। কাল রাত্রে ডাল পুড়ে গিয়েছিল। একে তো নিরামিষ [illegible] আর

ওপর ডাল পোড়া হলে কেমন মেজাজ হয় বল তো ? মায়ের শরীর ভাল নয়, তাই বোন রাঁধছে ক'দিন। তা বোনকে বকতে গেলাম, 'বাড়িতে বসে বসে কী করিস ? রান্নাটাও দেখতে পারিস না ?' বোন অমনি ছ্যাড়-ছ্যাড় করে শুনিয়ে দিলো। বলে কিনা, 'তোমারও তো কাজকম্ম নেই—বাড়িতে বসে ভাল রাঁধলেই পারো।' ”

"তুই কী উত্তর দিলি ?" সোমনাথ জানতে চায়।

"কিছু বললাম না, মুখ বুজে দাঁত খিচুনি হজম করলাম। তবে, সুকুমার মিত্তির একদিন এর প্রতিশোধ নেবে।"

প্রতিশোধের ব্যাপারটা সোমনাথের ভাল লাগে না। সে নির্বিবাদী মানুষ। বললে, "দূর ! আপনজনদের ওপর প্রতিশোধ নিতে নেই।"

সুকুমার তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলো, "টেবিল-চেয়ারে বসিয়ে বউদি তোকে মণ্ডা-মিঠাই খাওয়াচ্ছে, তাই তোর মাথায় প্রতিশোধের কথা ওঠে না। আমার পলিসি অন্য। যারা আমার সঙ্গে এখন যেরকম ব্যবহার করছে তা আমি নোট করে রাখছি। ভগবান যখন সময় দেবেন, তখন সুদসমেত ফিরিয়ে দেবো।"

"আঃ সুকুমার ! হাজার হোক তোর নিজের বোন। তার ওপর আবার প্রতিশোধ কী ?" সোমনাথ আবার বন্ধুকে বোঝাবার চেষ্টা করলো।

হাসলো সুকুমার। "প্রতিশোধ মানে কি সমর্থ বোনকে ধরে মারবো, না রেগে গিয়ে দোজবরে বুড়োর সঙ্গে বিয়ে দেবো ? বোনের ব্যাপারে আমার প্রতিশোধের পলিসিই আলাদা। সব ঠিক করে রেখেছি এখন থেকে। চাকরিতে ঢুকে প্রথম মাসের মাইনে থেকে কণাকে একটা লাল রঙের ঝকঝকে শাড়ি কিনে দেবো। আর শাড়ির মধ্যেই একটা ছোট্ট চিরকুটে লেখা থাকবে—অমুক তারিখের রাত্রিতে যখন আমাকে রান্নাঘরে ঢুকতে বলেছিলি তখনই তোকে এই শাড়িটা দেবার ইচ্ছে হয়েছিল। ইতি দাদা।"

সোমনাথ একমত হতে পারলো না। বললে, "এখন তোর রাগ রয়েছে, তাই এসব কথা ভাবছিস। যখন প্রথম মাইনে পাবি তখন দেখবি শুধু শাড়িটা দেবার ইচ্ছে হচ্ছে, চিঠির কথা মনেই পড়বে না। হাজার হোক ছোট বোন তো, তার মনে ব্যথা দিতে তোর মায়া হবে।"

সুকুমার কথা বাড়ালো না। বললে, "হয়তো তাই। কিন্তু মাইনে-পাবার মতো অবস্থাটা কবে হবে বল তো ?"

একটু থেমে সুকুমার বললে, "মাঝে-মাঝে তো এম-এল-এদের কাছে যাই। [illegible] মাথায় ওঁদের যা-তা বলি। আপনাদের জন্যেই তো [illegible] এই

অবস্থা। চাকরি দেবার মুরোদ না থাকলে কেন ইংরেজ তাড়িয়েছিলেন, কেন নিজেরা গদি দখল্ করেছিলেন ?”

“ওঁরা কী বলেন ?” সোমনাথ জিজ্ঞেস করলো।

“মাইরি একটা আশ্চর্য গুণ, কিছুতেই রাগে না এম-এল-এগুলো। আমাকে ওইভাবে কেউ ফায়ার করলে, স্রেফ ঘাড় ধরে তাকে বাড়ির বাইরে বার করে দিতাম, বলতাম, পরের বারে ব্যাটাচ্ছেলে যাকে-খুশী ভোট দিও।”

“যারা পাবলিককে সামলাতে পারে না তারা ভোটে হেরে যাবে,” সোমনাথ বললে।

“ঠিক বলেছিস, অশেষ ধৈর্য লোকগুলোর,” স্কুমার বিস্ময় প্রকাশ করলো। “অমন চ্যাটাং-চ্যাটাং করে শোনালাম, একটু রাগলো না। বরং স্বীকার করে নিলো, প্রত্যেকটি ইয়ংম্যানকে চাকরি 'দেবার দায়িত্ব গভরমেণ্টের। যে-সরকার তা পারে না, তাদের লজ্জিত হওয়া উচিত।”

“লজ্জা কিছু দেখলি ?” সোমনাথ জানতে চায়।

“অত লক্ষ্য করিনি ভাই। তবে এম-এল-এদা ভিতরের খবর অনেক ছাড়লেন। মাস-কয়েকের মধ্যে অনেক চাকরি আসছে। সেল্‌স ট্যাক্স, স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড, হাউসিং ডিপার্টমেণ্টে হাজার হাজার চাকরি তৈরি হলো বলে। এত চাকরি যে সে অনুপাতে গভরমেণ্টের চেয়ার নেই। তা আমি বলে দিয়েছি, সেজন্যে চিন্তার কিছু নেই। চাকরি পেলে আমার বন্ধুর বাড়ি থেকে একটা চেয়ার চেয়ে নিয়ে যাবো। গভরমেণ্টের অসুবিধা করবো না।”

“উনি কী বললেন ?” সোমনাথ জানতে চাইলো।

“খুব ইমপ্রেস্‌ড হলেন। বললেন, সবার কাছ থেকে এ-রকম সহযোগিতা পেলে ওঁরা দেশে সোনা ফলিয়ে দেবেন। ভরসা পেয়ে তোর কথাটাও ওঁর কানে তুলে দিয়েছি। বলেছি, হাজার হাজার লাখ লাখ চাকরি যখন আপনাদের হাতে আসছে, তখন আমার বন্ধু সোমনাথ ব্যানার্জির নামটাও মনে রাখবেন। খুব ভাল ছেলে, আমারই মতো চাকরি না-পেয়ে বেচারা বড় মনমরা হয়ে আছে। চেয়ারের জন্যে কোনো অসুবিধে হবে না। ওদের বাড়িতে অনেক খালি চেয়ার আছে।”

সোমনাথ হাসলো।

স্কুমার একটু বিরক্ত হয়ে বললে, “এইজন্যে কারুর উপকার করতে নেই। দাঁত বার করে হাসছিস কী? এম-এল-এদা বলেছেন, শীগগির একদিন রাইটার্স বিল্ডিংস-এ নিয়ে যাবেন। খোদ মিনিস্টারের পি-এর সঙ্গে আলাপ

করিয়ে দেবেন। সি-এ জানিস তো? মিনিস্টারের গোপন সহকারী—কনফিডেনশিয়াল অ্যাসিস্ট্যাণ্ট। আজকাল এরা ভীষণ পাওয়ারফুল—আই-সি-এস খোদ সেক্রেটারীরা পর্যন্ত সি-এদের কাছে কেঁচো হয়ে থাকে।"

"তাতে তোর আমার কী? বড় বড় গভরমেণ্ট অফিসাররা চিরকালই কারুর কাছে গোখরো সাপ, কারও কাছে পাঁকাল মাছ।" সোমনাথ আই-এ-এস এবং আই-সি-এস সম্বন্ধে তার বিরক্তি প্রকাশ করলো।

সুকুমার কিন্তু নিরুৎসাহ হলো না। বন্ধুর হাত চেপে বললে, "আসল কথাটা শোন না। সি-এদের পকেটে ছোট্ট একটা নোটবুক থাকে। ওই নোটবুকে যদি একবার নিজের নাম-ঠিকানা তোলাতে পেরেছিস স্রেফ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সরকারী চাকরি পেয়ে যাবি।"

"তুই চেষ্টা করে দেখ। তদ্বিরের জন্য জুতোর হাফসোল ক্ষইয়ে ফেলে আমার চোখ খুলে গিয়েছে," সোমনাথ বিরক্তির সঙ্গে বললো।

সুকুমার বললো, "আশা ছাড়িস না। ট্রাই ট্রাই অ্যাণ্ড ট্রাই। একবারে না পারিলে দেখ শতবার।"

"শতবার! শালা সহস্রবারের ওপর হয়ে গেল, কিছু ফল হলো না। মাঝখান থেকে রয়াল টাইপ রাইটিং কোম্পানির নবীনবাবু বড়লোক হয়ে গেলেন। আমার কাছ থেকে কত বার যে পঞ্চাশ পয়সা করে চিঠি ছাপাবার জন্যে বাগিয়ে নিলেন! আমি মতলব করেছিলুম, কার্বন কাগজ ছড়িয়ে অনেকগুলো কপি করে রেখে দেবো, বিভিন্ন নামে ছাড়বো। কিন্তু বাবা এবং বউদি রাজী হলেন না। বললেন, অ্যাপ্লিকেশনটাই নাকি সবচেয়ে ইম্পর্টাণ্ট। ওর থেকেই ক্যাণ্ডিডেট সম্পর্কে মালিকরা একটা আন্দাজ করে নেয়। কার্বন কপি দেখলে ভাববে লোকটা পাইকিরী হারে অ্যাপ্লিকেশন ছেড়ে যাচ্ছে।"

"এটা মাইরি অন্যায়," সুকুমার এবার বন্ধুর পক্ষ নিলো। "তোমরা একখানা চাকরির জন্যে হাজার হাজার দরখাস্ত নেবে, আর আমরা দশ জায়গায় একই দরখাস্ত ছাড়তে পারবো না?"

সোমনাথ বললে, "আসলে বউদির খেয়াল। টাইপ করার পয়সাও হাতে গুঁজে দিচ্ছেন, বলার কিছু নেই। তবে এখন বুঝতে পারছি সরকার-বেসরকার কেউ আমাদের চাকরি দিয়ে উদ্ধার করবে না।"

"ভগবান জানেন," সুকুমার রাস্তায় দাঁড়িয়ে নিজের মনেই বললো। অফিসযাত্রীর ভিড় ইতিমধ্যেই অনেকটা পাতলা হয়ে এসেছে।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সোমনাথ এবার বললো, "আমার বউদি কিন্তু মোটেই

আশা ছাড়েনি। আমার কুষ্ঠিতে নাকি আছে যথাসময়ে অনেক টাকা রোজগার করবো।"

"আমার ভাই কুষ্ঠি নেই। থাকলে একবার ধনস্থানটা বিচার করিয়ে নেওয়া যেত।" সুকুমার বললে।

সোমনাথ আবার বউদির কথা তুললো। "সেদিন চুপচাপ বসেছিলাম। বউদি বললেন, 'মন খারাপ করে কী হবে? ছেলেদের চাকরিটা অনেকটা মেয়েদের বিয়ের মতো। বাবা আমার বিয়ের জন্যে কত ছটফট করেছেন। কত বাড়িতে ঘোরাঘুরি করেছেন। কিছুতেই কিছু হয় না। তারপর যখন ফুল ফুটলো, এ-বাড়িতে এক সপ্তাহের মধ্যে সব ঠিকঠাক হয়ে গেল।' বউদি বলছিলেন, আমার চাকরির ফুল হয়তো একদিন হঠাৎ ফুটে উঠবে, লোকে হয়তো ডেকে চাকরি দেবে।"

"তোর বউদির মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক। জুন মাসের মধ্যে যদি আমার ফুলটা ফোটে তাহলে বড় ভাল হয়, হাতে পুরো একটা মাস থাকে।" সুকুমার নিজের মনেই বললো।

"ফুল তো তোর আমার চাকর নয়। নিজের যখন ইচ্ছে হবে তখন ফুটবে," সোমনাথ উত্তর দিলো।

সুকুমার এবার মনের কথা বললো। "বড্ড ভয় করে মাইরি। আমাদের কলোনিতে আইবুড়ী দেঁতো পিসী আছে। বিয়ের সম্বন্ধ করতে করতেই পিসী বুড়ী হয়ে গেল—বর আর জুটলো না। আমাদের যদি ওরকম হয়? চুল দাড়ি সব পেকে গেল, অথচ চাকরি হলো না!"

এরকম একটা ভয়াবহ সম্ভাবনা যে নেই, তা মোটেই জোর করে বলা যায় না। এই ধরনের কথা শুনতে সোমনাথের তাই মোটেই ভাল লাগে না। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সোমনাথ বললো, "এবার বাড়ি ফেরা যাক। বউদি বেচারা হয়তো জলখাবার নিয়ে বসে আছেন।"

"যা তুই জলখাবার খেতে। আমি এখন বাড়ি ফিরবো না। একবার আপিসপাড়াটা ঘুরে আসবো।"

"আপিসপাড়ায় ঘুরে কী তোর লাভ হয়? কে তোকে ডেকে চাকরি দেবে?" সোমনাথ এবার বন্ধুর সমালোচনা করলো।

কিন্তু সুকুমার দমলো না। "সব গোপন ব্যাপার তোকে বলবো কেন? ভাবছিস ফর নাথিং এই সেকেণ্ড ক্লাস ট্রামের ভিড় ঠেঙিয়ে আমি আপিসপাড়ায় ভেরেণ্ডা ভাজতে যাচ্ছি? সুকুমার মিত্তিরকে অত বোকা ভাবিস না।"

সোমনাথের এবার কৌতূহল হলো। বন্ধুকে অনুরোধ করলো, "গোপন ব্যাপারটা একটু খুলে বল না ভাই।"

"এবার পথে এসো দাদা! বেকারের কি দেমাক মানায়? বাড়িতে বসে শুধু খবরের কাগজ পড়লে চাকরির গোপন খবর পাওয়া যায় না, চাঁদ।"

"তাহলে?" সোমনাথ জিজ্ঞেস করে।

সুকুমার বেশ গর্বের সঙ্গে বন্ধুকে খবর দিলো, "অনেক কোম্পানি আজকাল বেকার পঙ্গপালদের ভয়ে কাগজে চাকরির বিজ্ঞাপন দেয় না। একটা কোম্পানি তো কেবানির পোস্টের জন্যে বিজ্ঞাপন দিয়ে যা ফ্যাসাদে পড়েছে না! খবরের কাগজে বক্স নম্বর ছিল। সেখান থেকে তিন লরি অ্যাপ্লিকেশন কোম্পানির হেড আপিসে পাঠিয়েছে। এখনও চিঠি আসছে। তার ওপব আবার কীভাবে খববের কাগজের আপিস থেকে বক্স নম্বর ফাঁস হয়েছে। কারা বিজ্ঞাপন দিয়েছিল তা কিছু লোকে জানতে পেরেছে। প্রতিদিন তিন-চারশ' লোক আপিসে ভিড় কবছে। কোম্পানির পার্সোনেল অফিসার তো ঘাবড়ে গিয়ে কলকাতা থেকে কেটেছেন।"

"তাহলে উপায়?" সোমনাথ চিন্তিত হয়ে পড়ে।

"তাদের উপায় তাবা বুঝবে, আমাদের কী? তা যা বলছিলাম, এই পঙ্গপালদের ভয়ে অনেক কোম্পানি এখন বিজ্ঞাপন না-দিয়ে নোটিস বোর্ডে চাকরির খবর ঝুলিয়ে দিচ্ছে। আমাদেব শম্ভু দাস, ছোকরা এইরকমভাবে হাইড রোডের কারখানায় টাইপিস্টের চাকরি বাগিয়েছে। ছোকরার অবশ্য টাইপে স্পীড ছিল। বেটাকে একদিন দেখেছিলাম মেশিনের ওপর। পাঞ্জাব মেলের মতো আঙুল চলছে। ওব কাছ থেকে বুদ্ধি পেয়ে আমিও এখন আপিসে-আপিসে ঘুরে বেড়াই। মুখে কিছু বলি না—চাকরির খোঁজে এসেছি জানতে পারলে অনেক আপিসে আজকাল ঢুকতে দেয় না। তাই কোনো কাজের অছিলায় ভাঁটের মাথায় আপিসে ঢুকে পড়তে হয়, তারপর একটু ব্রেন খাটিয়ে স্টাফদের নোটিস বোর্ডে নজর দিয়ে আসি।"

একটু থামলো সুকুমার। তারপর বললো, "ভাবছিস পণ্ডশ্রম হচ্ছে? মোটেই না। চারে মাছ আছে, বুঝলি, সোমনাথ? এর মধ্যে তিন-চারখানা অ্যাপ্লিকেশন ছেড়ে এসেছি। কাল যে-আপিসে গিয়েছিলাম, সেখানে চাকরি হলে কেলেংকেরিয়াস কাণ্ড। প্রত্যেক দিন মাইনে ছাড়াও পঁচাত্তর পয়সা টিফিন—তাও বাবুদের পছন্দ হচ্ছে না! প্রতিদিন আড়াই টাকা টিফিনের দাবিতে কর্মচারী ইউনিয়ন কোম্পানিকে উকিলের চিঠি দিয়েছে।"

গোলপার্ক থেকে একলা বাড়ি ফিরে আসার পথে সুকুমারের কথা ভাবছিল সোমনাথ। ওর উদ্যমকে মনে মনে প্রশংসা নাকরে পারেনি সোমনাথ। হয়তো এই পরিশ্রমের ফল সুকুমার একদিন আচমকা পেয়ে যাবে। চাকরির নিয়োগপত্রটা দেখিয়ে সুকুমার চলে যাবে, কেবল সোমনাথ তখনও বেকার বসে থাকবে। এসব বুঝেও সোমনাথ কিন্তু সুকুমারের মতো হতে পারবে না।

বাবা সরকারী কাজ করতেন, একসময় অনেককে চিনতেন। কিন্তু সোমনাথ কিছুতেই তাঁদের বাড়ি বা অফিসে গিয়ে ধর্না দেবার কথা ভাবতে পারে না। বাবারও আত্মসম্মানজ্ঞান প্রবল—কিছুতেই বন্ধু-বান্ধবদের ধরেন না। দ্বৈপায়নবাবুর যে একটা পাস কোর্সে বি এ পাসকরা বেকার অর্ডিনারি ছেলে আছে সে খবরই অনেকে রাখে না। তাঁরা শুধু দ্বৈপায়ন ব্যানার্জির দুই হীরের টুকরো ছেলের কথা শুনেছেন—যাদের একজন আই-আই-টি ইনজিনীয়ার এবং আরেকজন বিলিতী কোম্পানির জুনিয়র অ্যাকাউনটেণ্ট।

হঠাৎ সোমনাথের রাগ হতে আরম্ভ করছে। সুকুমার বেচারা অত দুঃখী, কিন্তু কারুর ওপর রাগে না। সোমনাথের কিন্তু এই মুহূর্তে রাগে ফেটে পড়তে ইচ্ছে করছে। এই যে বিশাল সমাজ তার বিরুদ্ধে কোনো অপরাধই তো সোমনাথ বা বন্ধু সুকুমার করেনি। তারা সাধ্যমতো লেখাপড়া শিখেছে, সমাজের আইন-কানুন মেনে চলেছে। তাদের যা করতে বলা হয়েছে তারা তাই করেছে। তাদের দেহে রোগ নেই, তারা পরিশ্রম করতে রাজী আছে—তবু এই পোড়া দেশে তাদের জন্যে কোনো সুযোগ নেই। এমন নয় যে তারা বড় চাকরি চাইছে—যে-কোনো কাজ তো তারা করতে প্রস্তুত। তবু কেউ ওদের দিকে মুখ তুলে তাকালো না—মাঝখান থেকে জীবনের অমূল্য দুটো বছর নষ্ট হয়ে গেল।

একবার যদি সোমনাথ বুঝতে পারতো এর জন্যে কে দায়ী, তাহলে সত্যিই সে বেপরোয়া একটা কিছু করে বসতো। সুকুমার বেচারা হয়তো তার সঙ্গে যোগ দিতে সাহস করবে না—ওর দায়-দায়িত্ব অনেক বেশী। কিন্তু সোমনাথের পিছু টান নেই। তার রোজগার খাবার জন্যে সংসারে কেউ ফ্যালফ্যাল করে মুখের দিকে তাকিয়ে বসে নেই। ওর পক্ষে বেপরোয়া হয়ে বোমার মতো ফেটে পড়া অসম্ভব নয়।

বাড়ি ফিরতেই কমলা বউদি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। জিজ্ঞেস করলেন, "কারুর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে নাকি? মুখটা অমন লাল হয়ে রয়েছে।"

সোমনাথ সামলে নিলো নিজেকে। বললে, "বোধ হয় একটু রোদ লেগেছে।"

বুলবুল অনেক আগেই চেতলায় বাপের বাড়ি বেড়াতে গেছে। ওখানে ভাত খাবে সে। বাবা পুরানো অভ্যাস অনুযায়ী সাড়ে-দশটার সময় ভাত খেয়ে নিয়েছেন। শুধু কমলা বউদি সোমনাথের জন্যে অপেক্ষা করছেন।

তাড়াতাড়ি স্নান সেরে নিলো সোমনাথ। তারপর দুজনে একসঙ্গে খেতে বসলো। মায়ের মৃত্যুর পর এই এত বছর ধরে সোমনাথ কতবার কমলা বউদির সঙ্গে খেতে বসেছে। রান্না পছন্দ না-হলে বউদিকে বকুনি লাগিয়েছে। বলেছে, "বাবা কিছু বলেন না, তাই বাড়ির রান্না ক্রমশ খারাপের দিকে যাচ্ছে।"

কমলা বউদিও দেওরের সঙ্গে তর্ক করেছেন। বলেছেন, "তেল-ঝাল না থাকলে তোমাদের রান্না ভাল লাগে না। কিন্তু বাবা ওসব সহ্য করতে পারেন না। ডাক্তারবাবু বলে গেছেন, লঙ্কা আর অতিরিক্ত মসলা কারুর শরীরের পক্ষে ভাল নয়।"

কিন্তু এই দু-বছরেই অবস্থাটা ক্রমশ পালটে গেল। সোমনাথ এখন খেতে বসে কেমন যেন লজ্জা পায়। রান্নার সমালোচনা তো দূরের কথা; বিশেষ কোনো কথাই বলে না। আর কমলা বউদি দুঃখ করেন, "তোমার খাওয়া কমে যাচ্ছে কেন, খোকন? হজমের কোনো গোলমাল থাকলে ডাক্তার দেখিয়ে এসো। একটু-আধটু ওষুধ খেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।"

সোমনাথ প্রশ্নটা এড়িয়ে যায়। ওর কেমন ভয় হয় কমলা বউদির কাছে কিছুই গোপন থাকে না। বউদি ওর মনের সব কথা বোধ হয় বুঝতে পারেন।

অপরাহ্ণের পরিস্থিতি আরও যন্ত্রণাদায়ক। জন্ম-জন্মান্তর ধরে কত পাপ করলে তবে এই সময় বাড়িতে চুপচাপ বসে থাকবার শাস্তি পায় পুরুষ মানুষেরা।

কমলা বউদি সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর এই সময় একটু নিজের ঘরে বিছানায় গড়িয়ে নেন। বিনাশ্রম কারাদণ্ডের এই সময়টা সোমনাথ কীভাবে কাটাবে বুঝতে পারে না। এই সময় ঘুমোলে সারারাত বিছানায় ছটফট করতে হয়। চুপচাপ জেগে থাকলে, মনে নানা কিম্ভূতকিমাকার চিন্তা ভিড় করে। মাঝে-মাঝে বই পড়বার চেষ্টা করেছে সোমনাথ—এখন বই ভাল লাগে না। আগে ট্রানজিস্টর রেডিওতে গান শুনতো—এখন তাও অসহ্য মনে হয়।

অথচ কত লোক এই সময়ে অফিসে, আদালতে, কারখানায়, রেল স্টেশনে, পোস্টাপিসে, বাজারে কাজ করতে করতে গলদঘর্ম হচ্ছে। মা বলেছিলেন, কাউকে হিংসে করবে না—কিন্তু এই মুহূর্তে কাজের লোকদের হিংসে না করে পারছে না সোমনাথ।

সাড়ে-চারটের সময় বাবার বন্ধু সুধন্যবাবু এলেন। রিটায়ার করে তিনি এখানেই বাড়ি কিনেছেন। বিকেলের দিকে সুধন্যবাবু মাঝে-মাঝে বাবার সঙ্গে গল্প করতে আসেন।

সুধন্যবাবু 'এলেই বাবাব গাম্ভীর্যের মুখোশ খসে যায়। বউমার কাছে চায়ের অনুবোধ যায়। তারপর দুজনের সুখ-দুঃখেব গল্প শুরু হয়।

সুধন্যবাবুব দিকে সিগারেট এগিয়ে দিয়ে দ্বৈপায়ন জিজ্ঞেস করেন, "চিঠিপত্তর পেলে?"

চিঠিপত্তর মানে জামাই-এব চিঠি—সুধন্যবাবুব জামাই কানাডায় থাকে। সুধন্যবাবু বলেন, "জানো ব্রাদার, এখানে তো এত গরম, কিন্তু উইনিপেগে এখন বরফ পড়ছে। খুকী লিখেছে, রাস্তায় হাঁটা যায় না।"

"ওদের আর হাঁটবার দরকার কী? গাডি বয়েছে তো?" দ্বৈপায়নবাবু জিজ্ঞেস করেন।

"শুধু গাড়ি নয়—এয়ার-কণ্ডিশন লিমুজিন। শীতকালে গবম, গরমকালে ঠাণ্ডা! এখানে বিড়লাবাও অমন গাড়ি চড়তে পারে কিনা সন্দেহ। জামাই-বাবাজী গাড়ির একটা ফটো পাঠিয়েছে, তোমাকে দেখাবো'খন। জানো দ্বৈপায়ন, এমন গাড়ি যে গিয়ার চেঞ্জ করতে হয় না—সব আপনা-আপনি হয়। আর আমাদের এখানে দিশী কোম্পানিব গাড়ি দেখো! সেবার খুকী যখন এলো, তখন আমার নাতনী তো ট্যাক্সিতে চড়ে হেসে বাঁচে না। তাও বেছে বেছে নতুন ট্যাক্সিতে উঠেছিলাম আমরা।"

"কাদের সঙ্গে কাদের তুলনা করছো, সুধন্য?" দ্বৈপায়ন সিগারেটে টান দিয়ে বলেন। এ-দেশের অর্থনৈতিক ক্রমাবনতি সম্পর্কে দ্বৈপায়নের বিরক্তি ওঁর প্রতিটি কথায় প্রকট হয়ে উঠলো।

সুধন্যবাবু এবার সগর্বে ঘোষণা করলেন, "খুকী লিখেছে, জামাইয়ের মাইনে আরও বেড়েছে। এখন দাঁড়ালো, এগারো হাজার দুশো পঞ্চাশ টাকা। জানো ব্রাদার, গিন্নি তো এখনও সেইরকম সিমপল আছেন—উনি ভেবেছেন বছরে এগারো হাজার টাকা। বিশ্বাসই করতে চান না, প্রতি মাসে জামাইবাবাজী এত টাকা ঘরে আনছে। আমি রসিকতা করলাম, গিন্নি একি তোমার স্বামী, যে এগারো শো টাকায় রিটায়ার করবে।"

"[illegible] বেঁচে থাক, [illegible] উন্নতি করুক," দ্বৈপায়ন আশীর্বাদ জানালেন।

সুধন্যবাবু কিন্তু পুরোপুরি খুশী নন। বললেন, "খুকীর অবশ্য সুখ নেই। লিখেছে, এমন অভাগা দেশ যে একটা ঠিকে-ঝি পর্যন্ত পাওয়া যায় না। জানো দ্বৈপায়ন, আদরের মেয়েটাকে জমাদারণীর কাজ পর্যন্ত করতে হয়। অবশ্য জামাইবাবাজী হেল্প করে।

"বলো কী?" দ্বৈপায়ন সহানুভূতি প্রকাশ করেন।

"লোকের বড় অভাব, জানো দ্বৈপায়ন। কত চাকরি যে খালি পড়ে আছে, শুধু লোক পাওয়া যাচ্ছে না বলে।" সুধন্যবাবু সিগারেটে একটা টান দিলেন।

দ্বৈপায়ন কী মতামত দেবেন ভেবে পাচ্ছেন না। সিগারেটের ছাই ঝেড়ে তিনি বললেন, "রূপকথার মতো শোনাচ্ছে সুধন্য। বিংশ শতাব্দীতে একই চন্দ্র সূর্যের তলায় এমন দেশ রয়েছে যেখানে একটা পোস্টের জন্যে এক লাখ অ্যাপ্লিকেশন পড়ে, আবার অন্য দেশে চাকরি রয়েছে কিন্তু লোক খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।"

সুধন্যবাবু বন্ধুর মতো বিস্ময় বোধ করলেন না। বললেন, "তবে কি জানো দুটোই চরম অবস্থা। যে-দেশে নিজের বাসন নিজে মেজে খেতে হয় তাকে ঠিক সুসভ্যদেশ বলা চলে না।"

হাসলেন দ্বৈপায়ন। "কিন্তু যাদের বাড়িতে বেকার ছেলে রয়েছে তারা বলছে, পশ্চিম যা-করেছে তাই শতগুণে ভাল। এদেশে চাকরি-বাকরির যা-অবস্থা হলো।"

সুধন্যবাবু বললেন, "ভাগ্যে আমার ছেলে নেই, তাই চাকরি-বাকরির কথা এ-জীবনে আর ভাবতে হবে না।"

"বেঁচে গেছ, ব্রাদার। ছোকরা বয়সের এই যন্ত্রণা চোখের সামনে দেখতে পারা যায় না। অথচ হাত-পা বাঁধা অসহায় অবস্থা—সাহায্য করবার কোনো ক্ষমতা নেই।" দ্বৈপায়নের কণ্ঠে দুঃখের সুর বেজে উঠলো।

"এই অবস্থায় জামাই-এর মাথায় ভূত চেপেছে," সুধন্যবাবু ঘোষণা করলেন। "বিদেশে থাকলে স্বদেশের প্রতি ভালবাসা বাড়ে তো। লিখেছে, দেশে ফিরে গিয়ে দেশের সেবা করবো। বলো দিকিনি, কি সর্বনাশের কথা!"

কথাটা যে মোটেই সুবিধের নয় এ-বিষয়ে দ্বৈপায়ন বন্ধুর সঙ্গে একমত হলেন।

সুধন্যবাবু বললেন, "সেইজন্যেই তো তোমার সঙ্গে পরামর্শ করতে [illegible] জামাই লিখেছে, হাজার টাকা মাইনে পেলে দেশের কোনো কলেজে [illegible]

হয়ে ফিরে যাবো। বাবাজী অনেকদিন ঘরছাড়া, বুঝতে পারছে না ইণ্ডিয়াতে এত লোক যে মানুষেব কোনো সম্মান নেই। মানুষের এই জঙ্গলে মানুষকে যোগ্য মূল্য দিতে ভুলে গিযেছি আমবা।"

দ্বৈপায়ন বললেন, "মেয়েকে লিখে দাও, জামাইযেব কথায় যেন মোটেই রাজী না হয। এখানে এসে ওরা শুধু ভিড বাডাবে, তিন-চাবখানা বাডতি বেশন কার্ড হবে, অথচ দেশেব কোনো মঙ্গল হবে না। তাব থেকে ঐ যে বৈদেশিক মুদ্রা জমাচ্ছে, ওতে দেশেব অনেক উপকাব হচ্ছে।"

সুধন্যবাবুব মনেব মধ্যে কোথাও একটু লোভ ছিল মেয়েকে অতদূরে না-রাখার। চাপা গলায় বললেন, "তোমাকে বলতে লজ্জা নেই, গিন্নিব চোখে জল। হাজাব হোক একটি সন্তান—কোথায পড়ে বযেছে। ওঁব ইচ্ছে মেয়ে-জামাই ফিরে আসুক—অত টাকা নিযে কী হবে? এত লোক তো এই দেশেই কবে খাচ্ছে, গাডি চডছে, ভাল বাডিতে থাকছে।"

একটু থেমে সুধন্যবাবু বললেন, "সেদিক থেকে তুমি ভাই লাকি। হীরের টুকবো সব ছেলে। ভোম্বলেব আব কোনো প্রমোশন হলো নাকি?"

দ্বৈপায়ন ছেলেদেব সব খববাখবব বাখেন। ছেলেবা এসে অফিস সম্পর্কে বাবাব সঙ্গে আলোচনা কবে। দ্বৈপাযন বললেন, "ভোম্বল এ-বছরেই টেকনিক্যাল ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি ম্যানেজাব হবে শুনছি। ছোকবা নিজের চেষ্টায় সামান্য টাকায় ঢুকেছিল, চাকবিতে এতটা উঠবে আশা করিনি। কিন্তু বিয়েব পবই উন্নতি হচ্ছে—বউমাব ভাগ্য।"

বউমা সম্পর্কে কোথাও কোনোবকম মতদ্বৈধ নেই। সুধন্যবাবু বললেন, "গিন্নি এবং আমি তো প্রায়ই বলি, সাক্ষাৎ লক্ষ্মীকে তুমি নিযে এসেছো—নামে কমলা, স্বভাবে কমলা।"

দ্বৈপায়নেব থেকে এ-বিষয়ে কেউ বেশী বোঝে না। তিনি কিছুক্ষণ গম্ভীব হয়ে রইলেন। তাবপর বললেন, "বড বউমা না-থাকলে সংসারটা ভেসে যেত, সুধন্য। আজকালকার মেয়েদেব সম্বন্ধে যা সব শুনি।"

পা নাড়াতে-নাড়াতে সুধন্যবাবু বললেন, "আজকালকাব মেয়েরা যে রসাতলে যাচ্ছে তা হয়তো ঠিক নয়। তবে স্বামীরটি এবং নিজেবটি ছাড়া অন্য কিছুই বোঝে না। সুপুরুষ রোজগেরে স্বামীটি যে ছাব্বিশ-সাতাশ বছর বয়সে আকাশ থেকে বেলুনে চড়ে মাটিতে নেমে আসেনি, অনেক দুঃখ-কষ্টে পেটে ধরে [illegible] যে তাকে তিলতিল করে মানুষ করেছেন, এবং তাঁদেরও যে সন্তানের [illegible] দাবি আছে, তা বউমাদের মনে থাকে না।"

দ্বৈপায়ন বললেন, "এই ডেপুটি ম্যানেজার হবার খবরে বউমা কিন্তু খুব চিন্তিত।"

"সে কি ?" অবাক হয়ে গেলেন সুধন্যবাবু। "প্রমোশন, এ তো আনন্দের কথা।"

"প্রমোশন পেলে ভোম্বলকে হেড অফিসে বদলি করে দেবে," একটু থামলেন দ্বৈপায়ন। "মা আমার কম কথা বলে, কিন্তু বুদ্ধিমতী। কমলাবিহীন এ-সংসারের কী হবে তা নিশ্চয় বুঝতে পারো।"

"কেন ? মেজ বউমা ?" সুধন্যবাবু প্রশ্ন করেন।

দ্বৈপায়ন ঝুঁকে পড়েন সামনের দিকে। নিচু গলায় বললেন, "এখনও ছেলেমানুষ। মনটি ভাল, কিন্তু প্রজাপতির মতো ছটফট করে—একজায়গায় মন স্থির করতে পারে না। তাছাড়া কাজলের তো ঘন ঘন ট্রান্সফারের কাজ। আমেদাবাদে পাঠিয়ে দেবার কথা হচ্ছে।"

সুধন্যবাবু কিছু বলবার মতো কথা পাচ্ছেন না। দ্বৈপায়ন নিজেই বললেন, "এমনও হতে পারে যে এই বাড়িতে কেবল আমি এবং খোকন রয়ে গেলাম।"

কপালে হাত রাখলেন দ্বৈপায়ন। "আমি আর ক'দিন ? কিন্তু সংসারটা গুছিয়ে রেখে যেতে পারলাম না, সুধন্য। প্রতিভার সঙ্গে দেখা হলে বকাবকি করবে। বলবে, দুটো ছেলেকে মানুষ করে, মাত্র একজনের দায়িত্ব তোমার ওপরে দিয়ে এলাম, সে-কাজটাও পারলে না ?"

"চাকরির যে এমন অবস্থা হবে, তা কি কেউ কল্পনা করেছিল ?" বন্ধুকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলেন সুধন্যবাবু। "শুধু তোমার ছেলে নয়, যেখানে যাচ্ছি সেখানেই হাহাকার। হাজার হাজার নয়, লাখ লাখ নয়, এখন শুনছি বেকারের সংখ্যা লক্ষমাত্রা ছাড়িয়ে কোটিতে হাজির হয়েছে।"

দ্বৈপায়ন শুধু বললেন, "হুঁ।" এই শব্দ থেকে তাঁর মনের সঠিক অবস্থা বোঝা গেল না।

সুধন্যবাবু বললেন, "এখন তো আর কাজকর্ম নেই—মন দিয়ে খবরের কাগজটা পড়ি। কাগজে লিখছে, এত বেকার পৃথিবীর আর কোনো [illegible] নেই। এই একটা ব্যাপারে আমরা নিঃসন্দেহে ফার্স্ট হয়েছি—[illegible] কোনো জাত অদূর ভবিষ্যতে আমাদের এই সম্মান থেকে সরাতে পারবে না। [illegible] মধ্যে আবার আমরা বাঙালীরা বেকারীত্বে গোল্ড মেডেল নিয়ে বসে [illegible]।"

আরাম-কেদারায় শুয়ে দ্বৈপায়ন আবার বললেন, "হুঁ।"

সুধন্যবাবু বললেন, "জিনিসটা বীভৎস। লেখাপড়া শিখে, [illegible]

আশা নিয়ে লাখ-লাখ স্বাস্থ্যবান ছেলে চুপচাপ ঘরে বসে আছে, আর মাঝে-মাঝে কেবল দরখাস্ত লিখছে—এ-দৃশ্য ভাবা যায় না। সমস্যাটা বিশাল, বুঝলে দ্বৈপায়ন। সুতরাং তুমি একলা কী করবে?"

মন তবু বুঝতে চায় না। দ্বৈপায়নের কেমন ভয় হয়, প্রতিভার সঙ্গে দেখা হলে এইসব যুক্তিতে সে মোটেই সন্তুষ্ট হবে না। বরং বলে বসবে, তুমি না বাপ? মা-মরা ছেলেটার জন্যে শুধু খবরের কাগজী লেকচার দিলে!

সুধন্যবাবু বললেন, "সারাজন্ম খেটেখুটে পেনসন নিয়ে যে একটু নিশ্চিন্ত জীবন কাটাবে তার উপায় নেই। ছেলেরা মানুষ না হলে নিজেদের অপরাধী মনে হয়।"

সুধন্যবাবু উঠতে যাচ্ছিলেন। দ্বৈপায়ন বললেন, "এ-সম্বন্ধে তোমার মেয়ে একবার কি লিখেছিল না?"

সুধন্যবাবু আর একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, "একবার কেন? মেয়ে প্রায়ই লেখে। ওখানকার পলিসি হলো—নিজের বর নিজে খোঁজো—ওন-ইওর-ওন টেলিফোনের মতো। ইচ্ছে হলে, বড়জোর বাপ-মাকে কনসাল্ট করো। কিন্তু দায়িত্বটা তোমার। তেমনি, চাকরি খুঁজে দেবার দায়িত্ব বাপ-মায়ের নয়। তোমার গোঁপ-দাড়ি গজিয়েছে, সাবালক হয়েছো—এখন নিজে চরে খাও।"

সোমনাথের কথা সঙ্গে-সঙ্গে মনে পড়ে গেল দ্বৈপায়নের। মনের সঙ্কোচ ও দ্বিধা কাটিয়ে তিনি বললেন, "ভাবছিলাম, খোকনের জন্যে কানাডায় কিছু করা যায় কিনা। এখানে চাকরি-বাকরির যা অবস্থা হলো।"

সুধন্যবাবু কোনো আশা দিতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত দায়সারাভাবে উত্তর দিলেন, "তুমি যখন বলছো, তখন খুকীর কাছে আমি সব খুলে লিখতে পারি। কিন্তু আমি যতদূর জানি, প্রতি হপ্তায় কলকাতা থেকে এ-ধরনের অনুরোধ জামাইয়ের কাছে দু-তিনখানা যায়। কানাডিয়ানরা আগে অনেক ইণ্ডিয়ান নিয়েছে—এখন ওরা চালাক হয়ে গিয়েছে। ডাক্তার, ইনজিনীয়ার, টেকনিশিয়ান ছাড়া আর কাউকে কানাডায় ঢোকবার ভিসা দিচ্ছে না।"

দ্বৈপায়ন এই ধরনের উত্তরের জন্যেই প্রস্তুত ছিলেন। কানাডাকে তিনি দোষ দিতে পারেন না। ঢালোয়া দরজা খুলে রাখলে, কানাডার অবস্থা এদেশের মতো হতে বেশী সময় লাগবে না।

তবু মনটা খারাপ হলো দ্বৈপায়নের। সুধন্যর জামাইয়ের বিদেশ যাওয়ার সময় পাসপোর্টের গোলমাল ছিল। সে-গোলমাল দ্বৈপায়নই সামলে ছিলেন।

খুকীর পাসপোর্ট তৈরির সময়েও দ্বৈপায়নকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল। সুধন্য তখন অবশ্য ওঁর দুটো হাত ধরে বলেছিলেন, "তোমার ঋণ জীবনে শোধ করতে পারবো না।"

বিরক্তিটা সুধন্যর ওপর আর রাখতে পারছেন না দ্বৈপায়ন। মনে হচ্ছে, তিনকাল গিয়ে জীবনের শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। এখনও তাঁকে সংসারের কথা ভাবতে হবে কেন? দ্বৈপায়নের অকস্মাৎ মনে হলো, পাশ্চাত্য দেশের বাপ-মায়েরা অনেক ভাগ্যবান—তাঁদের দায়দায়িত্ব অনেক কম। মেয়ের বিয়ে এবং ছেলের চাকরি—এই দুটো বড় অশান্তি থেকে তাঁরা বেঁচেছেন।

সুধন্যবাবু বিদায় নেবার পরও দ্বৈপায়ন অনেকক্ষণ চুপচাপ বারান্দায় বসেছিলেন। বাইরে কখন অন্ধকার নেমে এসেছে। রাস্তা দিয়ে অফিসের লোকেরা ইতিমধ্যে বাড়ি ফিরে এসেছে। মাঝে-মাঝে দু-একটা গাড়ি কেবল এ অঞ্চলের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করছে।

"বাবা, আপনি কি ঘুমিয়ে পড়লেন?" বড় বউমার ডাকে সংবিৎ ফিরে পেলেন দ্বৈপায়ন।

সন্ধ্যার অস্পষ্ট অন্ধকারে সদ্যপ্রসাধিতা শ্রীময়ী বউমাকে দেখতে পেলেন দ্বৈপায়ন।

"এসো মা," বললেন দ্বৈপায়ন।

"আপনি স্নান করবেন না, বাবা?" স্নিগ্ধ স্বরে কমলা জিজ্ঞেস করলো।

"এখানে বসে থাকলেই নানা ভাবনা মাথার মধ্যে এসে ঢোকে, বউমা। বুড়ো-বয়সে কিছু করবার ক্ষমতা থাকে না, কিন্তু ভাবনাটা রয়ে যায়। অথচ কী যে ভাবি, তা নিজেও অনেক সময় বুঝতে পারি না।"

"বাবা, বেশী রাত্রে স্নান করলে আপনার হাঁচি আসে। আপনি বরং ঠাণ্ডা জলে গা মুছে নিন," শ্বশুরকে কমলা প্রায় হুকুম করলো।

দ্বৈপায়ন জিজ্ঞেস করলেন, "মেজ বউমা কোথায়?"

"কাজলের মেজ সায়েব নাইজিরিয়াতে বদলী হয়ে যাচ্ছেন—তাই পার্টি আছে। ওরা দুজন একটু আগেই বেরলো। ফিরতে হয়তো দেরি হবে।"

দ্বৈপায়ন বললেন, "বিলিতী অফিসের এই একটা দোষ। অনেক রাত্র পর্যন্ত পার্টি না-করলে সায়েবরা খুশী হন না।"

কমলা শ্বশুরকে আশ্বাস দিল, "এবার কমে যাবে। কারণ, নতুন মেজ সায়েব ইণ্ডিয়ান।"

"কী নাম ?" দ্বৈপায়ন জিজ্ঞেস করলেন।

"মিস্টার চোপরা, বোধ হয়," কমলা জানালো।

"ওরে বাবা ! তাহলে বলা যায় না, হয়তো বেড়েও যেতে পারে।"

কমলা বললে, "সিধু নাপিতকে কাল আসতে বলে দিয়েছি, বাবা। অনেক-দিন আপনার চুল কাটা হয়নি।"

"কালকে কেন ? পরশু বললেই পারতে," দ্বৈপায়ন মৃদু আপত্তি জানালেন।

"পরশু যে আপনার জন্ম বার," কমলা মনে করিয়ে দিলো। জন্ম বারে যে চুল ছাঁটতে নেই, এটা শাশুড়ীর কাছে সে অনেকবার শুনেছে।

দ্বৈপায়ন নিজের মনেই হাসলেন। তারপর বললেন, "চুল ছাঁটার কথা বলে ভালই করেছো, বউমা। ঠিক সময়ে চুল ছাঁটা না-হলে তোমার শাশুড়ী ভীষণ চটে উঠতেন।"

মুখ টিপে হাসলো কমলা। শ্বশুর-শাশুড়ীর অনেক ঝগড়া সে নিজের চোখে দেখেছে এবং নিজের কানে শুনেছে। শাশুড়ী রেগে উঠলে বলতেন, "যদি আমার কথা না-শোনো তাহলে রইলো তোমার সংসার। আমি চললাম।"

শ্বশুরমশায় বলতেন, "যাবে কোথায় ?"

শাশুড়ী ঝাঁঝিয়ে উঠতেন, "তাতে তোমার দরকার ? যেদিকে চোখ যায় সেদিকে চলে যাবো।"

বাবার কী সেসব কথা মনে পড়ছে ? নইলে উনি অমন অসহায়ভাবে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন কেন ? মায়ের কথা ভেবে বাবা রাতের নক্ষত্রের দিকেই তাকিয়ে থাকেন।

দ্বৈপায়ন নিজেকে শান্ত করে নিলেন। তারপর সস্নেহে বললেন, "ভোম্বলের কোনো খবর পেলে ?"

স্বামী ট্যুরে গিয়েছেন বোম্বাইতে। কমলা বললে, "আজই অফিস থেকে খবর পাঠিয়েছেন। টেলেক্সে জানিয়েছেন, ফিরতে আরও দেরি হবে। হেড অফিসে কী সব জরুরী মিটিং হচ্ছে।"

দ্বৈপায়ন বললেন, "হয়তো ওর প্রমোশনের কথা হচ্ছে। টেকনিক্যাল ডিভিসনের ডেপুটি ম্যানেজার হলে তো অনেক বেশী দায়িত্ব নিতে হবে।"

কমলা চুপ করে রইলো। দ্বৈপায়ন বললেন, "জানো বউমা, আই অ্যাম প্রাউড অফ ভোম্বল। ওর জন্যে কোনোদিন একটা প্রাইভেট টিউটর পর্যন্ত আমি রাখিনি। নিজেই পড়াশুনা করেছে, নিজেই আই-আই-টিতে ভর্তি

হয়েছে, নিজেই ফ্রি স্টুডেন্টশিপ যোগাড় করেছে, তারপর চাকরিটাও নিজের মেরিটে পেয়েছে। এগারো বছর আগে যখন তোমার সঙ্গে বিয়ের সম্পর্ক হলো, তখনও ভোম্বল ছিল একজন অর্ডিনারি টেকনিক্যাল অ্যাসিস্টাণ্ট। আর চল্লিশে পা-দিতে না-দিতে ডেপুটি ম্যানেজার।"

হঠাৎ চুপ করে গেলেন দ্বৈপায়ন। তিনি কি ভাবছেন কমলা তা সহজেই বলতে পারে। সোমনাথের কথা চিন্তা করে তিনি যে হঠাৎ বিমর্ষ হয়ে পড়ছেন তা কমলা বুঝতে পারছে। যোধপুর পার্কের এই বাড়ির একটা ভবিষ্যৎ কল্পনাচিত্র যে দ্বৈপায়নের মনে মাঝে-মাঝে উঁকি মারে তা কমলার জানা আছে।

ছবিটা এইরকম। ভোম্বল বোম্বাই বদলি হয়েছে। বউমাকেও স্বামীর সঙ্গে যেতে হয়েছে। যাবার আগে সে বাবাকে নিয়ে যাবার জন্যে অনেক চেষ্টা করেছে। বাবা রাজী হননি। কাজলও বদলি হয়েছে আমেদাবাদে। আর মেজ বউমা (বুলবুল) তো স্বামীর সঙ্গে যাবার জন্যে এক-পা বাড়িয়ে আছে। তখন এ-বাড়িতে কেবল দ্বৈপায়ন এবং সোমনাথ।

বড় বউমার দিকে অসহায়ভাবে তাকালেন দ্বৈপায়ন। কিন্তু কোনো কথা বললেন না। সঞ্চয় বলতে তাঁর বিশেষ কিছুই নেই—হাজার দুয়েক টাকা। আর পেনসন, সে তো তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে যাবে। তারপর সোমনাথ কী করবে? এ-বাড়িটাও তাঁর নিজস্ব নয়। দোতলা করবার সময় ভোম্বল ও কাজল দুজনেই কিছু কিছু টাকা দিয়েছে। কাজলের মাইনে থেকে এখনও কো-অপারেটিভের ঋণের টাকা মাসে মাসে কাটছে।

কমলা বললে, "বাবা আপনাকে একটু হরলিক্স এনে দেবো? আপনাকে আজ বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে।"

দ্বৈপায়ন নিজের ক্লান্তি অস্বীকার করতে পারলেন না। বললেন, "কিছুই করি না, তবু আজকাল মাঝে-মাঝে কেন যে এমন দুর্বল হয়ে পড়ি।"

কমলা বললে, "আপনি যে কারুর কথা শোনেন না, বাবা। দিনরাত খোকনের জন্যে চিন্তা করেন।"

দ্বৈপায়ন একটু লজ্জা পেলেন। মনে হলো পুত্রবধূর কাছে তিনি ধরা পড়ে গিয়েছেন।

কমলার মধ্যে কি মধুর আত্মবিশ্বাস। সে বললে, "আপনি শুধু শুধু ভাবেন ওর জন্যে। আমার কিন্তু একটুও চিন্তা হয় না। অত ভাল ছেলের ওপর ভগবান কখনও নির্দয় হতে পারেন না।"

বার্ধক্যের প্রান্তরে দাঁড়িয়ে দ্বৈপায়ন যদি বত্রিশ বছর বয়সের বউমার অর্ধেক বিশ্বাসও পেতেন তাহলে কি সুন্দর হতো। লক্ষ্মী-প্রতিমার মতো বউমার প্রশান্ত মুখের দিকে তাকালেন দ্বৈপায়ন।

ধীর শান্ত কণ্ঠে কমলা বললে, "ওর প্রমোশন অত তাড়াতাড়ি হচ্ছে বলে মনে হয় না। আর হলেও, খোকনের বিয়ে না দিয়ে আমি কলকাতা ছাড়ছি না।"

অনেক দুঃখের মধ্যেও দ্বৈপায়নের হাসি আসছে। ভাবলেন, একবার বউমাকে মনে করিয়ে দেন – রুজি-রোজগার না থাকলে কোনো ছেলের বিয়ের কথা ভাবা যায় না। আড়াই বছর ধরে সোমনাথ চাকরির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অনেক অ্যাপ্লিকেশন তিনি নিজে লিখে দিয়েছেন। প্রতিদিন তিনখানা করে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন তিনি তন্ন তন্ন করে দেখেন। সেগুলোতে লাল পেন্সিলে দাগ দেন প্রথমে। তারপর ব্লেড দিয়ে নিখুঁতভাবে কেটে পিছনে কাগজের নাম এবং তারিখ লিখে রাখেন।

দ্বৈপায়নের মনে পড়ে গেল আজকের খবরের কাগজের কাটিংগুলো ওঁর কাছেই পড়ে আছে। কাটিংগুলো বউমার হাতে দিয়ে বলেন, "সোমকে এখনই দিয়ে দাও।"

বাবার উদ্বেগের কথাও বউমা জানে। আগামীকাল ভোরবেলায় বউমাকে জিজ্ঞেস করবেন, "কাটিংগুলো খোকনকে দিয়েছো তো? ও যেন বসে না থাকে। তাড়াতাড়ি অ্যাপ্লিকেশন পাঠিয়ে দেওয়া ভাল। দুটো অ্যাপ্লিকেশনে আবার তিন টাকা ও পাঁচ টাকার পোস্টাল অর্ডার চেয়েছে।"

কমলা জানে সোমকে ডেকে সোজাসুজি এসব কথা বলতে আজকাল বাবা পারেন না। দুজনেই অস্বস্তি বোধ করে। অনেক সময় বাবা ডাকলেও সোম যেতে চায় না। যাচ্ছি-যাচ্ছি করে একবেলা কাটিয়ে দেয়। কমলাকে দু'পক্ষের মধ্যে ছোটাছুটি করতে হয়। কমলা বললে, "সোমকে আমি সব বুঝিয়ে বলে দিচ্ছি। পোস্টাল অর্ডারের টাকাও তো ওর কাছে দেওয়া রয়েছে।"

দ্বৈপায়ন তবুও নিশ্চিত হতে পারলেন না। ওঁর ইচ্ছে, সোমনাথ নাইট পোস্টাপিস থেকে এখনই পোস্টাল অর্ডার কিনে আনুক এবং আধ ঘণ্টার মধ্যে অ্যাপ্লিকেশন টাইপ হয়ে যাক, যাতে কাল সকালেই রেজিস্ট্রি ডাকে পাঠানো যায়।

কমলা বাবাকে শান্ত করবার জন্যে বললে, "দরখাস্ত নেবার শেষ দিন তো তিন সপ্তাহ পরে।"

নিজের অস্বস্তি চেপে রেখে দ্বৈপায়ন বললেন, "তুমি জানো না, বউমা। আজকাল ডাকঘরের যা অবস্থা হয়েছে, গিয়ে দেখবে পাঁচ টাকার পোস্টাল অর্ডার ফুরিয়ে গেছে। তারপর রেজিস্ট্রি ডাকের তো কথাই নেই। তিন ঘণ্টার পথ যেতে তিন সপ্তাহ লাগিয়ে দেয়। যারা চাকরির বিজ্ঞাপন দেয় তারাও ছুতো খুঁজছে। লাস্ট ডেটের আধঘণ্টা পরে চিঠি এলেও খুলে দেখবে না—একেবারে ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে ফেলে দেবে।"

নিজের ইচ্ছে যাই হোক, বউদির অনুরোধ এড়ানো যায় না। কমলা বউদি সোমনাথকে বললেন, "লক্ষ্মীটি সকালবেলাতেই পোস্টাপিসে অ্যাপ্লিকেশনটা রেজিস্ট্রি করে এসো—বাবা শুনলে খুশী হবেন। বুড়ো মানুষ, ওঁকে কষ্ট দিয়ে কী লাভ?"

চিঠি ও খাম টাইপ করিয়ে সোমনাথ পোস্টাপিসের দিকে যাচ্ছিলো। পোস্টাল অর্ডার কিনে ওখান থেকেই সোজা পাঠিয়ে দেবে

পোস্টাপিসের কাছে সুকুমারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সুকুমার চিৎকার করে বললে, "কী হে নবাব বাহাদুর, সকালবেলায় কোথায় প্রেমপত্তর ছাড়তে চললে?"

সোমনাথ হেসে ফেললো। "তোর কী ব্যাপার? দু তিনদিন পাত্তা নেই কেন?"

"তুমি তো মিনিস্টারের সি এ নও যে তোমার সঙ্গে আড্ডা জমাতে পারলে চাকরি পাওয়া যাবে। নিজের মাথার ব্যথায় পাগল হয়ে যাচ্ছি। রাইটার্স বিল্ডিংসের ভিতরে ঢোকা আজকাল যা শক্ত করে দিয়েছে মাইরি, তোকে কী বলবো!"

"মিনিস্টারের সি-এরাই হয়তো চায় না বাজে লোক এসে জ্বালাতন করুক," সোমনাথ বললো।

"সে বললে তো চলবে না, বাবা। মিনিস্টারের সি-এ যখন হয়েছো, তখন লোকের সঙ্গে দেখা করতেই হবে। বিশেষ করে আমাদের মতো যারা এম-এল-এর থ্রু দিয়ে এসেছে তাদের এড়িয়ে যেতে পারবে না।"

সুকুমার এবার বললো, "চল তোর সঙ্গে পোস্টাপিসে ঘুরে আসি। ভয় নেই, তোর অ্যাপ্লিকেশনে ভাগ বসাতে যাচ্ছি না। তুই যেখানে খুশী চিঠি পাঠা, আমি বাগড়া দেবো না।"

এবার সুকুমার বললো, "তোকে কেন মিথ্যে বলবো, গত দু'দিন ডিপি-[illegible]

সামনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চাকরির সাইক্লোস্টাইলকরা ফর্ম বেচে টু-পাইস করেছি। কেরানির পোস্ট তো, হুড় হুড় করে ফর্ম বিক্রি হচ্ছে মাইরি। এক ব্যাটা কাপুর তাল বুঝে হাজার হাজার ফর্ম সাইক্লোস্টাইল করে হোলসেল রেটে বাজারে ছাড়ছে। টাকায় দশখানা ফর্ম কিনলুম কাপুরের কাছ থেকে, আর বিক্রি হলো পনেরো পয়সা করে। তিরিশখানা ফর্ম বেচে পুরো দেড়টাকা পকেটে এসে গেল।"

"কাপুর সায়েব তো ভাল বুদ্ধি বার করেছে," সোমনাথ বললো।

সুকুমার বললো, "এ-দিকে কিন্তু কেলেংকেরিয়াস কাণ্ড। বাজারে কেউ জানে না—মিনিস্টারের সি-এর সঙ্গে দেখা না-করতে গেলে আমার কানেও আসতো না। পনেরোটা পোস্টের জন্যে ইতিমধ্যে এক লাখ অ্যাপ্লিকেশন জমা পড়েছে। সেই নিয়ে ডিপার্টমেণ্টে প্রবল উত্তেজনা। টপ অফিসার দু'বার মিনিস্টারের সি-এর সঙ্গে দেখা করে গেল।"

"তাহলে ওদের টনক নড়েছে। দেশের অবস্থা কোনদিকে চলছে ওরা বুঝতে পেরে ছোটাছুটি করছে," সোমনাথ খবরটা পেয়ে কিছুটা আশ্বস্ত হলো।

"দূর, দেশের জন্যে তো ওদের ঘুম হচ্ছে না। ওরা নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত। এক লাখ অ্যাপ্লিকেশন ইতিমধ্যে এসে গেছে শুনে সি-এ বললেন, কীভাবে এর থেকে সিলেকশন করবেন ?"

অফিসার বললেন, "সিলেকশন তো পরের কথা তার আগে আমি কী করবো তাই বলুন ? প্রত্যেক অ্যাপ্লিকেশনের সঙ্গে তিন টাকার ক্রসড্ পোস্টাল অর্ডার এসেছে। তিন টাকার পোস্টাল অর্ডার হয় না, তাই মিনিমম একটাকার তিনখানা অর্ডার প্রত্যেক চিঠির সঙ্গে এসেছে। তার মানে এক লাখ ইনটু থ্রি অর্থাৎ তিন লাখ ক্রসড্ অর্ডারের পিছনে আমাকে সই করতে হবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে জমা দেবার আগে। সব কাজ বন্ধ করে, দিনে পাঁচশোখানা সই করলেও আমার আড়াই বছর সময় লেগে যাবে। অথচ ফাইনানসিয়াল ব্যাপার, সই না করলেও অডিট অবজেকশনে চাকরি যাবে।"

হা-হা করে হেসে উঠলো সুকুমার। বললে, "লোকটার মাইরি, পাগল হবার অবস্থা। বলছে, হোল লাইফে কখনও এমন বিপদে পড়েনি।"

"কোন ডিপার্টমেণ্ট রে ?" সোমনাথ জিজ্ঞেস করলো। তারপর উত্তরটা শুনেই ওর মুখ কালো হয়ে গেল। ওই পোস্টের জন্যেই আরো তিন টাকার পোস্টাল অর্ডার কিনতে যাচ্ছে সে।

সুকুমার বললে, "তোর তিনটে টাকা জোর বেঁচে গেল। ওই টাকায়

ফুটবল খেলা দেখে, বাদাম ভাজা খেয়ে আনন্দ করে নে।”

খেলার মাঠের নেশাটা সোমনাথের অনেকদিনের। সুকুমারও ফুটবল পাগল। দুজনে অনেকবার একসঙ্গে মাঠে এসেছে। সোমনাথ বললে, “চল মাঠেই যাওয়া যাক।” সুকুমারের আত্মসম্মানজ্ঞান টনটনে। সে কিছুতেই সোমনাথের পয়সায় মাঠে যেতে রাজী হলো না।

সোমনাথের হঠাৎ অরবিন্দর কথা মনে পড়ে গেল। সুকুমারকে বললো, “শুনেছিস, রত্নার সঙ্গে অরবিন্দর বিয়ে। বাড়িতে অরবিন্দ একটা কার্ড রেখে গেছে।”

সুকুমার বললো, “আমাকেও একটা কার্ড পাঠিয়েছে ডাকে। শুভবিবাহ মার্কা কার্ড দেখে বাড়িতে আবার কতরকম টিপ্পনী কাটলে। ভেবেছিলুম, অরবিন্দর বিয়েতে যাবো—হাজার হোক বর কনে দুজনেই আমাদের ফ্রেণ্ড। কিন্তু বিয়ে মানেই তো বুঝতে পারিস।”

সোমনাথ চুপ করে রইলো। সুকুমার বললো, “আমি ভেবেছিলুম, খালি হাতেই একবার দেখা করে আসবো। সেই শুনে আমার বোনদের কি হাসি! বললে, ‘তোর কি লজ্জা শরম কিছু রইলো না দাদা? লুচি মাংস খাবার এতই লোভ যে শুধু হাতে বিয়ে বাড়ি যেতে হবে?’ ”

সোমনাথের বোন নেই। সুতরাং বোনদের সঙ্গে ভাইদের কী রকম রেষারেষির সম্পর্ক হয় তা জানে না।

সুকুমার বললো, “কণাকেও দোষ দিতে পারি না। ওর বন্ধুর বিয়েতেও নেমন্তন্নের চিঠি এসেছিল। উপহার কিনতে পারা গেল না, তাই বেচারা যেতে পারলো না।”

সোমনাথ বললো, “অরবিন্দ ছেলেটার ক্রেডিট আছে বলতে হবে। বেস্ট-কীন-রিচার্ডসের মতো কোম্পানিতে ঢুকেছে।”

সোমনাথের কথা শুনে সুকুমার ফিক করে হেসে ফেললো। “ক্রেডিট ওর বাবার। আয়রন স্টীল কনট্রোলে বড় চাকরি করেন—ঝোপ বুঝে কোপ মেরেছেন।”

একটু থেমে সুকুমার বললে, “তবে ভাই আমার রাগ হয় না।”

“কেন?” সোমনাথ জিজ্ঞেস করলো।

“ওদের ব্যাচে বারোজন ম্যানেজমেণ্ট ট্রেনি নিয়েছে—তার মধ্যে অরবিন্দই একমাত্র লোক্যাল বয়। আর সব এসেছে হরিয়ানা, পাঞ্জাব এবং তা থেকে। [illegible] পিছনে হয় মামা না হয় বাবা আছেন। [illegible]

বলছিল, 'কোনো ব্যাটা স্বীকার করবে না যে দিল্লীতে বড় বড় সরকারী পোস্টে ওদের আত্মীয়স্বজন আছেন। সবাই নাকি নিজেদের বিদ্যে বুদ্ধি এবং মেরিটের জোরে বেস্ট-কীন-রিচার্ডসে ঢুকেছে! কলকাতার ছেলেদের তো কোনো মেরিট নেই!' জানিস সোমনাথ, এই বেস্ট-কীন-রিচার্ডস যেদিন ঝুনঝুনওয়ালা কিংবা বাজোরিয়ার হাতে যাবে, তখন দেখবি সমস্ত মেরিট আসছে রাজস্থানে ওঁদের নিজেদের গ্রাম থেকে।"

সোমনাথ ও সুকুমার দুজনেই গম্ভীর হয়ে উঠলো। তারপর একসঙ্গে হঠাৎ দুজনেই হেসে উঠলো। সুকুমার বললো, "আমরা আদার ব্যাপারী জাহাজের খোঁজ করে মাথায় রক্ত তুলছি কেন? আমরা তো অফিসার হতে চাইছি না। আমরা কেরানির পোস্ট চাইছি। আর আমার যা অবস্থা, আমি বেয়ারা হতেও রাজী আছি।"

আজকাল বাবাকে দেখলে কমলার কষ্ট হয়। ওপরের ওই বারান্দায় বসে অসহায়ভাবে ছটফট করেন ছোট ছেলের জন্যে।

আরাম-কেদারায় সোজাভাবে বসে দ্বৈপায়ন বললেন, "জানো বউমা, যে-কোনো একটা চাকরি হলেই আমি সন্তুষ্ট। খোকনের একটা স্থিতি প্রয়োজন।"

কমলা গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে বললে, "নিশ্চয় স্থিতি হবে বাবা।"

"কোনো লক্ষণ তো দেখছি না, মা," গভীর দুঃখের সঙ্গে বললেন দ্বৈপায়ন।

চোখের চশমাটা খুলে সামনের টেবিলে রেখে দ্বৈপায়ন বললেন, "যার দাদারা ভাল চাকরি করে, তার পক্ষে একেবারে সাধারণ হওয়া বড্ড যন্ত্রণার। খোকন সেটা বোঝে কি না জানি না, কিন্তু আমার খুব কষ্ট হয়।"

কমলা অনেকবার ভেবেছে, দাদারা নিজেদের অফিসে সোমের জন্যে একটু চেষ্টা করে দেখলেই পাবে। আজ শ্বশুরের কাছে সেই প্রস্তাব তুললো কমলা।

দ্বৈপায়ন বললেন, "কথাটা যে আমার মাথায় আসেনি তা নয়। ভোম্বল এবং কাজল দুজনকেই খোঁজখবর করতে বলেছিলাম। কিন্তু উপায় নেই, নিজের ভাইকে অফিসে ঢোকালে ইউনিয়ন হৈ-চৈ বাধাবে। ভোম্বলের অফিসে তো বড় সাহেব গোপন সার্কুলার দিয়েছেন, কোনো অফিসারের আত্মীয়কে চাকরিতে ঢোকাতে হলে তাঁর কাছে পেপার পাঠাতে হবে। সোজাসুজি বলে

দিয়েছেন ব্যাপারটা তিনি মোটেই পছন্দ করেন না।"

"দুই ভাই যদি গুণের হয়? তবু তারা এক অফিসে জায়গা পাবে না?" কমলা বড় সায়েবের সঙ্গে ঠিক একমত হতে পারলো না।

দ্বৈপায়ন বললেন, "তা হলেও নয়। সায়েবদের ধারণা, একই পরিবারের বেশী লোক একই অফিসে ঢুকলে নানা সমস্যা দেখা দেয়।"

কমলার তবু ভালো লাগছে না। সে বললে, "একই পরিবারের লোক এক অফিসে থাকলে বরং সুবিধে। এ ওকে দেখবে।"

হাসলেন দ্বৈপায়ন। বললেন, "বউমা, কর্মস্থল এবং ফ্যামিলি এক নয়, তুমি ভোম্বলকে জিজ্ঞেস করে দেখো।"

কমলা কিছুতেই একমত হতে পারছে না। সে বললে, "কেন বাবা? ওঁদের অফিস থেকে যে হাউস ম্যাগাজিন আসে তাতে যে প্রত্যেক সংখ্যায় লেখা হয়, কোম্পানিও একটা পরিবার। প্রত্যেকটি কর্মচারী এই পরিবারের লোক।"

হাসলেন দ্বৈপায়ন। "ওটা সত্যি কথা নয়, বউমা। নাম-কা-ওয়াস্তে বলতে হয়, তাই বড় কর্তারা বলেন। কিন্তু কেউ বিশ্বাস করেন না। ভোম্বল একটা বই এনে দিয়েছিল, তাতে পড়েছিলাম—অফিসটা হলো পরিবারের উল্টো। অফিসে আদর্শের কোনো দাম নেই—সেখানে যে ভাল কাজ করে, যে বেশী লাভ দেখাতে পারে তারই খাতির। সে-লোকটা মানুষ হিসেবে কেমন তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। অথচ ফ্যামিলিতে মনুষ্যত্বের দামটাই বেশী দেবার চেষ্টা করি আমরা। দয়া মায়া স্নেহ মমতা এসবের কোনো স্বীকৃতি নেই অফিসে। যে ভুল করে, দোষ করে, নিয়ম ভাঙে, ঠিক মতো প্রোডাকশন দেয় না, কর্মক্ষেত্রে তাকে নির্দয়ভাবে শাসন করতে হয়—সংসারে কিন্তু তা হয় না। অফিসে যে ভাল কাজ করে তার দাম। বাড়িতে কোনো ছেলে পরীক্ষায় ফেল করলেও তার ওপর ভালবাসা কমে যায় না। বরং অনেক সময় ভালবাসা বাড়ে।"

কমলা এত বুঝতো না। সে সবিস্ময়ে সরল মনে বললে, "তাহলে পরিবারটাই তো অনেক ভাল জায়গা, বাবা।"

দ্বৈপায়ন হাসলেন। "সে-কথা বলো। সংসারটাই তো আমাদের আশ্রয়—সংসারের ভালর জন্যেই তো লোকে আপিসে যায়।"

কমলা বললে, "আপিসে তো যাইনি, তাই ব্যাপারটা কখনও বুঝিনি, বাবা।"

"অনেকে সারাজন্ম আপিস গিয়েও ব্যাপারটা বোঝে না, মা। সংসারের মূল্যও তারা জানে না।"

কমলা তার পদ্মের মতো চোখ দুটো বড় বড় করে বিস্ময়ে শ্বশুরের দিকে তাকিয়ে থাকে। দ্বৈপায়ন বললেন, "ভোম্বলকে বোলো তো বইটা আবার নিয়ে আসতে। আর একবার উল্টে দেখবো, তুমিও পড়ে নিও। একটা কথা আমার খুব ভাল লেগেছিল—আমাদের এই সমাজটাও একধরনের অরণ্য। ইট-কাঠ পাথর দিয়ে তৈরি এই অরণ্যে জঙ্গলের নিয়মই চালু রয়েছে'। এরই মধ্যে পরিবারটা হলো ছোট্ট নিরাপদ কুঁড়েঘরের মতো। এখান থেকে বেরোলেই সাবধান হতে হবে; সবসময় মনে রাখতে হবে আমরা মানুষের জঙ্গলে বিচরণ করছি।"

হতাশ হয়ে পড়লো কমলা। "তাহলে বলছেন, ভাইদের অফিসে সোমের কোনো আশা নেই?"

দুঃখের সঙ্গেই দ্বৈপায়ন স্বীকার করলেন, "কোনো সম্ভাবনাই নেই। এবং চেষ্টা করাও ঠিক হবে না, কারণ তাতে দুই দাদার কাজের ক্ষতি হতে পারে।"

দ্বৈপায়ন এবার বাথরুমে গা মুছবার জন্যে ঢুকলেন। কমলা সেই ফাঁকে দ্রুত এক গ্লাস হরলিক্স তৈরি করে নিয়ে এলো।

ঠাণ্ডা জলের সংস্পর্শে এসে দ্বৈপায়ন এবার বেশ তাজা অনুভব করছেন। শরীরের অবসাদ নষ্ট হয়েছে।

কমলা উঠতে যাচ্ছিলো। দ্বৈপায়ন বললেন, "রান্না তো শেষ হয়ে গিয়েছে?"

"খাবার লোক তো এবেলায় কম। নগেনদি কেবল রুটিগুলো সেঁকছেন," কমলা জানালো।

দ্বৈপায়নের ইচ্ছে বউমা আরও একটু বসে যায়। বললেন, "তোমার যদি অসুবিধে না হয়, তাহলে আরও একটু বসো না, বউমা।"

বাবার মন বোঝে কমলা। বউমার সঙ্গেই একমাত্র তিনি সহজ হতে পারেন। আর সবার সঙ্গে কথা বলার সময় কেমন যেন একটা দূরত্ব এসে যায়। এই দূরত্ব কীভাবে গড়ে উঠেছে কেউ জানে না। ছেলেরা কাছে এসে তাঁর কথা শুনে যায়, কিছু খবর দেবার থাকলে দেয়, কিন্তু সহজ পরিবেশটা গড়ে ওঠে না। কমলা বাবাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করে, কিন্তু প্রয়োজন হলে প্রশ্ন তোলে। আর বাবারও যে বউমার ওপর বেশ দুর্বলতা আছে তা সহজেই বুঝতে পারা যায়। বউমা প্রশ্ন করলে, রাগ তো দূরের কথা, তিনি খুশী হন। ছেলেদের অত সাহস নেই। তারা প্রতিবাদও করে না, প্রশ্নও করে না। তবে

তারা বাবার অবাধ্যও হয় না।

কমলা বললে, "বাবা, আপনি দু'বেলা বেড়াতে বেরোবেন।"

"বেশ তো আছি, বউমা। এখানে বসে বসেই তো পৃথিবীর অনেকটা দেখতে পাচ্ছি," দ্বৈপায়ন সস্নেহে উত্তর দেন। তারপর একটু থেমে বললেন, "আজকাল হাঁটতে ভাল লাগে না। বয়স তো হচ্ছে।"

"আপনার কিছুই বয়স হয়নি," মৃদু বকুনি লাগালো কমলা। "আপনার বন্ধু দেবপ্রিয়বাবু তো আপনার থেকে ছ'মাস আগে রিটায়ার করেছেন। সকাল থেকে টোটো করছেন, তাস খেলছেন।"

"দেবুটা চিরকালই একটু ফচকে। তাসের নেশা অনেকদিনের। আমার আবার তাসটা মোটেই ভাল লাগে না," দ্বৈপায়ন বললেন।

ছোট মেয়ের মতো উৎসাহে কমলা বললে, "কাকীমা সেদিন দেবপ্রিয়বাবুকে খুব বকছিলেন। কাকাবাবু নাকি কোনো সিনেমা বাদ দেন না। আজকাল ম্যাটিনী শোতে হিন্দী বই পর্যন্ত লাইন দিয়ে দেখে আসেন একা একা।"

গম্ভীর দ্বৈপায়ন এবার হাসি চাপতে পারলেন না। বললেন, "দেবু তাহলে বুড়ো বয়সে হিন্দী ছবির খপ্পরে পড়লো। বউকে নিয়ে গেলেই পারে—তাহলে বাড়িতে অশান্তি হয় না।"

"দোষটা তো কাকাবাবুর নয়," কমলা জানায়। "কাকীমা যে ঠাকুর-দেবতার বই ছাড়া দেখতে যাবেন না।"

এই ধরনের কথাবার্তা বাবার সঙ্গে এ-বাড়ির কেউ বলতে সাহস করবে না।

বাবা যে আবার সোমনাথ সম্পর্কে চিন্তা আরম্ভ করছেন তা কমলা ওঁর মুখের ভাব দেখেই বুঝলো।

দ্বৈপায়ন জিজ্ঞেস করলেন, "খোকন কোথায় ?"

সোমনাথ এখনও ফেরেনি শুনে প্রথমে একটু বিরক্তি এলো দ্বৈপায়নের। ভাবলেন, কোনো দায়িত্বজ্ঞান নেই—বেশ টো টো করে ঘুরছে। তারপর নিজেকে সামলে নিলেন। ঘোরা ছাড়া ওর কীই বা করবার আছে ?

ঠিক সময়ে সোমনাথ বাড়ি ফিরলে দ্বৈপায়ন তবু একটু নিশ্চিন্ত হতে পারেন। আজকাল যেরকম খুনোখুনীর যুগ পড়েছে, তাতে মাঝে-মাঝে দুশ্চিন্তা হয় দ্বৈপায়নের। কয়েকবছর আগে সমর্থ মেয়েদেরই একলা বাইরে বেরুতে দিতে ভয় করতো বাবা-মায়েরা। এখন জোয়ান ছেলেদের নিয়ে বেশী চিন্তা। গোপনে গোপনে এদের মনের মধ্যে কখন কীসের চিন্তা আসবে কে জানে। তারপর রাজনীতির নেশায় দলে পড়ে, সমাজের ওপর বিরক্ত হয়ে,

কী করে বসবে কে জানে ? দ্বৈপায়ন ভাবলেন, আত্মহনন ছাড়া এযুগের অভিমানী ছেলেগুলো অন্য কিছুই জানে না।

কমলা এবার শ্বশুরের চিন্তা নিরসন করলো। বললে, "সোমের বন্ধু অরবিন্দর বৌভাত আজ। যেতে চাইছিল না। আমি জোর করে পাঠিয়েছি।"

"অরবিন্দ তা হলে কাজ পেয়েছে ? পড়াশোনায় ও তো খুব ভাল ছিল না ?" দ্বৈপায়ন নিজের মনেই বললেন।

"ওর বাবা চেষ্টা করে কোন বড় অফিসে ঢুকিয়ে দিয়েছেন, সোম বলছিল।"

দ্বৈপায়ন বউমার এই কথা শুনে অস্বস্তি বোধ করলেন। নিজের অক্ষমতাকে চাপা দেবার জন্যেই যেন সমস্ত দোষ সোমের ওপর চাপাবার চেষ্টা করলেন। বেশ বিরক্তির সঙ্গে বউমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "কেন এমন হলো বলো তো ?"

কমলা উত্তর না-দিয়ে চুপ করে রইলো।

দ্বৈপায়ন বললেন, "আমি তো কখনও পরীক্ষায় খাবাপ করিনি। নিজের চেষ্টায় কম্পিটিশনে স্ট্যাণ্ড করে সরকারী কাজে ঢুকেছিলাম। ওর দাদাদের জন্যে কোনোদিন তো মাস্টার পর্যন্ত রাখিনি। তারা অত ভাল করলে। অথচ খোকন কেন যে অত অর্ডিনারি হলো ?"

কমলা শ্বশুরের সঙ্গে একমত হতে পারছে না। সোম মোটেই অর্ডিনারি নয়। ওর বেশ বুদ্ধি আছে। কমলা বললো, "পরীক্ষাটা আজকাল পুরোপুরি লটারি, বাবা। সোম তো বেশ বুদ্ধিমান ছেলে।"

দ্বৈপায়ন ঠোঁট উল্টোলেন। "তুমি বলতে চাও, ওর ওপর এগজামিনারের রাগ ছিল ?"

"তা হয়তো নয়। কিন্তু আজকাল কীভাবে যে পরীক্ষা-টরিক্ষা নেওয়া হয়। পরীক্ষকরাও বোঝেন না যে এর ওপর ছেলেমেয়েদের জীবন নির্ভর করছে।"

"এর মধ্যেই অনেকে ভাল রেজাল্ট করছে, বউমা।" দ্বৈপায়নের গলার স্বরে ছোট ছেলে সম্পর্কে ব্যঙ্গ ফুটে উঠলো।

ছোট দেওর সম্পর্কে কমলার একটু দুর্বলতা আছে। বিয়ের পর থেকে এতদিন ধরে ছেলেটাকে দেখছে কমলা। দুজনে খুব কাছাকাছি এসেছে।

"ওর মনটা খুব ভাল বাবা," কমলা শান্তভাবে বললো।

"মন নিয়ে এ-সংসারে কেউ ধুয়ে খাবে না, বউমা," বিরক্ত দ্বৈপায়ন উত্তর দিলেন। "পড়াশোনায় ভাল না করলে, দুনিয়াতে কোনো দাম নেই।"

"পড়াশোনায় ভাল অথচ স্বভাবে পাজী এমন ছেলে আজকাল অনেক হচ্ছে, বাবা। তাদের আমার ভাল লাগে না," কমলা বললো। তার যোগ্যতা

খসে পড়ছিল, সেটা আবার মাথার ওপর তুলে নিলো।

"যে-গোরু দুধ দেয় তার লাথি অনেকে সহ্য করতে রাজী থাকে, বউমা," দ্বৈপায়ন বিরক্তভাবেই উত্তর দিলেন।

"খোকন তো চেষ্টা কবছে, বাবা," কমলা ব্যর্থ চেষ্টা করলো শ্বশুরকে বোঝাবার।

"চেষ্টা নিয়ে সংসারে কী হবে? রেজাল্ট কী, তাই দিয়েই মানুষের বিচার হবে," দ্বৈপাযন যে সোমনাথের ওপর বেশ অসন্তুষ্ট হয়ে উঠেছেন তা তাঁর কথা থেকেই বোঝা যাচ্ছে।

কিন্তু কমলা কী করে সোমনাথের বিরুদ্ধে মতামত দেয়? সোমনাথ তো কখনও বডদের অবাধ্য হযনি। বাডির সব আইনকানুন খোকন মেনে চলেছে। পডাব সময় পডতে বসেছে। অন্য কোনো দুষ্টুমির সঙ্গেও জডিযে পডেনি। গোডাব দিকে সে তো পডাশোনায খারাপ ছিল না। কিন্তু মা দেহ রাখার পর কী যে হলো। ক্রমশ সোমনাথ পিছিযে পডতে লাগলো। সেকেণ্ড ডিভিসনে স্কুল ফাইনাল পাস কবলো। বাবার ইচ্ছে ছিল, এক ছেলে ইনজিনীযার, এক ছেলে চার্টার্ড অ্যাকাউনটেণ্ট এবং ছোট ছেলেকে ডাক্তার করবেন। কিন্তু ভাল নম্বব না-থাকলে ডাক্তাবিতে ঢোকা যায না।

কমলার মনে পডলো, সোমনাথ একবার বউদিকে বলেছিল, "আমাকে অত ভালবাসবেন না বউদি। আপনার বিশ্বাসের দাম তো আমি দিতে পারবো না। আমি সব বিষয়ে অর্ডিনারি।"

কমলা বলছিল, "তোমাকে আর পাকামো করতে হবে না।"

সোমনাথ বলেছিল, "মায়ের রং কত ফর্সা ছিল আপনি তো দেখেছেন। দাদারা ফর্সা হযেছে। আমার রং দেখুন—কালো। ভাগ্যে মেয়ে হইনি, তাহলে বাবাকে এই বাডি বিক্রি করতে হতো। পডাশোনায় কখনও ফাঁকি দিইনি—কিন্তু অর্ডিনারি থেকে গেছি। অনেকে গান-বাজনা কিংবা খেলা-ধুলোয় ভাল হয়। আমাব তা'ও হলো না।"

দুনিয়ার সব মানুষকে ব্রিলিয়াণ্ট হতে হবে, এ কী রকম কথা? পৃথিবীর কোন দেশে ক'টা লোক ব্রিলিয়াণ্ট হয়? বেশীর ভাগ মানুষই তো অতি সাধারণ। কিন্তু তারা কেমন সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে রয়েছে। কমলা বুঝতে পারে না, এই দেশের কী হতে চলেছে। ব্রিলিয়াণ্ট হোক না-হোক সোমকে খুব ভাল লাগে কমলার। ছেলেটা খুব নরম। ওর মনে নোংরামি নেই। অনেক বাড়িতে এক ভাই আর এক ভাইকে হিংসে করে। সোমের শরীরে হিংসে

নেই। আর বউদিকে সে যে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে তা কমলা ভালভাবে জানে।

বাবাকে আবার বোঝাবার চেষ্টা করলো কমলা। বললে, "আজকালকার ছেলেদের সম্বন্ধে যা শুনি তার থেকে সোম অনেক ভাল। ওর মনটা এখনও সংসারের নোংরামিতে বিষিয়ে যায়নি বাবা।"

দ্বৈপায়ন বিশেষ ভিজলেন না। বললেন, "তোমার কাছে বলতে বাধা নেই, এক এক সময় মনে হয়—কাউকে বেশী প্রোটেকশন দিতে নেই। বেশী সুখ, বেশী স্বাচ্ছন্দ্য, বেশী নিশ্চয়তার মধ্যে থাকলে অনেক সময় মানুষের ভিতরের আগুনটা জ্বলে ওঠবার সুযোগ পায় না। যাদের দেখবে প্রচণ্ড অভাব, প্রচণ্ড অপমান, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যাদের কোনো ভরসা নেই—তারা অনেক সময় নিজেদের দুঃখের শিকল নিজেরাই ছিঁড়ে ফেলে। তারা অপরের মুখ চেয়ে বসে থাকে না।"

কমলা বুঝতে পারলো বাবা কী বলতে চাইছেন। কিন্তু সব সময় কথাটা সত্যি নয়। সুকুমারকে তো বাবা চেনেন, তাহলে সে তো এতদিন আশ্চর্য কিছু একটা করে ফেলতো।

কমলা এবার একতলায় নেমে এলো। তার ভয়, সোমনাথ এসব না জেনে ফেলে। রাগের মাথায় বাবা কোনোদিন না সোমনাথের সঙ্গেই এসব আলোচনা করে বসেন। বাইরের সমস্ত দুনিয়া তো বেচারাকে অপমান করছে, এর পর বাড়ির আত্মসম্মানটুকু গেলে ছেলেটা কোথায় দাঁড়াবে?

দ্বৈপায়নও একটু লজ্জা পেলেন। সত্যি, এই সব ছেলে যে এখনও সভ্যভব্য রয়েছে, এটা কম কথা নয়। সুযোগ সুবিধে না-পেয়ে ঘরে ঘরে লক্ষ লক্ষ ছেলে যদি উচ্ছন্নে চলে যায়, তাহলে সেও এক ভয়াবহ ব্যাপার হবে। সত্যিই তো সোমনাথের বিরুদ্ধে বেকারত্ব ছাড়া তাঁর আর কোনো অভিযোগ নেই। একটা চাকরি সে যোগাড় করতে পারেনি। কিন্তু আর কোনো কষ্ট সোমনাথ তো বাবাকে দেয়নি। আজকাল ছেলেপুলে সম্বন্ধে যেসব কথা কানে আসে, তারা যেসব কাণ্ড বাধিয়ে বসছে, তাতে বাপ-মায়ের পাগল হয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

গতকালই তো দ্বৈপায়ন শুনলেন, অনেক বেকার ছেলে বাড়িতে আজকাল চরম দুর্ব্যবহার করছে। তারা বাড়ির সব সুবিধে নিচ্ছে, অথচ চোখও রাঙাচ্ছে। তারা নিজেদের জামাকাপড় পর্যন্ত কাচে না, এক গ্লাস জল পর্যন্ত গড়িয়ে খায় না, বাড়ির কোনো কাজ করে না এবং বাড়ির কোনো আইন মানতেও তারা প্রস্তুত নয়। বাড়িটাকেও ওরা জঙ্গল করে তুলেছে।

দ্বৈপায়ন ভাবলেন, এই সব ছেলে বাইরে হেরে গিয়ে, বাড়ির ভিতরে এসে যেন-তেন-উপায়ে জিততে চায়। এরা প্রত্যেকে এক-একটা সাইকলজিক কেস। গতকালই তো নগেনবাবুর কথা শুনলেন। ওঁর বড় ছেলেটা মস্তান হয়েছে। সকাল সাড়ে ন'টার আগে ঘুম থেকে ওঠে না। জলখাবার খেয়ে বাড়ি থেকে কেটে পড়ে। ভাত খাবার জন্যে ফিরে আসে তিনটের সময়। আবার বেরিয়ে পড়ে। ফেরে রাত এগারোটায়। বিড়ি সিগারেট টানে। বাবার পকেট থেকে টাকা চুরি করেছে। নগেনবাবু খুব বকুনি লাগিয়ে বলেছিলেন, "তোমাকে ছেলে বলে পরিচয় দিতে আমার লজ্জা হয়।" ছেলে সঙ্গে সঙ্গে বলেছিল, "দেবেন না।" চরম দুঃখে নগেনবাবু বলেছিলেন, "এই জন্যেই বুঝি লোকে সন্তান কামনা করে?" ছোকরা এতখানি বেয়াদপ, বাবার মুখের ওপর বলেছে, "ছেলের জন্ম হওয়াব পিছনে আপনার অন্য কামনাও ছিল, সন্তান একটা বাই-প্রোডাক্ট মাত্র।"

ছেলের কথা শুনে নগেনবাবু শয্যাশায়ী হয়েছিলেন দু'দিন। এখনও লুকিয়ে লুকিয়ে চোখের জল ফেলেন।

বউমাকে বলে দিলে হতো, খোকন যেন এঁদের কথাবার্তার কিছু জানতে না পারে। তাবপব দ্বৈপায়ন ভাবলেন, বউমা বুদ্ধিমতী, ওকে সাবধান করবার প্রয়োজন নেই।

দুপুরের ক্লান্ত ঘড়িটা যে সাড়ে-তিনটের ঘরে ঢুকে পড়েছে তা সোমনাথ এবার বুঝতে পারলো। কমলা বউদি ঠিক এই সময় বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েন। প্রতিদিনের অভ্যাস মতো এই সময় কমলা বউদি বাড়ির লেটার বক্সটা দেখেন। পিওন আসে তিনটে নাগাদ এবং তারপর থেকেই বাবা ছটফট করেন। মাঝে-মাঝে জিজ্ঞেস করেন, "চিঠিপত্তর কিছু এলো নাকি?" বাবার নামে প্রায় প্রতিদিনই কিছু চিঠিপত্তর আসে। চিঠি লেখাটা বাবার নেশা। দুনিয়ার যেখানে যত আত্মীয়স্বজন আছেন বাবা নিয়মিত তাঁদের পোস্টকার্ড লেখেন। তার ওপর আছেন অফিসের পুরানো সহকর্মীরা। রিটায়ার করবার পরে তাঁরাও চিঠি লিখে দ্বৈপায়নের খোঁজখবর নেন।

সোমনাথেরও চিঠি পেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু বিদেশী এক এমব্যাসির বিনামূল্যে-পাঠানো একখানা সাপ্তাহিক পত্রিকা ছাড়া তার নামে বিশেষ কিছুই

আসে না। এই পত্রিকা পাবার বুদ্ধিটাও স্থকুমারের। দু'খানা পোস্টকার্ডে দুজনের নামে চিঠি লিখে দিয়েছিল দিল্লীতে এমব্যাসির ঠিকানায়। বলেছিল, "পড়িস না পড়িস কাগজটা আস্থক। প্রত্যেক সপ্তাহে পত্রিকা এলে পিওনের কাছে স্থকুমার মিত্তির নামটা চেনা হয়ে যাবে। আসল চাকরির চিঠি যখন আসবে তখন ভুল ডেলিভারি হবে না।"

এই সাপ্তাহিক পত্রিকা ছাড়া গত সপ্তাহে সোমনাথের নামে একটা চিঠি এসেছিল। বিশ্ববিখ্যাত কোম্পানির বিশেষ যন্ত্রে প্রতিদিন পাঁচ মিনিট দৈহিক কসরত করলে টারজানের মতো পেশীবহুল চেহারা হবে। ডাকযোগে মাত্র আশি টাকা দাম। বিফলে মূল্য ফেরত। বিজ্ঞাপনের চিঠি পেয়ে প্রথমে বিরক্তি লেগেছিল। তারপর সোমনাথের মন কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠলো। বম্বের কোম্পানি কষ্ট করে নাম-ঠিকানা জেনে চিঠি পাঠিয়ে তাকে তো কিছু সম্মান দিয়েছে। চাকরিতে ঢুকলে, সোমনাথ ওই যন্তর একটা কিনে ফেলবে—পয়সা জলে গেলেও সে দুঃখ পাবে না।

এ-ছাড়া সোমনাথের পাঠানো রেজিস্টার্ড অ্যাকনলেজমেণ্ট ডিউ ফর্মগুলো দু-তিনদিন অন্তর ফিরে আসে। নিজের হাতে লেখা নিজের নাম সোমনাথ খুঁটিয়ে দেখে। তলায় একটা রবার-স্ট্যাম্পে কোম্পানির ছাপ থাকে—তার ওপর একটা দুর্বোধ্য হিজিবিজি পাকানো রিসিভিং ক্লার্কের সই।

আজও কয়েকটা অ্যাকনলেজমেণ্ট ফর্ম ফিরেছে। সেই সঙ্গে সোমনাথের নামে একটা চিঠিও এসেছে। কয়েকদিন আগে বক্স নম্বরে একটা চাকরির বিজ্ঞাপনের উত্তর দিয়েছিল। তারাই উত্তর দিয়েছে। লিখেছে, অবিলম্বে ওঁদের কলকাতা প্রতিনিধি মিস্টার চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করতে। মিস্টার চৌধুরী মাত্র কয়েকদিন থাকবেন, স্থতরাং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দেখা করা উচিত।

ঠিকানাটা কীড্ স্ট্রীটের। সময় নষ্ট না-করে সোমনাথ বেরিয়ে পড়লো। বউদি জিজ্ঞেস করলেন, "বেরুচ্ছো নাকি?"

ফর্সা সাদা শার্ট প্যাণ্ট ও সেই সঙ্গে টাই দেখে কমলা বউদি আন্দাজ করলেন, চাকরির খোঁজে বেরুচ্ছে সোমনাথ।

মনে মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলেন, "ওর একটা চাকরি করে দাও ঠাকুর। বিনা অপরাধে ছেলেটা বড্ড কষ্ট পাচ্ছে।"

কমলার মনে পড়লো, কী আমুদে ছিল সোমনাথ। সবসময় হৈচৈ করতো। বউদির পিছনেও লাগতো মাঝে-মাঝে। বলতো, "বউদি আপনাকে, [illegible]"

মাসের মাইনে থেকে ডেবিট হবে।”

কিন্তু এসবই স্বপ্ন। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। কোথায় চাকরি? চাকরির ধারে-কাছে নেই সোমনাথ।

সকালবেলা বউদি চুপি চুপি জিজ্ঞেস করলেন, “কখন যাবে? টাকাটা বার করে রেখেছি!”

টাকাটা পকেটে পুরে যথাসময়ে সোমনাথ বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

সোমনাথ ফিরতে দেরি করছে কেন? কমলা অধীর আগ্রহে ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে এলো। এখনও সোমনাথের দেখা নেই।

সাতটা নাগাদ সোমনাথ বাড়ি ফিরলো। ওর ক্লান্ত কালো মুখ দেখেই কমলার কেমন সন্দেহ হলো।

চিবুকে হাত দিয়ে সোমনাথ চুপচাপ বসে রইলো। বউদির দেওয়া টাকা নিয়ে সোমনাথ এম-এল-এ কোয়ার্টারে লোকটার সঙ্গে দেখা করেছিল। মিস্টার চৌধুরী নোটগুলো পকেটে পুরে সোমনাথকে ট্যাক্সিতে চড়িয়ে ক্যামাক স্ট্রীটের একটা বাড়ির সামনে নিয়ে গিয়েছিলেন। “আপনি বসুন, আমি ব্যবস্থাটা পাকা করে আসি” এই বলে লোকটা সেই যে বেপাত্তা হলো আর দেখা নেই। আরও পনেরো মিনিট ওয়েটিং ট্যাক্সিতে বসে থেকে তবে সোমনাথের চৈতন্য হলো, হয়তো লোকটা পালিয়েছে। ভাগ্যে পকেটে আরও একখানা দশ টাকার নোট ছিল। না-হলে ট্যাক্সির ভাড়াই মেটাতে পারতো না সোমনাথ।

বড় আশা করে বউদি টাকাটা দিয়েছিলেন। সব শুনে বললেন, “তুমি এবং আমি ছাড়া কেউ যেন না জানতে পারে।”

খুব লজ্জা পেয়েছিল সোমনাথ। সব জেনেশুনেও একেবারে ঠকে গেল সোমনাথ। বউদি বললেন, “ওসব নিয়ে ভেবো না। ভাল সময় যখন আসবে তখন অনেক আড়াইশ' টাকা উসুল হয়ে যাবে।”

তবু অস্বস্তি কাটেনি সোমনাথের। বউদিকে একা পেয়ে কাছে গিয়ে বলেছিল, “খুব খারাপ লাগছে বউদি। আড়াইশ' টাকার হিসেব কী করে মেলাবেন আপনি?”

বউদি ফিসফিস করে বললেন, “তুমি ভেবো না। তোমার দাদার পকেট কাটায় আমি ওস্তাদ! কেউ ধরতে পারবে না।”

জানাজানি হলে ওরা দুজনেই অনেকের হাসির খোরাক হতো। এই

কলকাতা শহরে এমন বোকা কেউ আছে নাকি যে চাকরির লোভে অজানা লোকের হাতে অতগুলো টাকা তুলে দেয় ?

নিজের ওপর আস্থা কমে যাচ্ছে সোমনাথের। পরের দিন দুপুরবেলায় বউদিকে একলা পেয়ে সোমনাথ আবাব প্রসঙ্গটা তুলেছিল। "বউদি, কেমন করে অত বোকা হলাম বলুন তো ?"

"বোকা নয়, তুমি আমি সরল মানুষ। তাই কিছু গচ্চা গেল। তা যাক। মা বলতেন বিশ্বাস করে ঠকা ভাল।"

বউদির কথাগুলো ভাবি ভাল লাগছিল সোমনাথের। কৃতজ্ঞতায় চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসছিল। বউদির এই স্নেহের দাম সে কীভাবে দেবে ? বউদি কিন্তু স্নেহ দেখাচ্ছেন এমন ভাবও করেন না।

কিন্তু ঠকে যাবার অপমানটা ঘুরে-ফিরে সোমনাথের মনের মধ্যে এসেছে। এই কলকাতা শহরে এত বেকার রয়েছে, তাদের মধ্যে সোমনাথই বা ঠকতে গেল কেন ?

এই ভাবনাতে সোমনাথ আরও দুর্বল হয়ে পড়তো, যদি-না দু'দিন পরেই বেকার-ঠকানো এই জোচ্চোবটাকে গ্রেপ্তারের সংবাদ খবরের কাগজে বেরুতো। কীড্ স্ট্রীটে এম-এল-এ হোস্টেলের সামনেই লোকটা ধরা পড়েছিল। সোমনাথের লোভ হয়েছিল একবার পুলিসে গিয়ে জলঘোলা করে আসে, লোকটার আর-একটা কুকীর্তি ফাঁস করে দেয়। কিন্তু বউদি সাহস পেলেন না। দুজনে গোপন আলোচনার পরে,ব্যাপারটা চেপে-যাওয়াই যুক্তিযুক্ত মনে হলো।

সোমনাথের আত্মবিশ্বাস কিছুটা ফিরে এসেছে। সোমনাথ একাই তাহলে ঠকেনি, আরও অনেকেই ফাঁদে পা দিয়েছে এবং সোমনাথের থেকে বেশী টাকা খুইয়েছে।

এবার বোধ হয় মেঘ কাটতে শুরু করেছে। একখানা দরখাস্তের জবাব এসেছে। লিখিত পরীক্ষা হবে। নির্দিষ্ট সময়ে পরীক্ষা-ফি বাবদ দশ টাকা নগদ সহ চাকুরি প্রার্থীকে পরীক্ষার হলে দেখা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পরের দিন ভোরবেলাতেই সুকুমার খবর নিতে এলো। সুকুমারের আর তর সয় না। বউদিকে দেখেই জিজ্ঞেস করলো, "সোমটা কোথায় ?" সুকুমারও পরীক্ষার চিঠি পেয়েছে। সে বেজায় খুশী।

ঠোঁট উল্টে সুকুমার বললে, "দেখলি তো তদ্বিরে ফল হয় কি না? আমাদের পাড়ার অনেকে অ্যাপ্লাই করেছিল, কিন্তু কেউ চিঠি পায়নি। সাধে কি আর মিনিস্টারের সি-একে পাকড়েছি! কেন মিথ্যে কথা বলবো, সি-এ বলেছিলেন, আমরা দুজনেই যাতে চান্স পাই তার ব্যবস্থা করবেন।"

আবার বউদির খোঁজ করলো সুকুমার। আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে কমলাকে বললো, "সি-এ তার কাজ করেছেন, এখন আশীর্বাদ করুন আমরা যেন ভাল করতে পারি।"

"নিশ্চয় ভাল পাবে," বউদি আশীর্বাদ করলেন।

সুকুমারের একটা বদ অভ্যাস আছে। উত্তেজিত হলেই দুটো হাত এক সঙ্গে দ্রুত ঘষতে থাকে। ঐভাবে হাত ঘষতে ঘষতে সুকুমার বললো, "বউদি. এক ঢিলে যদি দুই পাখি মারা যায়, গ্র্যাণ্ড হয়। একই অফিসে দুজনে চাকরিতে বেরুবো।"

সুকুমার বললে, "বিরাট পরীক্ষা। ইংরিজী, অঙ্ক, জেনারেল নলেজ সব বাজিয়ে নেবে। সুতরাং আজ থেকে পরীক্ষার দিন পর্যন্ত আমার টিকিটি দেখতে পাবেন না। মিনিস্টারের সি-এ আমাদের চান্স দিতে পারেন। কিন্তু পরীক্ষায় পাসটা আমাদেরই করতে হবে।"

সুকুমার সত্যিই সোমনাথকে ভালবাসে। যাবার আগে বললো, "মন দিয়ে পড় এই ক'দিন। তোর তো আবার পরীক্ষাতেই বিশ্বাস নেই। শেষে আমার সিকে ছিঁড়লো আর তুই চান্স পেলি না, তখন খুব খারাপ লাগবে।"

নির্দিষ্ট দিনে কপালে বিরাট দই-এর ফোঁটা লাগিয়ে সুকুমার এগজামিনেশন হলে হাজির হয়েছিল। সোমনাথ ওসব বাড়াবাড়ি করেনি। তবে বউদি জোর করে পকেটে কালীঘাটের জবাফুল গুঁজে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন. "রাখো সঙ্গে। মায়ের ফুল থাকলে পথে-ঘাটে বিপদ আসবে না।"

সোমনাথ এসব বিশ্বাস করে না। কিন্তু বউদির সঙ্গে তর্ক করতে ইচ্ছে হয়নি।

হলের কাছাকাছি এসেই সোমনাথ কিন্তু আশা ছেড়ে দিয়েছিল। এ-যে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার বাড়া। হাজার হাজার ছেলে আসছে। এবং তাও নাকি দফে দফে ক'দিন ধরে পরীক্ষা হচ্ছে। রোল নম্বরের দিকে নজর দিয়েই ব্যাপারটা বোঝা উচিত ছিল সোমনাথের। চব্বিশ হাজার কত নম্বর তার। আরও কত আছে কে জানে? হিন্দুস্থানী ফেরিওয়ালারা খবর পেয়েছে। তারা মুড়ি, বাদাম, পাঁউরুটি, চা ইত্যাদির বাজার বসিয়েছে।

দিনের শেষে মুখ শুকনো করে সোমনাথ বাড়ি ফিরলো। বউদি [illegible]

আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন, জিজ্ঞেস করবেন কেমন পরীক্ষা হলো। কিন্তু সোমনাথের ক্লান্ত মুখ-চোখ দেখে কিছুই জানতে চাইলেন না। কাজের অছিলায় বাবাও নেমে এলেন। কায়দা করে জিজ্ঞেস করলেন, "ফেরবার সময় বাস পেতে অসুবিধে হয়নি তো?"

সোমনাথ সব বুঝতে পারছে। বাবা কেন নেমে এসেছেন তাও সে জানে। সে গম্ভীরভাবে বললো, "এইভাবে লোককে কষ্ট না দিয়ে চাকরিগুলো লটারি করলে পারে। ন'টা পোস্টের জন্যে সাতাশ হাজার ছেলেমেয়ে পরীক্ষা দিচ্ছে। এর থেকে কে যোগ্য কীভাবে ঠিক করবে?"

বাবা ব্যাপারটা বুঝলেন। আর কথা না-বাড়িয়ে আবার ওপরে উঠে গেলেন, যদিও প্রশ্নপত্রগুলো তাঁর দেখবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু কোশ্চেন পেপার নিয়ে আসতে দেয়নি, পরীক্ষার হলেই ফেরত নিয়েছে

পরের দিন সকালে সুকুমার আবার এসেছে। ওর মুখ-চোখের অবস্থা দেখে বউদি পর্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লেন। জিজ্ঞেস করলেন, "কী হয়েছে তোমার? রাত্রে ঘুমোওনি?"

সুকুমার কষ্ট করে হাসলো। তারপর সোমনাথের খোঁজ নিলো। "কীরে? তোর পরীক্ষা কেমন হলো?"

সোমনাথ বিছানাতে শুয়ে ছিল উঠে বললে, "যা-হবার তাই হয়েছে।"

সুকুমার বললো, "ইংরিজী রচনায় কোনো অলটারনেটিভ ছিল না। এক এল-এ-দার কাছে শুনে গেলাম 'গরিবী হঠাও' পড়বে। ওই প্রবন্ধটা এমন মুখস্থ করে গিয়েছিলাম যে চান্স পেলে ফাটিয়ে দিতাম। জীবেন মুখুজ্যে গোল্ড মেডালিস্টের লেখা।"

সোমনাথ চুপচাপ সুকুমারের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। সুকুমার বললো, "আনএমপ্লয়মেণ্ট সম্বন্ধেও একটা রচনা খেটেখুটে তৈরি করেছিলাম। বেকার সমস্যা দূর করবার জন্যে অর্ডিনারি বইতে মাত্র ছ'টা কর্মসূচী থাকে, তার জায়গায় আমি সতেরটা দফা ঢুকিয়েছিলাম। পড়লে ফাটিয়ে দিতাম। কিন্তু এমনই পোড়া কপাল যে রচনা এলো 'ভারতীয় সভ্যতায় অরণ্যের দান'।"

মুখ কাঁচুমাচু করে সুকুমার জিজ্ঞেস করলো, "তুই কি লিখলি রে? তোর নিশ্চয় বিষয়টা তৈরি ছিল।"

"মুণ্ডু ছিল," সোমনাথ রেগে উত্তর দিলো।

"আমারও রাগ হচ্ছিলো, কিন্তু চাকরি খুঁজতে এলে রাগ করলে চলবে না।

তাই ফেনিয়ে ফেনিয়ে লিখে দিলুম, অরণ্য না-থাকলে ভারতীয় সভ্যতা গোল্লায় যেত—কেউ তাকে বাঁচাতে পারতো না।" সুকুমার অসহায়ভাবে বললো।

"তুই তো তবু লিখেছিস, আমি ছেড়ে দিয়ে এসেছি।"

সুকুমার সমস্ত বিষয়টাকে ভীষণ গুরুত্ব দিয়েছে। এবার মুখ কাঁচুমাচু করে বললো, "ভাই সোম, লাস্ট পেপারে এসে ডুবলাম। জেনারেল নলেজে ভীষণ খারাপ করেছি।"

সোমনাথের এসব বিষয় আলোচনা করতেই ভাল লাগছিল না। কিন্তু সুকুমার নাছোড়বান্দা।

সুকুমার বললো, "একটা মাত্র প্রশ্ন পেরেছি—ভারতে বেকারের সংখ্যা কত? মুখস্থ ছিল—পাঁচ কোটি। দু নম্বর কোনো বেটা আটকাতে পারবে না।"

"একশর মধ্যে দু নম্বর মন্দ কী?" ব্যঙ্গ করলো সোমনাথ।

সুকুমারের মাথায় ওসব সূক্ষ্ম ইঙ্গিত ঢুকলো না। সে বললো, "আরেকটা কোশ্চেনে দু নম্বর দিতেও পারে, নাও দিতে পারে। সেইটে নিয়ে চিন্তায় পড়ে গেছি। 'নীলগিরি' সম্বন্ধে আমি ভাই লিখে দিয়েছি—দাক্ষিণাত্যের পর্বত। কিন্তু অন্য ছেলেরা বললে, আমাকে নম্বব দেবে না। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার চাকরি তো! লিখতে হবে ভারতের নতুন ফ্রিগেট।"

খুব দুঃখ করতে লাগলো সুকুমার। "আমার মাথায় সত্যিই গোবর। কাগজে বেরিয়েছিল প্রধানমন্ত্রী নিজে নীলগিরি জলে ভাসালেন—আর আমি কিনা ছাই লিখে ফেললাম নীলগিরি পর্বত।"

বউদি চা দিতে এসে ব্যাপারটা শুনলেন। বললেন, "আমার তো মনে হয় তুমিই ঠিক লিখেছো। নীলগিরি পর্বত তো চিরকাল থাকবে, যুদ্ধ জাহাজ নীলগিরির পরমায়ু ক'বছর?"

সুকুমার আশ্বস্ত হলো না। "আপনি ভুল করছেন বউদি। ফ্রিগেট নীলগিরি যে গভরমেন্টের। গভরমেন্টের কোম্পানিতে চাকরির চেষ্টা করবে আর গভরমেন্টের জিনিস সম্বন্ধে লিখবে না, এটা কেন চলবে? নেহাত আমাকে যদি বাঁচাতে চায়, এগজামিনার হয়তো দুই-এর মধ্যে এক দেবে।"

"ওসব ভেবে কী হবে?" সোমনাথ এবার বন্ধুকে বোঝাবার চেষ্টা করে।

কিন্তু সুকুমার নিজের খেয়ালেই রয়েছে। বললে, "যা দুঃখু হচ্ছে না, মাইরি। পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট প্রজাতন্ত্রের নামটা জেনে যাইনি।"

"ডজন ডজন দেশ যখন রয়েছে, তখন তার মধ্যে একটা বৃহত্তম এবং একটা ক্ষুদ্রতম হবেই," সোমনাথের কথায় এবার বেশ শ্লেষ ছিল।

সুকুমার কিন্তু এসব চিন্তা ঝেড়ে ফেলতে পারছে না। বললে, "খবরের কাগজ আপিসের নকুল চ্যাটার্জির সঙ্গে বাসে দেখা হলো। উনি বলে দিলেন : উত্তর হবে, স্যান মেরিনো রাজ্য, ইটালির কাছে। দেশটার সাইজ কলকাতার মতো, মাত্র পনেরো হাজার লোক থাকে। খুব দুঃখ করতে লাগলো সুকুমার। "আগে থেকে জেনে রাখলে আরও দু নম্বর পেতুম।"

সোমনাথ এবার রাগে ফেটে পড়লো। "আপিসের জেনারেল ম্যানেজার এই সব প্রশ্নের উত্তর জানে?"

সুকুমার এমনই বোকা যে ভাবছে ওরা নিশ্চয়ই অনেক কিছু জানে, না হলে বড় বড় পোস্টে কী ভাবে বসলো?

সুকুমার বললো, "পরের কোশ্চেনটায় অবশ্য অনেকেই মার খাবে—পৃথিবীর সবচেয়ে বড় প্রাণীর নাম। আমি তো ভাই সরল মনে হাতির নাম লিখে বসে আছি। নকুলবাবু বললেন, সঠিক উত্তর হবে ব্লু হোয়েল। এক-একটার ওজন দেড়শ' টন। হাতি সে তুলনায় শিশু!"

"চুলোয় যাক ওসব।" আবার তেড়ে উঠলো সোমনাথ। "করবি তো কেরানির চাকরি। তার জন্য হাতির ডাক্তার হয়ে লাভ কী?"

বেচারা সুকুমার একটু মুষড়ে পড়লো। বললো, "তোর তো আমার মতো অবস্থা না। তুই এসব কথা বলতে পারিস। তুই মজাসে বাবা-দাদার হোটেলে আছিস। যে কোনো কোশ্চেন তুই ছেড়ে দিতে পারিস। আমার বাবাকে রিটায়ারের বিজ্ঞপিত্তর শুঁকিয়ে দিয়েছে। সামনের মাস থেকে বাবার চাকরি থাকবে না। পরের মাস থেকে মাইনে পাবে না। প্রতি সপ্তাহে আটটা লোকের রেশন তুলতে হবে আমাদের। বাড়ি ভাড়া আছে। মায়ের অসুখ। সুতরাং সমস্ত কোশ্চেনের উত্তর আমাকে দিতেই হবে। আমার যে একটা চাকরি চাই-ই।"

সুকুমার সেদিন চলে গিয়েছিল। যাবার পর সোমনাথের একটু দুঃখ হয়েছিল। দুনিয়ার ওপরে তার যে রাগ সেটা সুকুমারের ওপর ঢেলে দেওয়া উচিত হয়নি।

সুকুমাব বেচারার কী যে হলো সেই থেকে। বিশেষ আসে না। দিনরাত নাকি সাধারণ জ্ঞান বাড়াচ্ছে। একদিন বিকেলে সুকুমাব দেখা করতে এলো। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। বললো, "বাবার কাছে খুব বকুনি খেলাম। বোনটাও আবাব দলে যোগ দিযে বললে, কোনো কাজকম্মই তো নেই। শুধু নমো নমো করে একটা দশটাকা মাইনেব টিউশনি সেবে আসো। বসে না-থেকে সাধাবণ জ্ঞান বাড়াতে পাবো না?"

সোমনাথকে কেউ এইবকম কথা বলেনি। কিন্তু হঠাৎ কেমন যেন ভয় হলো সোমনাথেব। এ-বাড়িতেও তো একদিন এমন কথা উঠতে পারে।

সুকুমারের মন যে শক্ত নয় তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। ওর কীরকম ধারণা হয়ে যাচ্ছে, সাধাবণ জ্ঞানটা ভাল থাকলেই ও সেদিনেব চাকরিটা পেয়ে যেত।

সুকুমার নিজেই বললো, "বাবা ঠিকই বলেছিলেন—সুযোগ রোজ রোজ আসে না। অত বড় সুযোগ এলো অথচ পৃথিবীব ক্ষুদ্রতম রিপাবলিকেব নামটা লিখতে পারলাম না। দোষ তো কাবো নয়, দোষ আমাবই। বাঙালীদের তো এই জন্যেই কিছু হয় না। নিজেরা একদম চেষ্টা কবে না, পরীক্ষার জন্যে তৈরি হয় না।"

সুকুমারের চোখ দুটো লাল হয়ে আছে। ঠিক গাঁজাখোরের মতো দেখাচ্ছে। "সুকুমার মিত্তির আর ভুল করবে না। সবরকমের জেনারেল নলেজ বাড়িয়ে যাচ্ছি। এবাব চান্স পেলে ফাটিয়ে দেবো।"

"তা দিস। কিন্তু দাড়ি কাটছিস না কেন? বুরুশ কোম্পানিকে নিজের খোঁচা দাড়ি বিক্রি কববি নাকি?" সোমনাথ রসিকতা করলো।

ঠোঁট উল্টোলো সুকুমার। বললো, "সুকুমার মিত্তির বেকার হতে পারে কিন্তু এখনও বেটাছেলে আছে। সুকুমাব মিত্তিব প্রতিজ্ঞা করেছে বাপের পয়সায় আর দাড়ি কামাবে না। টিউশনির মাইনে দিতে দেরি করছে। তাই ব্লেড কেনা হচ্ছে না।"

সোমনাথ উঠে দাঁড়ালো। ঘরের কোণ থেকে একটা ব্লেড বার করে সুকুমারকে বললো, "নে। এটা তোর বাবার পয়সায় কেনা নয়।"

সুকুমার শান্ত হয়ে গেল। প্রথমে ব্লেড নিলো। পকেটে পুরলো। তারপর কী ভেবে পকেট থেকে ব্লেডটা বার করে ফিরিয়ে দিলো। বললো, "কারুর বাবার ব্লেড আমি নেবো না।"

হন হন করে বেরিয়ে গেল সুকুমার। বেশ মুষড়ে পড়লো সোমনাথ। যাবার আগে সুকুমার কি তাকেই অপমান করে গেল? সকলের সামনে মনে করিয়ে দিয়ে গেল, সোমনাথও রোজগার করে না, অন্যের পয়সায় দাড়ি কামায়।

সুকুমারের অবস্থা যে আরও খারাপ হবে তা সোমনাথ বুঝতে পারেনি। মেজদা একদিন বললেন, "তোর বন্ধু সুকুমারের কী হয়েছে রে?"

"কেন বলো তো?" সোমনাথ জিজ্ঞেস করলো।

মেজদা বললেন, "তোর বন্ধুর মুখে এক জঙ্গল দাড়ি গজিয়েছে। চুলে তেল নেই। পোস্টাপিসের কাছে আমার অফিসের গাড়ি থামিয়ে বললো, 'একটা আর্জেন্ট প্রশ্ন ছিল।' আমি প্রথমে বুঝতে পারিনি। ও নিজেই পরিচয় দিলো, 'আমি সোমনাথের বন্ধু সুকুমার!' আমি ভাবলাম সত্যিই কোনো প্রশ্ন আছে। ছোকরা বেমালুম জিজ্ঞেস করলো, 'চাঁদের ওজন কত?' আমি বললাম, 'জানি না ভাই।' সুকুমার রেগে উঠলো। 'জানেন। বলবেন না তাই বলুন।' আমি বললাম, 'বিশ্বাস করো, আমি সত্যিই চাঁদের ওজন জানি না।' ছোকরা বললে, 'এত বড় কোম্পানির অফিসার আপনি, চাঁদের ওজন জানেন না? হতে পারে?' তারপর ছোকরা কী বিড়বিড় করতে লাগলো, পুরো দুটো নম্বর কাটা যাবে।"

মেজদা বললেন, "এর পর আমি আর দাঁড়াইনি। অফিসের ড্রাইভারকে গাড়িতে স্টার্ট দিতে বললাম।" একটু থেমে মেজদা বললেন, "এর আগে ছোকরা তো এমন ছিল না। বদসঙ্গে আজকাল কী গাঁজা খাচ্ছে নাকি?"

সৎ কিংবা বদ কোনো সঙ্গীই নেই সুকুমারের। নিজের খেয়ালে সে ঘুরে বেড়ায়। গড়িয়াহাট ওভার ব্রিজের তলায় সুকুমারকে দূর থেকে সোমনাথ একদিন দেখতে পেলো। খুব কষ্ট হলো সোমনাথের। কাছে গিয়ে ওর পিঠে হাত দিলো, "সুকুমার না?"

সুকুমারের হাতে একখানা শতচ্ছিন্ন হিন্দুস্থান ইয়ারবুক, একখানা জেনারেল নলেজের বই, আর কমপিটিশন রিভিউ ম্যাগাজিনের পুরানো কয়েকটা সংখ্যা। একটা বড় পাথরের ওপর বসে সুকুমার পাতা ওল্টাচ্ছিল। বিরক্ত হয়ে সোমনাথের দিকে তাকিয়ে সুকুমার বললো, "মন দিয়ে একটু পড়ছি, কেন ডিসটার্ব করলি?"

"আঃ! সুকুমার," বকুনি লাগালো সোমনাথ।

সুকুমার বললো, "তোকে একটা কোশ্চেন করি। বল দিকিনি বেকার ক'রকমের?"

মাথা চুলকে সোমনাথ উত্তর দিলো, "শিক্ষিত বেকার এবং অশিক্ষিত বেকার।"

বেশ বিরক্ত হয়ে সুকুমার চিৎকার করে উঠলো, "তুই একটা গর্দভ। তুই চিরকাল ধর্মের ষাঁড় হয়ে বউদিব দেওয়া ভূষি খেয়ে যাবি। তোর কোনোদিন চাকরি-বাকরি হবে না—তোর জেনারেল নলেজ খুবই পুওর।"

হাঁপাতে লাগলো সুকুমার। তারপর বললো, "টুকে নে—বেকার দু'রকমের। কুমারী অথবা ভার্জিন বেকার এবং বিধবা বেকার। তুই এবং আমি হলুম ভার্জিন বেকার—কোনো-দিন চাকরি পেলুম না, স্বামী কি দোব্য জানতে পারলুম না। আর ছাঁটাই হয়ে যারা বেকার হচ্ছে তারা বিধবা বেকার। যেমন আমার ছাত্তরের বাবা। রাধা গ্লাস ওয়ার্কসে কাজ করতো, দিয়েছে আর পি-এল—রানিং পোঁদে লাথি। আমার বাকি মাইনেটা দিলো না—এখনও ব্লেড কিনতে পারছি না। আমার বাবাও বিধবা হবে, এই মাসের শেষ থেকে।"

সোমনাথ বললো, "বাড়ি চল। তোকে চা-খাওয়াবো।"

সুকুমার রেগে উঠলো। "চাকরি হলে অনেক চা খাওয়া যাবে। এখন মরবার সময় নেই। জেনারেল নলেজের অনেক কোশ্চেন বাকি রয়েছে।"

একটু থেমে কী যেন মনে করার চেষ্টা করলো সুকুমার। তারপর সোমনাথের হাতটা ধরে বললো, "তুই জানিস 'পেরেডেভিক' কী? নকুলবাবু বললেন, পেরেডেভিক এক ধরনের সূর্যমুখী ফুলের বিচি—ওয়েস্টবেঙ্গলে আনানো হচ্ছে রাশিয়া থেকে, যাতে আমাদের রান্নার তেলের দুঃখ ঘুচে যায়। কিন্তু কোনো জেনারেল নলেজের বইতে উত্তরটা খুঁজে পাচ্ছি না। ভুল হয়ে গেলে দুটো নম্বর নষ্ট হয়ে যাবে।"

পাথরের মতো চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো সোমনাথ। সুকুমার বললো, "রাখ রাখ—এমন পোজ দিচ্ছিস যেন সিনেমার হিরো হয়েছিস। চাকরি যদি চাস, আমার সঙ্গে জেনারেল নলেজে লড়ে যা। কোশ্চেন অ্যানসার তুই বলে যাচ্ছি। কারুর মুরোদ থাকে তো চ্যালেঞ্জ করুক। ডং হা কোথায়?—দক্ষিণ ভিয়েৎ-নামের বিখ্যাত জেলা। গাম্বিয়া এবং জাম্বিয়া কী এক?—মোটেই না। গাম্বিয়া পশ্চিম আফ্রিকায়, আর পুরানো উত্তর রোডেশিয়ার নতুন নাম জাম্বিয়া।"

বন্ধুকে থামাতে গেল সোমনাথ। কিন্তু সুকুমার বকে চললো, "শুধু পলিটি-ক্যাল সাইন্স জানলে চলবে না। ইতিহাস, ভুগোল, সাহিত্য, স্বাস্থ্য, ফিজিকস, কেমিসট্রি, ম্যাথামেটিকস—সব সম্পর্কে হাজার হাজার কোশ্চেনের উত্তর রেডি রাখতে হবে। আচ্ছা, বল দিকি শরীরের সবচেয়ে বড় গ্ল্যাণ্ডের নাম কী?"

চুপ করে রইলো সোমনাথ। প্রশ্নটার উত্তর সে জানে না।

"লিভার, লিভার," চিৎকার করে উঠলো সুকুমার। তারপর নিজের খেয়ালেই বললো, "ফেল করিয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু হাজার হোক বউদির ধর্মশালায় আছিস, দেখলে দুঃখ হয়, তাই আর একটা চান্স দিচ্ছি। কোন ধাতু সাধারণ ঘরের টেমপারেচারে তরল থাকে?"

এবারেও সোমনাথকে চুপ করে থাকতে দেখে সুকুমার বললো, "তুই চিরকাল বউদির আঁচল ধরে থাকবি? এই উত্তরটাও জানিস না? ওরে মূর্খ, 'পারা,'—মার্কারির নাম শুনিসনি?"

সুকুমার তারপর বললো, "দুটো ইমপর্টেন্ট কোশ্চেনের উত্তর জেনে রাখ। 'লাস্ট সাপার' ছবিটা কে এঁকেছিলেন? উত্তর: লিওনার্ডো দা ভিঞ্চি। দ্বিতীয় কোশ্চেন: 'বিকিনি' কোথায়? খুব শক্ত কোশ্চেন। যদি লিখিস মেমসায়েবদের স্নানের পোশাক, স্রেফ গোল্লা পাবি। উত্তর হবে: প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপ—এটম বোমার জন্যে বিখ্যাত হয়ে আছে।"

সোমনাথকে আরও অনেক কোশ্চেন শোনাতো সুকুমার। সোমনাথ বুঝলো, ওর মাথার গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। মনের দুঃখে সে হাঁটতে আরম্ভ করলো। সুকুমার বললো, "তোর আর কি! হোটেল-ডি-পাপায় রয়েছিস—পড়াশোনা না-করলেও দিন চলে যাবে। আমাকে দশদিনের মধ্যে চাকরি যোগাড় করতেই হবে।"

চোখের সামনে সুকুমারের এই অবস্থা দেখে সোমনাথের চোখ খুলতে আরম্ভ করেছে। একটা অজানা আশঙ্কা ঘন কুয়াশার মতো অসহায় সোমনাথকে ক্রমশ ঘিরে ধরছে। তার ভয় হচ্ছে, কোনোদিনই সে চাকরি যোগাড় করতে পারবে না। সুকুমারের মতো তার ভাগ্যেও চাকরির কথা লিখতে বিধাতা ঠাকুর বোধ হয় ভুলে গেছেন।

মেজদা অফিসের এক বন্ধুকে সস্ত্রীক বাড়িতে নেমন্তন্ন করেছে। জুনিয়রমোস্ট অ্যাকাউনটেন্ট কাজলের তুলনায় এই ভদ্রলোক অনেক বড় চাকরি করেন। কিন্তু কাজলের সঙ্গে ইনি মেলামেশা করেন। একবার বাড়িতে নেমন্তন্ন না করলে ভাল দেখাচ্ছিল না।

বুলবুলের বিশেষ অনুরোধে সোমনাথকে গড়িয়াহাটা থেকে বাজার

করে আনতে হয়েছে।

হাতে কোনো কাজ-কর্ম নেই, তবুও আজকাল বাজারে যেতে প্রবৃত্তি হয় না সোমনাথের। অরবিন্দর সঙ্গে ওইখানে দেখা হয়ে যেতে পারে। এবং দেখা হলেই জিজ্ঞাসা করবে, ফরেনে যাবার ব্যবস্থা কতদূর এগলো। বাজারে যাবার আগে বুলবুল বলেছিল, "তোমার মেজদাকে বাজারে পাঠিয়ে লাভ নেই। হয়তো পচা মাছ এনে হাজির করবেন।"

দূর থেকে কমলা বউদি হাসতে হাসতে বললেন, "দাঁড়াও কাজলকে ডাকছি।"

বুলবুল ঘাড় উঁচু করে বললো, "ভয় করি নাকি? যা-সত্যি, তাই বলবো। অফিসে ঠাণ্ডা ঘরে বসে হিসেব করা আর সব জিনিস বুঝে শুনে সংসার করা এক জিনিস নয়।"

মেজদার কানে দুই-বউয়ের কথাবার্তা এমনিতেই পৌঁছে গেল। মাথার চুল মুছতে মুছতে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে বউদিকে অভিজিৎ জিজ্ঞেস করলো, "কী বলছে?"

বউদি রসিকতার সুযোগ ছাড়লেন না। বললেন, "আমাকে কেন? নিজের বউকেই জিজ্ঞেস করো।"

বউকে কিছুই জিজ্ঞেস করলো না মেজদা। বললো, "নিজে বাজারে বেরোলেই পারো।"

"কী কথাবার্তার ধরন! দেখলেন তো দিদি।" বুলবুল স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করলো কমলা বউদির কাছে।

সোমনাথের এইসব রস-রসিকতা ভাল লাগছে না। সে নিজের ঘরের ভিতর ঢুকে বসে রইলো।

এখান থেকেও ওদের সমস্ত কথাবাতা শোনা যাচ্ছে। কমলা বউদি কাজলকে বকলেন। "কেন তুমি বুলবুল বেচারার পিছনে লাগছো?"

বুলবুল সাহস পেয়ে গেল। বরকে সোজা জানিয়ে দিলো, "ইচ্ছে হলে বাজার করতে পারি। কিন্তু অগ্নিসাক্ষী রেখে মন্তর-পড়ে খাওয়ানো-পরানোর দায়িত্ব নিয়েছিলে কেন?"

স্বামী-স্ত্রীর এই খুনসুটি অন্য সময় মন্দ লাগে না সোমনাথের। বুলবুলের মধ্যে সখীভাবটা প্রবল, আর কমলা বউদির মধ্যে মাতৃভাব। কমলা বউদি দু-একবার সোমনাথকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, "বুলবুলও বউদি, ওকে বউদি বলবে।" ওই জিনিসটা পারবে না সোমনাথ। ভূতপূর্ব কলেজ-বান্ধবীকে

রাতারাতি বউদি করে নিতে পারবে না। বুলবুলও একই পথ ধরেছে। সোমনাথকে ঠাকুরপো বলে না, কলেজের নাম ধরেই ডাকে।

কমলা বউদি বলেছিলেন, "নিদেনপক্ষে সোমদা বোলো।"

বুলবুল তাতেও রাজী হয় নি—"আমার থেকে বয়সে তো বড় নয়। সুতরাং হোয়াই দাদা?"

কমলা বউদির গলা শোনা গেল। "বিছানায় শুয়ে শুয়ে রাত্রে ঝগড়া কোরো বুলা। এখন খোকনকে ছেড়ে দাও।"

সোমনাথের ঘরে ঢুকে বুলবুল বললো, "ভাই সোম, রক্ষে করো।"

সোমনাথ নিজেই এবার হাল্কা হবার চেষ্টা করলো। বললো, "দাদার হাত থেকে কী করে রক্ষে করবো? জেনে-শুনেই তো বিয়ের মন্ত্র পড়েছিলে!"

দেওরের দিকে তির্যক দৃষ্টি দিলো বুলবুল। তারপর শাড়ির আঁচলে ভিজে হাতদুটো মুছলো। বললো, "তুমিও আমার পিছনে লাগছো সোম? অফিসের যে-লোকটা খেতে আসবে সে বেজায় খুঁতখুঁতে। বউটা তেমনি নাক উঁচু। যদি আপ্যায়নের দোষ হয় অফিসে কথা উঠবে। আর তোমার দাদা আমাকে আস্ত রাখবে না।"

কপট গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললো, "বাজারে আস্ত থেকে কাটার দাম বেশী।"

বুলবুল ছাড়লো না। আঁচলটা কোমরে জড়াতে জড়াতে বললো, "এর প্রতিশোধ একদিন আমিও নেবো, সোম। তোমারও বিয়ে হবে এবং বউকে আমাদেরই খপ্পরে পড়তে হবে।"

রসিকতায় খুশী হতে পারলো না সোমনাথ। এ-বাড়িতে বেকার সোমনাথের বিয়ের কথা তোলা যে ব্যঙ্গ তা মোক্ষদা ঝিও জানে।

বুলবুল বললো, "ইলিশ এবং ভেটকি দু'রকমই নিও, সোম। ওরা আবার আমাদের চিংড়ি মাছও খাইয়েছিল। আমি কিন্তু টেক্কা দেবার চেষ্টা করবো না।"

বাজার ঠিকমতো করেছিল সোমনাথ। কিন্তু বাড়িতে অতিথি আসবে শুনলেই সে অস্বস্তি বোধ করে। অতিথির সঙ্গে পরিচয়ের পর্বটা সোমনাথ মোটেই পছন্দ করে না। দুপুরবেলা হলে সোমনাথ কোথাও চলে যেত—ন্যাশনাল লাইব্রেরির দরজা তো বেকারদের জন্যেও খোলা রয়েছে। কিন্তু অতিথি আসছেন রাত্রিবেলাতে।

অতিথি পরিচয়ের আধুনিক বাংলা কায়দাটা সোমনাথের কাছে মোটেই শোভন মনে হয় না। 'নমস্কার, ইনি অভিজিৎ ব্যানার্জির ভাই' বললেই পর্বটা চুকে যাবে না। একটা অলিখিত প্রশ্ন বিরাট হয়ে দেখা দেবে। 'ভাই

তো বুঝলাম, কিন্তু ইনি কী করেন?' কলকাতার তথাকথিত ভদ্রসমাজে এ-প্রশ্ন এড়িয়ে যাবার কোনো উপায় নেই।

অতিথিরা সন্ধ্যা সাড়ে-সাতটার সময় এলেন। মিস্টার অ্যাণ্ড মিসেস এস কে নন্দীকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে বুলবুল এক্সট্রা স্পেশাল সাজ করে সময় গুণছিল। এই সাজের পিছনে বুলবুলের অনেক চিন্তা আছে। মেজদার সঙ্গে জল্পনা-কল্পনাও হয়েছে। বুলবুলকে দেখে কমলা বউদি মন্তব্য করলেন, "এত ভেবে-চিন্তে, শেষ পর্যন্ত এই সাধারণ সাজ হলো!"

বুলবুল উত্তর দিলো, "আর বলেন কেন, দিদি। এইটাই নাকি এখনকার চালু স্টাইল। নিজের বাড়ি তো—খুব ব্রাইট কোনো শাড়ি পরলে এবং লাউড মেক-আপ থাকলে ভাববে ইনি নিজেই বাইরে নেমন্তন্ন রাখতে যাচ্ছেন! তাই মেক-আপ খুব টোন ডাউন করতে হবে এবং শাড়িটা যেন সাধারণ মনে হয়। কিন্তু শাড়ির দামটা যে মোটেই সাধারণ নয় তা যেন অভ্যাগতরা বুঝতে পারেন। ভাবটা এমন, এতক্ষণ রান্নাঘরেই ছিলাম, আপনারা এসেছেন শুনে আলতোভাবে মুখের ঘামটা মুছে দ্রুত চলে এসেছি। অতিথি আপ্যায়নের সময় কী নিজের সাজ-গোজের কথা খেয়াল থাকে?"

সোমনাথের হাসি আসছিল। অফিসার হয়েও তাহলে শান্তি নেই—কত-রকমের অভিনয় করতে হয়। বুলবুল অবশ্য পারবে—ওর এইসব ব্যাপারে বেশ ন্যাক আছে।

মিস্টার-মিসেস নন্দীকে গেটেই কাজল ও বুলবুল অভ্যর্থনা করলো। এ-বাড়ির রীতি অনুযায়ী অতিথি-দম্পতিকে একবার ওপরে বাবার কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। বাবার সঙ্গে দু-একটা কথার পর মিস্টার-মিসেস নন্দী নিচে নেমে এলেন।

মুখে মিষ্টি হাসি ফুটিয়ে বুলবুল বললো, "আমার ভাশুরের সঙ্গে আপনার আলাপ হলো না। এখন ট্যুরে রয়েছেন।"

মেজদা বললো, "বউদিকে ডাকো।" কমলা বউদিকে ধরে আনবার জন্যে বুলবুল বেরিয়ে যেতেই মিস্টার নন্দীকে মেজদা বললো, "দাদা ব্রিটিশ বিস্কুট কোম্পানিতে আছেন। কয়েক সপ্তাহের জন্যে বোম্বাই গিয়েছেন। ওদের কোম্পানির নাম পাল্টাচ্ছে—ইণ্ডিয়ান বিস্কুট হচ্ছে।"

মিস্টার নন্দী বললেন, "হতেই হবে। সমস্ত জিনিসই আমাদের ক্রমশ দিশী করে ফেলতে হবে, মিস্টার ব্যানার্জি।"

"রাখো তোমার স্বদেশী মন্তর," মিসেস নন্দী স্বামীকে বকুনি লাগালেন। "তোমাদের আপিসের সব সায়েবগুলো চলে গিয়ে যখন হরিয়ানী বসবে তখন মজা বুঝতে পারবে।"

মিস্টার নন্দী যে বউয়ের বকুনিতে অভ্যস্ত তা বোঝা গেল। বেশ শান্তভাবে ইণ্ডিয়া কিং সিগারেট ধরিয়ে বউকে তিনি বললেন, "হরিয়ানা এবং স্বদেশীয়ানা যে একই জিনিস তা এখন অনেকেই হাড়ে হাড়ে বুঝছে। কিন্তু মিনু, সায়েবদের চলে যেতে বলছে কে? শুধু খোলস পাল্টাতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।"

মিসেস নন্দী বললেন, "কোম্পানির পার্টিতে যেতে আমার মোটেই ভাল লাগে না। কিন্তু বাধ্য হয়ে প্রেজেণ্ট থাকতে হয়।"

"কী করবেন বলুন। যে-পুজোর যে-মন্ত্র," সুদর্শনা ও সুসজ্জিতা মিসেস নন্দীকে সান্ত্বনা দিল অভিজিৎ।

মিসেস নন্দী বললেন, "সেদিনের ককটেল পার্টিতেও স্বদেশীর কথা উঠেছিল। মিস্টার অ্যাণ্ড মিসেস চোপরা তিনমাস ফরেনে বেড়িয়ে এসে ভীষণ স্বদেশী হয়ে উঠেছেন। বললেন, মেয়েদের কসমেটিক্স এবং ছেলেদের স্কচ্ হুইস্কি ছাড়া আর সব জিনিস স্বদেশী হয়ে গেলে তাঁদের কোনো আপত্তি নেই।"

বুলবুলও সেদিন পার্টিতে উপস্থিত ছিল। পার্টির শেষের দিকে বেশ কয়েক পেগ ফরেন হুইস্কি পান করে মিসেস চোপরা আরও উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন। বুলবুলের কোমরে হাত রেখে পঞ্চাশ বছরের যুবতী মিসেস চোপরা বলেছিলেন, "দেশের মঙ্গলের জন্যে ইমপোর্টেড কসমেটিক্স আনা কয়েক বছর বন্ধ হলে তাঁর আপত্তি নেই।"

বুলবুলের কথা শুনে হা-হা করে হেসে উঠলেন মিস্টার নন্দী। "মিসেস ব্যানার্জি, আপনি সত্যিই খুব সরল প্রকৃতির মানুষ। আপনি মিসেস চোপরার কথা বিশ্বাস করলেন? উনি বলবেন না কেন? এবারে ফরেন থেকে ফেরবার সময় মহিলা যা কসমেটিক্স এনেছেন তাতে ওঁর সমস্ত জীবন সুখে কেটে যাবে!"

"ও মা!" মিসেস নন্দী ইস্কুলের কিশোরী বালিকার মতো বিস্ময় প্রকাশ করলেন।

মিস্টার নন্দী বললেন, "এসব ভিতরের খবর। বিশ্বাস না হলে, ট্র্যাভেল ডিপার্টমেণ্টের অ্যারো মুখার্জিকে জিজ্ঞেস করবেন। কাস্টমসের নাকের সামনে দিয়ে বিনা-ডিউটিতে ওই মাল ছাড়িয়ে আনতে বেচারার ব্লাড-প্রেসার বেড়ে গিয়েছে। উপায়ও নেই—রিজিওন্যাল ম্যানেজারের বউ। লিপস্টিকের ওপর ডিউটি ধরলে অ্যারো মুখার্জির চাকরি থাকবে না।"

"ওমা! তুমি তখন বললে না কেন চুপি চুপি।" মিসেস নন্দী আবার বালিকা-বিস্ময় প্রকাশ করলে।

"কেন মিসেস নন্দী? সি-বি-আইকে খবর পাঠাতেন নাকি?" অভিজিৎ রসিকতা করলো।

"কিছুই করতাম না। শুধু মহিলাকে নেশার ঘোরে ভুলিয়ে-ভালিয়ে দু-একটা লিপস্টিক হাতিয়ে নিতাম," মিসেস নন্দী আপসোস করলেন।

মিস্টার নন্দী সন্দেহ প্রকাশ করে বললেন, "সে-মুরোদ তোমাদের নেই। মিসেস চোপরার কালচারে মানুষ হলে চক্ষুলজ্জা থাকতো না, তখন হেসে কেঁদে কিংবা স্রেফ অঙ্গভঙ্গী দেখিয়ে ঠিক ম্যানেজ করে আনতে। ওরা যেমন নির্লজ্জভাবে বড়কর্তাদের জন্যে তেল পাম্প করে, তেমনি নির্দয়ভাবে নিচু থেকে তেলের সাপ্লাই প্রত্যাশা করে।"

একতলা ঘুরে ঘুরে দেখতে দেখতে চারজনের মধ্যে কথা হচ্ছে। নিজের ঘরে বসেই সোমনাথ এসব বেশ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে।

ঘুরতে ঘুরতে ওরা যে এবার সোমনাথের সামনে দাঁড়িয়েছে তা সোমনাথ বুঝতে পারলো। দরজাটা অর্ধেক খোলা ছিল। অভিজিৎ একটা আলতো টোকা মারলো। সোমনাথ চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালো।

"উঠবেন না, উঠবেন না, বসুন।" হাঁ-হাঁ করে উঠলেন মিস্টার নন্দী।

মেজদা বললো, "আমার ইয়ংগেস্ট ভাই, সোমনাথ।" তারপর সোমনাথকে বললো, "খোকন, আমাদের অফিসের ট্রেনিং অ্যাণ্ড স্টাফ ম্যানেজার মিস্টার নন্দী।"

সোমনাথ সম্পর্কে শূন্যস্থান পূরণের জন্যে মিসেস নন্দী স্বভাবসিদ্ধ কৌতূহলী দৃষ্টিতে বুলবুলের দিকে তাকালেন। বুলবুলের বুঝতে বাকি রইলো না, মিসেস নন্দী কি জানতে চাইছেন। বুলবুলের বেশ অস্বস্তি লাগছে।

অভিজিৎও অস্বস্তি বোধ করছে। কিন্তু সে কায়দা করে উত্তর দিলো, "সামনে ওর নানা পরীক্ষা রয়েছে। বাড়ির ছোট ছেলে তো, আমরা তাই একটু বেশী করে ভাবছি।"

"ঠিক করছেন মশায়," উৎসাহিত হয়ে উঠলেন মিস্টার নন্দী। "মার্চেন্ট ফার্মে অফিসার পোস্টে ঢুকিয়ে ওঁর জীবনটা বরবাদ করে দেবেন না। তার থেকে আই-এ-এস-টেস অনেক ভাল।"

কান লাল হয়ে উঠছিল সোমনাথের। অপমান ও উত্তেজনার মাথায় সে হয়তো কিছু বলেই ফেলতো। কিন্তু মিস্টার নন্দী বাঁচিয়ে দিলেন। বুলবুলকে

বললেন, "ওঁর পড়াশোনায় ডিসটার্ব করে লাভ নেই। চলুন আমরা অন্য কোথাও যাই।"

সোমনাথের মুখটা যে কালো হয়ে উঠছে, তা দাদা ছাড়া কেউ লক্ষ্য করলো না।

কমলা বউদি ভিতরে খাবারের ব্যবস্থা করছেন। আর বাইরের ঘরে ওঁরা চারজন এসে বসলেন। ওদের সব কথাবার্তা সোমনাথ এখান থেকে শুনতে পাচ্ছে।

মিস্টার নন্দী অভিযোগ করলেন, "জিনিসপত্তরের দাম যেভাবে বাড়ছে তাতে আর চলছে না, মিস্টার ব্যানার্জি। আপনারা অ্যাকাউনটেণ্টরা দেশের যে কী হাল করলেন।"

"আমরা কী করলাম? দেশের ভার তো অ্যাকাউনটেণ্টদের হাতে দেওয়া হয়নি, তাহলে ইণ্ডিয়ার এই অবস্থা হতো না।" অভিজিৎ হাসতে হাসতে উত্তর দিলো।

"পার্সোনেল অফিসারদের হাতেও দেশটা নেই। থাকলে, অন্তত ইস্কুলে-কলেজে, পথে-ঘাটে কল-কারখানায়, অফিসে-আদালতে ডিসিপ্লিনটা বজায় রাখা যেত," দুঃখ করলেন মিস্টার নন্দী।

"তাহলে দেশটা রয়েছে কার হাতে?" একটু অবাক হয়েই প্রশ্ন করলেন মিসেস নন্দী।

"মা-জননীদের হাতে।" রসিকতা করলেন মিস্টার নন্দী। "সঙ্গে তালিম দিচ্ছেন কয়েকজন ব্রীফলেস উকিল এবং কিছু টেকসট-বুক পড়া প্রফেসর। ম্যানেজমেণ্টের 'ম' জানেন না এঁরা।"

এবার তুলনামূলক সমালোচনা আরম্ভ করলেন মিসেস নন্দী। "পার্সোনেল অফিসারদের থেকে আপনারা অনেক ভাল আছেন, মিস্টার ব্যানার্জি।"

"এত দুঃখ করছেন কেন, মিসেস নন্দী?" বুলবুল জিজ্ঞেস করলো।

"অনেক কারণে ভাই। বাড়িতে পর্যন্ত শান্তি নেই। লোকে যেমনি শুনলো পার্সোনেল অফিসার, অমনি চাকরির তদ্বির শুরু হয়ে গেল।"

মিস্টার নন্দীও সায় দিলেন। "বন্ধুর বাড়ি, বিয়ে বাড়ি, এমনকি বাজার-হাটেও যাবার উপায় নেই। চেনা-অচেনা হাজার হাজার চাকরির জন্যে খাই-খাই করছে। চাকরি কি মশাই আমি তৈরি করি?"

মিসেস নন্দী বললেন, "আগে ওঁর ঠাণ্ডা মাথা ছিল, লোকের সঙ্গে ভালভাবে কথা বলতেন—এখন চাকরির নাম শুনলে বেগুনে জ্বলে ওঠেন।"

"ধৈর্য থাকে না, মিস্টার ব্যানার্জি," এম কে নন্দীকে বলতে শোনা গেল।

"মেয়ের বিয়ে এবং ছেলের চাকরির জন্যে বাঙালীরা তো চিরকালই ধরাধরি করে এসেছে, মিস্টার নন্দী," বুলবুল হঠাৎ বলে ফেললো। পরে বুলবুলের মনে হলো, কথাটা মিস্টার নন্দীর মনঃপূত নাও হতে পারে।

"বাঙালী ছেলেদের চাকরি ?" আঁতকে উঠলেন মিস্টার নন্দী। তারপর বললেন, "কিছু যদি মনে না করেন, তাহলে সত্যি কথাটা বলি। বাংলাব শিক্ষিত বেকাররা বিধাতার এক অপূর্ব সৃষ্টি। এরা ইস্কুলে-কলেজে ঢুলে ঢুলে কিছু মানে-বই মুখস্থ করেছে—কিন্তু এক লাইন ইংরিজী স্বাধীনভাবে লিখতে শেখেনি। বারো-চোদ্দ বছব ধবে প্রতিদিন ইস্কুলে এবং কলেজে-গিয়ে এরা এবং এদের মাস্টারমশায়রা যে কী করেছেন ভগবান জানেন! পৃথিবীর কোনো খোঁজই এরা রাখে না। এবা জানে না মোটব গাড়ি কীভাবে চলে; কোন সময়ে ধান হয়, সিপিয়া রঙের সঙ্গে লাল রঙের কী তফাত। এবা কলমেব থেকে ভারী কোনো জিনিস তিন-পুরুষের মধ্যে তোলেনি। এরা রাঁধতে জানে না, খাবার খেয়ে নিজেদের থালাবাসন ধুতে পারে না, মায় নিজেদের জামা-কাপড়ও কাচতে পারে না। অন্য লোকে ঝাঁটা না-ধরলে এদের ঘরদোর পরিষ্কার হবে না। দৈহিক পরিশ্রম কাকে বলে এবা জানে না। এরা কোনো হাতের কাজ শেখেনি, ম্যানার জানে না, কোনো অভিজ্ঞতা নেই এদেব। এরা শুধু আনএমপ্লয়েড নয়, আমাদের প্রফেশনে বলে আনএমপ্লয়েব্‌ল। এদের চাকরি দিয়ে কোনো লাভ নেই।"

এ ঘরে বসে সোমনাথ ভাবছে, মেজদা কিছু মতামত দিচ্ছে না এই যথেষ্ট।

মিস্টার নন্দী বোধ হয় আর একটা সিগারেট ধরালেন। কারণ দেশলাই জ্বালানোর শব্দ হলো। তাঁর গলা আবার শোনা গেল। "এই ধরনের লক্ষ লক্ষ অদ্ভুত জীব আমাদের এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জগুলোতে নাম লিখিয়ে চাকরির আশায় বাড়িতে কিংবা পাড়ার রকে বসে আছে। হাজার পঞ্চাশেক ইস্কুল-কলেজ আরও কয়েক লাখ একই ধরনের জীবকে প্রতিবছর চাকরির বাজারে উগরে দিচ্ছে। অথচ এই সব অভাগাদের জন্যে দেশের কারও কোনো মাথা ব্যথা নেই। এরা সমাজের কোন কাজে লাগবে বলতে পারেন ? ইস্কুল-কলেজে এমন ধরনের অপদার্থ বাবু আমরা কেন তৈরি করছি পৃথিবীর কেউ জানে না।"

"আমাদের সমাজই তো এদের এইভাবে তৈরি করেছে, মিস্টার নন্দী," অভিজিৎ গভীর দুঃখের সঙ্গে মৃদু প্রতিবাদ করলো।

মিস্টার নন্দী বোধহয় সিগারেটে একটা টান দিলেন। তারপর বললেন,

"ইনটারভিউতে বসে এইসব বেঙ্গলী ছেলেদের তো দেখছি আমি। চোখ ফেটে জল আসে। উগ্রপন্থীরা যে বলতো ইস্কুল-কলেজ বোমা মেরে বন্ধ করে দাও, তার মধ্যে কিছু লজিক ছিল মিসেস ব্যানার্জি। কারণ ইস্কুল-কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের এইসব ছেলেদের স্বয়ং ভগবানও এই সমাজে প্রোভাইড করতে পারবেন না।"

"দোষটা তো এই ছেলেদের নয়।" অভিজিতের গলা শোনা গেল।

"সেইটাই তো আরো দুঃখের। এরা জানে না, এদের কি সর্বনাশের পথে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। যে-হাবে নতুন চাকরি হচ্ছে তাতে ইতিমধ্যেই যারা এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের লিস্টে নাম লিখিয়েছে তাদের ব্যবস্থা করতে আশি-পঁচাশি বছব লেগে যাবে। অর্থাৎ, এখন যদি বাইশ-তেইশ বছর বয়স হয়, চাকরির চিঠি আসবে একশ' দুই বছর বয়সে!"

মিস্টার নন্দী বললেন, "শতখানেক সরকারী চাকরির জন্যে লাখদশেক অ্যাপ্লিকেশন পড়তে পারে এমন খবর পৃথিবীব কেউ কোথাও কোনোদিন শুনেছে? সবচেয়ে দুঃখের কথা, গভরমেণ্টও এদের কাছে বেমালুম মিথ্যা কথা বলছে। ওরে বাবা, মুরোদ থাক-না-থাক অন্তত সত্যবাদী হও। ইয়ংমেনদের কাছে স্বীকার করো, এ-সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা কোনো সরকারের নেই। তাহলে ছেলেগুলোর অন্তত চৈতন্যোদয় হয়, নিজের ব্যবস্থা নিজেরা করে ফেলতে পারে।"

"নিজের ব্যবস্থা আর কী করবে, মিস্টার নন্দী?" অভিজিৎ দুঃখের সঙ্গে বললে।

"যাদের কেউ নেই, তাদের করতেই হয়," মিস্টার নন্দী উত্তর দিলেন। "আপনি কলকাতার চীনেদের দেখুন। তিন-চারশ' বছর ধরে তো ওরা কলকাতায় রয়েছে। ওদের ছেলেপুলেরাও তো লেখাপড়া শিখছে। কিন্তু কখনও এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে কোনো চীনেকে দেখেছেন? ওদের যে চাকরির দরকার নেই এমন নয়। কিন্তু ওরা জানে, এই সমাজে কেউ ওদের দেখবে না, কেউ ওদের সাহায্য করবে না, নিজেদের ব্যবস্থা নিজেদেরই করতে হবে। তাই নীরবে সেই অবস্থার জন্যে ছেলেমেয়েদেব ওরা তৈরি করেছে। এবং খুব দুঃখে কষ্টে নেই ওরা।"

মিসেস নন্দী একটু বিরক্ত হলেন। "আমরা তো আর চীনে নই—সুতরাং বার বার চীনের কীর্তন গেয়ে কী লাভ?"

হেসে ফেললেন মিস্টার নন্দী। "গিন্নির ধারণা আমি প্রো-চাইনীজ।"

"আমরাও প্রো-চাইনীজ—বিশেষ করে খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে।" অভিজিৎ মন্তব্য করলো।

একবার হাসির হুল্লোড় উঠলো।

মিস্টার নন্দী বললেন, "সুইডেনের প্রফেসার জোরগেনসেন এসেছিলেন কিছুদিন আগে। জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত। এই চাকরি-বাকরির ব্যাপারে নানা দেশে অনেক গবেষণা করেছেন। আমার সঙ্গে এক ডিনাবে আধঘণ্টার জন্যে দেখা হয়ে গেল। তিনি বললেন, অর্থনীতি এবং রাজনীতিব অনেক প্রাথমিক আইনই তোমাদের এই বেঙ্গলে খাটে না। অন্য দেশে বেকার বললেই একটা ভয়াবহ ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। একটা রুক্ষ মেজাজের সর্বনাশা চেহারার লোক—যার কোনো সামাজিক দায়দায়িত্ব নেই, যে প্রচণ্ড রেগে আছে। ইংলণ্ডের কিছু কিছু প্রি-ওয়াব উপন্যাসে এদের পরিচয় পাবে। লোকটা বোমার মতন—কারণ সে অনাহারে মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে আছে, তার আশ্রয় নেই, জামা-কাপড় নেই। যে-কোনো মুহূর্তে সে ফেটে পড়তে পারে।"

একটু থামলেন মিস্টার নন্দী। তারপর আরম্ভ করলেন, "প্রফেসর জোরগেনসেন বললেন, তোমাদেব এই বেঙ্গলে এসে কিন্তু তাজ্জব বনে গেলাম। রাস্তায় রাস্তায় পাড়ায় পাড়ায় এমন কি এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের সামনে দাঁড়িয়েও বেকার সমস্যার বাহ্যিক ভয়াবহতা দেখলাম না। অথচ তোমাদের এখানে যত বেকার আছে তার এক দশমাংশ কর্মহীন অন্য যে কোনো সভ্য দেশকে লণ্ডভণ্ড করে দিত। তোমাদের বেকাররা অস্বাভাবিক শান্ত। আর বেকারি ভাতা না-থাকলেও তোমাদের জয়েণ্ট ফ্যামিলি এদের সর্বনাশ করে দিচ্ছে। অনেকেরই যেন-তেন উপায়ে খাওয়া জুটে যাচ্ছে। তোমাদের পারিবারিক জীবন এই বোমাগুলোকে ফিউজ করে দিচ্ছে—এরা ফেটে পড়তে পারছে না। নতুন জীবনের অ্যাডভেঞ্চারেও নামতে পারছে না এরা। তাই সমস্যা সমাধানে কোনো তাড়াতাড়ি নেই—নাউ অর নেভার, একথা কারও মুখে শোনা যাচ্ছে না।"

মিস্টার নন্দী থামলেন না। বললেন, "জানেন মিস্টার ব্যানার্জি, প্রাইভেট ফার্মে চাকরি না-করলে বলতাম—বেকারি অনেকটা ম্যালেরিয়া এবং কালাজ্বরের মতো। এখনই মৃত্যুভয় নেই, কিন্তু আস্তে আস্তে জীবনের প্রদীপ শুকিয়ে আসছে। পৃথিবীর সর্বত্র মানুষ যুগে যুগে যৌবনকে জয়টীকা পরিয়েছে। ক্যাপিটালিস্ট বলুন, সোসালিস্ট বলুন, কম্যুনিস্ট বলুন, সবদেশে যৌবনের জয়-জয়কার। আর আমাদের এই পোড়া বাংলায় যুবকদের কি অপমান। লাখ

লাখ নিরপরাধ শিক্ষিত ছেলেমেয়েদের যৌবন কেমন বিষময় হয়ে উঠেছে দেখুন। ওরা যদি বলতো, সমাধান আজই চাই। আজ সমাধান না হলে, কাল সকালেই যা-হয় করবো—তাহলে হয়তো দেশের ভাগ্য পাল্টে যেত।"

মিস্টার নন্দীর কথাগুলো শুনতে শুনতেই সোমনাথের বক্তে আগুন ধরে যাচ্ছিলো। একবার মনে হলো, তাকে শোনাবার জন্যেই যেন গোপন ষড়যন্ত্র করে নন্দীকে আজ এ-বাড়িতে আনা হয়েছে।

কিন্তু এ-সমস্ত কথা যে সোমনাথের কানে যাচ্ছে তা মেজদা এবং বুলবুল কল্পনাও করতে পারেনি। সোমনাথের ঘরে ঢুকে বুলবুল একবার বলতে এলো, 'সোম, তুমিও এসো। সবাই একসঙ্গে খেয়ে নেওয়া যাবে।"

সোমনাথ রাজী হলো না। বললে, "আজকে খাওয়াটা বাদ দেবো ভাবছি। পেটের অবস্থা খারাপ।"

বুলবুল চলে গেল। খবর পেয়ে কমলা বউদি এলেন। "কখন পেট খারাপ করলো? আগে বলোনি তো।"

সোমনাথ বললে, "এমন কিছু নয়, আপনি অতিথিদের দেখুন।"

কমলা বউদি বললেন, 'ফ্রিজে কই মাছ রয়েছে—একটু পাতলা ঝোলের ব্যবস্থা করে ফেলি?"

"পাগল হয়েছেন," সোমনাথ আপত্তি করলো। "একদিন শাসন করলেই ঠিক হয়ে যাবে। পেটকে অনেকদিন আস্কারা দিয়ে এই অবস্থা হয়েছে।"

সোমনাথ মনস্থির করে ফেলেছে। কিন্তু বাড়ির লোকেরা বুঝতে পারেনি। সেদিন সকালে বেরোবার সময় বউদি আবার সোমনাথকে মনে করিয়ে দিলেন, "বাবা বলছিলেন, আজ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের কার্ড রিনিউ করবার দিন।"

সোমনাথের যে এ-বিষয়ে আগ্রহ নেই তা বউদি বুঝলেন। তাই বললেন, "বাবা বলছিলেন, কার্ডটা চালু রাখতেই হবে। কার্ড না-থাকলে অনেক অফিসে কথাই শুনবে না।"

সোমনাথ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে সকাল কাটালো। ওখান থেকে বেরুবার সময়ে বিশুবাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

বিশুবাবুর সঙ্গে ফুটবল খেলার মাঠে আলাপ। সুকুমারই বিশুবাবুর সঙ্গে প্রথম ভাব জমিয়েছিল। ভদ্রলোক ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের বিশস্ত ভক্ত। বিশুবাবু

বিজনেস করেন, এ খবরও খেলার মাঠে অনেকবার শুনেছে সোমনাথ।

বিশুবাবুর কালো আবলুশ কাঠের মতো গায়ের রঙ। মাথার চুলগুলো কপালের দিক থেকে পাতলা হতে আরম্ভ করেছে। তার ফলে কপালটা চওড়া মনে হয়। মধ্যপ্রদেশেও ঈষৎ মেদ জমতে শুরু করেছে বিশুবাবুর। বয়স চুয়াল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ হবে।

হাতে একটা ফোলিও ব্যাগ নিয়ে বিশুবাবু রাস্তার হিন্দুস্থানী দোকান থেকে বাংলা পান কিনছিলেন। সোমনাথকে দেখে বিশুবাবু চিৎকার করে উঠলেন, "কী মোহনবাগান? খবর কী?"

সোমনাথের মতামত না নিয়েই বিশুবাবু আর একটা পানের অর্ডার দিলেন। পান নিতে সোমনাথ একটু ইতস্তত করছিল। বিশুবাবু বকুনি লাগালেন। "এটা জেনে রাখবে পানের কোনো সময় নেই। যে কোনো সময় যটা ইচ্ছে চিবোতে পারো—শুধু ওই লাল মসলাগুলো খেয়ো না।"

পানওয়ালার কাছে নিজের গুণ্ডিমোহিনী বিশুবাবু আলাদাভাবে চেয়ে নিলেন। তারপর বললেন, "মোহনবাগানের কতকগুলো অপয়া ছেলে কালকে ইস্টবেঙ্গল-স্পোর্টিং ইউনিয়নের খেলা দেখতে এসেছিল। উদ্দেশ্য ইস্টবেঙ্গলের একটা পয়েন্ট-খাওয়া। দিস্ ইজ ব্যাড।" মতামত দিলেন বিশুবাবু। "তোমার ক্লাবকে তোমার সাপোর্ট করবার রাইট আছে, কিন্তু গায়ে-পড়া অপয়া ছেলেকে অন্য ক্লাবের সাপোর্টে পাঠিয়ে তাদের পয়েন্ট খাওয়া মোটেই স্পোর্টস-ম্যান-লাইক নয়।"

অন্য সময় হলে ফিক করে হেসে ফেলতো সোমনাথ। এমনকি বিশুবাবুর সঙ্গে তর্ক করে বলতো, শত্রুকে হারাবার জন্যে কোনো চেষ্টাই অন্যায় নয়। সত্যি কথা বলতে কি, সুকুমারের প্ররোচনায় সোমনাথ একবার ইস্টবেঙ্গলের পয়েন্ট খেয়ে এসেছে। আজকে এসব প্রসঙ্গের অবতারণা করবার মতো মনের অবস্থা নেই সোমনাথের।

পান চিবোতে চিবোতে বিশুদা জানতে চাইলেন, "হোয়ার ইজ ইওর ফ্রেণ্ড সুকুমার?"

সুকুমার গোল্লায় যেতে বসেছে। আজ সকালেও বাসস্ট্যাণ্ডের কাছে সুকুমারকে দেখতে পেয়েছে সোমনাথ। এক ভদ্রলোককে মোটর সাইকেল থেকে নামিয়ে জিজ্ঞেস করছে, পৃথিবীর ওজন কত?

সোমনাথ ছুটে না এলে ভদ্রলোক হয়তো বেচারা সুকুমারকে মেরে বসতেন। মারের হাত থেকে বেঁচে সুকুমার বললো, "দেখছিস তো, কোনো

লোক জেনারেল নলেজে হেল্প করতে চায় না। আমার চাকরি হলে তোমার কি ক্ষতি বাবা ?” কোনোরকমে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সোমনাথ ওকে যাদবপুরের বাসে তুলে দিয়েছিল। কণ্ডাকটরের হাতে বাসের ভাড়া দিয়ে বলেছিল সুলেখা স্টপেজের পরেই নামিয়ে দিতে।

বিশুবাবুর কাছে সোমনাথ এসব কিছুই বললো না।

"তোমার খবর কী ?" বিশুবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

সঙ্কোচ কাটিয়ে সোমনাথ এবার জিজ্ঞেস করলো, "বিশুদা, যাদের চাকরি-বাকরি হয় না, তাদের কী করা উচিত ?"

পানের পিচটা হজম করে নিয়ে জাঁদরেল বিশুদা বললেন, "ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়। সামনে যা পাওয়া যায় তাই পাকড়ে ধরতে হয়।" একটু ভেবে একগাল হেসে বিশুদা বললেন, "এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে লাইন মেরে মেরে বিরক্তি ধরে গিয়েছে বুঝি ? বোম্ কালী কলকাত্তাওয়ালী বলে ঝাঁপিয়ে পড়ো !"

"কোথায় ঝাঁপাবো ?" সোমনাথ একটু ঘাবড়ে যায়।

"ঘাবড়াবার কিছুই নেই," বিশুদা পিঠে এক থাপ্পড় লাগালেন। "চলো আমার সঙ্গে।"

বিশুবাবুর সঙ্গে হাঁটতে আরম্ভ করলো সোমনাথ। জি পি ও, রাইটার্স বিল্ডিংস এবং লালবাজার পেরিয়ে ওরা দুজনে এবার চিৎপুর রোডে পড়লো। আরও একটু এগিয়ে ডানদিকে পোদ্দার কোর্ট। তারপরে বাগড়ি মারকেট। বিশুবাবু বললেন, "ব্যাটাছেলের কোনো ইচ্ছে হলে সঙ্গে সঙ্গে কাজে নেমে পড়তে হয়।"

সোমনাথ বললে, "আচ্ছা বিশুদা, বিজনেস করতে হলে কত টাকা লাগে ?"

বিশুদা হেসে ফেললেন। বললেন, "হোল বিজনেস লাইফে এমন ডিফিকাল্ট কোশ্চেন আমাকে কেউ করেনি। এর উত্তর হলো—দশ পয়সা থেকে দশ কোটি টাকা। ঐ যে কলাওয়ালা দেখছো ওর দু টাকাও পুঁজি নেই। আর সামনে পোদ্দার কোর্ট দেখছো, বুঝতেই পারছো কত টাকা খরচ হয়েছে বাড়িটা করতে। টাটা বিড়লাদের টাকার যদি হিসেব চাও তাহলে মাথায় হাত দিয়ে বসবে। ওদের কোম্পানিগুলোর ব্যালান্সসীট থেকে ফিগার বার করে যোগ দিতে গেলে স্রেফ হেদিয়ে যাবে।"

"টাকা না-হলেও বিজনেস হতে পারে ?" সোমনাথ একটু ভয়ে ভয়েই জিজ্ঞেস করলো।

"অনেক হয় ! এই যে কলকাতার সব লক্ষপতি কোটিপতি গোয়েঙ্কা,

জালান, থাপর, কানোরিয়া, বাজোরিয়া সিংঘানিয়া দেখছো এরা সব কি রাজস্থান, হরিয়ানা থেকে লাখ লাখ টাকা পকেটে নিয়ে কলকাতায় বিজনেস করতে এসেছিল ? খোঁজ নিলে দেখা যাবে, মূলধন বলতে অনেকেরই আদিতে রয়েছে ওয়ান লোটা এবং ওয়ান কম্বল।”

বিশুদা বললেন, “অন্য লোক কেন ? আমার নিজেরই কেস দেখ না। পার্টিশনের সময় যশোর থেকে চলে এসেছিলাম। ক্যাপিটাল বলতে পৈতৃক এই গতরটি। বিদ্যেরও জাহাজ—টি টি এম পি অর্থাৎ কিনা টেনে-টুনে-ম্যাট্রিক-পর্যন্ত। কলকাতায় হাইকোর্ট বিল্ডিং ছাড়া কিছুই চিনি না। ওই বাড়িটা নেহাত প্রত্যেক বাঙালকেই তখন চিনতে হতো, ঘটিরা প্রথম চান্সেই বাঙালকে হাইকোর্ট দেখিয়ে দিত। এই শহরে কে তখন আমাকে চাকরি দেবে ? তাই জয়-মা-কালী কলকাত্তাওয়ালী বলে ব্যবসায় লেগে গেলুম। তারপর কোয়ার্টার-অফ-এ সেঞ্চুরি তো ম্যানেজ হয়ে গেল।”

বিশুদা এরপর সোমনাথকে কানোরিয়া কোর্টে তাঁর অফিসে নিয়ে গেলেন। বললেন, “এ আর এক অজানা জগৎ, বুঝলে ব্রাদার। সত্তর-আশিখানা ঘর আছে এই বাড়িতে। আবার প্রত্যেক ঘরে যে কতগুলো করে কোম্পানি আছে তা ভগবানই জানেন। পনেরো বছর আগে তখন আমার রমরমা অবস্থা চলছিল, সেই সময় ছ'তলার বাহাত্তর নম্বর ঘরখানা বাড়িওয়ালার দারোয়ানকে আড়াই হাজার টাকা সেলামী দিয়ে ম্যানেজ করেছিলুম। এখনও চালাচ্ছি সেই অফিস থেকে।”

এই বাড়িতে একটা প্রাগৈতিহাসিক লিফট আছে। লিফটের সামনে বিরাট লাইন। বিশুদা বললেন, “সর্বদাই ভিড় লেগে রয়েছে। আগে দিন-কাল ভাল ছিল। মাসে পাঁচ টাকা বকশিস পেলে লিফটম্যান সুন্দরলাল প্রেফারেন্স দিয়ে নিয়ে যেত। বলতো মালিকের আদমী। এখন সে-উপায় নেই। বাবু থেকে আরম্ভ করে বেয়ারা পর্যন্ত সবাই আপত্তি তোলে। সুতরাং লাইনে দাঁড়াতে হয়। অনেক সময় লেগে যায়।”

সোমনাথ অবাক হয়ে শুনছিল বিশুদার কথা। বিশুবাবু বললেন, “জানো ব্রাদার, বিজনেসম্যান হলেই সোজাপথে কিছু করতে ইচ্ছে হয় না। তাড়াতাড়ি ম্যানেজ করবার জন্যে ছটফটানি লেগে থাকে ! হয় লাইন ভেঙে এগিয়ে যাবো, দু-চার পয়সা দিয়ে ম্যানেজ করবো—আর তা যদি সম্ভব না হয় সিঁড়ি বেয়েই উঠবো।”

এরপর সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে যাওয়ার প্রস্তাব করলেন বিশুদা। সোম-

নাথের আপত্তি নেই। হাঁপাতে হাঁপাতে ছ'তলায় উঠে বিশুবাবু বললেন, "বুঝতে পারছি বয়স হচ্ছে—এখন ছ'তলায় উঠতেই কষ্ট হয়। তোমাদের আর কি ইয়ংম্যান—কেমন তরতর করে উঠে এলে।"

ছ'তলাটাও একটা ছোটখাটো পাড়ার মতো। অসংখ্য সরু গলি এদিক-ওদিক চলে গিয়েছে। সোমনাথ বললে, "এর মধ্যে লোকে নিজেদের অফিস খুঁজে পায় কী করে?"

বিশুবাবু হেসে উত্তর দিলেন, "প্রথম প্রথম আমারও তাই মনে হতো। নিজেই অফিসই খুঁজে পেতাম না! তারপর অভ্যাস হয়ে গেল।"

বাহাত্তর নম্বর ঘরের সামনে এসে বিশুবাবু বললেন, "এই আমার অফিস।"

বিশুবাবু আরও যা বললেন তার থেকে জানা গেল অফিসটা একসময় পুরোপুরি বিশুবাবুর ছিল। এখন তিনি অনেককে সাবলেট করেছেন। এই ঘরখানার মধ্যেই গোটা কুড়ি কোম্পানি চালু রয়েছে। এরা কিছু কিছু ভাড়া দেয় বিশুদাকে। তার থেকে বাড়িওয়ালার পাওনা চুকিয়েও বিশুবাবুর সামান্য লাভ থেকে যায়।

বিশুবাবু বলছেন, এতগুলো অফিস। কিন্তু ঘরে লোকজন তেমন দেখা গেল না। গোটা দশেক টেবিল অবশ্য রয়েছে। বিশুবাবু হাসলেন। বললেন, "প্রত্যেক টেবিলে ত'খানা করে কোম্পানি। এক কোম্পানি এধারে এবং আরেক কোম্পানি ওধারে। অফিসে বসে থাকলে তো আর পেট চলবে না। মালিকরা সবাই বাজারে মাছ ধরতে বেরিয়েছেন।"

বিশুবাবুর ওখানেই আর একটি লোকের সঙ্গে আলাপ হলো। বিশুবাবু বললেন, "ইনিই আমাদের কমাণ্ডার-ইন-চীফ ফকিরচন্দ্র সেনাপতি। নামে সেনাপতি কাজেও সেনাপতি। আমার সঙ্গে লাস্ট বাইশ বছর আছে। বাবা সেনাপতি, সোমনাথবাবু নতুন এলেন, একটু চা খাওয়াবি নাকি?"

সেনাপতি এতক্ষণ পিটপিট করে সোমনাথের দিকে তাকাচ্ছিল। সে ময়লা একটা ধুতি পরেছে, তার ওপর ঘরে-কাচা পরিষ্কার কিন্তু ইস্তিরিবিহীন খাকি কোট। সেনাপতির ঠোঁট লাল, দাঁতে পানের ছোপ। ফকিরচন্দ্র কেটলি হাতে নিয়ে বিশুবাবুর দিকে ইঙ্গিত করে কী যেন জানতে চাইলো।

বিশুবাবু হাসতে হাসতে বললেন, "ও-হরি ভুলেই গিয়েছিলুম। তিন নম্বর চা নিয়ে আয়।"

সেনাপতি চলে যেতেই বিশুবাবু বললেন, "এই নম্বরের ব্যাপারটা বুঝলে না নিশ্চয়। তিন নম্বর হলো ভাল চা উইথ ওমলেট অ্যাণ্ড টোস্ট। দু নম্বর হলো

ভাল চা উইথ বিস্কুট। এবং এক নম্বর হলো স্রেফ অর্ডিনারি চা। যে কোনো ভদ্র জায়গা হলে অর্ডিনারি চায়ের নম্বর হতো তিন। কিন্তু এটা বিজনেসের জায়গা। কাস্টমার বা গেস্ট কিছুই বুঝতে পারবে না—ভাববে মিস্টার বোস এক নম্বর কায়দাতেই আপ্যায়ন করছেন।"

ফকির সেনাপতি চা ও খাবার নিয়ে আসতেই বিশুবাবু বললেন, "এই শ্রীমানকেই দেখো। আগে যেখানে কাজ করতো সেখানে সবাই ফকির বলে ডাকতো। ব্যাপারটা আমার ভাল লাগলো না। বিজনেসে আমরা কেউ ফকির হতে আসিনি। এখানে সব সময় ঐ অপয়া ডাক মোটেই ভাল লাগলো না। তখন থেকে শ্রীমানকে সেনাপতি করে দিলুম।"

লাজুক লাজুক মুখভঙ্গিতে ফকিরচন্দ্র ফিক করে হাসলো। বিশুবাবু বললেন, "শ্রীমানের গুণের শেষ নেই। সব ক্রমশ জানতে পারবে। মিঃ সেনাপতি এই ঘরে রাত্রে থাকেন এবং এই অফিসের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা!"

ফকির সেনাপতি আবার ফিক করে হাসলো।

বিশুবাবু এবার সোমনাথকে বললেন, "তোমার যদি ইচ্ছে হয় বিজনেসে লেগে যাও। আমার ঘরটা তো রয়েছে। ছ'নম্বর টেবিলের এগারো নম্বর সীট খালি পড়ে আছে। নোপানি নামে এক ছোকরা ভাড়া নিয়েছিল। মাস তিনেক তার কোনো পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না। খবর নেবার জন্যে নোপানির বাড়িতে সেনাপতিকে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু সেখান থেকেও শ্রীমান কেটে পড়েছেন। সুতরাং তুমি ইচ্ছে করলে শূন্য চেয়ারে বসে পড়তে পারো।"

বিশুবাবু বললেন, "আমার খুব ইচ্ছে বাঙালীরা বিজনেস লাইনে আসুক। কিন্তু আসে কই? তুমি যদি সাহস দেখাতে পারো খুব খুশী হবো। তিনটে মাস লাক ট্রাই করে দেখ না? ওই তিন মাস আমি ভাড়া চার্জ করবো না। কিন্তু তারপর আশি টাকা করে নেবো। আশি টাকা ড্যাম চিপ বলতে পারো। এর মধ্যে বাড়ি ভাড়া, ফার্নিচার ভাড়া, সেনাপতির সার্ভিস এবং আলো পাখার খরচ সব থাকবে। বাইরে থেকে কল এলে টেলিফোনও ফ্রি। শুধু এখান থেকে ফোন করলে কল পিছু চল্লিশ পয়সা চার্জ। সঙ্গে সঙ্গে পয়সা দিতে হবে না, সেনাপতি খাতায় লিখে নেবে। টেলিফোনে চাবি মারা থাকে—সেনাপতিকে বললেই খুলে দেবে।"

সোমনাথ একটু ভরসা পাচ্ছে। চাকরি পাবার ইচ্ছেটা যদিও পুরোপুরি মন থেকে মুছে যাচ্ছে না, তবু সে ভাবছে ব্যবসা জিনিসটা মন্দ কী?

বিশুবাবু বললেন, "বসে থেকো না, ব্রাদার। বসে থাকলেই মরচে পড়ে।

বিবেকানন্দ স্বামী বলতেন, মরচে পড়ে পড়ে খতম হওয়াব থেকে ঘষে ঘষে শেষ হয়ে যাওয়া শতগুণ ভাল।"

ঘড়ির দিকে তাকালেন বিশুবাবু। বললেন, "আজ আমার বাজারে একটু কাজ আছে। তুমি যদি কালকে এখানে মুখ দেখাও তাহলে বুঝবো বিজনেসে ইচ্ছে আছে। না হলে, যেমন মাঠে দেখা হচ্ছে তেমন হবে।"

কানোরিয়া কোর্ট থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ডালহৌসি স্কোয়ারে এসেছে সোমনাথ। পথের দু'ধাবে অনেক লোককে দেখে সে একটু ভরসা পাচ্ছে। এরা সবাই তো চাকরি করে না, কিন্তু মোটামুটি খেয়ে-পরে বেঁচে আছে। তাহলে সোমনাথেব একবাব চেষ্টা করে দেখতে আপত্তি কি?

পাঁচ নম্বর বাসে বসেও সোমনাথ ভেবেছে। ওব মনে পডে গেল, কিছুদিন আগে কমলা বউদিকে নিয়ে ট্রেনে চড়ে শ্রীবামপুব গিযেছিল। ফেরবার পথে ইলেকট্রিক ট্রেনে এক ছোকরা চিৎকার করে ভারি মজার কথা বলেছিল: "আমার নাম নিশীথ রায়। বয়স তেইশ। পড়াশোনা স্কুল ফাইনাল। আমি নিজেব চাকবিব অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটারে নিজে সই কবেছি অ্যাজ ম্যানেজিং ডিবেকটর। আমার কর্মচারী হিসেবে আমাব মাইনে আমি ঠিক করি। গত মাসে দিয়েছি ছিয়াশি টাকা। নিশীথ রায় যদি খাটতে পারে তাহলে তাকে ঠকাবো না। দেড়শ', দু'শ', আড়াইশ' পর্যন্ত মাইনে করে দেবো।" এরপর ছোকরা পকেট থেকে কিছু ফাউনটেনপেন বার করেছিল বিক্রির জন্যে।

বাড়ি ফিরে এসে চুপচাপ ঘরে ঢুকে পড়লো সোমনাথ। কমলা বউদি চা নিয়ে এলেন। বললেন, "বাবা চিন্তা করছিলেন। নিশ্চয় এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে বিরাট লাইন পড়েছিল।"

"না, ওখানে ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে কাজ শেষ," সোমনাথ বললো।

কমলা বউদি খবরের কাগজ থেকে দু'খানা কাটিং দিলেন, "বাবা আজ কেটে রেখেছেন।"

কাটিং দুটো সোমনাথ হাতে নিলো, কিন্তু তাকিয়েও দেখলো না।

বউদি জিজ্ঞেস করলেন, "রোদে ঘুরেছো নাকি? মুখ শুকিয়ে গেছে।" দেওরের জন্যে বউদির যে খুব মায়া হচ্ছে তা যে-কেউ বলে দিতে পারে।

সোমনাথ বউদির মুখের দিকে তাকালো। কিন্তু কোনো উত্তর দিলো না।

বউদি বললেন, "দুপুরে সুকুমার এসেছিল। তোমার জন্যে দু'খানা জেনারেল নলেজের কোশ্চেন রেখে গেছে। বলেছে যেখান থেকে পারো

উত্তর যোগাড় করে রাখবে।"

সুকুমারের ইংরিজী চিঠিটা পড়লো সোমনাথ। সুকুমার অত্যন্ত জরুরী-ভাবে জানতে চেয়েছে, সমুদ্রের জল কেন নোনা? এবং ফরাসী বিপ্লবের সময় কোন নেতা স্নানের টবে খুন হয়েছিলেন।

বউদি বললেন, "বেচারা। ওর কী হয়েছে বলো তো? আমাকেও একটা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করলো। বললে, আমাকে উত্তর যোগাড় করে দিতেই হবে।"

বেশ উদ্বিগ্নভাবে সোমনাথ জিজ্ঞেস করলো, "কী প্রশ্ন?"

কমলা বউদি বললেন, "সুকুমার জিজ্ঞেস করলো, দশরথের চার পুত্র রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্নের নাম সবাই জানে, কিন্তু তাঁর মেয়ের নাম কী?"

"আপনাকে এভাবে জ্বালাতন করার মানে?" সোমনাথ একটু চিন্তিত হয়ে উঠলো।

কমলা বউদি বললেন, 'উত্তরটা আমার জানা ছিল, মায়ের কাছে শুনে-ছিলাম, রামচন্দ্রের বোনের নাম শান্তা। সেই শুনে খুব খুশী হলো সুকুমার। বললে, আপনাকে আর চিন্তা করতে হবে না। আমি কালই অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পাঠিয়ে দেবো।"

বদ্ধ পাগল হয়ে উঠেছে সুকুমারটা। কিন্তু কী করতে পারে সোমনাথ? আপনি পায় না খেতে আবার শঙ্করাকে ডাকে!

সোমনাথ বললো, "আপনাকে তাহলে খুব জ্বালিয়ে গেছে।"

বউদি চুপ করে রইলেন। কারুর সমালোচনা করা তাঁর স্বভাব নয়।

সোমনাথ বললো, "আমি কিন্তু পাগল হচ্ছি না, বউদি।"

"বালাই-ষাট। তুমি কোন দুঃখে পাগল হতে যাবে? মা নিজে বলে গেছেন, তোমার ভাগ্য খুব ভাল।"

"কবে কে একজন কী বলে গেছে, তা আপনি বিশ্বাস করেন বউদি?" সোমনাথ জিজ্ঞেস করলো।

"কেন করবো না? মায়ের কোনো কথা তো মিথ্যে হয়নি," বউদি বললেন।

বউদির দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো সোমনাথ। তারপর গভীর কৃতজ্ঞতায় বললো, "আমি যদি শরৎ চাটুজ্যে হতাম তাহলে আপনাকে নিয়ে মস্ত একখানা নবেল লিখতাম।"

"থাক! আগে তবু বউদির জন্যে দু-একটা কবিতা লিখতে—এখন তাও বন্ধ করে দিয়েছো!" বউদি দেওরকে বকুনি লাগালেন। বাবা ডাকছেন।'

কমলা বউদি এবার ওপরে গেলেন।

এ-বাড়িতে কমলা বউদিই একমাত্র সোমনাথকে অ্যাডমায়ার করতেন। মা তখনো বেঁচে। অঙ্কের খাতায় সোমনাথ একটা কবিতা লিখেছিল। তার জন্যে মায়ের কি বকুনি। "অঙ্কের খাতায় কবিতা লিখে তুমি রবিঠাকুর হবে?"

বউদি কিন্তু ছোট দেওরকে তুচ্ছ করেননি। গোপনে দাদাকে দিয়ে অক্সফোর্ডের দোকান থেকে নরম চামচায় মোড়া কালো রঙের একটা সুন্দর খাতা কিনে আনিয়েছিলেন। তার প্রথম পাতায় নিজের হাতে লিখেছিলেন 'একজন তরুণ কবিকে—তার বউদি'। খাতাটা হাতে দিয়ে সোমনাথকে বউদি অবাক করে দিয়েছিলেন। বউদি বলেছিলেন, "কবিতা আমার খুব ভাল লাগে, ঠাকুরপো। যত তাড়াতাড়ি পারো ভরিয়ে ফেলবে, তারপর আবার খাতা দেবো।"

সোমনাথের দুঃখ, কমলা কমলা বউদি অপাত্রে আস্থা স্থাপন করেছিলেন এবং আজও অপাত্রে নিজের ভালবাসা অপচয় করে চলেছেন।

ছোটবেলার সেই খাতাটা সোমনাথ দ্রুত বোঝাই করে ফেলেছিল। অনেকগুলো কবিতা লিখেছিল সোমনাথ। দুপুর বেলায় সবাই যখন শুয়ে পড়তো তখন বউদির সাথে সোমনাথের কাব্য-আলোচনা চলতো। সোমনাথ বলতো, "ইস্কুলে দু-একটা কবিতা শুনিয়েছি বউদি। কিন্তু মাস্টারমশাই বললেন, কিসসু হয় নি।" বউদি দমতেন না—"বলুক গে যাক। তোমার কবিতা আমার খুব ভাল লাগে। লিখতে লিখতে তোমার কবিতা নিশ্চয় আরও ভাল হবে। তখন দেশের সবাই তোমার নাম করবে।"

খাতাটা যত্ন করে রাখতে বলেছিলেন বউদি। বউদি কোথায় শুনেছিলেন, কবিদের প্রথম কবিতার খাতা পরে অনেক দামে বিক্রি হয়।

সোমনাথ কিছু বলেনি। কিন্তু খাতার এক কোণে তার অলিখিত প্রথম কাব্যগ্রন্থের উৎসর্গটা লিখে রেখেছিল। যদি কখনও বই ছাপা হয়, তাহলে প্রথমেই লেখা থাকবে—যিনি আমাকে কবি বলে প্রথমস্বীকারকরেছেন তাঁকে।

বউদি বলেছিলেন, "এর মানেটা সন্দেহজনক। কারণ মোক্ষদাও হতে পারে। তুমি যখনই মোক্ষদাকে কবিতা শুনিয়েছো সে শুনেছে। ঐতিহাসিকরা প্রমাণ করে দেবে তখন এ-বাড়িতে আমার বিয়ে হয়নি।"

সোমনাথ হেসেছিল। বলেছিল, "ঐতিহাসিকদের কে পাত্তা দিচ্ছে? নিজের জীবনস্মৃতিতে সমস্ত গোপন কথা ফাঁস করে দেবো। লিখে দেবো, মোক্ষদার স্বীকৃতির পিছনে রীতিমতো লোভ ছিল। দু-আনা পয়সার পান-

দোক্তা প্রাপ্তির প্রতিশ্রুতি না পেলে সে কিছুতেই কবিতা শুনতে বসতো না। অথচ বউদির স্বীকৃতিতে কোনো স্বার্থ ছিল না। রবীন্দ্রনাথের কাব্যলক্ষ্মী এবং সোমনাথের কাব্যকমলা।"

বউদি তখনও ছোট্ট মেয়ের মতো সরল ছিলেন। জিনিসটাকে রসিকতা ভেবে পুরোপুরি উড়িয়ে দিতে পারেননি। আন্তরিক বিশ্বাস ছিল দেওরটির ওপর। বলেছিলেন, "তুমি বিখ্যাত কবি হলে গ্র্যাণ্ড হয়। কবি সোমনাথের সঙ্গে আমারও নাম হয়ে যাবে।"

স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার সময়েও কবিতা লিখেছে সোমনাথ। কবিতার নেশা না-থাকলে সে হয়তো পরীক্ষায় ভাল করতে পারতো। কারণ ইনটেলিজেন্সের কোনো অভাব ছিল না সোমনাথের। কলেজে ঢুকেও অজস্র কবিতা লিখেছে সোমনাথ। বেশ কয়েকটা খাতা কখন যে কবিতায় বোঝাই হয়ে উঠেছে তা সোমনাথ নিজেই বুঝতে পারেনি।

কিন্তু কলেজে থেকে বেরিয়ে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের খাতায় নাম লেখানো মাত্রই কবিতার ধারা অকস্মাৎ শুকিয়ে গেল। সোমনাথ আর খাতা কলম নিয়ে বসে না। বউদি কতবার অভিযোগ করেছেন, কিন্তু সোমনাথ লিখতে পারে না। বেকার সোমনাথের জীবন থেকে কাব্যলক্ষ্মী বিদায় নিয়েছেন। যে বেকার এ-সংসারে তার কিছুই মানায় না।

কেন এমন হলো, সোমনাথ ভেবেছে। যেসব মানুষের আত্মপ্রত্যয় থাকে সোমনাথ তাদের দলে নয়। যতটুকু আত্মবিশ্বাস ছিল, হাজার খানেক চাকরির চিঠি লিখে তা উধাও হয়েছে। যে-মানুষের আত্মবিশ্বাস নেই সে কেমন করে কবি হবে?

সোমনাথের এই মানসিক অবস্থার কথা একমাত্র সুকুমার জানতো। সুকুমার বলেছিল, "দাঁড়া না। চাকরি যোগাড় করি আমরা—তখন ম্যাজিকের মতো আত্মবিশ্বাস ফিরে আসবে। তখন তুই কিন্তু কুঁড়েমি করিস না—আমাকে নিয়েও একটা কবিতা লিখিস। বাবা, মা, ভাই, বোন সবাইকে শুনিয়ে দেবো—চড়চড় করে প্রেস্টিজ বেড়ে যাবে!"

বাবার সঙ্গে কথা বলে বউদি আবার ফিরে এলেন। সোমনাথ বললো, "বউদি আপনার সঙ্গে খুব গোপন কথা আছে।"

বউদি হেসে ফেললেন, "গোপন কথা শুনতে আমার ভয় হয়। যা পেট-আলগা মানুষ, শেষে যদি কাউকে বলে ফেলি?"

সোমনাথ বললো, "আপনাকে ছাড়া আর কাউকে বলবো না, বউদি।

আপনিও চুপচাপ থাকবেন।" তারপর বিজনেসের ব্যাপারটা সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়ে সোমনাথ বললো, "ট্রেনের সেই ছোকরার মতো নিজের অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার নিজেই সই করে দেখি।"

বউদি বেশ উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। জিজ্ঞেস করলেন, "বাবাকে বলতে আপত্তি কী?"

সোমনাথ রাজী হলো না। "কী হয় তার ঠিক নেই। আবার হয়তো লোক হাসাবো। আগে নেমে দেখি, ভাল করলে তখন বাবাকে জানাবো।"

বউদি রাজী হয়ে গেলেন। হেসে বললেন, "তোমার দাদার কাছে মিথ্যে কথা বলা মুশকিল। কিন্তু সে-সমস্যা সমাধান হয়ে গেছে। উনি আরও মাস-খানেক বম্বেতে থেকে যাচ্ছেন। কে একজন ছুটিতে যাবেন, তাঁর কাছে ট্রেনিং নিচ্ছেন।"

বউদি বললেন, "বাবার কথাও শুনো কিন্তু। যেখানে অ্যাপ্লিকেশন পাঠাতে বলেন, পাঠিয়ে দিও। আর বাকি সময়টা নতুন লাইনে যথাসাধ্য চেষ্টা কোরো।"

"জানেন বউদি, ব্যবসা অনেকটা লটারির মতো। অনেকে তাড়াতাড়ি বড়লোক হয়ে যায়।"

প্রবল উৎসাহে বউদি বললেন, "তুমি হঠাৎ বিজনেসে দাঁড়িয়ে গেলে বেশ মজা হবে! বাবা তো বিশ্বাসই করতে চাইবেন না। আমাকেই তখন বকুনি খেতে হবে। বলবেন, বউমা সব জেনে-শুনে আমাদের কাছে চেপে গেলে কেন?"

ভবিষ্যতের রঙীন কল্পনায় দুজনে একসঙ্গে খুব হাসলো। বউদি জানতে চাইলেন, "বিজনেস করতে গেলে টাকার দরকার হয় না, খোকন?"

এ-ব্যাপারটা এখনও পর্যন্ত খেয়ালই হয়নি সোমনাথের। মাথা চুলকে বললো, "আগে হতো। এখন সম্ভবত দরকার হয় না। শিক্ষিত বেকারদের ধার দেবার জন্যে ব্যাঙ্কগুলো উঁচিয়ে বসে আছে।"

কমলা বউদির বিশ্বাস এত বেশী যে ওসবের মধ্যে তেমন ঢুকলেন না। শুধু বললেন, "মায়ের টাকাটা তো তোমার এবং আমার জয়েন্ট নামে ব্যাঙ্কে পড়ে আছে। পাস বইটা দেখবে? তা তিন হাজার টাকা তো হবেই!"

এই টাকাটার কথা সোমনাথের খেয়ালই ছিল না।

বউদি চলে যাবার একটু পরেই বুলবুল ঘরে ঢুকলো।

যত বয়স বাড়ছে, মেজদার বউ তত খুকী হচ্ছে। বাড়িতেও আজকাল ডলপুতুলের মতো সেজেগুজে বসে থাকতে ভালবাসে। এই দীপান্বিতা ঘোষাল আবার কলেজে ইউনিয়ন ইলেকশনের অন্যতম নায়িকা ছিল! ভোটের জন্যে দীপান্বিতা তখন সোমনাথকেও ধরেছিল। 'দেশকে যদি ভালবাসেন, যদি শোষণ থেকে মুক্তি চান তাহলে আমাদের দলকে ভোট দেবেন,' এইসব কী কী যেন তখনকার দীপান্বিতা ঘোষাল তড়বড় করে বলেছিল। বিয়ে করে ঐসব বুলি কোথায় ভেসে গিয়েছে। এখন বব, ববের চাকরি এবং নিজের শাড়ী ব্লাউজ ছাড়া কিছুই বোঝে না ভূতপূর্ব ইউনিয়ননেত্রী বুলবুল ঘোষাল।

বুলবুল নিজে পড়াশোনায় ভাল ছিল না। সোমনাথ ও সুকুমার দুজনের থেকেই খারাপ রেজাল্ট করেছিল। কিন্তু বুলবুলের রূপটা ছিল—মেয়েদের ওইটাই আসল। মোটামুটি ভালভাবে বি-এ পাস করেও সোমনাথ ও সুকুমার জীবনের পরীক্ষায় পাস করতে পারলো না। আর বি-এতে কমপার্টমেন্টাল পেয়েও বুলবুল কেমন জিতে গেল। কেউ তাকে প্রশ্ন করে না, কেন পরীক্ষায় ভাল করনি? মেয়েদের মলাটই ললাট!

বুলবুলের হাতে একটা ইনল্যাণ্ড চিঠি। সোমের চিঠি, কোনো মহিলার হস্তাক্ষর। বুলবুল বললে, "এই নাও! লেটার বক্সে পড়েছিল। আমি তো ভুলে খুলেই ফেলছিলাম!" এই বলে বুলবুল আবার ফিক করে হাসলো।

এই হাসির মাধ্যমে বুলবুল যে একটা মেয়েলী প্রশ্ন করছে, তা সোমনাথ বুঝতে পারে। কিন্তু মেজদার বউকে সে বেশী পাত্তা দিলো না।

খামের ওপর হাতের লেখাটা সোমনাথ আবার দেখলো। তারপর চিঠিটা না-খুলেই বালিশের তলায় রেখে দিলো।

"আমার সামনে তো এসব চিঠি পড়বে না, আমি যাচ্ছি," একটু অভিমানের স্বরে বললো বুলবুল।

বুলবুল চলে যাবার পরেও সোমনাথ একটু অস্বস্তি বোধ করলো। চিঠিটা কারুর হাতে না-পড়লেই খুশী হতো সোমনাথ। খামটার দিকে সে আর একবার তাকালো। এই চিঠি লেখবার মতো মেয়ে পৃথিবীতে একটি আছে। তার হাতের লেখার সঙ্গে সে যথেষ্ট পরিচিত। কিন্তু যার চাকরি নেই, ভবিষ্যৎ নেই, যে বাবার এবং দাদার গলগ্রহ সে তো এমন চিঠি পাবার যোগ্য নয়। এ ধরনের

চিঠি সোমনাথকে মানায় না।

চিঠিটা খুলতে সাহস হচ্ছে না সোমনাথের। এক কাজল চোখের খেয়ালী মেয়ের নিষ্পাপ মুখচ্ছবি তার চোখের সামনে ভেসে উঠছে। শান্ত, স্নিগ্ধ, গভীর চোখের এই মেয়েব নাম কে যে রেখেছিল তপতী? ওকে দেখেই ঘরে বাইরে উপন্যাসের বিমলার মায়ের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল সোমনাথের। আমাদেব দেশে তাকেই বলে সুন্দব যাব বর্ণ গৌব। কিন্তু যে আকাশ আলো দেয় সে নীল।”

আঙুল দিয়ে খামটা এবাব খুলে ফেললো সোমনাথ। তপতী লিখেছে: “একেবারেই ভুলে গেলে নাকি? এমন তো কথা ছিল না। গতকাল ইউ-জি-সি স্কলারশিপের খববটা এসেছে। এর অর্থ—সবকাবী প্রশ্রয়ে ডি-ফিল করার স্বাধীনতা। ভাবলাম, খবরটা তোমারই প্রথম পাওয়া উচিত। কেমন আছো? ইতি তপতী।”

ইতি এবং তপতীর মধ্যে একটা কথা লেখা ছিল। কিন্তু লেখার পরে কোনো কাবণে যত্ন করে কাটা হয়েছে। কথাটা কী হতে পারে? সোমনাথ আন্দাজ করবার চেষ্টা কবলো। চিঠিটা আলোব সামনে ধবে কাটা কথাটা পাঠোদ্ধারেব চেষ্টা কবলো সোমনাথ। মনে হচ্ছে লেখা ছিল ‘তোমাবই’। যদি সোমনাথেব আন্দাজ ঠিক হয়ে থাকে, তাহলে কথাটা তপতী কেন কাটতে গেল? ‘তোমাবই তপতী’ লিখতে তপতী কী আজকাল দ্বিধা কবছে? নিজের চিঠি থেকে যে-কোনো অক্ষর কেটে দেবাব অধিকাব অবশ্যই তপতীর আছে। কিন্তু তাহলে চিঠি লেখাব কী প্রয়োজন ছিল? তার ইউ-জি-সি স্কলারশিপের খবব প্রথম সোমনাথকেই দেওয়ার কথা ওঠে কেন?

এদিকে বাবা নিশ্চয় সোমনাথের জন্য অপেক্ষা করছেন। ভাবছেন এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের সমস্ত ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা সোমনাথের কাছ থেকে শোনা যাবে। কত লোক লাইনে দাঁড়িয়ে ছিল? কতক্ষণ সময় লাগলো? অফিসার ডেকে কোনো কথা বললেন কি না? অথবা কেরানিরাই কার্ড নতুন করে দিলো।

ও-বিষয়ে ছেলের কিন্তু বিরক্তি ধবেছে। এক্সচেঞ্জ অফিসেব সামনে সাড়ে-পাঁচ ঘণ্টা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার অপমানকর অভিজ্ঞতা সে ভুলতে চায়। সমবয়সিনী এক বালিকার মিষ্টি চিঠি বুকে নিয়ে সে শুয়ে থাকতে চাইছে। তপতীর সঙ্গে অনেকদিন যোগাযোগ কবেনি সোমনাথ। ওর সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছে হয়েছে অনেকবার। ভবানীপুরের রাখাল মুখার্জি রোড তো

বেশী দূর নয়। কিন্তু দ্বিধা ও সংকোচ কাটিয়ে উঠতে পারেনি সোমনাথ।

যাকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল, তার চিঠিই আজকে তাকে কাছে নিয়ে আসছে। চিঠিটা আরেকবার পড়তে বেশ ভাল লাগলো। অথচ ছোট্ট চিঠি। যা ভাল লাগছে তা এই চিঠির না-লেখা অংশগুলো—যেসব শূন্যস্থান একমাত্র সোমনাথের পক্ষেই পূরণ করা সম্ভব। যেমন তপতীর চিঠিতে কোনো সম্বোধন নেই। এখানে অনেক কিছুই বসিয়ে নেওয়া যায়; সবিনয় নিবেদন—খোকন—সোমনাথ—সোমনাথবাবু—প্রীতিভাজনেষু—প্রিয়বরেষু…। আরও একটা শব্দ তপতীর মুখে শুনতে ইচ্ছে করে, হাতের লেখায় দেখতে প্রবল লোভ হয়। শব্দটার প্রতিচ্ছবি তপতীর শ্যামলী মুখে সোমনাথ অনেকবার দেখেছে। কিন্তু বড় গম্ভীর এবং কিছুটা চাপা স্বভাবের মেয়ে। কেউ কেউ আছে যা অনুভব করে তার ডবল প্রকাশ করে ফেলে। তপতী যা অনুভব করে তার থেকে অনেক কম জানতে দেয়। তবু কাল্পনিক সেই কথাটা সোমনাথ চিঠির ওপরেই আন্দাজ করে নিলো। তপতীর অনভ্যস্ত বাংলা হাতের লেখায় প্রিয়তমেষু কথাটা কী রকম আকার নেবে তা কল্পনা করতে সোমনাথের কোনোরকম অসুবিধা হচ্ছে না।

তারপর তপতী লিখেছে: একেবারেই ভুলে গেলে নাকি? তপতীর ছোট্ট নরম গোল-গোল হাত দুটো দেখতে পাচ্ছে সোমনাথ। লেখার সময় বাঁ হাত দিয়ে এই চিঠির কাগজটা তপতী নিশ্চয়ই চেপে ধরেছিল। এই হাতে সুন্দর একগাছি সোনার কাঁকন পরে তপতী—অনেকটা বউদির কাঁকনে যে-রকম ডিজাইন আছে।

তপতীর ডান হাতের কড়ে আঙুলের নখটা বেশ বড় আকারের। এই নখটা নিয়ে ছাত্রজীবনে সোমনাথ একবার রসিকতা করেছিল। "মেয়েরা শখ করে নখ রাখে কেন?" তপতী প্রথমে লজ্জা পেয়েছিল—ওর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতিটি খুঁটিনাটি কেউ অডিট করছে এই বোধটাই ওর অস্বস্তির কারণ। তপতীর সঙ্গে সেদিন বান্ধবী শ্রীময়ী রায় ছিল। ভারি সপ্রতিভ মেয়ে। শ্রীময়ী বলেছিল, "অনেক দুঃখে মেয়েরা আজকাল নখ রাখছে, সোমনাথবাবু। মেয়ে হয়ে ট্রাম-বাসে যদি কলেজে আসতেন তাহলে বুঝতেন। কিছু লোক যা ব্যবহার করে। সভ্য মানুষ না জঙ্গলের জানোয়ার বোঝা যায় না।"

শ্রীময়ীর কথার ভঙ্গীতে তপতী ভীষণ লজ্জা পেয়েছিল। বন্ধুকে থামাবার চেষ্টা করেছিল। "এই চুপ কর। ওদের ওসব বলে লাভ নেই, ওরা কী করবে?"

জন-অরণ্য কথাটা সোমনাথের মনে তখনই এসেছিল। কবিতা লেখার

উৎসাহে তখনও ভাঁটা পড়েনি। কলেজের লাইব্রেরিতে বসে সোমনাথ একটা কবিতা লিখে ফেলেছিল। বিশাল এই কলকাতা শহরকে এক শ্বাপদসঙ্কুল গহন অরণ্যের সঙ্গে তুলনা করেছিল সোমনাথ—যেখানে অরণ্যের আইনই ভদ্রতার কোট পরে চালু রয়েছে। কেউ এখানে নিরাপদ নয়। সুতরাং অরণ্যের আদিম পদ্ধতিতেই আত্মরক্ষা করতে হবে। প্রকৃতিও তাই চায়—না হলে সুদেহিনী সুন্দরীর কোমল অঙ্গেও কেন তীক্ষ্ন নখ গজায়? দন্ত কৌমুদীতেও কেন আদিম যুগের শাণিত ক্ষুরধারের সহ অবস্থান?

কবিতার প্রথম কয়েকটা লাইন এখনও সোমনাথের মনে পড়ছে: "এও এক আদিম অরণ্য শহর কলকাতা / অগণিত জীব পোশাকে-আশাকে মানুষের দাবিদার / প্রকৃতি তালিকায় জন্তু মাত্র—।" কবিতার নাম দিয়েছিল: জন-অরণ্য।

কোনো নকল না-রেখেই কবিতাটা খাতার পাতা থেকে ছিঁড়ে তপতীর হাতে দিয়েছিল সোমনাথ। সেই ছেঁড়া পাতাটা তপতী যত্ন করে রেখে দিয়েছিল।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের কার্ড হোল্ডার সোমনাথ হাসলো। কলেজের সেই সবুজ দিনগুলোতে তপতী প্রত্যাশা করেছিল সোমনাথ মস্ত কবি হবে। জন-অরণ্য সে মুখস্থ করে ফেলেছিল। কলেজ থেকে বেরিয়ে রাস্তায় বাসের জন্যে অপেক্ষা করতে করতে তপতী বলেছিল, "একটা কবিতা শুনুন। 'এও এক আদিম অরণ্য শহর কলকাতা…'" সমস্ত কবিতাটা সে আবৃত্তি করে ফেললো। তপতীর মুখে কী সুন্দর শোনাচ্ছিল কবিতাটা।

শ্রীময়ী রায় কাছেই দাঁড়িয়েছিল। তপতীর মুখে কবিতা শুনে সে অবাক হয়ে গেল। জিজ্ঞেস করলো, "তোর আবার কবিতায় আগ্রহ হলো কবে? আমি তো জানতাম হিসট্রি ছাড়া কোনো বিষয়ে তোর হুঁশ নেই।"

তপতী লজ্জা পেয়েছিল। শ্রীময়ী জিজ্ঞেস করেছিল, "কবিতাটা কার লেখা?" তপতী ও সোমনাথ দুজনেই উত্তরটা চেপে গেল। তপতী বলেছিল, "কবিতা ভাল লাগলে পড়ি। কবির নাম-টাম আমার মনে থাকে না।"

শ্রীময়ী অন্য বাসে রিজেণ্ট পার্কে চলে গিয়েছিল। দু'নম্বর বাসের জন্যে অপেক্ষা করতে করতে তপতী বলেছিল, "আপনার কবিতা ভাল হয়েছে—কিন্তু নেগেটিভ। বিরক্ত হয়ে আপনি আঘাত করেছেন, কিন্তু সমাজের মধ্যে আশার কিছু লক্ষ্য করেননি।"

কবি সোমনাথ মনে মনে ধন্য হলেও প্রতিবাদ জানিয়েছিল। লাবণ্যময়ী তপতীর ঝলমলে দেহটার ওপর চোখ বুলিয়ে মৃদু হেসে বলেছিল, "দাঁত, নখ

এগুলো তো আঘাতেরই হাতিয়ার।”

ওর স্বরের গাঢ়তা তপতী উপভোগ করেছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়েছিল, “মেয়েদের আপনি কিছুই বোঝেননি। নখ কি কেবল আঁচড়ে দেবার জন্যে? মেয়েরা নখে তাহলে রঙ লাগায় কেন?”

উত্তরটা খুব ভাল লেগেছিল সোমনাথের। তপতীর বুদ্ধির দীপ্তি অকস্মাৎ ওর মসৃণ কোমল দেহে ছড়িয়ে পড়েছিল। মুগ্ধ সোমনাথ বলেছিল, “এখন বুঝতে পারছি, লম্বা সরু এবং ধারালো ওই নখ নিয়ে কোনো কবির কলমও হতে পারে!”

এমন কিছু নিবিড় পরিচয় ছিল না দুজনের মধ্যে। ফস করে এই ধরনের কথা বলে ফেলে সোমনাথ একটু বিব্রত হলো। হঠাৎ দু নম্বর বাস আসছে দেখে তপতী দ্রুত এগিয়ে গিয়ে রাষ্ট্রীয় পরিবহণের ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেল— সে বিরক্ত হলো কিনা সোমনাথ বুঝতে পারলো না।

পরের দিন কলেজের প্রথম পিরিয়ডে তপতী সাইড বেঞ্চির প্রথম সারিতে বসেছিল। দূর থেকে ওর গম্ভীর মুখ দেখে সোমনাথের চিন্তা আরও একটু বেড়েছিল—ফলে অধ্যাপকের লেকচার কানেই ঢুকলো না সোমনাথের। প্রায় পনেরো মিনিট নজর রাখার পর দুজনের চোখাচোখি হলো। দৃষ্টিতে বিশেষ কোনো বিরক্তির চিহ্ন ধরা না-পড়ায় নিশ্চিন্ত হলো সোমনাথ। তপতীর সর্দি হয়েছে। মাঝে-মাঝে রুমাল বার করে নিজেকে সামলাচ্ছে।

দুপুরবেলায় দুজনে আবার দেখা হয়েছিল। ক্লাস থেকে আরেক ক্লাসে যাবার পথে তপতী দ্রুত ওর হাতে একটা ছোট্ট প্যাকেট গুঁজে দিয়ে উধাও হয়েছিল। বন্ধুদের সতর্কদৃষ্টি ফাঁকি দিয়ে কলেজের লাইব্রেরিতে গিয়ে প্যাকেট খুলেছিল সোমনাথ। একটা পাইলট পেন—সঙ্গে ছোট্ট চিরকুট। কোনো সম্বোধনই নেই—লেখিকার নামও নেই। শুধু লেখা: “নখকে কলম করা নিতান্তই কবির কল্পনা। কবিতা লিখতে হয় কলম দিয়ে।”

সবুজ রঙের সেই কলম আজও সোমনাথের হাতের কাছে রয়েছে। তপতীর সেই প্রত্যাশার সম্মান রাখতে পারেনি সোমনাথ। কবিতা না লিখে, বস্তা বস্তা আবেদন পত্র বোঝাই করে করে কলমকে ভোঁতা করে ফেলেছে সোমনাথ। অসুস্থ কলমটা মাঝে-মাঝে বমি করে—হঠাৎ বিনা কারণে ভক ভক করে কালি বেরিয়ে আসে। সোমনাথ ব্যানার্জির এই পরিণতি হবে জানলে, তপতী নিশ্চয় তাকে কলম উপহার দিত না। কলম দিয়ে তপতীর চিঠির ওপর হিজিবিজি দাগ কাটতে কাটতে নানা অর্থহীন চিন্তার জালে সোমনাথ জড়িয়ে পড়লো।

সকাল দশটা। হাতে একটা অ্যাটাচি কেস নিয়ে নতুন জীবন আরম্ভ করতে বেশ লাগছে সোমনাথের। অ্যাটাচি কেসটা কমলা বউদি জোর করে হাতে ধরিয়ে দিলন—বড়দার নাকি একাধিক আছে, কোনো কাজে লাগছে না।

এবারেও পকেটে ফুল গুঁজে দিলেন কমলা বউদি। আশীর্বাদ করে বললেন, "তুমি মানুষ হবে—আমার কোনো সন্দেহ নেই।"

সোমনাথ মনে মনে নিজেকে প্রশ্ন করলো, মানুষ হওয়া কাকে বলে? তারপর ওর মনে হলো, নিজের অন্ন নিজে জুটিয়ে নেবার ব্যবস্থা করা মানুষ হবার প্রাথমিক পদক্ষেপ।

সোমনাথ বুঝতে পারছে, বেশ দেরি হয়ে গিয়েছে। এখনও নিজের পায়ে না দাঁড়ালে আর মনুষ্যত্ব থাকবে না।

কানোরিয়া কোর্টের বাহাত্তর নম্বর ঘরে বিশুবাবু বসেছিলেন। সোমনাথকে দেখেই উৎফুল্ল বিশুবাবু বললেন, "এসো এসো।"

সোমনাথ তখনও বুঝতে পারছিল না, হৃদয়হীন উদাসী সময় তাকে কোন পথে নিয়ে চলেছে।

এসব চিন্তা তার মাথায় হয়তো আজ আসতো না, যদি না বাস স্ট্যাণ্ডের কাছে সুকুমারের সঙ্গে দেখা হয়ে যেত। সোমনাথের ফর্সা জামাকাপড় দেখে সুকুমার বললে, "বেশ বাবা! লুকিয়ে লুকিয়ে চাকরির ইণ্টারভিউ দিতে যাচ্ছিস।"

সুকুমারের রুক্ষ চাহনি ও খোঁচাখোঁচা দাড়ি দেখে কষ্ট হচ্ছিল সোমনাথের। সুকুমার বললো, "মিনিট দশেক দাঁড়া—জামাকাপড় পাল্টে আমিও তোর সঙ্গে ইণ্টারভিউ দিয়ে আসবো।"

সোমনাথকে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সুকুমার কাতরভাবে বললো, "আমি গ্যারাণ্টি দিয়ে বলতে পারি লাট সাহেব, চীফ মিনিস্টার, টাটা, বিড়লা কেউ আমার সঙ্গে জেনারেল নলেজে পেরে উঠবে না।"

সোমনাথ ওর হাত দুটো ধরে বললো, "বিশ্বাস কর, আমি ইণ্টারভিউ দিতে যাচ্ছি না।"

"তুইও আমাকে মিথ্যে কথা বলছিস?" হঠাৎ চীৎকার করে উঠলো সুকুমার। তারপর অকস্মাৎ কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো সে। বললো, "আমার যে একটা চাকরি না হলে চলছে না, ভাই।"

সোমনাথের গম্ভীর মুখ দেখে বিশুবাবু ভুল বুঝলেন। বললেন, "কী ব্যাপার? অফিসার না হয়ে বিজনেসম্যানদের খাতায় নাম লেখাতে হলো বলে মন খারাপ নাকি?"

সোমনাথ বললো, "চাকরি যখন আমাকে চাইছে না, তখন আমি চাকরিকে চাইতে যাবো কেন?"

বিশুবাবু বললেন, "পাকিস্তানে সব খুইয়ে যখন এসেছিলুম তখন আমার অবস্থা শোচনীয়। মুরগীহাটায় মুটেগিরি করেছিলুম ক'দিন। তারপর চটা সুদে দশ টাকা ধার করে এক ঝুড়ি কমলালেবু কিনতে গেলাম। আনাড়ী লোক, ফলের বাক্সর ওপর লাল-নীল সাঙ্কেতিক দাগ থেকে কী বুঝবো? আমার অবস্থা দেখে চিৎপুর পাইকিরী বাজারে এক বুড়ো মুসলমানের দয়া হলো। দেখে শুনে কমলালেবুর একটা বাক্স ভদ্রলোক কিনিয়ে দিলেন। প্রথম দিন বেশ ভাল মাল বেরুলো। পাঁচ ঘণ্টা রাস্তায় বসে দু টাকা নেট লাভ করে ফেললুম—মনের আনন্দে নিজের অজান্তে দুটো লেবুও খেয়ে ফেলেছি। চটা সুদ-কোম্পানির গোঁফওয়ালা ষণ্ডামার্কা যে-লোকটা সন্ধ্যেবেলায় পাওনা টাকা শোধ করতে আসতো, সে তো অবাক। ভেবেছিল আমি টাকা শোধ করতে পারবো না। দশ টাকা দশ আনা তাকে ফেলে দিলুম। রইলো এক টাকা ছ' আনা।"

নিজের গল্প বন্ধ করলেন বিশুবাবু। বললেন, "থাক ওসব কথা। এখন তোমার হাতে-খড়ির ব্যবস্থা করি। মল্লিকবাবুকে ডেকে পাঠাই।"

সেনাপতি ছুটলো মল্লিকবাবুকে ডাকতে। একটু পরেই চোখে একটা হ্যাণ্ডেল-ভাঙা চশমা লাগিয়ে হাজির হলেন বুড়ো মল্লিকবাবু। পরনে ফতুয়া, পায়ে বিদ্যাসাগরী চটি। ভদ্রলোক এ-পাড়ার ছাপাখানা সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করেন।

বিশুবাবু বললেন, "মল্লিকমশাই, সোমনাথের লেটার হেড এবং ভিজিটিং কার্ডের ব্যবস্থা করে দিন। আমার ঘরের নম্বর এবং টেলিফোন দিয়ে দেবেন।"

"নাম কী হবে?" মল্লিকবাবু ঝিমোতে ঝিমোতে জিজ্ঞেস করলেন।

"সত্যি তো, নাম একটা চাই", বিশুবাবু বললেন। "কিছু প্রিয় নাম-টাম আছে নাকি?" তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

প্রিয় নাম একটা আছে—কমলা। কিন্তু এই জীবনের জটের সঙ্গে তাঁকে শুধু শুধু জড়িয়ে ফেলে কী লাভ? তার থেকে বরং দায়িত্বটা পুরোপুরি নিজের ওপরেই থাক—কোম্পানির নাম দেওয়া যাক: সোমনাথ উদ্যোগ।"

নাম শুনেই বিশুবাবু বললেন, "ফার্স্ট ক্লাস। এই উদ্যোগ কথাটা মাড়ওয়াবীবা খুব ব্যবহাব করছে। আর তোমার নিজেব নামখানিও খাসা। কার সাধ্য ধরে বাঙালীর কারবার? প্রয়োজন হলে গুজবাতী কনসার্ন বলে চালিয়ে দেওয়া যাবে। সোমনাথ নামটা গুজরাতীদেব খুব প্রিয়—ওদের সেন্টিমেন্টেও লাগে। সোমনাথ মন্দিবটা কতবাব যে বিদেশীবা এসে ঝেড়েঝুড়ে সাবাড় কবে দিলো।"

মল্লিকবাবু চলে যেতেই বিশুবাবু বললেন, "এই যে পাড়া দেখছো, এখানে লাখ-লাখ কোটি-কোটি টাকা উড়ে বেড়াচ্ছে। যে-ধবতে জানে সে হাওয়া থেকেই টাকা কবছে। এসব গল্প কথা নয়—দু-দশটা লক্ষপতি এই কলকাতা শহবে এখনও প্রতিমাসে তৈবি হচ্ছে। আমি বাপু তোমাকে জলে ছেড়ে দিলুম, কিন্তু সাঁতাব নিজে থেকেই শিখতে হবে। ঝিনুকে কবে এ-লাইনে দুধ খাওযা শেখানো হয না।"

বিশুবাবু কথা বলতে বলতেই ঘবেব মধ্যে কম বয়সী এক ছোকবা ঢুকলো। বাস সতেবো-আঠাবোব বেশী নয। বিশুবাবু বললেন, "অশোক আগবওয়ালা। ওব বাবা শ্রীকিষণজী আমাব ফ্রেণ্ড। রাজস্থান ক্লাবের অন্ধ ভক্ত। তবে শীল্ডে বাজস্থান হেবে যাবার পব ইস্টবেঙ্গলকে সাপোর্ট কবে।"

অশোককে ডাকলেন বিশুবাবু। "অশোক কেমন আছো? পিতাজীর তবিয়ত কেমন?"

পিতাজী যে ভাল আছেন, অশোক বিনীতভাবে বিশুবাবুকে জানালো। বিশুবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "অশোক, তুমি কার সাপোর্টাব?"

অশোক নির্দ্বিধায় বললে, "রাজস্থান অ্যাণ্ড ইস্টবেঙ্গল।"

"রাজস্থান তো বুঝলাম। কিন্তু ইস্টবেঙ্গল কেন, আমার ফ্রেণ্ড মিস্টার সোমনাথকে একটু বুঝিয়ে বলো তো।"

অশোকের উত্তরে জানা গেল, ইস্টবেঙ্গল তার বাবার জন্মস্থান। নারায়ণগঞ্জে তাদের পাটের কারবার ছিল। তাই ওরা ভাল বাংলা জানে। শ্রীকিষণজী তো বাংলা নবেলও পড়েন।

ওদের দুজনের আলাপ হয়ে গেল। অশোক ছেলেটি বেশ ভাল। বিশুবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আজ কিছু জালে পড়লো?"

অশোক বললে, "বাজার খারাপ, কিছুই হচ্ছিলো না। শেষ পর্যন্ত চল্লিশখানা ফ্ল্যাট ফাইলের অর্ডার ধরেছি। মাত্র চার টাকা থাকবে।"

অশোকের হাতে একটা বড় কাগজের প্যাকেট। অশোক বললে, "ট্যাক্সি-

চড়তে গেলে কিছুই থাকবে না। তাই বাসের ভিড় কম থাকতে থাকতে ডেলিভারি দিয়ে আসবো ভাবছি।”

ফাইলের তাড়া নিয়ে অশোক বেরিয়ে গেল। বিশুবাবু বললেন, “ওর বাবা টাকার পাহাড়ে বসে আছেন। দু-তিনটে বড় বড় কোম্পানির মালিক। তিন-চারশ’ লোক ওঁর আণ্ডারে কাজ করে। আবার একটা কেমিক্যাল ফ্যাকটরি বানাচ্ছেন। অশোক মর্নিং ক্লাসে বি-কম পড়ে। বাবা কিন্তু ছেলেকে দুপুরবেলায় ধান্দায় লাগিয়ে দিয়েছেন।”

সোমনাথ শুনলো অশোকের জন্যে নিজের কোম্পানিতে স্থান করেননি শ্রীকিষণ আগরওয়ালা। ছেলের হাতে আড়াইশ’ টাকা দিয়ে চরে খেতে পাঠিয়েছেন। শ্রীকিষণজী চান ছেলে নিজের খুশী মতো বিজনেস করুক। বিশুবাবুর অফিসে বসে অশোক। আর বাজারে একলা ঘুরে ঘুরে ঠিক করে কোন বিজনেস করবে।

“বাঙালী বড়লোকেরা এসব ভাবতে পারে?” বিশুবাবু দুঃখ প্রকাশ করলেন। “তাঁদের ছেলেদের গায়ে একটু রোদ লাগলে ননী গলে যাবে?”

অশোকের উৎসাহ আছে। নিজের কলেজেই বিজনেসের সুযোগ নিয়েছে। ওদের ফাইলগুলো সাপ্লাই করবে।

বিশুবাবু বললেন, “বিজনেসের অনেক জিনিস গোপন রাখতে হয়। সুতরাং তোমাকে আমি রোজ পাখি-পড়া করাবো না। নিজের ময়লা নিজে সাফ করবে, নিজের গোলমাল নিজে মেটাবে। আমি জিজ্ঞেস করতেও আসবো না।”

বিশুবাবুর নিজের কিন্তু তেমন ব্যবসায় মন নেই। কোনো রকমে চালিয়ে নেন। সেনাপতি বলে, “সায়েবের আর কী? বিয়ে-থা করেননি। সংসারের টান বলতে মা ছিলেন। দু’বছর হলো মা দেহ রেখেছেন।” এখন দুর্বলতা বলতে ওই ইস্টবেঙ্গল ক্লাবটুকু। ইস্টবেঙ্গলের খেলা থাকলে মাঠে যাবেনই! তাতে বিজনেস থাকুক আর যাক।

বিশুবাবুর আর একটা দোষ আছে। সন্ধ্যেবেলা একটু ড্রিঙ্ক করেন বিশু-বাবু। ওর ভাষায়, “রাত্রে একটু আহ্নিকে বসতে হয় ব্রাদার। ব্যাড্ হ্যাবিট হয়ে গিয়েছে। ঐ এলফিনস্টোন বার-এ গিয়ে বসি। ইয়ার বন্ধুদের সঙ্গে দুটো প্রাণের কথা হয়। ওখান থেকেও মাঝে-মাঝে দু-চারটে বায়না এসে যায়। গত সপ্তাহে এলফিনস্টোন বার-এ শুনলাম এক ভদ্রলোক একখানা লরি বেচবেন। শ্রীকিষণজীর একখানা লরি কিছুদিন আগে ধানবাদের কাছে অ্যাক্সিডেন্টে নষ্ট হয়ে গিয়েছে শুনেছিলুম। এলফিনস্টোন বার থেকে পোদ্দার

কোর্টে শ্রীকিষণজীকে ফোন করলুম। তারপর গডেস কালীর নাম করে দুই পার্টিকে ছাঁদনাতলায় হাজির করিয়ে দিলুম। পকেটে পাঁচশ' টাকা এসে গেল উইদাউট এনি ইনভেস্টমেন্ট। এর নাম ভগবানের বোনাস। হঠাৎ হয়তো বিশ্বনাথ বোসের কথা মনে পড়ে গেল ভগবানের—ভাবলেন, হতভাগার জন্যে অনেকদিন কিছু করা হয়নি।"

বিশুবাবু এরপর সোমনাথকে নিয়ে বাজারে বেরিয়েছিলেন। ভিড় ঠেলে রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে বিশুবাবু বলছিলেন, "দুনিয়াতে যত ব্যবসা আছে তার মধ্যে এই অর্ডার সাপ্লায়ের ব্যবসাটা সব চেয়ে সহজ। সুখেরও বলতে পারো —অবশ্য যদি চলে।"

ব্যাপারটা কি জানতে চাইলো সোমনাথ। বিশুবাবু বললেন, "অপরের শিল অপরের নোড়া, তুমি শুধু কারুর দাঁতের গোড়া ভেঙে টু-পাইস করে নিলে।"

এরপর বিশুবাবু ব্যাখ্যা করলেন, "অপরের ঘরে মাল রয়েছে। তুমি খোঁজ-খবর করে দাম জেনে নিলে। তারপর যদি একটা খদ্দের খুঁজে বার করতে পারো যে একটু বেশি দামে নিতে রাজী আছে—তা হলেই কম্ম ফতে।"

"তাহলে দাঁড়ালো কী?" বিশুবাবু প্রশ্ন করলেন। "বাজারে কোন জিনিস কত সস্তায় কার ঘরে পাওয়া যায় জানতে হবে। তারপর সেই মাল কাকে গছানো যায় খবর করতে হবে। বাস—আমার কথাটি ফুরলো, নোটের তাড়াটি পকেটে এলো!"

এই নতুন জগতে সোমনাথ এখনও বিশেষ ভরসা পাচ্ছে না। কোনো অজানা জগতে বেপরোয়াভাবে হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজের মনস্কামনা সিদ্ধি করবার মতো মানসিকতা সোমনাথের নেই। থাকবেই বা কী করে? বড় নিরীহ প্রকৃতির মানুষ সে। কলকাতার লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেদের মতোই সে মানুষ হয়েছে—জন-অরণ্যে নিরীহ মেষশাবক ছাড়া আর কিছুর সঙ্গেই এদের তুলনা করা চলে না।

বিশুবাবু এসব নিয়ে মাথা ঘামান না। আপন মনে তিনি বললেন, "বিজনেসের ডেফিনিশন দিতে গিয়ে যে-ভদ্রলোক বলেছিলেন—ব্যবসা মানে সস্তায় কেনা এবং বেশি দামে বেচা, তাঁকে অনেকে সমালোচনা করে। কিন্তু সার সত্যটি এর মধ্যেই আছে।"

কয়েকটা লোক দেখিয়ে বিশুবাবু বললেন, "এই বাজারে হাজার হাজার লোক অর্ডার সাপ্লায়ের ওপর বেঁচে আছে। অফিসের আলপিন থেকে আরম্ভ

করে চিড়িয়াখানার হাতি পর্যন্ত যা-বলবে সব সাপ্লাই করবে এরা। তবে মার্জিন চাই।"

হাতির কথা শুনে বোধ হয় সোমনাথের মুখে হাসি ফুটে উঠেছিল। বিশুবাবু বললেন, "হাসছো? বিশ্বাস হচ্ছে না? চলো শ্যামনাথবাবুর কাছে।"

একটা ছোট্ট আপিসে মুখ শুকনো করে বসে আছেন শ্যামনাথ কেদিয়া। মোটাসোটা মধ্যবয়সী ভদ্রলোক। একটু তোতলা। বিশুবাবুকে দেখে কেদিয়াজী মৃদু হাসলেন। বললেন, "কী বোসবাবু, কুছ এনকোয়ারি পেলেন?"

বিশুবাবু বললেন, "না কেদিয়াজী, দুটো তিনটে সার্কাস কোম্পানির খবরা-খবর করলাম—কিন্তু হাতির বাজার খুব নরম। সামনে বর্ষা, কেউ এখন স্টকে হাতি তুলতে চাইছে না।"

কেদিয়াজী ঠোঁট উল্টে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন, "এখন লিচ্ছে না—পরে আফসোস কোরবে। একই হাতি তিন হাজার রুপীয়া জাদা দিয়ে লিতে হোবে।"

বিশুবাবু বললেন, "সার্কাস কোম্পানি তো—মাথায় অত বুদ্ধি নেই। আপনি বরং হাতিটাকে শোনপুরের মেলায় পাঠিয়ে দিন। ওখানে এক গ্রোস হাতি বিক্রি করতেও অসুবিধা হবে না।"

"সোব জায়গায় গণ্ডগোল। হাতির ওয়াগন মিলতেই বহুত টাইম লেগে যাচ্ছে," দুঃখ করলেন কেদিয়াজী।

"আপনি তাহলে এক্সপোর্টের চেষ্টা করুন। পৃথিবীর অন্য জায়গায় হাতির খুব কদর।" বিশুবাবু মতলব দিলেন।

কেদিয়াজী সে-খোঁজও নিয়েছিলেন। ওয়েলিংটন বলে এক সায়েব মাঝে-মাঝে জন্তুজানোয়ার কিনতে কলকাতায় আসেন। তিনি এলেই কেদিয়াজী সাডার স্ট্রীটে ফেয়ারল্যাণ্ড হোটেলে লোক পাঠাবেন। কিন্তু সেপ্টেম্বর মাসের আগে ওয়েলিংটন সায়েবের কলকাতায় আসবার সম্ভাবনা নেই। তাছাড়া 'ফোরেন' মার্কেটে কেবল বেবি হাতির কদর। এরোপ্লেনে পাঠাতে খরচ কম। পকেট থেকে প্লেন ভাড়া দিয়ে কয়েক টন ওজনের ধাড়ি হাতি বিদেশে পাঠাতে হলে ঢাকের দায়ে মনসা বিকিয়ে যাবে।

বিশুবাবু এবার সোমনাথের পরিচয় দিয়ে কেদিয়াজীকে বললেন, "ইয়ং মিস্টার ব্যানার্জি হাই সোসাইটিতে ঘোরেন। ওঁর আত্মীয়স্বজন সব বড় বড় কোম্পানির বড় বড় পোস্টে রয়েছেন।"

কেদিয়াজী এবার বিশুবাবুকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে কী সব আলোচনা

করলেন। তারপর ফিরে এসে কেদিয়াজী ফিক ফিক করে হাসতে লাগলেন। সোমনাথকে বললেন, "আচ্ছা কোনো কোম্পানিকে আপনি হাতিটা সেল করুন। আচ্ছা কমিশন মিলবে।"

"বড় বড় কোম্পানি কেন হাতি কিনতে যাবে?" বিজনেসে অনভ্যস্ত সোমনাথ খোলাখুলি সন্দেহ প্রকাশ করলো।

এ-লাইনে কোনো সেলস্ম্যান এইভাবে প্রশ্ন করে না। কিন্তু কেদিয়াজী বিরক্তি প্রকাশ করলেন না। বললেন, "জানা-শোনা থাকলে ফোরেন কোম্পানির বড় সায়েবরা সোব চিজ লিয়ে লেবে।"

কেদিয়াজীর ওখান থেকে বেরিয়ে বিশুবাবু বললেন, "অতি লোভে কেঠি- ডুবতে বসেছেন! ইলেকট্রিকাল গুডসের দালালি করে হাজার পঁচিশান কামিয়েছিলেন লাস্ট ইয়ারে। এ-বছরের গোড়ার দিকে এক হিন্দী সি কোম্পানির খপ্পরে পড়েছিলেন। ওবা একটা হাতি কিনে শুটিং করনবার শুটিং-এর শেষে ফিল্ম কোম্পানি বোম্বাইতে হাতি ফিবিয়ে নিয়ে গে। বহু জলের দামে হাতি পাচ্ছেন ভেবে কেদিয়া কিনে ফেললেন! তখন এক সার্কাস কোম্পানির দালালের সঙ্গে কেদিয়াজীব যোগাযোগ ছিল, সে লোভ দেখিয়েছিল খুব মোটা দামে হাতি বেচে দেবে।"

যা জানা গেল সেই দালালই কেদিয়াজীকে ডুবিয়েছে। হাতির বাজারে উন্নতির জন্যে কেদিয়াজী মাস কয়েক অপেক্ষা করতে তৈার ছিলেন। কিন্তু হাতির খোরাক যোগাতে প্রতিদিন যে পঞ্চাশ-ষাট টাকা খরচ করতে হবে, এই হিসেবটা তিনি ধরেননি।

"খোঁজখবর না নিয়ে হাতির ব্যবসায় ঝাঁপিয়ে পড়লে এই হয়," বিশুদা বললেন। "এখন হাতির খরচ এবং একটা মাহুতের মাইনে গোনো! তার ওপর পুলিসের হাঙ্গামা। হাতির জন্যে যে লাইসেন্স করতে হয় তাও জানতেন না, কেদিয়াজী।" হাতি বাজেয়াপ্ত হতে বসেছিল। জানা-শোনা এক পুলিসের সাহায্যে বিশুদা ক'দিন বহু চেষ্টা করে ম্যানেজ করে দিয়েছেন। কিন্তু এবার হাতি সরাতেই হবে। তাই জলের দামে হাতি বেচে দিতে চাইছেন কেদিয়াজী।

বিশুদা নিজেও মুচকি হাসলেন। তারপর বললেন, "আমরা হাসছি—কিন্তু সিরিয়াসলি কাজ করলে এর থেকেও হাজার খানেক টাকা রোজগার করতে পারো। বলা যায় না, বড় কোনো কোম্পানির পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্ট প্রচারের জন্যে হাতি লিজ নিতে পারে। তারপর পূজো নাগাদ শিক্ষিত হাতির দাম বেশ উঠে যাবে। সার্কাস কোম্পানিদের তখন ঘুম ভাঙবে।"

সমস্ত ব্যাপারটা রসিকতা মনে হয়েছিল তখন। কিন্তু পরের দিন বিকেলেই সোমনাথ শুনলো, কেদিয়াজীর হাতি বিক্রি হয়ে গিয়েছে। কোনো এক দালাল দশ পারসেন্ট কমিশনে হাতি হাওয়া করে দিয়েছে। কেদিয়াজী অবশ্য প্রতিজ্ঞা করেছেন যে-লাইনে অভিজ্ঞতা নেই সে-ব্যবসায় তিনি আর হাত বাড়াবেন না।

ল্লিকবাবু ছাপানো প্যাডগুলো দিয়ে গেলেন। কিন্তু যাবার সময় বললেন, খব কখানা মাত্র কোম্পানি করবেন?"

হাঁ মল্লিকবাবু ভেবেছেন কী? সোমনাথ কি মস্ত ব্যবসায়ী? "একটা পানি সামলাতে পারি কিনা দেখি।" সোমনাথ সলজ্জভাবে মল্লিকবাবুকে া।

আফ হোবে নভিজ্ঞ সোমনাথের কথা শুনে হেসে ফেললেন মল্লিকবাবু। চশমার মোটা ল ভিতর দিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে বললেন, "ফট্টি ইয়াবস এ-লাইনে হয়ে াল—একটা কোম্পানি করলে বিজনেসে টেকা যায় না।"

"মানে?" একটু অবাক হয়েই সোমনাথ জিজ্ঞেস করলো।

"আপনি বাঙালীর ছেলে, তাই বলছি। অন্তত তিনখানা কোম্পানি চাই। না হলে কোটেশন দেবেন কী করে? পারচেজ অফিসারকে পোষ মানাবেন আপনি—কিন্তু তিনি তো নিজের গা বাঁচিয়ে চলবেন। পোষ মানবার পরে পারচেজ অফিসার নিজেই আপনাকেই বলবে, তিনটে কোম্পানির নামে কোটেশন নিয়ে আসুন। দুটো কোটেশনে বেশী দাম লেখা থাকবে—আর আপনারটায় দাম কম থাকবে।"

অর্ডার সাপ্লাই লাইনের গোড়ার কথাটাই যে সোমনাথ এখনও জানে না তা আবিষ্কার করে বৃদ্ধ মল্লিকবাবু বেশ কৌতুক বোধ করলেন।

"শুধু আলাদা কোম্পানি হলে তো চলবে না। ঠিকানাও তো আলাদা চাই?" সোমনাথ জিজ্ঞেস করলো।

"সে তো একশোবার," মল্লিকবাবু একমত হলেন। "সাপ ব্যাঙ দুটো ঠিকানা লাগিয়ে দিলেই হলো। কলকাতায় ঠিকানার অভাব? অনেকে তো আমার ছাপাখানার ঠিকানা লাগিয়ে দিতে বলে।" বিজ্ঞের মতো মল্লিকবাবু বললেন, "আপনি তিনখানার কথা ভাবছেন! আর আপনার পাশের শ্রীধরজীর এগারোখানা কোম্পানি। এগারো রকমের চালান, এগারো রকমের বিল,

এগারো রকমের রসিদ, এগারো রকমের চিঠির কাগজ। আমার দুটো পয়সা হয়।"

সোমনাথের মুখের অবস্থা দেখে মল্লিকবাবু বললেন, "টাকাকড়ির টানাটানি থাকলে এখন একটা কোম্পানিই করুন। তেমন আটকে গেলে আমার কাছে আসবেন, দু-চারখানা পুরানো কোম্পানির লেটারহেড এমনি দিয়ে দেবো। কত কোম্পানি হচ্ছে, কত কোম্পানি আবার ডকে উঠছে—আমার কাছে অনেক চিঠির কাগজের স্যাম্পেল থেকে যাচ্ছে।"

মল্লিকবাবু যে শ্রীধরজীর কথা বললেন তিনি ফিনফিনে পাঞ্জাবি, ফর্সা ধুতি এবং চপ্পল পরে সকালের দিকে মিনিট পনেরোর জন্য অফিসে আসেন। চিঠি-পত্তর কিছু এসেছে কিনা খোঁজখবর করেন। তারপর গোটাচারেক পান একসঙ্গে গালে পুরে বাজারে বেরিয়ে যান।

শ্রীধরবাবুর এক পার্টটাইম খাতা রাখার বাবু আছেন। তিনি দু-তিনবার অফিসে ঘুরে যান। এর নাম আদকবাবু। বোগা পাকানো চেহারা। বহু লোকের হিসেব রেখে বেড়ান। সোমনাথ শুনলো, এ-লাইনে আদকবাবুর খুব নামডাক—বিশেষ করে সেল্‌স ট্যাক্স সমস্যা নাকি গুলে খেয়েছেন। লোকে বলে সেল্‌স ট্যাক্সের বিধান রায়! যত মর মর কেসই হোক, আদকবাবু ঠিক পার্টিকে বাঁচিয়ে দেবেন।

আদকবাবু একদিন সোমনাথকে বললেন, "আপনি চালিয়ে যান। বেচা-কেনা করে পয়সা আনুন—তারপর তো খাতা তৈরির জন্যে আমি আছি।"

সোমনাথ চুপচাপ ওঁর কথা শুনে যাচ্ছিলো। কোথায় বিজনেস তার ঠিক নেই, এখন থেকে সেল্‌স ট্যাক্স ইনকাম ট্যাক্সের চিন্তা! আদকবাবু বোধহয় একটু মনঃক্ষুণ্ণ হলেন। সোমনাথকে বললেন, "বিজনেসে যখন নেমেছেন, তখন এই খাতা জিনিসটাকে ছোট ভাববেন না, স্যর। আপনার ওই টেবিলেই তো মোহনলাল নোপানি বসতো। বিজনেসের কূটবুদ্ধি তো খুব ছিল। বম্বে থেকে প্লাস্টিক পাউডার আনিয়ে তার সঙ্গে ভেজাল মিশিয়ে বেশ টু-পাইস করছিল। কিন্তু হঠাৎ ঘটিবাটি ফেলে নোপানিকে উধাও হতে হলো কেন?"

উত্তরটা আদকবাবু নিজেই দিলেন। "খাতা ঠিক মতো রাখেনি। ভেবেছিল ওটাও নিজে ম্যানেজ করবে। এখন ইনকাম ট্যাক্স ও সেল্‌স ট্যাক্সের—শনি রাহু দুজনেই একসঙ্গে ছোকরার ওপর নজর দিয়েছেন!"

নোপানির কথাই তো বিশুবাবু বলছিলেন, সোমনাথের মনে পড়লো। "মিস্টার বোস তো সেনাপতিকে ভদ্রলোকের বাড়িতেও পাঠিয়েছিলেন।

নোপানি সেখানে নেই। কলকাতা ছেড়ে চলে গিয়েছেন।” সোমনাথ বললো।

পানের ছোপধরা দাঁতের পাটি বার করে আদকবাবু হাসলেন। ফিসফিস করে বললেন, “বাড়ি না-ছেড়ে উপায় আছে? সাতাশ হাজার টাকার প্রেমপত্তর নিয়ে সেল্‌স ট্যাক্স ঘোরাঘুরি করছেন। প্রেমপত্তর বোঝেন তো?” আদকবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

না-বুঝে উপায় আছে। তপতীর চিঠিখানা গতকালই তো পাঁচবার পড়েছে সোমনাথ। কপাল কুঞ্চিত করে আদকবাবু বললেন, “আমাদের লাইনে প্রেমপত্তর মানে সার্টিফিকেট। ট্যাক্সো ঠিক সময় না দিলে আলিপুরের সার্টিফিকেট অফিসার ঘটিবাটি বাজেয়াপ্ত করার জন্যে এই সার্টিফিকেট ইস্যু করে। সার্টিফিকেট অফিসের বেলিফ বসময় হাজরাকে তো দেখেননি—সাক্ষাৎ চেঙ্গিজ খাঁ! টাকা না দিলে ভাতের হাঁড়ি পর্যন্ত ঠেলাগাড়িতে চড়িয়ে নিয়ে চলে যাবে। কোনো মায়াদয়া করে না।”

কোনোরকম রোজগার না-করেই সার্টিফিকেট অফিসেব পেয়াদা রসময় হাজরার কাল্পনিক কালাপাহাড়ী মূর্তি সোমনাথকে একটু বিমর্ষ কবে তুললো। এতদিন সার্টিফিকেট বলতে বেচারা পরীক্ষার সার্টিফিকেট এবং ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট বুঝতো। আলিপুরের সার্টিফিকেট অফিসারের নাম সে কোনোদিন শোনেইনি। আদকবাবু ফিসফিস করে খবর দিলেন, “আপনি ভাবছেন, নোপানি চম্পট দিয়েছে কলকাতা থেকে? একেবারে বাজে কথা। এই কলকাতাতেই ঘুরে বেড়াচ্ছে। তবে এখন যদি নোপানি বলে ডাকেন চিনতেই পারবে না। নাম নিয়েছে, প্রেমনিধি গুপ্তা!”

খাতা লেখা বন্ধ রেখে আদকবাবু বললেন, “আপনাকে সত্যিকথা বলছি, এখন লুকিয়ে লুকিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করছে, আমাব হাতে ধরছে। বলছে, ‘আদকবাবু বাঁচান’। রোগী মরে যাবার পর খবর দিলে ডাক্তার কী করবে বলুন?”

আদকবাবু ওঁর চশমার ফাঁক দিয়ে সোমনাথের দিকে তাকালেন। তাবপর জিজ্ঞেস করলেন, “কী বুঝলেন?”

“বুঝলুম নোপানি ফ্যাসাদে পড়েছে।”

সোমনাথের উত্তরে সন্তুষ্ট হলেন না আদকবাবু। বললেন, “নোপানি হচ্ছে জাত ব্যবসাদার—ওর বিপদ ও ঠিক সামলাবে। আপনি কী বুঝলেন? আপনাকে দেখে শিখতে হবে—ঠেকে শিখতে গেলে এ-লাইনে স্রেফ গাড়ি চাপা পড়ে যাবেন। শিক্ষাটা হলো এই যে শুধু রোজগারের চেষ্টা করলে হবে না—

সেই সঙ্গে হিসেবের খাতাখানি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রেখে যেতে হবে।"

খুড়ো আদকবাবুর যে সোমনাথের ওপর মায়া পড়েছে তা সেনাপতি দরজার কাছে বসে থেকেই বুঝতে পারছে। আদকবাবু ফিসফিস করে বললেন, "যে-লাইনে এসেছেন—টু-পাইস আছে। অনেকে এখনও রাতারাতি লাল হচ্ছে। এই যে শ্রীধরজী—কেমিক্যাল বেচে বেশ কামাচ্ছেন। কিন্তু এগারোখানা কোম্পানি—এর টুপি ওর মাথায় এমন কায়দায় পবিয়ে যাচ্ছেন যে আপনাব মনে হবে রামকৃষ্ণ মিশনের অ্যাকাউন্ট। সেল্‌স ট্যাক্স অফিসার নাক দিয়ে শুঁকলে ধূপধুনোর গন্ধ পাবে!"

এ-লাইনের প্রথম বউনি আদকবাবুব অনুগ্রহেই হলো। জয়সোয়ালদের স্টেশনারি দোকানের খাতা উনি বাখেন। ওখানকার ব্রিজবাবুর সঙ্গে সোম-নাথের আলাপ কবিয়ে দিয়েছিলেন আদকবাবু। বলেছিলেন, "বসে থাকবেন কেন? চেষ্টা করুন।"

ব্রিজবাবু খুব বেশী ভবসা কবেননি ছোকবা সোমনাথের ওপর। তবে বলে-ছিলেন, "ডুপ্লিকেটিং কাগজ এবং খামেব ভাল স্টক বয়েছে। দেখুন যদি সেল করতে পারেন। আদকবাবু যখন এর মধ্যে রয়েছেন তখন আপনাকে অবিশ্বাস করবো না।"

রাস্তায় বেরিয়ে সোমনাথ একশ' রিম ডুপ্লিকেটিং কাগজ এবং লাখখানেক খাম বারবার চোখের সামনে দেখতে লাগলো। একলক্ষ খাম কোথায় বেচবে সে ভেবেই পেলো না। সোমনাথের মাথায় নানা অদ্ভুত চিন্তা আসছে। একলক্ষ খাম মানে একলাখ চিঠি। সে কি সোজা ব্যাপার!

লালবাজারের সামনে বি কে সাহার প্রখ্যাত চায়েব দোকানের পাশে রেস্তোরাঁয় বসে এক কাপ চা খেতে খেতে সোমনাথ হিসেব করতে লাগলো: নিজের সঙ্কোচ কাটিয়ে তপতীকে যদি প্রতিদিন সে একখানা চিঠি লেখে তাহলেও বছরে মাত্র ৩৬৫খানা খাম লাগবে। দশ বছর ধরে অবিশ্রান্ত চিঠি লেখা চালিয়ে গেলেও মাত্র ৩৬৫০ খানা খাম খরচ হবে। অল্ রাইট—তপতীকেও যদি সোমনাথ কিছু খাম পাঠিয়ে দেয় এবং সেও যদি রোজ একখানা করে চিঠি লেখে তাহলে সামনের দশ বছরে আরও ৩৬৫০ খানা খাম কাজে লাগবে। অর্থাৎ সর্বসাকুল্যে সাত হাজার তিনশ' খাম। অঙ্কটা নেশার মতো সোমনাথের মাথার ওপর চেপে বসছে। একশ' বছরেও তাহলে একলাখ খাম খরচ হচ্ছে না—লাগছে মাত্র তিয়াত্তর হাজার খাম।

আরও এক চুমুক চা খেলো সোমনাথ। না, হিসেব ঠিক হচ্ছে না—

কোথায় যেন ভুল থেকে যাচ্ছে। একশ' বছরে অন্তত পঁচিশটা লিপ-ইয়ার পড়বে—তার অর্থ, বাড়তি পঁচিশ দিন, হুইচ মিনস আরও পঞ্চাশখানা চিঠি।

হিসাবের ভারে মাথাটা যখন বেশ গরম হয়ে উঠেছে তখন হঠাৎ বাইরের দিকে নজর পড়লো সোমনাথের। একজন ছোকরা কোটপ্যান্ট পরে লালবাজার পুলিস হেডকোয়ার্টারের গেট দিয়ে বেরিয়ে আসছে। কলেজবান্ধবী শ্রীময়ীর নববিবাহিত হাজবেণ্ড।

ভদ্রলোক বি কে সাহার দোকানের কাছে দাঁড় করানো একটা গাড়ির সামনে দাঁড়াতেই সোমনাথ দোকান থেকে বেরিয়ে এলো। "মিস্টার চ্যাটার্জি না? চিনতে পারছেন?"

অশোক চ্যাটার্জি গাড়ির মধ্যে ঢুকতে যাচ্ছিলো। সোমনাথের গলা শুনেই থমকে দাঁড়ালো। সোমনাথের দিকে মুখ ফিরিয়ে হাসিমুখে অশোক চ্যাটার্জি বললো, "খুব চিনতে পারছি। আপনিই তো মিস্টার ব্যানার্জি? গড়িয়াহাটের মোড়ে সেদিন শ্রীময়ী আলাপ করিয়ে দিলো।"

লালবাজারের সামনে গাড়ি দাঁড়াতে দেয় না। তাই অশোক চ্যাটার্জি এবার সোমনাথকে গাড়ির মধ্যে তুলে নিলো।

মিশন রোয়ের ওপরেই ওদের অফিস। ওখানকার ভাল একটা পোস্টে রয়েছে অশোক চ্যাটার্জি। ভাল পোস্টে না থাকলে শ্রীময়ীর মতো চালু মেয়ে কেন অকালে টাক-পড়া শ্যামবর্ণের এই নাদুস-নুদুস ছোকরাকে বিয়ে করতে যাবে? কলেজ জীবনে শ্রীময়ী যার সঙ্গে ঘুরে বেড়াতো সেই সমর ছিল সত্যি সুদর্শন। তপতীর কাছে শুনেছিল, শ্রীময়ী বলতো ছেলেরা সুদর্শন না হলে তার কথা বলতে ইচ্ছে করে না। আপেলের মতো টুকটুকে ফর্সা, স্মার্ট, লম্বা ছেলে ছাড়া শ্রীময়ী কিছুতেই বিয়ে করবে না। সিনেমার হিরোর মতো চেহারা ছিল সমরের, কিন্তু সে এ-জি-বেঙ্গলের লোয়ার ডিভিসন কেরানি হয়েছে।

অশোক চ্যাটার্জির গাড়িতে বসে শ্রীময়ীর ভূতপূর্ব বন্ধুদের কথা সোমনাথের ভাবা উচিত হচ্ছে না। সে বললো, "সেদিন আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে খুব ভাল লাগলো।"

গাড়ি চালাতে চালাতে অশোক বললো, "একদিন বাড়িতে আসতে হবে। শ্রীময়ী খুব খুশী হবে। কিন্তু একলা এলে হবে না—গিন্নিকে আনা চাই।"

হেসে ফেললো সোমনাথ। অশোক অপ্রস্তুত হলো। বোকা বোকা হেসে বললো, "ওই পাট এখনও চোকানো হয়নি বুঝি?"

সোমনাথ এবার জিজ্ঞেস করলো, "আচ্ছা আপনাদের অফিসে স্টেশনারি

পারচেজ করেন কে ?”

“আমি করি না। তবে যিনি করেন, আমার বিশেষ ফ্রেণ্ড।” অশোক বললো।

“ওঁর সঙ্গে একটু আলাপ করিয়ে দেবেন ? পার্টটাইম বিজনেস করছি। বিজনেস ছাড়া বাঙালীদের মুক্তি নেই বুঝতেই তো পারছেন, মিস্টার চ্যাটার্জি।”

“সে কথা বলে !” অশোক উৎসাহ দিলো।

ছেলেটি সত্যি ভাল। সোজা সোমনাথকে নিয়ে গেল মিস্টার গাঙ্গুলীর কাছে। বললে, “আমার বিশেষ পরিচিত। যদি সম্ভব হয়, একটু সাহায্য করবেন।”

ভাগ্য ভাল। মিস্টার গাঙ্গুলী কাগজের নমুনা দেখলেন। পঁচিশ রিম এখনই দরকার। রেট জানতে চাইলেন। মল্লিকবাবুর ছাপানো প্যাড বার করে সোমনাথ একটা কোটেশন ওখানেই লিখে দিলো।

মিস্টার গাঙ্গুলী কর্মচারীকে ডেকে বললেন, “দেখুন তো গতবার আমরা কী দামে কাগজ কিনেছিলাম।” ভদ্রলোক একটা ফাইল এনে মিস্টার গাঙ্গুলীর সামনে ধরলেন। দামটা গোপনে দেখে নিয়ে গাঙ্গুলী বললেন, “আপনার রেট ভালই আছে। আমরা নগদ টাকায় কিনে নেবো।”

খামের ব্যাপারে একটু সময় লাগবে। নমুনা এবং কোটেশন রেখে যেতে বললেন। স্টকের অবস্থা যাচাই করতে হবে।

বেলা পাঁচটার মধ্যে ব্যবসা খতম। সব হাঙ্গামা চুকিয়ে, খরচখরচা বাদ দিয়ে কড়কড়ে তিনখানা দশ টাকার নোট হাজির হয়েছে সোমনাথ উদ্যোগ-এর মালিক সোমনাথ ব্যানার্জির পকেটে। জীবনে প্রথম রোজগার। প্রথম প্রেমের মতোই সে এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা। কলকাতা শহরের বিবর্ণ রূপ মুছে গিয়ে হঠাৎ সমস্ত শহরটা সোমনাথের চোখের সামনে ঝকঝক করছে। ব্যবসায় যে রস আছে, তা সোমনাথ এবার বুঝতে পারছে। উত্তেজনা চাপতে না পেরে মানিব্যাগ বার করে সোমনাথ টাকাটা আবার গুনলো।

অফিসে ফিরে এসে বিশুবাবুর খোঁজ করলো সোমনাথ। তিনি নেই—কোনো এক কাজে কলকাতার বাইরে গেছেন। আদকবাবু আসতেই মি[illegible] আনতে দিচ্ছিলো সোমনাথ। হাঁ-হাঁ করে উঠলেন আদকবাবু। “এই জন্যে বাঙালীর বিজনেস হয় না। এই তো আপনার প্রথম নিজস্ব ক্যাপিটাল হলো। এখনই খেয়ে উড়িয়ে দিলে চলবে কেন ? আগে হাজার দশেক টাকা হোক—

তারপর আপনার কাছ থেকে জোর করে মিষ্টি খাবো।"

সোমনাথ খুশী মনে রয়েছে। বললে, "দেখুন না! যদি খামের কোটেশনটা লেগে যায়, তাহলে আমাকে পায় কে?"

ব্রিজ জয়সোয়ালের টাকাও যে সে মিটিয়ে দিয়েছে, তা সোমনাথ এবার আদকবাবুকে জানিয়ে দিলো। "উনি কী বললেন?" আদকবাবু জানতে চাইলেন।

"খুব খুশী হলেন। কীভাবে কোথায় বিক্রি করলাম সব বললুম ওঁকে।"

"অ্যাঁ!" আঁতকে উঠলেন আদকবাবু। "করলেন কি মশায়। আপনার পার্টির নাম ব্রিজবাবুকে বলে দিলেন?"

তাতে মহাভারতের কি অশুচি হয়েছে সোমনাথ বুঝতে পারলো না। আদকবাবু বেশ বিরক্তভাবে বললেন, "আপনি বড়ো ফ্যামিলির ছেলে, বিজনেস করতে এসেছেন, আর আমি গরীব মানুষ খাতা লিখে খাই—আমার মুখে সব কথা মানায় না। তবু বলছি, এ-লাইনে কখনও নিজের তাসটি অন্য কাউকে দেখাবেন না। কাকে সাপ্লাই করছেন, তা ভুলেও কাউকে বলবেন না। যেখানে ঘোরাঘুরি করছি আমরা—এটা বাজারও বটে, জঙ্গলও বটে।"

ইতিমধ্যে তিরিশ টাকা রোজগার হয়েছে শুনে বেজায় খুশী হয়েছেন কমলা বউদি। লুকিয়ে বৌদিকে খাওয়াতে চেয়েছিল সোমনাথ। বউদি রাজী হলেন না। খুব ধরাধরি করতে বউদি বললেন, "তার বদলে, গাড়িটা বার করে আমাকে কবীর রোডে মামার বাড়িতে একটু ঘুরিয়ে নিয়ে এসো।" দাদা সেলফ ড্রাইভ করেন। গাড়িটা মাঝে-মাঝে স্টার্ট দিয়ে চালু রাখার কথা বউদিকে লিখেছেন। সোমনাথের অসুবিধে নেই। গাড়ি চালানোটা বউদি ও সোমনাথ দুজনে একসঙ্গে শুরু করেছিল। কমলা বউদি দু দিন চালিয়ে আর সাহস পাননি। কিন্তু সোমনাথ ড্রাইভিং লাইসেন্স করিয়ে ফেলেছিল সেই বি-এ পড়ার সময়েই।

বউদিকে সেদিন মামার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে, এক ঘণ্টা পরে আবার ফিরিয়ে আনলো সোমনাথ। পথে লেকের ধারে গাড়ি থামিয়েছিল। সোমনাথ জোর করে বউদিকে কোকাকোলা খাওয়ালো—কোনো আপত্তি শুনলো না। দেওরের প্রথম উপার্জনের পয়সায় কোকাকোলা খেতে কমলা বউদির খুব আনন্দ হচ্ছিলো। ওঁর ইচ্ছে, বাবার জন্যেও একটু মিষ্টি কেনা হোক। সোমনাথ কিন্তু এই অবস্থায় বাড়িতে কিছুই জানাতে চায় না। বউদিও সব

ভেবে জোর করলেন না। বিজনেস লাইনে শেষপর্যন্ত যদি সোমনাথ হেরে যায়, এবং সবাই যদি তা জানতে পারে, তাহলে বেচারার আত্মবিশ্বাস চিরদিনের মতো নষ্ট হয়ে যাবে। ওর আত্মসম্মানে আঘাত লাগুক এমন কিছু করতে কমলা বউদি রাজী নন।

তবে শেষপর্যন্ত একটা রফা হলো। সোমনাথের পয়সায় বাবার জন্যে একশ' গ্রাম ছানা কেনা হবে, কিন্তু কে পয়সা দিয়েছে তা বাবাকে বলা হবে না। এই ব্যবস্থায় সোমনাথের আপত্তি নেই।

জোড়ে জোড়ে তরুণ তরুণীদের লেকের ধারে ঘুরে বেড়াতে দেখে, কমলা বউদিব একটু রসিকতা করতে ইচ্ছে হলো দেওরের সঙ্গে। কমলা বউদির খুব ইচ্ছে কম বয়সেই সোমনাথের বিয়ে দেন। কিন্তু বিয়ের প্রসঙ্গ তুলতে সাহস হলো না। যা দিনকাল, ছেলেদের কপালে বিধাতাপুরুষ কী লিখে রেখেছেন কে জানে?

পাইপের মধ্য দিয়ে কোকাকোলা টানতে টানতে কমলা বউদি বললেন, "আমার মন বলছে ব্যবসাতে তোমার খুব নাম হবে।"

"আপনার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক বউদি।" সোমনাথ আন্তরিকভাবে বললো।

বউদি বললেন, "আচ্ছা ঠাকুরপো, তুমি যদি বিরাট বড়ো বিজনেসম্যান হও, কী করবে?"

মাথা চুলকে সোমনাথ বললে, "আপনাকে কোম্পানিব চেয়ারম্যান করবো। আর বেচারা সুকুমারকে একটা বড় পোস্ট দেবো। সুকুমার তদ্বির করে আমাকে একটা ইন্টারভিউ পাইয়ে দিয়েছিল। আমি ওর জন্যে কিছুই করতে পারিনি।"

কমলা বউদি বললেন, "শুনেছি ওদের বড্ড অভাব। ওর সঙ্গে দেখা হলে বোলো, চাকরির অ্যাপ্লিকেশনের জন্য টাকাকড়ি লাগলে যেন আমাকে বলে। তোমার দাদার কাছ থেকে মাসে তিরিশ টাকা হাতখরচা আদায় করেছি।"

আদকবাবুর কথা যে মিথ্যে নয়, তা তিনদিনের মধ্যেই বুঝতে পারলো সোমনাথ। অশোক চ্যাটার্জির অফিস থেকে খামের অর্ডারটা পাবে এ সম্বন্ধে সে প্রায় নিশ্চিত ছিল। কিন্তু মিস্টার গাঙ্গুলী গম্ভীরভাবে দুঃখ প্রকাশ করলেন। বললেন, "হলো না। আপনার দামটা অনেক বেশী।"

মুখ শুকনো করে সোমনাথ যখন বেরিয়ে আসছিল, তখন মিস্টার গাঙ্গুলীর ডিপার্টমেন্টের সেই ক্লার্কের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। শিক্ষিত বেকারকে হতাশ হয়ে ফিরে যেতে দেখে ভদ্রলোকের বোধ হয় একটু মায়া হলো। তিনি বলেই

ফেললেন, "জয়সোয়াল কোম্পানির কাছে থাম কিনে বুঝি সাপ্লাই করছেন? ওরাই তো আপনার থেকে সস্তা কোটেশন দিয়ে গেল। বললে, সোজা ওদের কাছ থেকে নিলে আমাদের লাভ।"

সোমনাথ তাজ্জব। ব্রিজবাবুকে জিজ্ঞেস করতে তিনি আকাশ থেকে পড়লেন! ব্যাপারটা মোটেই স্বীকার করলেন না। বরং বললেন, "বিজনেসে আমরা সবাই ভাই-ভাই। আমি কী করে আপনার পেছনে ছুরি লাগাবো?"

কুণ্ডুবাবু বলে এক কর্মচারি চুপচাপ ওদের কথাবার্তা শুনছিলেন। ব্রিজবাবু চলে যেতেই ফিসফিস করে বললেন, "উনিই তো লোক পাঠিয়েছেন। কেন পাঠাবেন না? এইটাই তো বিজনেসের নিয়ম। আপনি যদি ব্রিজবাবুর থেকে কম দামে অন্য কোথাও থাম পেতেন—ছাডতেন?"

সব শুনে আদকবাবু বললেন, "এতো আমি জানতাম। আপনি যদি জয়সোয়ালকে উচিত শিক্ষা দিতে চান তাহলে ঐ মিস্টার গাঙ্গুলীকে ম্যানেজ করুন। ব্রিজবাবুর কাছে যদি প্রমাণ করতে পারেন, আপনি না-থাকলে ঐ কোম্পানি থেকে কিছুতেই অর্ডার আসবে না—তাহলে উনি আবার আপনার জুতোর সুখতলা হয়ে থাকবেন!"

"ওঁর অপমান হবে না?" সোমনাথ জিজ্ঞেস করে।

"দূর মশায়! মান থাকলে তবে তো অপমান হবে? এটা তো বাজার, ল্যাং দেওয়া-নেওয়া চলবে জেনেই তো এরা মার্কেটে এসেছে।"

বেশ রাগ হচ্ছে সোমনাথের। ব্রিজবাবুকে যোগ্য শিক্ষা দেবার একটা প্রচণ্ড লোভ হচ্ছে। কিন্তু আদকবাবু যে মতলব দিচ্ছেন তা সোমনাথ পারবে না। মিস্টার গাঙ্গুলী কেন তার কথা শুনবেন? তাছাড়া কম দামে যেখানে মাল পাওয়া যায় সেখান থেকে কেনবার জন্যেই তো কোম্পানি মিস্টার গাঙ্গুলীকে রেখেছে।

আদকবাবু ওসব বুঝলেন না। বললেন, "এ-লাইনে অনেকদিন হলো। পারচেজ অফিসারদের কত গল্প কানে আসে। ওঁরা ইচ্ছে করলে যা-খুশি তাই করতে পারেন।"

বাড়িতে ফিরে বিছানায় আধশোয়া অবস্থায় ব্রিজবাবুকে হারিয়ে দেবার ব্যাপারটা সোমনাথের মাথায় ঘুরছে। বউদিকে এই ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে লাভ হলো না। সোমনাথ জানতে চেয়েছিল, প্রতিহিংসা জিনিসটা কেমন? বউদি যথারীতি মায়ের কথা তুললেন। মা বলতেন, কুকুর তোমাকে কামড়াতে এলে তুমি কুকুরকে তাড়িয়ে দেবে। কিন্তু তুমি কুকুরকে কামড়াতে পারবে না।

তবু সোমনাথের মনটা শান্ত হচ্ছে না।

দেওর ব্যবসা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে দেখে কমলা বউদি ভরসা পেলেন।

সোমনাথ পরের দিন অশোক চ্যাটার্জির অফিস পর্যন্ত গিয়েছিল। ভাবলো একবার শ্রীময়ীকে ফোনে ধরবে কিনা। নববিবাহিতা বধূ কোনো অনুরোধ করলে অশোক চ্যাটার্জি তা ফেলতে পারবে না। কিন্তু ইচ্ছে করলো না সোমনাথের। যেখানে সন্ধ্যা হয় সেইখানেই বাঘের ভয়। অফিসের দরজার গোড়ায় অশোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। বরটি ভালই ম্যানেজ করেছে শ্রীময়ী। মনটি বেশ উদার। সোমনাথের সঙ্গে নমস্কার বিনিময় হলো।

অশোক চ্যাটার্জি আজও সৌজন্য প্রকাশ করলো—ব্যবসার খোঁজখবর নিলো। কিছু অর্ডার পেয়েছে শুনে খুশী হলো—কিন্তু সোমনাথ খামের কথাটা তুলতে পারলো না।

আদকবাবু আবার জিজ্ঞেস করলেন, "জয়সোয়ালকে একটু শিক্ষা দিলেন ?"

সোমনাথ পরাজয় স্বীকার করলো। বললে, "মিস্টার গাঙ্গুলীর কাছে ছোট হতে পারলাম না।"

আদকবাবু বললেন, "এ-লাইনে যদি কিছু করতে চান পারচেজ অফিসার-দের সঙ্গে ভাব করুন।"

চার নম্বর টেবিলে উমানাথ যোশী বেশ মনমরা হয়ে বসে আছে। ছোকরা কোনো লাইনেই তেমন সুবিধে করতে পারছে না। বাঠী নামে এক ভদ্র-লোকের কোম্পানিতে সে কাজ করতো। মন কষাকষি হওয়ায় চাকরি ছেড়ে দিয়ে ব্যবসা শুরু করেছে। কিন্তু হাতে তেমন কাজকর্ম নেই।

যোশী যে-লাইনে কাজ-কারবার করে সেই একই লাইনে ব্যবসা করছেন দু নম্বর টেবিলের সুধাকর শর্মা। অথচ সুধাকরবাবুর নিশ্বাস ফেলবার সময় নেই। একজন পার্টটাইম টাইপিস্ট রেখেছেন। কিন্তু সে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে। সুধাকরবাবু একটা সারাক্ষণের টাইপিস্ট রাখবার কথা ভাবছেন। অনেক টেলিফোন আসে সুধাকরবাবুর নামে। ফকির সেনাপতি বার বার হাঁক দেয়—সায়েব আপনার টেলিফোন।

সুধাকর শর্মার সাফল্যের রহস্যটা বুঝতে পারে না সোমনাথ। যোশীর কাজকর্ম নেই তেমন—তাই সোমনাথের সঙ্গে মাঝে-মাঝে গল্প করে। যোশী বলে, "শর্মাজী জাদু জানেন। পারচেজ অফিসারকে মন্তর দিয়ে বশ করে ফেলেন।"

শর্মাজীর কাজ করেন না আদকবাবু। উনি বলেন, "পারচেজ অফিসার যদি গোখরো সাপ হয়—শর্মাজী হচ্ছেন সাপুড়ে। যতই ফণা তুলুক, অফিসারকে ঠিক বশ করে শর্মাজী নিজের ঝাঁপিতে পুরে ফেলবেন।"

কিসের যে ব্যবসা করেন না সুধাকরজী তা সোমনাথ বুঝতে পারে না। ঝোলাগুড় থেকে আরম্ভ করে, সাবান, টয়লেট, পেপার, কাঁচের গেলাস সব কিছুই সাপ্লাই করেন।

যোশী বলে, "সুধাকরজীর লক্ষ্মী হলো কোন্নগরের এক কারখানা। সেখানে সাড়ে আটশ' পিস সাবান প্রতি মাসে সাপ্লাই করতেন ভদ্রলোক। ওঁর গিন্নির সঙ্গে ওখানকার ম্যানেজারবাবুর দূরসম্পর্কের আত্মীয়তা আছে। আগে প্রত্যেক ওয়ার্কারকে হাত ধোবার জন্যে প্রতি মাসে একখানা সাবান দেওয়া হতো। এরপর সুধাকরজী নাকি ইউনিয়নের কোনো পাণ্ডাকে পাকড়াও করেন। ওরা প্রতিমাসে দু'খানা সাবান দাবি করলো—কোম্পানি দিতে বাধ্য হয়েছে। সুধাকরজী মাসে সতেরোশ' পিস সাবান সাপ্লাই করতে আরম্ভ করলেন। তারপর কীভাবে অন্য অনেককে ম্যানেজ করেছেন। সুধাকরজীর কাজ এত বেড়েছে যে নিজের আলাদা আপিসের কথা ভাবছেন

সোমনাথ মাঝে-মাঝে স্বপ্ন দেখছে সেও সুধাকর শর্মার মতো কাজকর্ম বাড়িয়ে চলেছে। কিন্তু কী যে মন্তর সুধাকরবাবু জানেন—সে বুঝতেই পারে না। টো টো করে সেও সারাদিন অফিসে অফিসে ঘুরছে, কিন্তু সুবিধে করতে পারছে না।

সুধাকর শর্মা কোনো প্রশ্নের উত্তরই দেন না। শুধু ফিক করে হাসেন। আর সন্ধ্যা হলেই অফিস থেকে বেরিয়ে পড়েন। ফকির সেনাপতি বলে, "শর্মাজী মাঝে-মাঝে অনেক রাতে ফিরে আসেন। তখন নাকি একটু বেসামাল অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায় তাঁকে।" সেনাপতি বিরক্ত হতে পারে না। কারণ সুধাকর শর্মা তাকে আলাদা করে প্রতি মাসে পঁচিশ টাকা দেন। অবশ্য সেনাপতিকে তার বদলে একশ' টাকার ভাউচার সই করতে হয়। কিন্তু সেনাপতির তাতে আপত্তি নেই। কিছু টাকা তো মিলছে।

সুধাকর শর্মার জামাকাপড় বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বুশ-শার্ট এবং টেরিলিন প্যান্ট পরেন। অফিসের আলমারিতে একটা কোট এবং টাইও আছে। বড় কোনো পার্টির সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকলে অনেক সময় কোট চড়িয়ে নেন। সেনাপতি একটা ব্রাশ দিয়ে সুধাকরের কোট ঝেড়ে দেয়।

পাশের ঘরে কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ হয়েছে সোমনাথের। এদের দু-একজনের নিজস্ব গোডাউন আছে। ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ধার নিয়ে এরা অনেক জিনিস গুদোমে রেখে দেয়। একেবারে পরের ঘাড়ে বন্দুক রেখে ব্যবসার স্তর এরা পেরিয়ে এসেছে। কলকাতা ছাড়াও, উড়িষ্যা এবং আসামের দূর দূর প্রান্তে এদের বেচাকেনা চলে।

ঐ ঘরে টিমটিম করে হীরালাল সাহা বলে এক বাঙালী ভদ্রলোক জ্বলছেন। হীরালাল সাহা রেল আপিসে কাজ করতেন। একবার সাইড বিজনেস হিসেবে কিছু পুরানো রেলওয়ে স্লিপার নীলাম ডাকে কিনেছিলেন। তাতে পাঁচ হাজার টাকা লাভ করেছিলেন। সেই সময় শ্যামবাজারে একখানা পুরানো বাড়ি ভাঙা হচ্ছিলো। ওই বাড়ির ইঁট কাঠ জানলা দরজা সব কিনেছিলেন হীরালাল সাহা। অফিসের সহকর্মীরা পিছনে লাগলো, হীরালালবাবু চাকরি ছেড়ে দিলেন।

হীরালালবাবু বলেন, "গডেস মঙ্গলচণ্ডীর কাইণ্ডনেসে করে খাচ্ছি। জানেন মিস্টার ব্যানার্জি, বাঙালীদের সবচেয়ে বড় শত্রু হলো বাঙালীরা। আমি দেখুন চাকরিও করছিলাম, বিজনেস থেকেও টু-পাইস আনছিলাম—তা আমার বাঙালী বন্ধুদের সহ্য হলো না। আর এই বিজনেস পাড়ায় দেখুন—গুজরাতী গুজরাতীকে, সিন্ধি সিন্ধিকে দেখছে। মাড়োয়ারীদের তো কথাই নেই। যে-আপিসে মাড়োয়ারী আছে সেখানে পারচেজ বলুন, বিক্রির এজেন্সি বলুন জাতভাইদের জামাই আদর।"

হীরালালবাবু খবরাখবর রাখেন। বললেন, "আপনি তো জয়সোয়ালদের জিনিস বেচতে গিয়ে ধাক্কা খেয়েছেন? আপনাকে দুটো পয়সা দিতে ওদের গায়ে লাগলো। অথচ, আমি জানি নিজের গাঁয়ের তিন-চারটে ছোঁড়াকে ওরা ছ'মাসের ধারে মাল দিচ্ছে।"

হীরালালবাবুর সময়টা এখন ভাল যাচ্ছে। বললেন, "বউবাজারের কাছে গডেস মঙ্গলচণ্ডী আছেন। ওঁকে মাঝে-মাঝে নিজের দুঃখ জানিয়ে আসবেন—মা কোনো কষ্টই রাখবেন না। মায়ের করুণায় পর পর দু'খানা সাহেব বাড়ির কড়ি বর্গা টালি কিনলুম। দু মাসের মধ্যে টু-পাইস এসেছে, কেন মিথ্যে বলবো।"

হীরালালবাবু বললেন, "সারাদিন এখন গ্লাই টোটো করে রাস্তায় ঘুরি।

একখানা ভাঙবার মতো বাড়ির সন্ধান পেলেই বেশ কিছু হয়ে যাবে। এমন কিছু হাঙ্গামা নেই। ব্যবস্থা পাকা করে খবরের কাগজে একখানা বিজ্ঞাপন দিই—'সাহেব বাড়ি ভাঙা হইতেছে। অতি মূল্যবান কাঠকাঠরা ও ভিনিসিয়ান টালি বিক্রয়। অমুক ঠিকানায় খোঁজ করুন।' একখানা বোর্ড করিয়ে রেখেছি। তাতেও লেখা থাকে—'সেল! সেল! সেল! সাহেব বাড়ি ভাঙা হইতেছে। ভিতরে খোঁজ করুন।' আমার একটা হিন্দুস্থানী দারোয়ান আছে। সে ভাঙা বাড়িতেই বসে থাকে—ওইখানেই ইট কাঠ দরজা জানলা, মায় সাহেবদের ব্যবহার করা পুরানো কমোড পর্যন্ত বিক্রি হয়ে যায়।"

হীরালালবাবু বললেন, "সাহেব বাড়ির কোনো খোঁজখবর থাকলে বলবেন। আপনাকে 'স্যুইটেবল' কমিশন দেবো।"

ভাঙা বাড়ির কথায় সোমনাথ বললো, 'দাঁড়ান একটু ভেবে দেখি।"

গতকাল তপতীদের বাড়িতে যাবে কিনা ভাবছিল সোমনাথ। হাঁটতে হাঁটতে এলগিন রোডের ওপর একটা পুরানো বাড়ির দিকে সোমনাথের নজর পড়েছিল। সেখানে বোধহয় নতুন কোনো ফ্ল্যাটবাড়ি উঠবে—কারণ কুলিরা লরি থেকে নতুন একটা সাইনবোর্ড নামাচ্ছিল। সোমনাথ ঠিকানাটা হীরালালবাবুকে দিয়ে দিলো।

"দেখো মা চণ্ডী," বলে হীরালালবাবু তখনই ছুটলেন। সারাদিন আর দেখা নেই।

দুদিন পরে সকালে হীরালালবাবুর খোঁজ পাওয়া গেল। ভীষণ খুশী মনে হচ্ছে তাঁকে। সোমনাথের পিঠে হাত দিয়ে বললেন, "গডেস চণ্ডী দয়া না করলে এ-সুযোগ আসতো না, মিস্টার ব্যানার্জি। ঠিক দেখেছেন—একেবারে সাহেব বাড়ি। পা থেকে মাথা পর্যন্ত বর্মা টিকে সাজানো। আজকেই বায়না করে এলাম।"

হীরালালবাবু বললেন, "আপনি শ'দেড়েক টাকা রাখুন। যদি তেমনি প্রফিট করতে পারি আরও দু'শ' টাকা দেবো।"

সোমনাথ টাকাটা নিতে চাচ্ছিলো না। কিন্তু হীরালালবাবু নাছোড়বান্দা। বললেন, "খবর দেওয়াটাও তো বিজনেস, মশাই। গডেস মঙ্গলচণ্ডী কী ভাববেন, যদি আপনাকে প্রাপ্য না দিই? আরও খবরটবর রাখবেন। তবে জেনুইন সাহেব বাড়ি হওয়া চাই। বাঙালী বাড়ি ভেঙে সুখ নেই মশাই—জল [illegible] ঢেলে বাড়ির কিছু রাখে না।"

জেনুইন সাহেব বাড়ি কাকে বলে জানবার লোভ হলো সোমনাথের।

হীরালালবাবু বললেন, "সাহেবদের জন্যে যেসব বাড়ি তৈরি হয়েছিল।" এবার দাঁত বার করে হাসলেন তিনি। বললেন, "সাহেব বাড়ি কলকাতায় একখানাও থাকবে না। আমরা সব ভেঙে বেচে ফেলবো। জমির দাম যে অনেক বেড়ে গেছে। একখানা সাহেব বাড়িতে বড় জোর দুজন সাহেব ভাড়া থাকতো। তার বদলে সেই জায়গায় পঁচিশ-তিরিশটা ফ্ল্যাট তৈরি হবে—অনেক ভাড়া উঠবে।"

হীরালালবাবু বললেন, "তাহলে নজর রাখতে ভুলবেন না, মশাই। এই এলগিন রোড ধরেই আমি গতমাসে দুবার ঘুরেছি—অথচ এই বাড়িটা হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছিলো।"

টাকাটা পকেটে পুরে এই দুপুরবেলায় কলেজের সেই শ্যামলী মেয়েটার কথা সোমনাথের মনে পড়ে যাচ্ছে। ব্যবসার সময়ে অন্য কারুর কথা এখানে কেউ ভাবে না। কিন্তু সোমনাথ সত্যিই কি শেষপর্যন্ত এদের একজন হতে পারবে? আশা-নিরাশার মধ্যে দোল খাচ্ছে সে। বিকেলে একটা মিটিং আছে মিস্টার মাওজীর সঙ্গে। তার আগে অফুরন্ত সময়।

অফিসের টেলিফোনটা এই সময় বেজে উঠলো। সেনাপতি তার নিজস্ব কায়দায় ফোন ধরলো। তারপর সোমনাথকে অবাক করে দিলো, "বাবু, আপনার ফোন।" সোমনাথকে কে ফোন করতে পারে?

ফোনের ওপাশে যে তপতী রয়েছে সোমনাথ ভাবতেও পারেনি।

কলেজ স্ট্রীট থেকে ফোন করছে তপতী। আজ হঠাৎ রিসার্চের কাজ থেকে ছুটি পাওয়া গেছে।

তপতীকে যে এখনই আসতে বলা উচিত তা সোমনাথ বুঝতে পারছে। তপতী নিশ্চয় কিছু বলতে চায়, না হলে সে কেন ফোন করবে?

ফোনে সোমনাথ বললো, "যদি সময় থাকে, চলে আসতে পারো।"

খুঁজে খুঁজে তপতী আধঘণ্টার মধ্যে কানোরিয়া কোর্টের বাহাত্তর নম্বর ঘরে হাজির হলো। সোমনাথ অন্য কোথাও তাকে আসতে বলতে পারতো। অন্তত মেট্রো সিনেমার তলায় দাঁড়ালে ওর অনেক সুবিধে হতো। কিন্তু ইচ্ছে করেই সোমনাথ এখানকার কথা বলেছিল। তপতীকে ঠকিয়ে লাভ নেই। সে নিজের চোখে সোমনাথের অবস্থা দেখুক।

দূর থেকে তপতীকে কাছে আসতে দেখে সোমনাথের বুকটা অনেকদিন পরে দুলে উঠলো।

তপতীর ডানহাতে বেশ কয়েকখানা বই। একটা ছাপানো মিলের শাড়ী পরেছে তপতী। সঙ্গে সাদা ব্লাউজ। ওর শ্যামলিমার সঙ্গে হঠাৎ যেন অন্য কোনো ঔজ্জ্বল্য মিশে এই ক'দিনে তপতীকে অসামান্য করে তুলেছে। ওর মাথার সামনের চুলগুলো তেমনি অবাধ্যভাবে কপালের ওপর এসে পড়েছে। আজ তপতীকে সত্যিই বিদুষী সুন্দরী মনে হচ্ছে।

তপতীর চোখে চশমা ছিল না আগে। একটা কালো ফ্রেমের আধুনিক ডিজাইনের চশমা পরেছে সে। চশমাটা সত্যি ওর মুখের ভাব পাল্টে দিয়েছে। ওকে অনেক গম্ভীর মনে হচ্ছে, ওর যে বয়স হচ্ছে, ও যে আর কলেজের ছোট মেয়ে নেই, তা এবার বোঝা যাচ্ছে।

সোমনাথ বোধ হয় একটু বেশীক্ষণই তপতীর মুখের দিকে তাকিয়েছিল। ঘরে সেনাপতি ছাড়া কেউ নেই। তপতী নিজেও বোধহয় এই পরিবেশে অস্বস্তি বোধ করছে।

সোমনাথ এবার স্তব্ধতা ভাঙলো। গাঢ়স্বরে বললে, "তোমাকে চিনতেই পারছিলাম না। কবে চশমা নিলে?"

তপতী ওর দিকে কয়েক মুহূর্তের জন্য তাকিয়ে রইলো। তারপর পুরানো দিনের মতো সহজভাবে বললো, "দু মাস হয়ে গেল। ভীষণ মাথা ধরছিল। ডাক্তার দেখাতেই বললেন, বেশ পাওয়ার হয়েছে।"

"খুব পড়াশোনা করছো বুঝি?" সোমনাথ সস্নেহে জিজ্ঞেস করে।

"যা কমপিটিশন, না পড়ে উপায় কি?" তপতীর কথার মধ্যে এমন একটা কিশোরী মেয়ের বিস্ময় আছে যা সোমনাথকে মুগ্ধ করে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অনেক মেয়ের জীবন থেকে বিস্ময় চলে যায়। তপতী এখনও এই ঐশ্বর্য হারায়নি।

সোমনাথ এবং তপতীর মধ্যে এখন অনেক দূরত্ব। তবু এই মুহূর্তে সেই অপ্রিয় সত্যকে স্বীকার করতে পারছে না সোমনাথ। সে ভাবলো এখনও তারা দুজনে কো-এডুকেশন কলেজের ছাত্র-ছাত্রী। সোমনাথ উষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে তপতীকে আর একবার নিরীক্ষণ করলো—ওর টিকলো নাক, টানা-টানা চোখ, দীর্ঘ গ্রীবা। তারপর কোনোরকমে বললো, "চশমায় তোমাকে সুন্দর মানিয়েছে তপতী।"

তপতী অন্য অনেক মেয়ের মতো ন্যাকা নয়। মিষ্টি হেসে বিনা প্রতিবাদে

অভিনন্দন গ্রহণ করলো। সোমনাথের দিকে তাকালো তপতী। চোখের পাতা কয়েকবার দ্রুত বন্ধ করে নিজের আনন্দ প্রকাশ করলো এবং বললো, "থ্যাংকস্।" তারপর হাতের কলমের মুখটা খুলতে এবং বন্ধ করতে করতে তপতী বললে, "ফ্রেম করবার সময় আমার ভয় হচ্ছিল তোমার আবার পছন্দ হবে তো।"

তাহলে তপতী আজও সোমনাথের পছন্দ-অপছন্দের ওপর গুরুত্ব দেয়—নিজের চশমা কেনার সময়েও সোমনাথের কথা মনে পড়ে।

"তোমার জন্যে একটু চা আনাই, তপতী?" সোমনাথ জিজ্ঞেস করলো।

তপতী একটু অস্বস্তি বোধ করলো। বললো, "কী দরকার?"

"এ-পাড়ায় আমরা কী-রকম চা খাই, দেখবে না?" সোমনাথ জিজ্ঞেস করলো।

তপতী সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেল।

চা শেষ করে সোমনাথ বললে, "চলো, বেরিয়ে পড়ি।"

"বারে! তোমার কাজের অসুবিধা হবে না?" তপতী জিজ্ঞেস করে। ওর মনটা বড় খোলা। বাংলার বাইরে ছোটবেলা কাটিয়েছে বলে, কলকাতার অনেক নীচতা ও সংকীর্ণতা ওকে স্পর্শ করতে পারেনি।

গম্ভীর সোমনাথ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, "কাজ থাকলে তো অসুবিধা? আপাতত আমার কোনো কাজ নেই।"

তপতীর একটা সুন্দর স্বভাব আছে, কখনও গায়ে পড়ে কোনো জিনিসের ভিতর ঢুকতে চায় না। অহেতুক কৌতূহল দেখায় না। যা জানতে পায় তাতেই সন্তুষ্ট থাকে। ওর মানসিক স্বাস্থ্য যে এদেশের অসংখ্য মেয়ের আদর্শ হতে পারে তা সোমনাথ ভালভাবেই জানে। তপতী বললে, "তাহলে চলো।"

এসপ্ল্যানেড থেকে বাসে চড়ে ওরা নদীর ধারে চাঁদপাল ঘাটের সামনে নেমে পড়লো।

"অতগুলো বই তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে—আমাকে কিছুক্ষণ ভার বইতে দাও, সোমনাথ দু-একখানা বই নেবার জন্যে তপতীর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো।

বইগুলো আরও জোর করে আঁকড়ে ধরলো তপতী। গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে সে হেসে ফেললো। কিন্তু হাসি চাপা দিয়ে তপতী বললো, "তোমার সঙ্গে আজ ঝগড়া করতে এসেছি, সোম।"

এইরকম একটা কিছু আশঙ্কা করেছিল সোমনাথ। তবু সাহস সঞ্চয় করে

বললো, "বইটা হাতে দিয়েও ঝগড়া করা যায় তপতী।"

তপতী বললো, "ভীষণ ঝগড়া করতে হবে যে।" ওর মেঘলা মুখের আড়ালে আবার হাসির রৌদ্র উঁকি মারছে।

স্ট্র্যাণ্ড রোড ধরে ওরা দুজন মন্থর গতিতে দক্ষিণ দিকে হাঁটছে। এই দুপুরে এখানে তেমন ভিড় থাকে না। মাঝে-মাঝে দূরে কলেজের খাতা-পত্র হাতে দু-একটি ছাত্র-ছাত্রীর জোড় দেখা যাচ্ছে। রাস্তার ওপারে ইডেন গার্ডেন। পশ্চিমে ধীর প্রবাহিণী গঙ্গার দিকে ওরা দুজনেই মাঝে-মাঝে তাকাচ্ছে।

তপতী এবার নিস্তব্ধতা ভাঙলো। জিজ্ঞেস করলো, "তোমার খোঁজখবর নেই কেন?"

সোমনাথ কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না। সে কোনো উত্তর না দিয়েই হাঁটতে লাগলো।

তপতী বললো, "যে খবর চায় সে যদি খবর না পায় তাহলে তার মনের অবস্থা কেমন হয়?"

"খুব কষ্ট হয়। তাই না?" সোমনাথ বেশ অস্বস্তি বোধ করছে।

"তুমি তো কবি। তুমিই উত্তর দাও।" তপতী সরলভাবে দায়িত্বটা সোমনাথের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলো।

কবি! পৃথিবীতে একমাত্র তপতীই এখনও তাকে কবি বলে মনে রেখেছে। কবিতার সঙ্গে বেকার সোমনাথের এখন কোনো সম্পর্ক নেই।

আজকের এই জনবিরল নদীতীরে দাঁড়িয়ে, হারিয়ে যাওয়া অতীতের অনেক কথা সোমনাথের মনে পড়ে যাচ্ছে।

হাওয়ায় অবাধ্য চুলগুলো সামলে নিয়ে সোমনাথ বললো, "অনেকদিন আগে প্রথম যখন এখানে এসেছিলাম, সেদিনকার কথা মনে আছে তোমার?"

হাসলো তপতী। বললো, "তারিখটা ছিল ১লা আষাঢ়।"

"তারিখটা তোমার মনে আছে তপতী!" অবাক হয়ে গেল সোমনাথ।

"ইতিহাসের ছাত্রী। পুরানো সব কথা মনে না রাখলে পাস করবো কী করে?" সহজভাবেই উত্তর দিলো তপতী।

তপতীর মুখের দিকে তাকালো সোমনাথ। ওর জন্যে ভারী মায়া হচ্ছে সোমনাথের। একবার ইচ্ছে হলো, ওর নরম হাতদুটো ধরে সোমনাথ বলে, "তপতী, ভালবেসে তুমি আমাকে ধন্য করেছো। কিন্তু তোমার নির্বাচনের জন্যে সত্যি আমার দুঃখ হয়। একজন সহপাঠী হিসেবে আই-জেনুইনলি ফিল স্যরি ফর ইউ।"

কিন্তু তপতীকে কিছুই বলতে পারছে না সোমনাথ। মেয়ে হয়েও ওর আত্মবিশ্বাস আছে। তপতী নরম, কিন্তু লতাগাছের মতো পরনির্ভর নয়।

অনেকগুলো চেনা মুখ মনে পড়ছে। সোমনাথ বললো, "পুরানো দিনগুলোর কথা ভাবতে বেশ লাগছে তপতী।"

নদীর বেপরোয়া হাওয়ার অশোভন উৎপীড়ন থেকে নিজের শাড়ি সামলে নিয়ে তপতী বললো, "ইতিহাসের ছাত্রী, আমরা তো দিনরাতই অতীত নিয়ে পড়ে আছি—তাই মাঝে-মাঝে ভবিষ্যতের দিকে উঁকি মারতে লোভ হয়।"

সোমনাথ ভাবলো একবার বলে, "তাতো মনে হচ্ছে না তপতী। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তোমার এক বিন্দু মায়া মমতা থাকলে বেকার সোমনাথ ব্যানার্জির সঙ্গে তুমি এইভাবে ঘুরে বেড়াতে না।"

"দীপঙ্করকে মনে আছে তোমার?" সোমনাথ জিজ্ঞেস করলো তপতীকে।

"খুব মনে আছে। ভীষণ চ্যাংড়া ছিল।" তপতী উত্তর দিলো।

"শুনলাম, আই-এ-এস পেয়েছে। আলিপুরের এ-ডি-এম হয়ে আসছে", সোমনাথ খবর দিলো।

তপতী কোনো আগ্রহ দেখালো না। সোমনাথের মনে পড়লো, এই দীপঙ্কর কলেজে তপতীর সুনজরে আসবার জন্যে কত চেষ্টা করেছে—ফার্স্ট ইয়ারে। কিন্তু তপতী একেবারেই পাত্তা দেয়নি দীপঙ্করকে। পড়াশোনায় ভাল বলে দীপঙ্করের একটু দম্ভ ছিল। তপতী এই ধরনের ছেলের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেনি। দীপঙ্কর শেষপর্যন্ত লম্বা চিঠি লিখেছিল তপতীকে। সেই দীর্ঘ চিঠি তপতীকে আরও বিরক্ত করেছিল। উত্তর না দিয়ে চিঠিটা নিজে হাতে দীপঙ্করকে ফিরিয়ে দিয়েছিল তপতী।

তপতী, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যদি তোমার একটুও মমতা থাকতো তাহলে আজ দীপঙ্কর রায়ের ওয়াইফ হতে পারতে, সোমনাথ মনে মনে বললো।

কলেজ থেকে পালিয়ে সেই যেদিন ওরা প্রথম এই নদীর ধারে এলো, সেদিনটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সোমনাথ। শ্রীময়ী, সমর, তপতী—জন্মদিনে ওদের সামান্য খাওয়াবে ঠিক করেছিল সোমনাথ।

কমলা বউদির কাছ থেকে সেদিন সকালেই তিরিশ টাকা নগদ জন্মদিনের উপহার পেয়েছিল সোমনাথ।

সোমনাথের জীবনে তখনও কত রঙীন স্বপ্ন। নিত্য নতুন অনুপ্রেরণায় কবি সোমনাথ তখন অজস্র কবিতা লিখে চলেছে। সেই সব সৃষ্টির তখন দুজন নিয়মিত পাঠিকা—কমলা বউদি ও তপতী। তপতী সবে তখন মীরাট

থেকে এসে ওদের কলেজে ভর্তি হয়েছে। ইংরিজী মিডিয়ামে পড়েছে এতদিন। ভাল বাংলা জানে না বলে ভীষণ লজ্জা। বাংলা সাহিত্য এবং বাংলার লেখক সম্বন্ধে তার বিরাট শ্রদ্ধা। সোমনাথের জন-অরণ্য তার খুব ভাল লেগেছিল।

কবির সঙ্গে তার পরিচয় সেই থেকে ক্রমশ নিবিড় হয়েছে। তপতীর জন্যে এবার সোমনাথ সুদীর্ঘ এক কবিতা লিখেছিল। নাম—আঁধার পেরিয়ে। উচ্ছ্বসিত তপতী বলেছিল, "কলম কেনার টাকাটা আমার উসুল হয়ে গেল। জন-অরণ্য কবিতায় আপনি মানুষকে ভালবাসতে পারেননি, এবার মানুষের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পেরেছেন।"

"সমালোচনা কিছু থাকলে বলবেন," সোমনাথ অনুরোধ করেছিল।

খুব খুশী হয়েছিল তপতী। আঙুলের নখ কামড়ে বলেছিল, "আমার ঘাড়ে মস্ত দায়িত্ব চাপিয়ে দিচ্ছেন আপনি।" একটু ভেবে তপতী বলেছিল, "সবসময় গুরুগম্ভীর হবেন না। কবিদের তো হাসতে মানা নেই।"

তপতীর সমালোচনা অনুযায়ী সোমনাথ লিখেছিল হাল্কা মেজাজের কবিতা 'বনলতা সেনের বয় ফ্রেণ্ডের প্রতি।' সেই কবিতা পড়ে কমলা বউদি খুব হেসেছিলেন। বলেছিলেন, "এ-যে নতুন ধরনের কবিতা দেখছি। কারও বয়-ফ্রেণ্ড হবার চেষ্টা করছো নাকি, সোম?" সোমনাথ মুখ টিপে হেসে উত্তরটা এড়িয়ে গিয়েছিল। কবিতা পড়ে তপতী বলেছিল, "যদি কোনোদিন বই প্রকাশিত হয়, লিখে দিতে হবে 'তপতী রায়েব পরামর্শ অনুযায়ী লিখিত।' না-হলে, অ্যাডভাইস ফি দিতে হবে।"

তপতীর কি এসব মনে আছে? সোমনাথের জানতে ইচ্ছে করে।

নদীর হাওয়ার দৌরাত্ম্য যেন বাড়ছে। সোমনাথের হাতে বইপত্তরের বোঝাটা দিয়ে তপতী আবার আঁচল সামলে নিলো। তারপর নিজেই জিজ্ঞেস করলো, "প্রথম যেদিন তোমার সঙ্গে এখানে এসেছিলাম, সেদিন কি জায়গাটা আরও সবুজ ছিল?"

"তখন আমাদের মন সবুজ ছিল, তপতী," সোমনাথ শান্তভাবে বললো।

তপতী বললো, "তুমি তখনও খুব চাপা ছিলে। মনের ভিতর তোমার কী চিন্তা রয়েছে তা অন্য কাউকে বুঝতে দিতে না। সেদিন কলেজে যাবার পথে বাস স্ট্যাণ্ডেই তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল। আমার সঙ্গে শ্রীময়ী ছিল। তুমি বললে, আপনাদের দুজনকে আজ খাওয়াবো, মাঝে-মাঝে ঘুষ না দিলে কবিতা পড়ার লোক পাওয়া যাবে না।

"আমার মতো শ্রীময়ীও খুব ফরওয়ার্ড ছিল। মুখে কোনো কথা আটকাতো

না। তোমাকে সঙ্গে সঙ্গে বললো, 'খাওয়াবেনই যখন, তখন নদীর ধারে চলুন। জায়গাটা গ্র্যাণ্ড শুনেছি।' তুমি রাজী হয়ে গেলে। হেসে বললে, তিন জনে যাত্রা নিষেধ। সুতরাং চতুর্থ ব্যক্তিকে আমরা দুজনে যেন মনোনয়ন করি। আমি ভেবেছিলাম, ললিতাকে আমাদের সঙ্গে যেতে বলবো। কিন্তু ফচকে শ্রীময়ী বললে, 'প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হযে যাবে।' আমি বাংলা জানতাম না—প্রথমে বুঝতে পারিনি যে শ্রীময়ী বলতে চাইছে, ললিতাকে দলে নিলে ছেলে এবং মেয়েব প্রপোবশন নষ্ট হয়ে যাবে।

"শ্রীময়ী আমাকে গোপনে জিজ্ঞেস কবলো, 'তোর নমিনি কে?' আমি হেসে বলেছিলুম, তিনিই তো খাওয়াচ্ছেন! শ্রীময়ীর ইচ্ছে দেখলাম, সমরকে সঙ্গে নেয়। সুতরাং তুমি ওকেই নেমন্তন্ন করলে।"

সোমনাথ হেসে বললো, "সমরকে নির্বাচনের পিছনে সেদিন যে তোমাদের এত চিন্তা ছিল তা আমি জানতাম না। তবে সমব ছোকরা যে অত চালু তা আন্দাজ করিনি।"

অতীত রোমন্থন করে সোমনাথ বললো, "তোমাব মনে আছে তপতী, সেদিন আমরা যখন এখানে এসে পৌঁছলাম তখন দুপুর বারোটা। পনেরো মিনিট এক সঙ্গে হৈ-হুল্লোড় কববাব পবে সমর হঠাৎ ঘড়িব দিকে তাকালো। তারপর বললে, 'নদীর ধারে রেস্তোরাঁয় আমরা পৌনে একটার আগে যাচ্ছি না। সুতরাং কিছুক্ষণেব জন্যে বিচ্ছেদ। যত মত তত পথ! আমাদের সামনে দুটো চয়েস—হয় ইডেন গার্ডেন এবং না হয় নদীব ধার।' শ্রীময়ী একটা সিকি দিয়ে হেড-টেল করলো। ওরা চলে গেল ইডেন গার্ডেনের ভেতর—আমরা দুজন হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম নদীর ধারে।"

"তুমি বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিলে সেদিন, সোমনাথ।" তপতী মনে করিয়ে দিলো।

"ঘাবড়াবো না? তোমার জন্যেই চিন্তা হলো। তুমি যদি ভাবো, আমরা দুই পুরুষ বন্ধু একটা সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র অনুযায়ী তোমাদের আলাদা করে দিলুম।"

সুদর্শনা তপতী ওর নতুন চশমার মধ্য দিয়ে সোমনাথের দিকে স্নিগ্ধ প্রশান্ত দৃষ্টিপাত করলো। বললে, "কবিরা যে ষড়যন্ত্রী হয় না তা আমার চিরদিনই বিশ্বাস ছিল, সোম।"

"তপতী, সেদিন তোমাকে খু-উ-ব ভাল লেগেছিল। বাদল দিনের প্রথম কদম ফুলের মতো!"

"তুমি কিন্তু বড্ড সরল ছিলে, সোমনাথ। শ্রীময়ী ও সমর রাস্তার ওপারে

অদৃশ্য হয়ে যাওয়া মাত্র বেশ নার্ভাস হয়ে পড়েছিলে। তারপর বলেছিলে, 'আপনি যদি চান, আমি এখনই ওদের ডেকে নিয়ে আসছি!' আমি বাধা না-দিলে, হয়তো তুমি ওদের খোঁজ করতে যেতে। আমি পশ্চিমে মানুষ। মীরাটের রাস্তায় সাইকেল চালিয়েছি। জিমনাসিয়ামে যুযুৎসু শিখেছি। ছেলেদের অত ভয় পাই না। বললাম, 'ওদের ডিসটার্ব করবেন কেন শুধু শুধু?' তুমি তখনও নার্ভাসনেস কাটাতে পারোনি। উত্তেজনার মাথায় গোপন খবরটা প্রকাশ করে ফেললে। বললে, 'আজ আমার জন্মদিন।' বউদি তিরিশটা টাকা দিয়ে বললেন, যেমনভাবে খুশি খরচ করতে।"

সোমনাথ মৃদু হাসলো। বললো, "এরপর তুমি কিন্তু আমাকে বেশ ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে তপতী। গম্ভীরভাবে তুমি জিজ্ঞেস করলে, 'সোমনাথবাবু জন্মদিনে পাওয়া টাকাটা অনেকভাবেই তো খরচ করতে পারতেন। কিন্তু আমাদের ডাকলেন কেন?' "

সেদিনের কথা ভেবে এতদিন পরেও তপতী মচকি হাসলো। বললো, "তোমার মুখের অবস্থা দেখে তখন আমার মায়া হচ্ছিল। তুমি ঘাবড়ে গিয়ে বললে, 'আপনি জন-অরণ্য কবিতাটা পছন্দ করে নিজের কাছে রেখে দিলেন। আমার পরের কবিতাগুলোকে কষ্ট করে পড়লেন। তাই কৃতজ্ঞতার ঋণ স্বীকার করতে ইচ্ছে হলো।' "

সোমনাথ অবিন্যস্ত চুলগুলোকে শাসন করতে করতে তপতীর কথায় কৌতুক বোধ করলো। "তুমি যে আমার অবস্থা দেখে মনে মনে হাসছো, তা কিন্তু তখন বুঝতে দাওনি। বেশ সহজ হয়ে বলেছিলে, 'কৃতজ্ঞতা পাঠিকার দিক থেকেই সোমনাথবাবু। একটা পুরো অপ্রকাশিত কবিতা আমাকে দিয়ে দিলেন।' তারপর তুমি রাগ দেখিয়েছিলে, তপতী। বলেছিলে, 'আপনার জন্মদিনে আমাকে এইভাবে বিপদে ফেললেন কেন? কিছু উপহার নিয়ে আসবার সুযোগ দিলেন না!' "

তপতী বললে, "তোমার অসহায় অবস্থাটা তখন বেশ হয়েছিল। আমার মায়া হচ্ছিল, যখন তুমি বললে, 'জন্মদিনের খবরটা শুধু আপনাকেই দেবো ঠিক করে রেখেছিলাম। শ্রীময়ী ও সমর যেন না-জানতে পারে।' "

সোমনাথ একটুও ভোলেনি। তপতীকে বললো, "তুমি রাজী হয়ে গেলে, আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। তুমি যখন বললে, 'জন্মদিনে অভিনন্দন জানাতে হয়, সোমনাথবাবু! আপনি অনেক বড় হোন—অনেক নাম করুন। এবং মেনি হ্যাপি রিটার্নস্ অফ দি ডে,' জানো তপতী, সেই মুহূর্তে তোমাকে হঠাৎ

ভীষণ ভাল লেগেছিল। একবার ভাবলুম, মনের এই আনন্দের কথা তোমাকে বলি। কিন্তু সাহস হলো না।"

তপতী চুপ করে রইলো। তারপর গম্ভীরভাবে বললো, "তোমার এই স্বভাবটাই তো আমাকে ভাবিয়ে তোলে, সোম। তোমার আনন্দ, তোমার দুঃখ—কোনো কিছুতেই ভাগ বসাতে দাও না আমাকে।"

সোমনাথ কোনো উত্তর না দিয়ে চুপচাপ হাঁটতে লাগলো। দূরে সেই পরিচিত রেস্তোরাঁটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। ওখানকার দোতলায় বসেই একদিন ওরা অকস্মাৎ পরস্পরকে আবিষ্কার করেছিল।

সোমনাথ বললো, "মনে আছে তোমার? আমরা পশ্চিমদিকে কোণের টেবিলটা দখল করেছিলাম।"

সোমনাথ নিজের মনেই বললো, "বিরাট কাঁচের জানালার ভিতর দিয়ে গঙ্গার জল দেখা যাচ্ছিলো। আমি অস্ফুটভাবে উচ্চারণ করলাম, পতিত উদ্ধারিণী গঙ্গে। তুমি মুখ ফুটে কিছুই বললে না। শুধু অবাক হয়ে একবার আমার দিকে তাকালে। আমিও গঙ্গার শোভা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তোমার দিকে তাকিয়ে রইলাম। হঠাৎ মনে হলো, চোখের আলোয় দেখা হলো, এই প্রথম আমরা নিজেদের চিনলাম "

তপতী গম্ভীর হয়ে বললো, "তুমি তাহলে মনে রেখেছো? আমি ভাবছিলাম " এবার চুপ করে গেল তপতী।

"কী ভাবছিলে? বলো না, তপতী।" সোমনাথ অনুরোধ করলো।

অভিমানিনী তপতী বলেই ফেললো, "আমি ভাবছিলাম—অতীতকে তুমি ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে দিয়েছো।"

সোমনাথ নির্বাক হয়ে রইলো। সে কী বলবে কিছুই ঠিক র উঠতে পারছে না।

স্নেহময়ী তপতী খুব মিষ্টি স্বরে জিজ্ঞাসা করলো, "রাগ করলে?"

"না, তপতী। রাগ করবো কেন?" সোমনাথ বেশ নার্ভাস হয়ে উঠছে। "জানো তপতী," সোমনাথ আবার কিছু বলবার চেষ্টা করলো।

"বলো," তপতী করুণভাবে অনুরোধ করলো।

"জীবনটাকে কিছুতেই গুছোতে পারলাম না।" সোমনাথ অকপটে স্বীকার করলো। তপতীর কাছে এসব বলতে তার লজ্জা লাগছে। কিন্তু আজ কিছুই সে চেপে রাখবে না। "তুমি, বাবা, বউদি, দাদারা সবাই অধীর আগ্রহে আমার দিকে তাকিয়ে আছো—কিন্তু আমি নিজের পায়ে দাঁড়াতেই পারছি না।

তোমাদের সবাইকে আমি নিরাশ করছি। কোথাও নিশ্চয় আমার একটা সিরিয়াস দোষ আছে।"

তপতী এ-বিষয়ে মোটেই বিব্রত নয়। বললো, "তুমি বড্ড বেশী ভাবো, সোম। অবশ্য তোমার মধ্যে কবিতা রয়েছে, তুমি ভাববেই তো।, অনেকে একদম ভাবে না—না নিজের সম্বন্ধে না অপরের সম্বন্ধে।"

"তারা বেশ সুখে থাকে। তাই না?" সোমনাথ জিজ্ঞেস করলো।

"তা হয়তো থাকে—কন্তু তাদের আমার মোটেই ভাল লাগে না। দীপঙ্করের কথা বলছিলে তুমি। ছেলেটা ঐ ধরনেব। আই-এ-এস হতে পারে, কিন্তু নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত।"

সোমনাথ চুপচাপ রইলো। তারপর দূরে একটা নৌকাব দিকে তাকিয়ে বললো, "তোমার মনে আছে? শ্রীময়ী এবং সমব আমাদের কী বিপদে ফেলেছিল? পৌনে একটার সময় রেস্তোরাঁয় ফেরবার কথা—আমরা দুজনে হাঁ করে বসে আছি, ওরা এলো দেড়টার সময়। বকুনি দিতে ফিক করে হেসে সমর বললো, 'ঘড়িতে গোলমাল ছিল।' শ্রীময়ীর মুখচোখেও কোনো বিরক্তির ভাব দেখা গেল না।"

তপতী নিজেও ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে। এখন সোয়া একটা। তপতী বললে, "একটা কথা বলবো? রাগ করবে না?"

"আগে শুনি কথাটা," সোমনাথ উত্তর দিলো।

"তোমাকে লাঞ্চে নেমন্তন্ন কবছি।" তপতী বেশ ভয়ে ভয়ে বললো।

সোমনাথ আপত্তি করলো না। কিন্তু ওর মুখ কালো হয়ে উঠলো।

পশ্চিম দিকের সেই পরিচিত সীটটায় বসলো ওরা। কলেজের সেই পুবানো সোমনাথ কোথায় হারিয়ে গেছে। যে-সোমনাথ আজ তপতীর সামনে বসে রয়েছে সে প্রাণহীন নিষ্প্রভ। ঝকঝকে সুন্দর কবিতার ভাষায় যে কথা বলতে পারতো, সে এখন চুপচাপ বসে থাকে। নিতান্ত প্রয়োজন না হলে মুখ খোলে না। অথচ একে কেন্দ্র করেই তপতীর সব স্বপ্ন গড়ে উঠেছে।

সোমনাথ এই মুহূর্তে প্রেমেব মধ্যেও অর্থের বিষ দেখতে পাচ্ছে। এখানে এই গঙ্গার তীরে প্রিয় বান্ধবীকে নিয়ে বার বার আসবে এমন স্বপ্ন সোমনাথ অবশ্য দেখেছিল। কিন্তু তাই বলে তপতী খরচা দেবার প্রস্তাব করবে এটা অকল্পনীয়।

তপতী বুঝতে পারছে হঠাৎ কোথাও ছন্দপতন হয়েছে। সে যা সহজভাবে নিয়েছে, সোমনাথ তা পারছে না।

"রাগ করলে ?" তপতী জিজ্ঞেস করলো।

সোমনাথ প্রশ্নটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলো। বললো, "না।"

সোমনাথ ভাবছে ১লা আষাঢ়ের সেই প্রথম আবিষ্কারের পর এই নদী দিয়ে অনেক জল বয়ে গিয়েছে। ভাঁটার টানে সোমনাথ ক্রমশ পিছিয়ে পড়েছে আর তপতী জোয়ারের স্রোতে ক্রমশ এগিয়ে চলেছে। সেই সেদিন যখন প্রথম দেখা হলো তখন দুজনেই কলেজের প্রথম বছরের ছাত্রছাত্রী। সুদর্শন সোমনাথ সচ্ছল পরিবারের ভদ্র সন্তান। উপরন্তু সে কবি—সাধারণ মেয়ের সাধারণ দুঃখ থেকে জন-অরণ্যের মতো কবিতা লিখে ফেলতে পারে। আর তপতী সাধারণ একটা সুশ্রী শ্যামলী মেয়ে। স্বভাবে মধুর, কিন্তু এই বাংলায় নতুন। ভাল করে বাংলা উচ্চারণ করতে পারে না—কবিতা লেখা তো দূরের কথা। সোমনাথকে শ্রদ্ধা করতে পেরেছিল বলেই তো তপতী নিজের হৃদয়কে অমনভাবে দিয়েছিল।

কিন্তু তারপর ? তপতী পড়াশোনায় ভাল করেছে। ছাত্রী হিসাবে নাম করেছে। আর সোমনাথ অর্ডিনারি থেকে গেছে। তপতী অনেক নম্বর পেয়েছে, সোমনাথ কোনো রকমে ফেলের ফাড়া কাটিয়েছে। তপতী সুন্দর ইংরেজী লিখতে পারে, বলতে পারে আরও ভাল। সোমনাথ ইংরিজীর কোনো ব্যাপারেই তেমন সুবিধে করতে পারে না। সোমনাথ পাস কোর্সের বি-এ, তপতীর অনার্সে ভাল ফল পেতে কোনো অসুবিধে হয়নি। এরপর প্রিয়বান্ধবীর সঙ্গে সোমনাথ আর তাল রাখতে পারেনি। তপতী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। প্রথম শ্রেণীর এম-এ ডিগ্রিটা নিতান্ত সহজভাবেই সে ভ্যানিটি ব্যাগে পুরে ফেলেছে। সোমনাথ এই আড়াই বছর ধরে ডজন ডজন চাকরির আবেদন করেছে এবং সর্বত্র ব্যর্থ হয়েছে। এখন তপতী রায় রিসার্চ স্কলার। সোমনাথের কবি হবার স্বপ্ন কোনকালে শুকিয়ে ঝরে পড়েছে। তার এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ কার্ডের নম্বর দু লক্ষ দশ হাজার সতেরো।

এসব তপতীর যে অজ্ঞাত তা নয়। কিন্তু কোনো এক ১লা আষাঢ়ে সে যাকে আপন করে নিয়েছিল, হৃদয়ের স্বীকৃতি দিয়েছিল, তাকে সে আজও অস্বীকার করেনি। সোমনাথের জীবনের পরবর্তী ঘটনামালার সঙ্গে তপতীর ভালবাসার যেন কোনো সম্পর্ক নেই। তপতী এর মধ্যে আরও প্রস্ফুটিতা হয়েছে। ভারী সুন্দর দেখতে হয়েছে তপতী—ফার্স্ট ইয়ারে বরং এতোটা মনোহরিণী ছিল না সে।

সোমনাথ ভাবলো যৌবনের প্রথম প্রহরে অনেকে অনেক রকম আকর্ষণে মুগ্ধ হয়—ক্ষণিকের জন্য অযোগ্য কাউকে মন দিয়েও ফেলে। কিন্তু বুদ্ধিমতীরা

সেইটাই শেষ কথা বলে মেনে নেবার নির্বুদ্ধিতা দেখায় না। সময়ের সঙ্গে শ্রীময়ী তো কত ঘুরে বেড়িয়েছে। ইডেনে নির্জন প্যাগোডার ধারে ১লা আষাঢ়েই তো ওরা দুজনে ইচ্ছে করে দেড় ঘণ্টা বসেছিল। চুম্বনেও আপত্তি করেনি শ্রীময়ী। তারপর সুপুরুষ সময়ের হাত ধরে শ্রীময়ী তো কত দিন লেকের ধারে, বোটানিকসে এবং ব্যাণ্ডেল চার্চের প্রাঙ্গণে ঘুরে বেড়িয়েছে। কিন্তু যেমনি সময় পড়ায় পিছিয়ে পড়তে লাগলো, যেমনি বোঝা গেল ওর ভবিষ্যৎ নেই, অমনি শ্রীময়ী ব্রেক কষেছে, আর বোকামি করেনি।

সোমনাথ ভাবলো, ভালই করেছে শ্রীময়ী। নিজের মতামতের পুনর্বিবেচনার অধিকার প্রত্যেক মানুষের আছে। না হলে, শ্রীময়ী আজ কষ্ট পেত—সিঁথির লাল রঙের জোরে অফিসার অশোক চ্যাটার্জির নতুন ফিয়াট গাড়িটায় অমন সুখে বসে থাকতে পারতো না।

শুধু শ্রীময়ী কেন? কলেজের কত মেয়ে তো ক্লাসের কত ছেলের সঙ্গে ভাব করেছে, একসঙ্গে সিনেমা থিয়েটার দেখেছে, অন্ধকারে অধৈর্য বন্ধুদের একটু আধটু দৈহিক প্রশ্রয় দিয়েছে। অরবিন্দের মতো যেসব ছেলে চাকরি পেয়েছে, তারা বান্ধবীদের গলায় মালা পরাতে পেরেছে। বাকি সব সঙ্গিনী কোথায় হারিয়ে গিয়েছে। যার জীবনসঙ্গিনী হবার অভিলাষ ছিল তাকেই এখন পথে দেখলে মেয়েরা চিনতে পারে না। বেকারদের সঙ্গে প্রেম করবার মতো বিলাসিতা মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েদের নেই। তাদের আর্থিক নিরাপত্তা চাই। নিজের বোন থাকলেও সোমনাথ তাই খুঁজতো।

"তুমি ভীষণ রেগে গেছো, মনে হচ্ছে। একটাও কথা বলছো না," আবার অভিযোগ করলো তপতী।

ছোটো ছেলের মতো হাসলো সোমনাথ। ওর এই হাসিটা তপতীর খুব ভাল লাগে। সে বলেই ফেললো, "তোমার হাসিটা ঠিক একরকম আছে, সোম। খুব কম লোক এমনভাবে হাসতে পারে।"

"হাসি দিয়ে মানুষকে বিচার করা আজকের যুগে নিরাপদ নয়, তপতী," সোমনাথ হাসি চাপবার চেষ্টা করলো।

"যারা মানুষ ভাল নয়, তারা এমন হাসতে পারে না।" সোমনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে সপ্রতিভভাবে তপতী উত্তর দিলো। এই সহজ নির্মল হাসি দেখেই বহু সহপাঠীর ভিড়ের মধ্যে সোমনাথকে তপতী খুঁজে পেয়েছিল।

খাবারের অর্ডার দিয়েছে তপতী। সোমনাথ কী খেতে ভালবাসে সে জানে। খেতে খেতে সোমনাথ বললো, "খুব ঝগড়া করবে বলেছিলে যে

হেসে ফেললো তপতী। "করবোই তো। কিন্তু খাওয়ার সময় ছেলেদের সঙ্গে ঝগড়া করতে নেই।"

"পারমিশন দিচ্ছি," সোমনাথ বললো।

এবার তপতী বললো, "সোম, তুমি আমাকে এমনভাবে দূরে সরিয়ে রাখছো কেন?" অনেক কষ্ট করে তপতী যে কথাগুলো বলছে তা সোমনাথের বুঝতে বাকী রইলো না।

মুহূর্তের জন্যে স্তম্ভিত হয়ে রইলো সোমনাথ। তারপর ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, "আমি যেসবের যোগ্য নই তুমি অকাতরে তাই আমাকে দিয়েছো, তপতী। কিন্তু আমি অমানুষ নই। তোমার ক্ষতি করতে পারবো না।"

শান্ত তপতী গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কারও সঙ্গে কথা বললে, চিঠি লিখলে, দেখা করলে, বুঝি তার ক্ষতি করা হয়?"

"আমাদের এই দেশে মেয়েদের ক্ষেত্রে হয়, তপতী। তোমার কোনো ভাল করতে পারিনি, তোমার যোগ্য করে নিজেকে তৈরিও করতে পারিনি —কিন্তু তোমার ভবিষ্যৎটা নষ্ট করবো না," সোমনাথের গলা বোধ হয় একটু কেঁপে উঠলো।

তপতী কিন্তু সহজভাবে সোমনাথের দিকে তাকালো। তারপর প্রশ্ন করলো, 'মেয়েরা যে ছেলেদের সমান, এটা তুমি স্বীকার করো সোম?"

"ওরে বাবা! অবশ্যই করি। সংবিধানসম্মত অধিকার, স্বীকার না করে উপায় আছে? সামনেই হাইকোর্ট।" দূরে কলকাতা হাইকোর্টের চুড়োটা এখান থেকে দেখা যাচ্ছে।

তপতী বললো, "তাহলে আমাকে নাবালিকা ভাবছো কেন? তুমি তো আমার কাছে কিছুই চেপে রাখোনি।"

"আমার নিজের কনসেন্স তো চেপে রাখতে পারি না, তপতী। আমার সম্মান নেই, চাকরি নেই, রোজগার নেই—তোমার সব আছে।"

তপতী জিজ্ঞেস করলো, "তাহলে আমার নিজের কোনো অধিকার নেই? আমার কাকে পছন্দ করা উচিত তা আমি ঠিক করতে পারবো না? চাকরি ছাড়া পুরুষ মানুষের অন্য কিছুই মেয়েরা ভালবাসতে পারবে না? বিদেশে তো এমন হয় না। ইংলণ্ড আমেরিকায় তো কত মেয়ে চাকরি করে স্বামীকে পড়ায়—নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করে।"

গম্ভীর হয়ে উঠলো সোমনাথ। বললো, "তুমি এবং আমি বিদেশে জন্মালে বেশ হতো, তপতী।"

তপতীর মনোবলের অভাব নেই। বললে, "যেখানেই জন্মাই—যা মন চায তা করবোই।"

চুপ করে রইলো সোমনাথ। সে ভাবছে, বিদেশে জন্মালে, কোনো সমস্যাই থাকতো না—সেখানে কেউ এমনভাবে বেকার বসে থাকে না।

"কী ভাবছো?" তপতী জিজ্ঞেস করলো।

বিষণ্ণ অথচ শান্ত সোমনাথ বললো, "তুমি দিচ্ছো বলেই যদি আমি গ্রহণ করি তাহলে কেউ আমাকে ক্ষমা করবে না, তপতী। ভাববে জেনেশুনে এই বেকার-বাউণ্ডুলে একটা শিক্ষিতা সুন্দরী সবল মেয়ের সর্বনাশ করেছে। জানো তপতী, আড়াই বছর দোরে-দোরে চাকরি ভিক্ষে করে দুনিয়ার কাছে ছোট হয়ে গেছি—কিন্তু এখনও নিজের কাছে ছোট হইনি। নিজের কাছে ছোট হতে আমার ভীষণ ভয় লাগে।"

তপতী কিছু না বলেই ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। মেয়েরা অনেক বড় বড় ব্যাপারে কত সহজে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে—ছেলেরা পারে না, তাদের মধ্যে কত দ্বিধা এবং দ্বন্দ্ব থেকে যায়।

সোমনাথ বললো, "তুমি এবং কমলা বউদি হয়তো বিশ্বাস করবে না—কিন্তু আজকাল মাঝে-মাঝে ভয় হয়, শেষ পর্যন্ত আমি নিজের কাছে যেন ছোট না হয়ে যাই।"

বেয়ারা বিল দিয়ে গেল। সোমনাথ বিলটা নিতে গেলে, তপতী অকস্মাৎ ওর হাতটা চেপে ধরলো। এই প্রথম তপতীর উষ্ণ অঙ্গের কোমল স্পর্শ পেলো সোমনাথ। ঘন সান্নিধ্যের এক অনাস্বাদিত শিহরণ মুহূর্তের জন্য অনুভব করেও, পরমুহূর্তে সে হাত ছাড়িয়ে নিলো। সোমনাথের মনে হলো নিজের কাছে সে এবার সত্যিই ছোট হয়ে যাচ্ছে।

তপতী গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করলো, "তোমাকে এখানে নিয়ে এলো কে?"

সোমনাথ বললো, "সব জিনিসের একটা নিয়ম আছে, তপতী। ছেলেদের ছোট করতে নেই।"

তপতী বললে, "প্লীজ সোমনাথ। আমার কথা শোনো। আজ প্রথম ইউ-জি-সি স্কলারশিপের আড়াইশ' টাকা পেলাম। আমার অনেকদিনের ইচ্ছে ছিল প্রথম মাসের টাকা পেয়ে তোমার কাছে আসবো।"

তপতী এবার কোনো কথা শুনলো না। বিলের টাকাটা মিটিয়ে সে বেরিয়ে এলো।

বাস স্টপের দিকে হাঁটতে হাঁটতে সোমনাথ বললো, "তুমি বিশ্বাস করলে না।

আমার কাছে টাকা ছিল। আজই হঠাৎ দেড়শ' টাকা রোজগার হয়ে গেল।"

তপতী বললো, "এই তো শুরু। আমি জানি, বিজনেসে তুমি অনেক টাকা রোজগার করবে। এবং তখন ..."

কথাটা শেষ করছে না তপতী। ইতিমধ্যে তপতীর বাস এসে গেছে—সে ভবানীপুরে যাবে। সোমনাথ ফিরে যাবে অফিসে।

বাসে তপতীকে তুলতে তুলতেই সোমনাথ জিজ্ঞেস করলো, "তখন ?"

"তখন কোনো কথাই শুনবো না—সারাজীবন তোমার অন্ন খাবো।"

তপতীর শেষ কথাগুলো অসংখ্য বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে এক অনির্বচনীয় সুরের ঝঙ্কারে সোমনাথের কানে এখনও বাজছে। সোমনাথকে নিজের পায়ে দাঁড়াতেই হবে। সংসারের পরগাছা হয়ে সোমনাথ কিছুতেই আর সময়ের অপচয় করবে না।

বিকেলবেলায় মিস্টার মাওজীর সঙ্গে সোমনাথের দেখা করার কথা আছে। মাওজীরা নানারকম কেমিক্যালের ব্যবসা করেন। আদকবাবুই এদের খবর দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "ভারী ভদ্দরলোক, বোম্বাই মুসলমান- এরা। আপনার ব্রিজবাবুর মতো শুধু নিজের আত্মীয়কুটুম্ব এবং গাঁয়ের লোকদের কোলে ঝোল টানে না। মুখুজ্যে, চাটুজ্যে, হাজরা, দাস, বোসদের সঙ্গেও এরা সম্পর্ক রাখে—লাভের সবটাই দেশে পাঠাবার জন্যে এরা উঁচিয়ে বসে নেই।"

মাওজীদের সঙ্গে এর মধ্যে কয়েকবার দেখা করে এসেছে সোমনাথ। ওঁরা একেবারে বিদায় দেননি। সোমনাথকে একটু বাজিয়ে দেখেছেন। দু-একটা অফিস থেকে খবরাখবর আনতে বলেছেন। সোমনাথ যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে। দু-একটা খবরও এনেছে।

মিস্টার মাওজী আজ জিজ্ঞেস করলেন, "কাজকর্ম কেমন হচ্ছে, মিস্টার ব্যানার্জি ?"

এ-পাড়ার অভিজ্ঞতা থেকে সোমনাথ জেনেছে, কখনও বলতে নেই যে কিছুই হচ্ছে না। তাতে পার্টির ভরসা কমে যায়, ভাবে লোকটার দ্বারা কিছু হবে না। তাই ব্যবসায়িক কায়দায় সোমনাথ বললে, "আপনাদের শুভেচ্ছায় চলে যাচ্ছে।"

মাওজী জিজ্ঞেস করলেন, "এখন কোন লাইনে কাজ করছেন ?"

কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না সোমনাথ। কোথায় সায়েব বাড়ি ভাঙা হচ্ছে, এই খোঁজখবর করছে বললে মিস্টার মাওজী নিশ্চয় ইমপ্রেসড হবেন না। হঠাৎ খাম এবং কাগজের কথা মনে পড়ে গেল। বললো, "পেপার, স্টেশনারি এই সব অফিস সাপ্লাইয়ের দিকে জোর দিচ্ছি।"

মাওজী বললেন, "ওসব লাইনে তো বেজায় ভিড়। ওখানে খুব সুবিধে হবে কী?"

"অফিস-টফিসে হায়ার লেভেলে কিছু জানা-শোনা আছে, কোনোরকমে চালিয়ে দিচ্ছি।" সোমনাথ বেশ সুন্দর অভিনয় করলো। মাওজী যদি জানতে পারেন—গত ক'মাসে সে সর্বসমেত তিরিশ এবং দেড়শ টাকা রোজগার করেছে!

"কাজ বাড়িয়ে যান," মিস্টার মাওজী বললেন। "বিজনেস এমন জিনিস যে দাঁড়িয়ে থাকাটাই মৃত্যু। সব সময় এগিয়ে যেতে হবে।"

কী ধরনের উত্তর দেওয়া উচিত সোমনাথ বুঝতে পারছে না। শেষ পর্যন্ত বললো, "বুঝতেই পারছেন—ক্যাপিটালের অভাব। টাকা না হলে ব্যবসা হয় না। সরকারী ব্যাঙ্কগুলো বলছে পয়সা আমরা দেবো। কিন্তু কেবল নাম-কা-ওয়াস্তে। ওদের কাছে টাকা নিয়ে তো ক্যাপিটেল বাড়ানো যায় না।"

এমন সময় মাওজীদের আর এক ভাই ঘরে ঢুকলেন। সিনিয়র মিস্টার মাওজী এবার ছোট ভাইয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। জুনিয়র মাওজী সোমনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনাকে তো দেখেছি মনে হচ্ছে।"

"কোথায় বলুন তো?" স্ট্র্যাণ্ড রোডের রেস্তোরাঁর লোকটা এতক্ষণ বসেছিল না তো? সোমনাথের একটু চিন্তা হলো।

মাওজী বললেন, "এবার মনে পড়েছে। লেকের ধারে। একটা অ্যামবাসাডার গাড়ি চালাচ্ছিলেন আপনি। সঙ্গে এক ভদ্রমহিলা ছিলেন। আপনারা কোকাকোলা খেলেন। আমরাও ওই দোকানে কোক খাচ্ছিলাম।"

সিনিয়র মাওজী ধরে নিলেন সোমনাথের গাড়ি আছে। তিনি বললেন, "যা বলছিলুম, মিস্টার ব্যানার্জি। নজরটা উঁচু করুন। আপনার গাড়ি রয়েছে, জানাশোনা কোম্পানি রয়েছে অনেক—আপনি বড় বড় কাজ ধরার চেষ্টা করুন। টাকার জন্যে ভাববেন না। টাকার কোনো দরকার নেই। আপনি শুধু অর্ডার বুক করবেন। কোম্পানি সোজা মাল পাঠিয়ে দেবে—আপনি কমিশন পেয়ে যাবেন।"

মিস্টার মাওজী যে কী বলছেন সোমনাথ বুঝতে পারছে না!

মাওজী বললেন, "আমাদের কয়েকজন আত্মীয় বোম্বাইতে একটা কেমিক্যাল ফ্যাকটরি খুলেছে। কয়েকটা প্রোডাক্ট আমরা নিজেরাই বাজারে চালাচ্ছি। আপনি একটু বসুন—আমার কাজিন বোম্বাই থেকে এসেছে, এখনই দেখা হয়ে যাবে।"

মিস্টার মাওজীর কাজিন একটু পরেই এলেন। সব শুনে বললেন, "আপনাকে একটা সুযোগ দিতে পারি আমি। আমাদের নতুন মাল কয়েকটা জায়গায় চালু করবার চেষ্টা করে দেখুন। আপনার কোনো আর্থিক দায়িত্ব নেই। সোজা এখানে অর্ডার পাঠিয়ে দেবেন। তারপর যদি ভাল কাজ দেখাতে পারেন—আপনার ফিউচার ব্রাইট। আমরা আপনাকে এজেন্সি দিয়ে দেবো। কমিশন পাবেন।"

বেশ উত্তেজনা বোধ করছে সোমনাথ। আদকবাবু বললেন, "দেখুন যদি আপনার কিছু হয়। ও-ঘরে মিস্টার সিংঘী তো বোম্বাই-এর ভাল একটা কোম্পানির এজেন্সি রেখেছেন। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মাসে বারোশ' টাকা রোজগার করছেন।"

সুতরাং বলা যায় না—হয়তো এবার সত্যিই সোমনাথ ব্যানার্জির ভাগ্য খুলবে।

বউদি এদিকে অধৈর্য হয়ে উঠেছেন। বলছেন, "বাবাকে আর চেপে রেখে লাভ কী?"

সোমনাথ বললো, "দাঁড়ান, আগে একটু আশার আলো দেখি। এখনও পর্যন্ত তো আপনার দেওয়া পয়সাতেই টিফিন সারছি।"

সোমনাথ ঠিক করেছিল কাউকে বলবে না। কিন্তু বউদির কাছে চাপতে পারলো না সোমনাথ। "বউদি, যা দেখছি, বড় জায়গায় বড় টোপ ফেলতে হয়। নোংরা জামা-কাপড় পরে বাসে-ট্রামে ঝুলে পারচেজ অফিসারদের কাছে গেলে কাজ হয় না। দু-একদিন যদি গাড়িটা বার করবার দরকার হয়?"

"এত বলবার কী আছে?" বউদি ভেবে পান না। "তা ছাড়া তোমার দাদা এখানে নেই। মাঝে-মাঝে গাড়িটা বার করলে বরং ভালই হবে। তুমি আমার কাছে পেট্রলের দাম নিয়ে নেবে।"

তেলের দাম দরকার হবে না। এখনও নগদ দেড়শ' টাকা পকেটে রয়েছে। মাছের তেলেই মাছ ভাজবে সোমনাথ।

কিন্তু সোমনাথের ভাগ্যটা নিতান্তই পোড়া। নতুন কেমিক্যালসের নমুনা এবং চিঠিপত্তর নিয়ে কাছাকাছি চার-পাঁচ জায়গায় দেখা করলো সোমনাথ। সবাই টেলিফোন নম্বর পর্যন্ত লিখে নিলো। সোমনাথ প্রতিদিন সেনাপতির কাছে জানতে চায় কোনো ফোন এসেছিল কিনা। সেনাপতি বলে, "কোথায় আপনার ফোন?"

ফোন আসে অনেক। কিন্তু সবই সুধাকর শর্মার। সুধাকর শর্মা কাজের চাপে হিমসিম খেয়ে যান।

অত কাজের মধ্যেও বিকেলের দিকে যাঁর সঙ্গে টেলিফোনে সুধাকরবাবু কথা বলেন তাঁর নাম নটবর মিত্তির।

কয়েকবার নটবরবাবুকে দেখেছে সোমনাথ। সুধাকর শর্মা ওঁকে সঙ্গে নিয়ে আড়ালে চলে যান। দুজনে কী সব গোপনে কথাবার্তা হয়।

এই বন্ধুহীন জগতে এখন আদকবাবুই একমাত্র সোমনাথের ভরসা। বিশুবাবু যে কোথায় উধাও হয়েছেন কেউ জানে না। সেনাপতির ধারণা, তিনি এক ফ্রেণ্ডের সঙ্গে বিজনেস-কাম-প্লেজার ট্রিপে বেরিয়েছেন—গাড়িতে বিহার এবং উড়িষ্যা ঘুরবেন। বিশুবাবু থাকলে দু-একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা যেত।

আদকবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কী ভাবছেন অত, মিস্টার ব্যানার্জি?"

সোমনাথ বললো, "আপনি যদি না হাসেন, তাহলে একটা প্রশ্ন করি।"

"বলুন।" আদকবাবু সম্মতি দিলেন।

"আচ্ছা, এই ঘরে এতগুলো লোক হাত গুটিয়ে চুপচাপ বসে আছে, অথচ সুধাকরবাবুর এত কাজ কী করে হয়?"

হেসে ফেললেন আদকবাবু। তারপর বললেন, "কেন মিছে কথা বলবো: শ্রম। এই দুনিয়াতে কপালটা বিধাতাপুরুষ দেন—কিন্তু শ্রম পুরুষমানুষের নিজস্ব।"

সেই সময় যে নটবরবাবু ওখানে এসে পড়েছেন কেউ লক্ষ্য করেনি। নটবরবাবুর সঙ্গে আদকবাবুর পরিচয় আছে। নটবরবাবুর গোলগাল চেহারা। বুশ শার্টের তলায় পাঁচ নম্বর ফুটবলের মতো একটি ভুঁড়ি রয়েছে। মাথার মধ্যিখানে তিন ইঞ্চি ব্যাসের গোল টাক পড়েছে। ওখানকার ক্ষতিপূরণ হয়েছে অন্যত্র। দুই কানে বেশ কিছু বাড়তি চুল ভদ্রলোকের।

নটবরবাবু হুঙ্কার ছাড়লেন, "কী বললেন? ডাহা ভুল। ওনলি ওয়ান-

আপন-এ-টাইমের কথা বলে কেন এই ইয়ংম্যানের টুয়েলভ-ও-ক্লক বাজাচ্ছেন? ‘শ্রম’ দিয়ে যদি কিছু হতো তাহলে কুলি এবং রিকশাওয়ালারাই কলকাতার সবচেয়ে বড়লোক হতো!”

সোমনাথ অবাক হয়ে ওঁর মুখের দিকে তাকালো। নটবর বললেন, “বিজনেসের একমাত্র কথা হলো পি-আর।”

“সেটা আবার কী জিনিস?” আদকবাবু বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

নটবর একগাল হেসে বললেন, “পাবলিক রিলেশন অর্থাৎ জনসংযোগ।”

সোমনাথ এখনও বোকার মতো তাকিয়ে আছে। নটবরবাবু বললেন, “এখনও বুঝতে পারলেন না? যেসব ক্ষমতাবান লোক আপনার কাছে মাল কিনবেন তাঁদের সঙ্গে আপনার সংযোগটা কী রকম তার ওপর নির্ভর করছে।”

সোমনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে অধৈর্য নটবর বললেন, “এখনও বুঝতে পারছেন না? অন্য জাতের ছেলেরা তো পেট থেকে পড়বার আগেই এই সব জেনে ফেলে।”

সুধাকরজী এখনও আসেননি। ওঁর টেবিলের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে নটবর মিত্তির বললেন, “এই শর্মাজীকেই দেখুন না কেন। মাল খারাপ, ওজন কম, দাম বেশী। তবু শর্মাজী পটাপট অর্ডার পাচ্ছেন ওই জনসংযোগের জোরে। আর আপনি ঐ সব কোম্পানিতেই কম দামে ভাল মাল অফার করুন। এক আউন্স কেমিক্যাল বিক্রি করতে পারবেন না। যদিও বা বিক্রি করতে পারেন, পেমেণ্ট কিছুতেই পাবেন না। আট মাস-ন’মাস পরে পয়সার অভাবে আপনি ব্যবসা ডকে তুলে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরে যাবেন। অথচ ঠিক মতো জনসংযোগ করুন……”

কথায় বাধা পড়লো। সুধাকরজী এসে পড়লেন। নটবর মিত্তির বললেন, “ওঁর সঙ্গে জরুরী কথাবার্তা আছে। যদি এ-সব ব্যাপার শিখতে চান—আসবেন এই গরীবের কাছে।” এই বলে নিজের একখানা ভিজিটিং কার্ড সোমনাথের হাতে গুঁজে দিয়ে নটবর মিটার সামনের টেবিলে চলে গেলেন। দু মিনিটের মধ্যে ওঁরা দুজনে আবার বেরিয়ে পড়লেন।

আদকবাবু এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। এবার বিরক্তভাবে বললেন, “লোকটা যেন কেমন ধরনের! সুধাকরবাবুর সঙ্গে গলায় গলায়। আমার কিন্তু মোটেই ভাল লাগে না ওঁকে।”

কয়েক দিন পরে নটবর মিত্তিরের সঙ্গে রবীন্দ্র সরণির ওপরেই দেখা হয়ে গেল সোমনাথের। “ও মিস্টার ব্যানার্জি, শুনুন শুনুন,” নটবর মিত্তির

সোমনাথকে ডাকলেন।

সোমনাথ নমস্কাব করলো নটববকে। মিস্টার মিটার জিজ্ঞেস করলেন, "কেমন হচ্ছে বিজনেস ?"

সোমনাথ কিছু চেপে বাখলো না। বললো, "কয়েকটা কাপড়ের কল এবং কাগজের কলে পারচেজ অফিসাবদের সঙ্গে নিয়মিত দেখা করছি। ভাল দু-একটা কেমিক্যালস আছে।"

"কিছু হচ্ছে ?" মিস্টাব মিটাব একগাল হেসে জিজ্ঞেস করলেন।

"চেষ্টা করছি।" সোমনাথ বললো।

এবার হা-হা করে হেসে উঠলেন নটবর মিটাব। "ওই চেষ্টাই করে যাবেন। আর আপনার নাকেব ডগায় অর্ডার নিয়ে যাবে সুধাকর কোম্পানি !"

পকেট থেকে কৌটো বাব কবে নস্যি নিলেন নটবর মিটাব। "আপনি সন অফ দি সয়েল তাই বলছি। না হলে আমাব কী ? আপনি হোল লাইফ ধবে ভেরাণ্ডা ফ্রাই করুন না, আমাব কিছু এসে যাবে না। শুনুন মশাই, সোজা কথা—বড় বড কোম্পানিবা আপনাব কাছে মাল কিনবে না। তারা নামকবা কোম্পানিব ঘর থেকে ডাইরেক্ট মাল নেবে। বিলিতী কোম্পানির কেমিক্যাল ছেড়ে তাবা আপনাব ওই মাগুজী কোম্পানির মাল টাচ করবে না। ঠিক কিনা ?"

সোমনাথকে একমত হতে হলো। নটবব মিটার বললেন, "তাহলে আপনাকে যেতে হবে মাঝারি এবং ছোট-ছোট কোম্পানিতে। ঠিক কি না ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ," সোমনাথ বললে।

নটবর মিটার মিটমিট করে হেসে বললেন, "ছোট-খাট কোম্পানিগুলো সব এখন ইণ্ডিয়ানদের হাতে। গেঁড়াকলেব সুবিধের জন্যে মালিকরা নিজেদের ভাইপো-ভাগ্নে এবং গাঁয়েব লোকদের এনে পারচেজ অফিসে বসিয়ে দিয়েছে। তারা মালিকদের সুবিধে দেখছে এবং সেই সঙ্গে নিজেদের সুবিধেও করছে।"

সোমনাথ চুপ করে আছে। নটবর মিটার বললেন, "সুতরাং আপনাকে বশীকরণ মন্তরটা আগে জানতে হবে, যেমন জানেন সুধাকরজী। আর না-জানলে আমাদের মতো পাবলিক রিলেশন কনসালটেণ্টদের কাছ থেকে শিখে নিতে হবে।"

নটবর মিটার বললেন, "ট্যাক্সি পাচ্ছি না বলেই আপনার সঙ্গে এইভাবে সময় নষ্ট করতে পারছি। না হলে, অ্যাজ এ জনসংযোগ উপদেষ্টা আমি ভীষণ ব্যস্ত। অর্ডার সাপ্লাই লাইনে যারা পাকা লোক তারা জানে নটবর মিটারের দাম।"

নটবর মিটার আবার নস্যি নিলেন। বললেন, "যাকগে ওসব বাজে কথা—নিজের প্রশংসা নিজের মুখে মানায় না। আপনি পারচেজ দেবতাদের সন্তুষ্ট করবার মন্তর শিখুন। সুধাকরবাবু একটা সুন্দর কথা বলেন—যতক্ষণ না অফিসারের সঙ্গে ক্যাশের ব্যবস্থা হলো ততক্ষণ দুশ্চিন্তা থেকে যায়। যেমনি বুঝলাম, মাল খায়, টাকা নেয়, আর ভাবনা থাকে না। ঘরটা আমার পাকাপাকি হবার চান্স রইলো। নিজের স্বার্থেই অফিসার আমার স্বার্থটা দেখবেন।"

সোমনাথের এসব কথা মোটেই ভাল লাগছে না। সে বললো, "নিজেকে ছোট করে কী লাভ, মিস্টার মিটার?"

আঁতকে উঠলেন নটবর মিটার। "ওরে বাবা! এ যে ফিজিক্সের কথা তুলে ফেললেন। স্যরি, ফিজিক্স নয়—ফিলজফি। এখানে মশাই, কেউ ফিলজফি করতে আসে না—টু-পাইস কামাতে আসে। তা ছাড়া আপনি নিজেকে ছোট করবেন কেন? প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই তো দেবতা আছেন—গ্রেট বিবেকানন্দ সোয়ামী বলে গেছেন। মনে করুন, আপনি সাক্ষাৎ নারায়ণের সেবা করছেন, হোক না সে পারচেজ অফিসার।"

নটবর মিত্তির ঘড়ির দিকে তাকালেন। বললেন, "না মশাই, ট্যাক্সি পাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছে না। আমি ট্রামেই উঠে পড়বো এবার। তবে শুনে রাখুন—জাত সেল্‌সম্যানের কাছে প্রত্যেক খদ্দের একটা চ্যালেঞ্জ! পৃথিবীতে এমন লোক জন্মায়নি যার দুর্বলতা নেই। বাইরে থেকে মনে হবে দুর্ভেদ্য দুর্গ, কিন্তু খোঁজ করলে দেখা যাবে কোথাও একটা দরজা খোলা আছে। আমার নেশা হলো, মানুষের এই ভেজানো দরজা খুঁজে বার করা। খুউব ভাল লাগে! আপনি মশাই, ফিলজফি-টফি ভুলুন—মন দিয়ে জনসংযোগ করুন।"

সোমনাথ গম্ভীর হয়ে হাঁটতে লাগলো। চিৎপুর রোড থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ডালহৌসি স্কোয়ারে এসে হঠাৎ হীরালাল সাহার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ভদ্রলোক হাঁ করে রাইটার্স বিল্ডিংসের দিকে তাকিয়ে আছেন। ওঁর চোখে যে ছোটছেলের লোভ রয়েছে তা সোমনাথও বুঝতে পারছে। ধরা পড়ে গিয়ে হীরালালবাবু লজ্জা পেলেন। মুখে হাসি ফোটাবার ব্যর্থ চেষ্টা করে বললেন, "আপনাকে সত্যি বলছি, এই ভাঙা বাড়ির বিজনেস করে আমার অভ্যেস খারাপ হয়ে গেছে। কোনো পুরানো বাড়ি দেখলেই হিসেব করতে ইচ্ছে হয় ভাঙলে কত কাঠ, কত লোহা, কত পাথর পাওয়া যাবে। কখন

কোটেশন দিতে হয় কিছুই ঠিক নেই তো!"

"তা বলে আপনি এই রাইটার্স বিল্ডিংস-এর দিকে তাকাবেন?" সোমনাথ জিজ্ঞেস করে।

হীরালালবাবু রেগে উঠলেন। "কেন? অন্যায়টা কী মশাই? চিরকাল তো আর এ-বাড়ি থাকবে না। একদিন না একদিন ভাঙতে হবেই।" হীরালালবাবু বললেন, "সায়েব বাড়ি বলেই আমার আগ্রহ। ইণ্ডিয়ান আমলে রাইটার্স বিল্ডিং তৈরি হলে আমি সময় নষ্ট করতুম না। স্বাধীনতার পরে যেসব দেশলাই বাক্সর মতো নতুন বাড়ি হয়েছে আমি তো সেদিকে তাকিয়েও দেখি না। জানেন মিস্টার ব্যানার্জি, ভবিষ্যতে যাঁরা আমাদের এই বাড়ি-ভাঙা লাইনে আসবে তারা একেবারে পথে বসবে। হাল আমলের বাড়িগুলোতে কিসস্যু নেই। সায়েব বাড়িগুলো খতম হলেই কলকাতা খতম হয়ে গেল।"

হীরালালবাবু তারপর বললেন, "এলগিন রোডের বাড়িটায় হাজার দুয়েক টাকা ঢালবেন নাকি? চার-পাঁচ দিনের মধ্যে লাভ পেয়ে যাবেন। আমার কিছু টাকা কমতি পড়েছে। ভাবলুম—কেন ঐ পাগড়ি পরা গুড়ের নাগরী-গুলোর কাছে হাত পাতি। আপনি লোকাল লোক রয়েছেন।"

কমলা বউদি একবার প্রশ্ন করলেন না। ব্যাঙ্কের চেকবইটা বার করে সোমনাথের হাতে দিলেন। বললেন, "তুমি যখন ব্যবসায় চালছো, আমি ভেবে দেখবার কে?"

ব্যাঙ্ক থেকে তুলে টাকাটা হীরালালবাবুর হাতে দিয়েছে সোমনাথ। উনি সঙ্গে সঙ্গে রসিদ লিখে দিলেন। বললেন, "আমার মনে হয় অন্তত হাজার টাকা লাভ পেয়ে যাবেন। চারদিনের জন্যে দু হাজার টাকা লাগিয়ে হাজার টাকা পকেটে এলে মন্দ কী? কোনো বিজনেসে এই প্রফিট পাবেন না।"

সোমনাথের মনে হচ্ছে এবার মেঘ কাটছে। নটবরবাবুর কথাগুলো থেকেও সে কিছু শেখবার চেষ্টা করছে। অসৎ পথে যাবে না সোমনাথ। কিন্তু মানুষের বিশ্বাস উৎপাদনের চেষ্টা করতে হবে—না হলে সত্যিই তাঁরা কেন অর্ডার দেবেন?

সোমনাথের সাহসও বেড়ে যাচ্ছে। ক'দিন আগেই এক কাপড়ের মিলে

গিয়েছিল। ওখানকার মিস্টার সেনগুপ্ত বললেন, "আপনার কোম্পানির ছুটো স্যাম্পল টেস্টিং-এ পাঠিয়েছি—এখনও রিপোর্ট আসেনি। তবে মশাই—বড় বড় কোম্পানির একই জিনিস রয়েছে, মালও ভেসে যাচ্ছে। আবার আপনারা একই লাইনে ঢুকতে গেলেন কেন?"

অন্যসময় হলে সোমনাথ মাথা নিচু করে চলে আসতো। কিন্তু এখন বললো, "বড বডরা তো সব সময়েই থাকবেন, স্যর। বম্বেতে অত বিরাট বিরাট কাপড়ের কল থাকা সত্ত্বেও আপনারা তো একদিন সাহস করে এখানে কল বসিয়েছিলেন—এবং এত নাম করেছেন।"

"বাঃ বেশ ভাল বলেছেন। কথাটা আমার মাথাতেই আসেনি। সত্যি তো, কোথায় আর খোলা মাঠ পডে রয়েছে? রুই কাতলা থাকা সত্ত্বেও চুনোপুঁটিরা সাহস করে ঢুকে পড়ছে—এবং যোগ্যতা দেখিয়ে আমাদের কোম্পানির মতো বড হচ্ছে।" মিস্টার সেনগুপ্ত বেশ খুশী হলেন।

সোমনাথকে তিনি বসতে দিলেন। তারপর বললেন, "আপনি ইয়ংবেঙ্গলী—আপনাকে সোজা বলছি—আমাকে ধরে কিছু হবে না। আমার ডিরেকটর মিস্টার গোয়েঙ্কার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো।"

সোমনাথ বললো, "গোয়েঙ্কাজী মস্ত লোক, উনি কি আমার মতো চুনোপুঁটিকে পাত্তা দেবেন?"

সেনগুপ্ত বললেন, "উনি নিজে মস্ত লোক নন—ওঁর শ্বশুর মিস্টার কেজরিওয়াল মস্ত লোক। ওঁদেরই মিল—গোয়েঙ্কাজীকে বছর কয়েক হলো বড় পোস্টে বসিয়ে দিয়েছেন। আপনি চেষ্টা করুন—আপনার জিনিসটা আমাদের মিলে অনেক প্রয়োজন হয়। তাছাড়া কেজরিওয়ালদের আর একটা মিলের মালপত্র গোয়েঙ্কাজী কেনেন।"

গোয়েঙ্কা লোকটি সুদর্শন। এয়ারকুলার লাগানো ঘরে পাতলা আদ্দির পাঞ্জাবি ও ধুতি পরে তিনি বসে আছেন। পাকা মর্তমান কলার মতো গায়ের রঙ, টিয়াপাখির মতো টিকলো নাক। ভদ্রলোকের দেহে বাড়তি মেদ নেই—বরং একটু রোগার দিকেই। বয়স বছর চল্লিশ।

ওঁর সঙ্গে সোমনাথের দেখা হয়ে গেল। ঘরের একদিকে একটা কালো রোগা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ে-টাইপিস্ট নিজের কাজ করছে। সোমনাথ বললে, "আপনার অমূল্য সময় নষ্ট করবো না, স্যর। শুধু রেসপেক্ট জানাতে এসেছি।"

টেলিফোনে সেনগুপ্তর কাছে বিষয়টা শুনেছেন গোয়েঙ্কাজী। গালের পান

সামলাতে সামলাতে বললেন, "মালের রিপোর্ট কী রকম হয় দেখা যাক।"

কেমিক্যালসের ধাবেই গেল না সোমনাথ। বললো, "ওসব আপনাব হাতে রইলো, মিস্টার গোয়েঙ্কা। আপনার এত নাম শুনেছি।"

"কোথায় আমার নাম শুনলেন?" বেশ খুশী হয়েই গোয়েঙ্কা প্রশ্ন করলেন। দামী ফরাসী সেন্টের গন্ধে ঘরটা ভুরভুর করছে।

সোমনাথ বেশ অপ্রস্তুত হয়ে পড়লো। তারপর কোনোরকমে বললো, "আপনার নাম কে না জানে? ভাল জিনিসের কদর দেন আপনি—অজানা কোম্পানিব নতুন মাল বলে ছুঁড়ে ফেলে দেন না। তাই তো কলকাতা থেকে ছুটে আসতে সাহস পেযেছি।"

গোয়েঙ্কাজীর দিকে দামী সিগারেট এগিয়ে দিলো সোমনাথ। উনি একটা সিগারেট তুলে নিলেন। পানের ঢিবিটা বাঁ দিক থেকে গালের ডান দিকে ট্রান্সফাব করলেন। তারপব বললেন, "কলকাতা থেকে দূবত্বটাই আমাদেব মুশকিল।"

"এমন কি আব দূর, মিস্টাব গোয়েঙ্কা? ফবেনে চল্লিশ মাইল কিছু নয়।" সোমনাথ এতক্ষণে একটা আলোচনার বিষয় পেয়েছে।

"কিন্তু রাস্তার যা অবস্থা। এইটুকু পথ যেতেই সমস্ত দিন নষ্ট হয়ে যাবে," মিস্টার গোয়েঙ্কা বললেন।

"অথচ মিউনিসিপ্যালিটি এবং গভবমেণ্ট রাস্তা মেরামতের জন্যে আপনাদের কাছ থেকে মোটা টাকা আদায় কবছে।" সোমনাথ বললো।

"সে সব টাকা যে কোথায় যায়! গোড্ এলোন নোজ্।" সোমনাথেব সহানুভূতিতে মিস্টার গোয়েঙ্কা যে সন্তুষ্ট হয়েছেন তা ওঁর কথার ভঙ্গীতেই বোঝা যাচ্ছে।

সুযোগ বুঝে সোমনাথ এবাব কড়া ডোজে গোয়েঙ্কাজীর প্রশংসা করলো। বললো, "এরকম সাজানো গোছানো অফিস কিন্তু কলকাতাতেও বেশী নেই। এই অফিসের সর্বত্র আপনার সুরুচির পবিচয় ছড়িয়ে রয়েছে।"

গোয়েঙ্কাজী প্রশংসায় নরম হয়েছেন মনে হলো। তবে প্রথম দর্শনেই সোমনাথকে তিনি যে পুরোপুরি বিশ্বাস করছেন না, তাও আন্দাজ করতে সোমনাথের কষ্ট হলো না। সোমনাথ আর এগলো না। শুধু জিজ্ঞেস করলো, "একা একা গাড়িতে কলকাতা ফিরছি—এখান থেকে কেউ যাবেন নাকি?"

গোয়েঙ্কাজী প্রথমে ইতস্তত করলেন। বাড়িতে গিন্নির সঙ্গে ফোনে কথা বললেন। তারপর নিবেদন করলেন, "আমার ওয়াইফের পিসীমার এক ঝি

এখানে পড়ে রয়েছে। বেচারা একলা যেতে পারবে না। আমারও নিয়ে যাবার সময় হচ্ছে না। যদি একটু চিত্তরঞ্জন অ্যাভিন্যুতে শ্বশুরবাড়িতে পৌঁছে দেন।"

খুব উৎসাহের সঙ্গে রাজী হয়ে গেল সোমনাথ। সুপুষ্ট স্তনের অধিকারিণী অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান যুবতীর আফিসিক ভদ্রতাবোধ একটু কম। চিঠি ছাপানো বন্ধ রেখে, আলপিন দিয়ে নখের ময়লা পরিষ্কার করতে করতে মেয়েটি ওদের কথাবার্তা শুনছিল। সে এবার উৎসাহিত হয়ে উঠলো। তার কলকাতা যাবার প্রয়োজন। মৃদু হেসে মিস্টার গোয়েঙ্কা রাজী হয়ে গেলেন।

গাড়ি চালিয়ে ফিরতে ফিরতে সোমনাথের মনে হলো সে যেন থিয়েটারের রাজা সেজেছে। একটা সামান্য কেরানির চাকরি পেলে যে বর্তে যায়, পেটের দায়ে সে কেমন অন্যের গাড়ি নিয়ে থার্ড পার্টিকে লিফট দিচ্ছে। পিছনে গোয়েঙ্কাজীর শ্বশুরবাড়ির বুড়ি ঝি বসে আছেন। সোমনাথের পক্ষে তিনিই অসামান্যা—কারণ গোয়েঙ্কার সঙ্গে পরিচয়ের যোগসূত্র।

সোমনাথের পাশে বসেছে মিস জুডিথ জেকব। মহিলার দেহ থেকে সস্তা দেশী সেন্টের উগ্র গন্ধ ভকভক করে ভেসে আসছে। মুক্তোর মতো ঝকঝকে দাঁতগুলো বার করে মিস জেকব বললো, "তুমি তো খুব স্টেডি ড্রাইভ করো।" সোমনাথ রাস্তার দিকে মনোযোগ রেখে মিটমিট করে হাসলো। মিস জেকব বললো, "তোমার জন্যে আমার ফিঁয়াসের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে।" হুড-হুড করে ব্যক্তিগত অনেক খবরাখবর দিয়ে যাচ্ছে মিস জেকব। ফিঁয়াসে কোন এক কোম্পানিতে উইং মারার কাজ করে। তার ফ্ল্যাটের বাড়তি চাবি মিস জেকবের কাছে আছে। যখন খুশী সে ভাবী স্বামীর ঘরে গিয়ে শুয়ে থাকতে পারে, কোনো অসুবিধে নেই। আরও কী সব বলতে যাচ্ছিলো মিস জেকব, কিন্তু সোমনাথের আগ্রহ নেই শোনবার।

গাড়ি চালাতে চালাতে সোমনাথ অন্য কথা ভাবছিল। নটবরবাবুর মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠছে। নটবরবাবু মানুষকে মোটেই বিশ্বাস করেন না।

নটবর বলেছিলেন, "সব মানুষের কোনো-না-কোনো দুর্বলতা আছে। টাকা এবং মদে নাইনটি নাইন পার্সেন্ট বিসনেজ ম্যানেজ হয়ে যায়। কিন্তু একবার মশাই ভীষণ বিপদে পড়ে গিয়েছিলাম। ওই সুধাকর শর্মাই কেসটা দিলো। বললে, 'দাদা, ভীষণ শক্ত ঠাঁই কিছুতেই সুবিধে করতে পারছি না। বেটাচ্ছেলে নরম-না-হলে, একদম মারা যাবো। গভরমেণ্টকে কিছু খারাপ মাল সাপ্লাই করেছি—শালা ধম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির যদি রিজেকট্ করে দেয় একেবারে ফিনিশ হয়ে যাবো।' প্রথমে সুধাকরকে একটু বকুনি লাগিয়ে

বলেছিলাম, 'তোমার অভ্যেসটা পাল্টাও—মাঝে-মাঝে অন্তত থার্ড ক্লাস মাল সাপ্লাই বন্ধ করো।' সুধাকর বললো, 'এসব কি আজগুবী কথা বলছেন নটবরদা? লর্ড ক্লাইভের আমল থেকে আজ পর্যন্ত কে কবে গোরমেণ্টকে জেন্নুইন মাল সাপ্লাই করেছে?' সুধাকর কিছুতেই শুনলো না, জোর করে কেসটা আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিলো। গভরমেণ্টের লোকটাকে আমি বাজিয়ে দেখলাম—ব্যাটা সত্যি ঘুষ নেয় না, পরের গাড়িতে চড়ে না, মদ ছোঁয় না। কিন্তু আমিও নটবর মিত্তির! তখনও আশা ছাড়লাম না। তিন চারদিন ধরে বিভিন্ন সোর্স থেকে খোঁজখবর নিয়ে শুনলাম, লোকটা এক ম্যাড্রাসী মহাপুরুষ বাবার ভক্ত। আর পায় কে? আমিও বিরাট ভক্ত বনে গেলুম। বললুম, 'আপনি বিরাট ভক্ত—আর আমি কীটাণুকীট, সবে ভক্তিমার্গে পা বাড়িয়েছি। আপনাকে আলো দেখাতে হবে।' দেড়শ' টাকা দিয়ে ম্যাড্রাসী বাবার একখানা স্পেশাল রঙীন ফটো যোগাড় করে পার্ক স্ট্রীটের সেমুলড থেকে দামী ফ্রেমে বাঁধিয়ে ভক্ত-বাবাজীর বাড়ি দিয়ে এলুম। মন্ত্রের মতো কাজ হয়ে গেল। ভদ্রলোক বুঝতেই পারলেন না, ওঁর হাতে আমি তামাক খেয়ে গেলুম।"

কিন্তু নটবর মিত্তির হবে না সোমনাথ। নিজের কাছে সে ছোট হতে পারবে না।

তবে ভদ্রতা করতে পারে সোমনাথ। কলকাতায় ফিরে এসে গোয়েঙ্কাজীর বাড়িতে সোমনাথ একটা ফোন করে দিল।

কয়েকদিন পরে গোয়েঙ্কাজীর সঙ্গে দেখা হলো। ধন্যবাদ জানিয়ে গোয়েঙ্কাজী বললেন, "ঝিকে পৌঁছে দিয়েছেন এই যথেষ্ট—আবার কষ্ট করে ট্রাঙ্ককলে জানাবার কী প্রয়োজন ছিল?"

সোমনাথ বললে, "ভাবলাম, ভাবীজী দুশ্চিন্তা করবেন।"

গোয়েঙ্কাজীর ঘরে ফিরিঙ্গী টাইপিস্টকে দেখতে পাচ্ছে না সোমনাথ। গোয়েঙ্কাজী খবর দিলেন, "চাকরি ছেড়ে পালিয়েছে।" তারপর ফিক করে হেসে বললেন, "গাড়িতে আপনি কিছু করেছিলেন নাকি, সেদিন? সেই যে আপনার সঙ্গে কলকাতায় গেল, তার পরের দিনই রেজিগনেশন।"

নোংরা কথায় কান লাল হয়ে উঠছিল সোমনাথের। দাদার থেকেও বয়সে বড় লোকটা। গোয়েঙ্কাজী বললেন, "আরে, ভয় পাচ্ছেন কেন? এমনি রসিকতা করলাম। আমাদের মিল কলকাতা থেকে এতো দূর যে ভাল লেডি টাইপিস্ট আসতেই চায় না।"

চুপ করে রইলো সোমনাথ। গোয়েঙ্কাজী বললেন, "আপনি তো অনেক বড় বড় অফিসে ঘোরেন। আজকাল নাকি গাউন-পরা মেমসায়েব রাখা আর ফ্যাশন নয়? বড় বড় কোম্পানিরা নাকি এখন শাড়ি-পরা সেক্রেটারী রাখছে?"

হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। এসব খবর তো সোমনাথ রাখে না। বললে, "সে-রকম তো কিছু শুনিনি। দু রকম মহিলাই তো অফিসে কাজ করেন।"

গোয়েঙ্কাজী হেসে বললেন, "আপনি তাহলে অফিসে গিয়ে কোনো স্টাডিই করেন না। গাউন-পরা মেমসায়েবদের ডিমাণ্ড খুব পড়ে গেছে। আপনাদের লাইনের এক ভদ্রলোকের কাছে আমি খবরটা পেয়েছি, নাম মিঃ নটবর মিটার।"

"চেনেন ওঁকে?" সোমনাথ জিজ্ঞেস করলো। পরিচিত একটা নাম শুনে সোমনাথ কিছুটা ভরসা পাচ্ছে।

"মিস্টার মিটার দু-একবার আমার এখানে এসেছিলেন—ওঁর এক বন্ধুর কাজে। ভারি আমুদে মানুষ। একেবারে সুপার সেল্‌সম্যান।"

সোমনাথ ওসব কথায় আগ্রহ দেখালো না। বরং টাকার কথা তুললো। বললে, "আপনার ওপর তো ইনকাম ট্যাক্সের ভীষণ চাপ।"

এই ব্যাপারে সহানুভূতি পেয়ে খুশী হলেন গোয়েঙ্কা। বললেন, "গভরমেণ্ট ডাকাতি করছে—টাকায় সত্তর পয়সা কেটে নিলে, কাজকর্মে মানুষের কোনো উৎসাহ থাকতে পারে?"

সোমনাথ বললো, "লোকের ধারণা বড় বড় পোস্টে আপনারা খুব সুখে আছেন। অথচ মোটেই তা নয়।"

এরপর গোয়েঙ্কাজী হয়তো কিছু টাকার কথা তুলতেন। কিন্তু সোমনাথকে এখনও বিশ্বাস করতে পারছেন না। হাজার হোক সামান্য চেনা।

গোয়েঙ্কার ওপর সোমনাথ বিরক্ত হয়েছে। কিন্তু ব্যবসায়ে ভদ্রতা রেখে চলতেই হবে। মিস্টার মাওজী বলেছেন, বড় পার্টি হলে, একটু-আধটু এনটারটেন করবেন। সোমনাথ তাই গোয়েঙ্কাকে বললো, "কলকাতায় এলে দয়া করে একটা ফোন করে দেবেন। যদি সুযোগ দেন কোথাও লাঞ্চে যাওয়া যাবে।"

এবার বেশ বকুনি খেল সোমনাথ। কারণ গোয়েঙ্কা মুখের ওপর জানিয়ে দিলেন তিনি মাছ মাংস খান না—ড্রিঙ্কও ভালবাসেন না। সুতরাং তাঁকে নেমন্তন্ন করে লাভ নেই। বরং অসুবিধে।

বিদায় দেবার আগে গোয়েঙ্কাজী বললেন, "যদি জানা-শোনা ভাল কোনো লেডি সেক্রেটারী থাকে রেকমেণ্ড করবেন। শাড়ি-পরা বেঙ্গলী সেক্রেটারী রাখতেও আমাদের কোনো আপত্তি নেই।"

সোমনাথের বেশ অস্বস্তি লাগলো। চাকরি না-পেয়ে যে-জগতের মধ্যে সোমনাথ ঢুকতে চেষ্টা করছে সে-সম্পর্কে বাঙালীদের কোনো জ্ঞান নেই। বিজনেস সম্পর্কে এতদিন একটা অস্পষ্ট ধোঁয়াটে ধারণা ছিল সোমনাথের। বিজনেস এমন জিনিস যা বাঙালীরা পাবে না—কারণ তাদের ধৈর্য নেই। সোমনাথ এখন বুঝেছে, হাজার রকমের বিজনেস আছে। কিন্তু যে-বিজনেসের জগতে সে পা ফেলবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে, তার মধ্যে দীর্ঘদিনের নোংরা ষড়যন্ত্র রয়েছে। বিজনেসের অনেক রহস্যই বংশানুক্রমিকভাবে গোপন রাখা হয়—একান্ত আপনজন ছাড়া কেউ জানতে পাবে না।

নটবর মিত্রকে সোমনাথ এবং আদকবাবু যতই অপছন্দ করুক ভদ্রলোক অন্তত ভিতরের অনেক খবর ফাঁস করে দিয়েছেন—যা সারা জীবন বাহাত্তর নম্বর ঘরের এগারো নম্বর টেবিলে বসে থাকলেও সোমনাথ জানতে পারতো না।

মিস্টার গোয়েঙ্কার ব্যাপারেও নটবরবাবু বোধ হয় কিছু সাহায্য করতে পারেন।

গলার টাইটা কয়েক ইঞ্চি ঢিলে করে নটবর মিত্তির নিজের অফিসে বসেছিলেন।

সোমনাথকে দেখেই একগাল হেসে নটবর মিত্তির বললেন, "আসুন মিস্টার ব্যানার্জি। মুখ দেখেই বুঝতে পারছি কিছু হচ্ছে না। কতকগুলো হরিয়ানী পাঞ্জাবী রাজস্থানী সিন্ধি ডাকাত বিজনেসের নাম করে সোনার বাংলাকে লুটে-পুটে খেলে। আমরা তো শুধু আঙুল চুষে-চুষেই দিন কাটিয়ে দিলাম।"

সোমনাথ জিজ্ঞেস করলো, "আপনি মিস্টার গোয়েঙ্কাকে চেনেন?"

"বিজনেসে রয়েছি, এই কলকাতায় অন্তত দেড়শ' গোয়েঙ্কাকে চিনি। আপনি কার কথা বলছেন?"

সোমনাথ পরিচয় দিলো। নটবর একগাল হেসে বললেন, "মহাত্মা মিলস্-এর সুদর্শন গোয়েঙ্কার কথা বলছেন? লালু জামাইবাবুর মতো চেহারা তো?"

হো হো করে হাসলেন নটবর মিত্তির। "আপনি বুঝি ওখানেও মাল বেচবার চেষ্টা করছেন?"

"কেন পার্টি খারাপ নাকি?" নটবর মিত্রের কথার ধরনে সোমনাথ চিন্তায় পড়ে গেল।

"পার্টি খারাপ হতে যাবে কোন দুঃখে? তবে বড় শক্ত ঘাঁটি!" টাই-এর ফাঁসটা আরও আলগা করে নটবর মিত্তির বললেন, "আমার এক পার্টি ওখানে ফেঁসে গিয়েছিল। কিছুতেই সুবিধে করতে পারে না। শেষ পর্যন্ত পাঁচশ' টাকা ফুরনে আমাকে পাঠালো। আমি অনেক কষ্ট করে দু-তিনবার ট্রাই নিয়ে একদিন ড্রিংকসের টেবিলে গোয়েঙ্কাকে ফেললাম। তবে কাজ হাসিল হলো।"

"তবে যে উনি বললেন, মদ-টদে আগ্রহ নেই ওঁর।" সোমনাথ একটু আশ্চর্য হলো।

"আপনি অচেনা-অজানা লোক, তাছাড়া আপনাকে কী বলবে? 'যা-দিনকাল পড়েছে, যাকে-তাকে বলা যায় না—আমার বিনা পয়সায় মাল খেতে ভাল লাগে। আপনি সত্যিই হাসালেন সোমনাথবাবু।"

নটবরবাবু সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে ফিসফিস করে বললেন, "এ-লাইনে আমার চোখ ডাক্তার বি সি রায়ের মতো। পার্টির হাঁচি শুনলে বলতে পারি মনে কী রোগ হয়েছে। আপনার ঐ গোয়েঙ্কাকেও বুঝে নিয়েছি। এক ডোজ ওষুধেই বনের হাতি পোষ মেনেছে! মিস্টার গোয়েঙ্কা এখন আমার ফ্রেণ্ডের মতো হয়ে গেছেন।"

"তাই তো বললেন, মিস্টার গোয়েঙ্কা। আপনার খুব প্রশংসা করলেন।" সোমনাথ জানালো।

বেশ সন্তুষ্ট হলেন নটবর মিটার। গর্বের সঙ্গে বললেন, "অথচ দেখুন, মোটে তিপ্পান্ন টাকা মালের বিল হয়েছিল। আপনাদের বাড়ির মিস্টার মেহতা তো হিন্দুস্থান হোটেলে নিয়ে গিয়ে ওই গোয়েঙ্কার পিছনে সাড়ে-তিনশ' টাকার ফরেন হুইস্কি ঢেলেছিল—কিন্তু পারলো কিছু করতে?"

চুপ করে রইলো সোমনাথ। নটবর বললেন, "অত ঘাবড়াচ্ছেন কেন মশাই? সেল করতে গেলেই কিছু ট্যাক্সো গুণতে হয়—এসব খরচকে সেল্‌স ট্যাক্স মনে করে এ-লাইনের লোকরা।"

সোমনাথের ব্যবসা সম্পর্কে নটবর মিটার এবার আরও কিছু প্রশ্ন করলেন। তারপর বললেন, "খুব দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি—আপনার কেসটা খুব শক্ত। কিছু কাঁচা টাকা ঢেলে আপনি গোয়েঙ্কাকে মাল গছাতে পারবেন না। কারণটা অ-আ-ক-খর মতো সিম্পল। ওই যে অপথালমিক হোয়াইটনার এবং একটা কেমিক্যাল আপনি বেচতে চাইছেন তার জন্যে আমারই এক জানা-শোনা

পার্টির কাছ থেকে গত তিন বছর ধরে গোয়েঙ্কা একশ' টাকায় তিন টাকা করে নমস্কারী পেয়ে আসছে। আপনি নিজেই তো আড়াই পারসেন্টের বেশী কমিশন পাবেন না। তাহলে নিজের পকেট থেকে আরও আধ পারসেন্ট দিতে হয়। মাওজীর হাতে-পায়ে ধরে আপনি সমান বেট দিলেও ফল হবে না। কোন দুঃখে গোয়েঙ্কা নিজের দেশওয়ালী ভাই ছেড়ে আপনার কাছে আসবে?"

উঠতে যাচ্ছিলো সোমনাথ। নটবর বললেন, "আপনি একেবারে হতাশ হবেন না। বাবারও বাবা আছে—হাইকোর্টের ওপরে যেমন রয়েছে সুপ্রীম কোর্ট। গোয়েঙ্কাকে অন্যপথে নরম করতে হবে। আমি তো কাল সকালেই অন্য একটা কাজে গোয়েঙ্কার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। দেখি আপনার জন্যে কোনো পথ বার করতে পারি কিনা।"

সোমনাথ বললো, "মনে হলো, আপনার ওপর ভদ্রলোকের খুব বিশ্বাস আছে। যদি আমার সম্বন্ধে একটু বলে দেন। আমি যে বিশ্বাসযোগ্য লোক সেটাও যদি উনি জানেন।"

নটবর একগাল হেসে বললেন, "অত ছটফট করছেন কেন? বসুন। চা খান। যখন এ-লাইনে প্রথম এলেন তখন বর্ষার পুঁইডগার মতো তাজা কচি মুখখানি ছিল। এই ক'দিনেই শুকিয়ে গেল কেন?"

সোমনাথ বললো, "কিছুতেই কিছু লাগাতে পারছি না, নটবরদা। মিস্টার মাওজী একটা সুযোগ দিলেন—সেটাও যদি হাতছাড়া হয়ে যায়।"

নটবর মিটার লোকটার অন্তর আছে। সোমনাথের কথা শুনে জ্বলে উঠলেন। বললেন, "আপনি কিছু ভাববেন না। আমার উপর বিশ্বাস করে ছেড়ে দিন, মহাত্মা মিলের গোয়েঙ্কাকে আমি কব্জা করে দিচ্ছি। আপনার কোনো চিন্তার কারণ নেই—আপনার কাছ থেকে আমি এই কেসে কোনো চার্জ করবো না।"

নটবর মিত্তির কী করতে কী করে ফেলবেন কেউ জানে না। তবু সোমনাথ আপত্তি করলো না। তার মধ্যে হতাশা আসছে। মনে হচ্ছে এসপার-ওসপার একটা কিছু হয়ে যাক।

পরের দিন বিকেলে ফোনে সোমনাথকে ডেকে পাঠালেন নটবর মিত্তির।

বেজায় খুশী মনে হচ্ছে ভদ্রলোককে। নিজের টাকে হাত বুলিয়ে নটবর বললেন, "আপনার কপাল বোধ হয় খুললো মিস্টার ব্যানার্জি। গোয়েঙ্কাকে যা-বলবার বলে এসেছি।"

ভীষণ উৎসাহিত বোধ করছে সোমনাথ। প্রথমেই আন্তরিক ধন্যবাদ জানালো নটবরবাবুকে।

নটবরবাবু দার্শনিকভাবে বললেন, "শুধু টাকাতেই সব কাজ হাসিল হয় না, মিস্টার ব্যানার্জি। আমাদের এই লাইনে টাকার ওপরেও জিনিস রয়েছে! সুপ্রীম কোর্টের পরেও যেমন আছে রাষ্ট্রপতির কাছে মার্সি পিটিশন।"

এবার সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লেন নটবর মিটার। বললেন, "গোয়েঙ্কা সম্পর্কে একটু বাইরে খোঁজখবর নিলুম। ফরেনে একেই বলে ফিল্ড রিসার্চ। গোপন অনুসন্ধানের খবর অনুযায়ী গোয়েঙ্কার নাড়ি টিপতেই সুড়সুড় করে সব খবর বেরিয়ে এলো। ইউ উইল বি গ্ল্যাড টু নো গোয়েঙ্কার মনে অনেক দুঃখু আছে। পয়সার লোভে কেজরিওয়ালের খোঁড়া মেয়ে বিয়ে করেছে। অমন কার্তিকের মতো চেহারা, কিন্তু শরীরের অনেক সাধ-আহ্লাদ পূরণ হয় না।"

কান লাল হয়ে উঠছে সোমনাথের। নটবরবাবু তা লক্ষ্য করলেন না। তিনি বলে চললেন, "কমবয়সী মেয়েদের ওপর খুউব লোভ আছে। কিন্তু ভীষণ ভয়ও আছে। আমিও চান্স বুঝে টোপ ফেলে দিয়েছি আপনার নামে। চালাক লোক তো—আন্দাজে সব বুঝে নিয়েছে। বলেছি, যেদিন কলকাতায় আসবেন, শুধু দয়া করে ফোনটা তুলে ব্যানার্জিকে জানিয়ে দেবেন। আর সন্ধ্যেটা ফ্রি রাখবেন।"

নটবর মিত্তির আশা করেছিলেন, সোমনাথ এই দুরূহ কাজের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দেবে। তিনি বলতে গেলেন, "অনেক সস্তায় কাজ হয়ে যাবে আপনার। সব ব্যবস্থা করে দেবো আমি—আপনার কোনো চিন্তা থাকবে না।"

প্রায় আর্তনাদ করে উঠলো সোমনাথ। "এ আপনি কী করলেন, মিস্টার মিটার? এসব কথা আপনাকে কে বলতে বললো? ভদ্রলোকের ছেলে ব্যবসায় নেমেছি।"

নটবরবাবু মোটেই উত্তেজিত হলেন না। শান্তভাবে সোমনাথকে বললেন, "এ-লাইনে কে ভদ্রলোকের ছেলে নয়, বলুন? আমি, শ্রীধরজী, মিস্টার গোয়েঙ্কা.

সবাই ভদ্দরলোক। ভদ্দরলোকের ছেলেরাই তো এদেশের পলিটিক্স, গভরমেণ্ট এবং বিজনেস চালাচ্ছে। শুনুন মশাই, আমি যে প্রপোজাল গোয়েঙ্কার কাছে দিয়ে এসেছি তার মধ্যে একটুও অভদ্রতা নেই—যস্মিন্ দেশে যদাচার, কাছা খুলে নদী পার।"

"অসম্ভব," দাঁতে দাঁত চেপে সোমনাথ বললো। অন্য কেউ হলে এতক্ষণ লোকটার থেবড়া নাকে এক ঘুষি বসিয়ে দিত সোমনাথ।

নিজেকে বহু কষ্টে শান্ত করে সোমনাথ বললো, "এসব নোংরামির মধ্যে আমাদের বংশে কেউ কখনও থাকেনি। আপনি লোকটাকে এখনই বারণ করে দিন।"

মুখের হাসি বজায় রেখে নটবরবাবু বললেন, "লাও বাবা! যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর! যাকগে। বলা যখন হয়ে গেছে, তখন চারা নেই। গোয়েঙ্কা যেদিন আপনাকে ফোন করে জানাবেন আসছেন, টেলিফোনে সোজাসুজি বলে দেবেন—আপনি ব্যস্ত আছেন, সন্ধ্যেবেলায় কোনোরকম কো-অপারেশন করতে পারবেন না। তাহলেই গোয়েঙ্কাজী বুঝে নেবেন।"

সোমনাথ আর এক মুহূর্তও দেরি না করে, নটবরবাবুর অফিস থেকে বেরিয়ে এলো। রাগে তার সর্বশরীর জ্বলছে।

কিন্তু যার কোনো মুরোদ নেই, তার শরীর জ্বললে দুনিয়ার কী এসে যায়? যে-সাপের বিষ নেই তার কুলোপানা চক্করে কে ভয় পাবে—মা বলতেন। কোন দিকে যায় সোমনাথ? ইচ্ছে করছে, কোথা থেকে যদি একটা এটম বোমা পাওয়া যেত মন্দ হতো না—চার্নক সাহেবের এই জারজ সৃষ্টির ওপর বোমাটা ফেলে দিত সোমনাথ। চিরদিনের মতো সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। কিন্তু শক্তি কোথায়? এটম বোমা তো দূরের কথা, কলকাতার রাস্তায় দাঁড়িয়ে দু-একটা হারামজাদার গালে থাপ্পড় মারবার মতো সাহসও ঈশ্বর দেননি সোমনাথকে।

মনের ঠিক এমন অবস্থার সময় সেনাপতি ডাকলো, "বাবু, আপনার ফোন।"

"হ্যালো, আমি তপতী বলছি।"

তপতী আর ফোন করবার সময় পেলো না? সোমনাথের গম্ভীর গলা শোনা গেল, "বলো।"

"একটু আগেও তোমাকে ফোন করেছিলাম—শুনলাম, তুমি কোন এক মিস্টার নটবর মিত্রের অফিসে গেছ।"

"অনেক কাজ-কর্ম থাকে, তপতী।" ওর প্রশ্নটা সোমনাথ এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলো।

তপতী বললো, "কই সেদিনের পর তুমি তো আমার খোঁজ করলে না?"

কী বলবে সোমনাথ? শেষপর্যন্ত উত্তর দিলো, "তপতী, কয়েকজন ভদ্রলোকের সঙ্গে মিটিং চলছে—ওঁরা বসে রয়েছেন। পরে একদিন দেখা করা যাবে।"

"কাল আমি থাকছি না। শ্রীরামপুরে যাচ্ছি। অলমোস্ট যেতে বাধ্য হচ্ছি। পরশু তোমার ওখানে যাবো। দেখা হলে, সব বলবো। বেশ সিরিয়াস।"

ফোন নামিয়ে রাখলো সোমনাথ। ইংরেজী ও বাংলা তারিখ মেশানো দেওয়াল ক্যালেণ্ডারটা সামনেই ঝুলছে। পরশু ১৬ই জুন। অর্থাৎ ১লা আষাঢ়।

জন্মদিনটা আনন্দের কেন, এই প্রশ্ন সোমনাথের আগে প্রায়ই মনে হতো। জন্মগ্রহণ করে শিশু তো কাঁদে—তার সমস্ত জীবনের দুঃখ ও যন্ত্রণার সেই তো শুরু। তবু সবাই বলে জন্মদিনে আনন্দ করতে হয়। অনেকদিন আগে মাকে এই প্রশ্ন করেছিল সোমনাথ। "জন্মদিনে আমি তো তোমায় অনেক কষ্ট দিয়েছিলাম, তবু তুমি ১লা আষাঢ়ে আনন্দ করো কেন?"

মা বলেছিলেন, "তুই চুপ কর। অন্যদিন হলে তোকে বকতাম।" জন্মদিনে মা কাউকে বকতেন না। বরং পায়েস রাঁধতেন!

তারপর এই বাড়িতে ১লা আষাঢ়ের অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে। জন্মদিনেই একদিন মৃত্যুর ঘন অন্ধকার নেমে এসেছিল যোধপুর পার্কের বাড়িতে। ১লা আষাঢ় এখন শুধু সোমনাথের জন্মদিন নয়, মায়ের মৃত্যুদিবসও বটে।

আজ যে সোমনাথের জন্মদিন তা কে আর মনে রাখবে? ভোরবেলায় বিছানায় শুয়ে শুয়েই ভাবছিল সোমনাথ। কবে কোনকালে উজ্জয়িনীর প্রিয় কবি আপন খেয়ালে আষাঢ়স্য প্রথম দিবসকে কাব্যের মালা পরিয়ে অবিস্মরণীয় করেছিলেন। তারই রেশ তুলে বহু শতাব্দী পরে আজ ঘরে ঘরে বিরহ-মিলনের রাগিণী বেজে উঠবে। একটু পরে রেডিওতে মহাকবি ও তাঁর সৃষ্টি অমর চরিত্রের উদ্দেশে সংগীতাঞ্জলি শুরু হবে। কিন্তু কে মনে রাখবে, বেকার, ব্যর্থ কবি সোমনাথ ব্যানার্জি ওই একই দিনে পৃথিবীর আলো দেখেছিল? ছন্দের মন্ত্র পড়ে প্রেম-প্রীতি-ভালবাসাকে সেও অমরত্ব দিতে চেয়েছিল।

জন্মোৎসবের আগের দিন থেকেই কত লোকের বাড়িতে অভিনন্দনের পালা শুরু হয়ে যায়। ফুল আসে, ফোন আসে, রঙীন টেলিগ্রাম পৌঁছে দিয়ে যায় ডাকঘরের পিওন। কিন্তু সোমনাথের ভাগ্যে এসেছে দুঃসংবাদের ইঙ্গিত। হীরালাল সাহা যে দু হাজার টাকা নিয়েছিল লাভ সমেত কালকেই তা ফেরত দেবার কথা ছিল। বউদিকে সোমনাথ একটা ইঙ্গিতও দিয়ে রেখেছিল—১লা আষাঢ় তার একটা প্রীতি উপহার পাবার সম্ভাবনা আছে। সোমনাথ এবার কোনো প্রতিবাদই শুনবে না। কমলা বউদি বলেছিলেন, "বেশ। যদি সুখবর সত্যিই কিছু থাকে—নেবো তোমার উপহার। তোমার দাদাকেও শিক্ষা দেওয়া হবে—ভাবছেন, উনি ছাড়া আমাকে কেউ উপহার দেবার নেই!" কিন্তু গতরাত্রে হীরালালকে কিছুতেই খুঁজে পায়নি সোমনাথ। তিন বার অফিসে গিয়েও দেখা হলো না।

ভোরবেলায় বুলবুল একবার কী কাজে ঘরে ঢুকলো। সে কিন্তু কিছুই বললো না। সোমনাথের আজ যে জন্মদিন তা মেজদার বালিকাবধূটি খবরও রাখে না। মেজদা যে সামনের সেপ্টেম্বরে অফিসের কাজে বিলেত যেতে পারে, সেই খবরটাই বুলবুল শুনিয়ে গেল। বললে, "আমি ছাড়ছি না। যে করে হোক আমিও ম্যানেজ করবো বিলেত যাওয়াটা।"

সোমনাথ বললো, "চেষ্টা চালিয়ে যাও—প্রতিদিন দু ঘণ্টা ধরে ঘ্যানঘ্যান করে দাদার লাইফ মিজারেব্‌ল করো।"

বিছানায় উঠে বসে ভীষণ দুর্বল মনে হচ্ছে সোমনাথের। এই বাড়ির সে কেউ নয়। যেন কিছুদিনের অতিথি হয়ে সে যোধপুর পার্কে এসেছিল। নির্ধারিত সময়ের পরও অতিথি বিদায় নিচ্ছে না। এই ঘর, এই খাট-বিছানা, এই টেবিল, এই ফুলকাটা চায়ের কাপ—এসবের কোনো কিছুতেই তার অধিকার নেই। ভদ্রতা করে গৃহস্বামী এখনও অতিথি আপ্যায়ন করছেন। সবাইকে সন্দেহ করছে সোমনাথ। ভয় হচ্ছে, কমলা বউদিও বোধহয় এবার ক্লান্ত হয়ে পড়বেন।

দরজা খুলে সোমনাথ বাড়ির বাইরে বারান্দায় দাঁড়াতে যাচ্ছিলো। এমন সময় রোগা পাকানো চেহারার এক বুড়ো ভদ্রলোককে পুরানো অস্টিন গাড়ি থেকে নামতে দেখা গেল। দ্বৈপায়নবাবুর খোঁজ করলেন ভদ্রলোক। বাবার সঙ্গে আলাপের জন্যে ওপরে উঠে যাবার আগে ভদ্রলোক আড়চোখে সোমনাথকে বেশ খুঁটিয়ে দেখে নিলেন।

ভদ্রলোক গত এক সপ্তাহের মধ্যে দু-তিনবার এলেন। বাবার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে কী সব কথাবার্তা বললেন।

বুলবুল মেজদার অফিস টিফিনের জন্যে স্যাণ্ডউইচ তৈরি করছিল। সোমনাথ জিজ্ঞেস করলো, "লোকটা কে?"

স্যাণ্ডউইচগুলো অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলে মুড়তে মুড়তে বুলবুল ঠোঁট উল্টোলো। ওর মাথায় যে কোনো দুষ্টুমি আছে তা সোমনাথ সন্দেহ করলো।

সোমনাথ বললো, "ঠোঁট উল্টোচ্ছ যে?"

আরও একপ্রস্থ ঠোঁট উল্টে বুলবুল বললো, "বাবে! আমার ঠোঁট আমি উল্টোতে পারবো না?"

সোমনাথের এসব ভাল লাগছে না। বুলবুল বললো, "অধৈর্য হচ্ছো কেন? সময় মতো জানতে পারবে।"

সোমনাথ যে আরও রেগে উঠবে বুলবুল তা ভাবতে পারেনি। বেশ বিরক্ত হয়ে বুলবুল এবার খবরটা ফাঁস করে দিলো। "অর্ধেক রাজত্ব যাতে পাও তার জন্যে বাবা কথাবার্তা চালাচ্ছেন, সেই সঙ্গে···বুঝতেই পারছো।" এই বলে বুলবুল রাগে গনগন করতে করতে নিজের শোবার ঘরে ঢুকে পড়লো।

রোগা বুড়ো ভদ্রলোক আধঘণ্টা পরে বিদায় নিলেন। তারপরেই ওপরে বড় বউমার ডাক পড়লো। মিনিট দশেক ধরে বাবার সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের আলোচনা করে কমলা বউদি একতলায় নেমে এলেন। মেজদার সঙ্গে আড়ালে তাঁর কী সব কথাবার্তা হলো। বউদি আবার ওপরে উঠে গেলেন।

সোমনাথ বাথরুমে ঢুকতে গিয়ে মেজদা ও বুলবুলের দাম্পত্য আলোচনা শুনতে পেলো। বুলবুল ফোঁস ফোঁস করতে করতে বলছে, "তুমি কিন্তু এসবের মধ্যে একদম থাকবে না। বাবার যা ইচ্ছে করুন। ছেলে তো আর কচি খোকাটি নেই।"

স্নানের শাওয়ারের তলায় দাঁড়িয়ে সোমনাথ নিজেকে শান্ত করবার চেষ্টা করছে। অনেকগুলো ১লা আষাঢ়ের সঙ্গে সোমনাথের তো পরিচয় হয়েছে—কিন্তু কোনো ১লা আষাঢ়কেই আজকের মতো নিরর্থক মনে হয়নি সোমনাথের। সোমনাথ এবার ছেলেমানুষী করে ফেললো। জলের ধারার মধ্যে চোখ খুলে হঠাৎ সে জিজ্ঞেস করে বসলো, "আমি কী দোষ করেছি? তোমরা বলো। আমি তো কোনো অপরাধ করিনি—আমি শুধু একটা চাকরি যোগাড় করতে পারিনি।"

কিন্তু এসব প্রশ্ন সোমনাথ কাকে জিজ্ঞেস করছে? সোমনাথ তো এখন নাবালক নেই। এ-ধরনের প্রশ্ন করবার অধিকার তো একমাত্র বাচ্চা ছেলেদের থাকে। এর উত্তর কার কাছ থেকে সে প্রত্যাশা করে? ওপরের বারান্দায়

মৃতদার দুর্বল যে-বৃদ্ধটি বসে আছেন, তিনি উত্তর দেবেন ? না আকাশের ওধার থেকে কোনো এক ইন্দ্রজালে মা কিছুক্ষণের জন্যে ফিরে এসে সোমনাথের সমস্যা সমাধান করবেন ? কেউ তো এসব প্রশ্ন শুনবেও না। উত্তর দেবার দায়িত্ব তাঁর নয় জেনেও, বেচারা কমলা বৌদি কেবল সোমনাথের হাত চেপে ধরবেন এবং ওর তপ্ত কপালে ঠাণ্ডা হাত বুলিয়ে দেবেন।

সোমনাথ বাথরুম থেকে বেরোতেই কমলা বউদি খবর দিলেন, "বাবা তোমায় ডাকছেন।"

বাবা ঠিক যেভাবে ইজিচেয়ারের পূর্বদিকে মুখ করে ব্যালকনিতে বসে থাকেন সেইভাবেই বসেছিলেন। কোনোরকম গৌরচন্দ্রিকা না-করেই তিনি বললেন, "তোমার নিজের পায়ে দাঁড়াবার একটা সুযোগ এসেছে। নগেনবাবু এসেছিলেন—ভদ্রলোকের অবস্থা ভাল। নিজের একটা সিমেন্টের দোকান আছে। ওঁর ছেলে নেই—তিনটি মেয়ে। তোমাকেই দোকানটা দেবেন—যদি ছোট মেয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ হয়।"

বাবার সামনে কথা বলার, বিশেষ করে প্রতিবাদের অভ্যাস, এ-বাড়ির কারুর নেই। তবু সোমনাথ বললো, "নিজের পায়ে দাঁড়ানো হলো কই ?"

বাবা এবার মুখ তুলে অবাধ্য পুত্রের চোখের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, "ওদেব ফ্যামিলি ভাল। আমাদের পাল্টি ঘর। মেয়ের বাঁ হাতে সামান্য ফিজিক্যাল ডিফেক্ট আছে। দেখতে খারাপ নয়। সুলক্ষণা। ক্লাস সেভেন পর্যন্ত পড়েছে। আমি ভেবে দেখলাম, তোমার সমস্যা এতেই সমাধান হবে। বউমার কাছে মেয়ের ছবি আছে, তুমি দেখতে পারো।"

কোনো উত্তর না-দিয়েই সোমনাথ নেবে এলো। বুলবুল জিজ্ঞেস করলো, "ছবিটা দেখবে ?"

এক বকুনি লাগালো সোমনাথ। "তোমাকে পাকামো করতে হবে না।"

ছেলের মতিগতি যে সুবিধে নয়, বাবা বোধ হয় আন্দাজ করতে পেরেছেন। তাই আবার বড় বউমাকে ডেকে পরামর্শ করলেন।

এই ধরনের প্রস্তাবে দ্বৈপায়ন যে সন্তুষ্ট নন, তা কমলা জানে। প্রথমে বাবার মোটেই ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু কোনোদিকে কোনো আশার আলো না-দেখতে পেয়ে নিরুপায় দ্বৈপায়ন মনস্থির করেছেন। এদেশে সোমনাথের যে চাকরি হবে না তা অনেক চেষ্টার পর এবার দ্বৈপায়ন বুঝতে পেরেছেন।

বড় বউমা ফিরে এসে সোমনাথকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গেলেন। তারপর সস্নেহে দেবরকে বললেন, "রাজী হয়ে যাও ঠাকুরপো—বাবার যখন এত ইচ্ছে।"

"এর থেকে অপমানের আমি কিছু ভাবতে পারছি না, বউদি।" সোমনাথের সামনে কমলা ছাড়া অন্য কেউ থাকলে সে এতক্ষণ রাগে ফেটে পড়তো।

বউদির মুখে একটুও উদ্বেগের চিহ্ন নেই। দেবরের পিঠে হাত দিয়ে বললেন, "কিছু মনে কোরো না ভাই—বাবার ধারণা, জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার এইটাই তোমার শেষ সুযোগ।"

সোমনাথ বউদির চোখের দিকে তাকালো না। মুখ ফিরিয়ে নিলো। বউদি বললো, "কে আর জানতে পারছে, কেন তোমার এখানে বিয়ে হচ্ছে।" এরপরে বাবা যা বলতে বলেছেন, কমলা বউদি তা মুখে আনতে পারলেন না। বাবা হুকুম করেছেন, "ওকে জানিয়ে দিও, এরকম সুযোগ রোজ আসে না। এবং কথার বাধ্য না হলে এরপব এ-বাড়িব কেউ আব তার জন্যে দায়ী থাকবে না।"

এ-কথা না শুনলেও, বাবা যে বউদির মাধ্যমে চরমপত্র পাঠিয়েছেন তা সোমনাথ আন্দাজ করতে পারলো। বউদির হাত ধরে সোমনাথ বললো, "তুমি অন্তত আমাকে নিজের কাছে ছোট হতে বোলো না।"

কমলা বউদি বেচারা উভয় সঙ্কটে পড়লেন। পাত্রীব ছবিখানা তাঁর হাতে রয়েছে। বাবার নির্দেশ, সোমের সঙ্গে আজই এসপার-ওসপার করতে হবে।

কমলা বউদি আবার ওপবে ছুটলেন বাবাকে সামলাবার জন্যে। বললেন, "হাজার হোক বিয়ে বলে কথা। দু-একদিন ভেবে দেখুক সোম।"

বাবা সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। বললেন, "যেসব পাত্রের চাকরি-বাকরি আছে তাদের মুখে এসব কথা মানায়, বউমা। নগেনবাবুর হাতে আরও দুটো সম্বন্ধ ঝুলছে। আমাদের ফ্যামিলি সম্বন্ধে এত শুনেছেন বলেই ওঁব একটু বেশী আগ্রহ।"

বেচারা কমলা বৌদি! সংসারের সবাইকে সুখে রাখবার জন্যে কীভাবে নিজের আনন্দটুকু নষ্ট করছেন।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে জামা-প্যান্ট পরে, ব্যাগটা নিয়ে তৈরি হয়েছে সোমনাথ। মেজদা অনেক আগেই বেরিয়ে পড়েছেন। কমলা বউদি এবার সোমনাথের ঘরে ঢুকে পড়লেন। কী মিষ্টি হাসি কমলা বউদির।

সোমনাথের দিকে তাকিয়ে কমলা বউদি সস্নেহে বললেন, "আমার ওপর রাগ করলে, খোকন?"

সোমনাথ অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিলো। তারপর মনে মনে বললো, "পাপিষ্ঠ না-হলে তো তোমার ওপর রাগ করতে পারবো না, বউদি।"

বউদি এবার ডান হাতটা বাড়িয়ে দিলেন। "আড়ি করতে নেই, ভাব করো—আজ তোমার জন্মদিন। মনে আছে, মা তোমাকে কী বলতেন? জন্মদিনে সবাইকে ভালবাসতে হয়, কারুর ক্ষতি করতে নেই, নিজে খু-উব ভাল হতে হয়, সবার মুখে হাসি ফোটাতে হয়।" সোমনাথ পাথরের মতো স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

বউদি এবার আঁচলেব আড়াল থেকে একটা ঘড়ির বাক্স বার করলেন। একটা দামী সুইস রিস্টওয়াচ দেবরের হাতে পরিয়ে দিলেন কমলা বউদি। "অমর যখন সুইজারল্যাণ্ড থেকে এলো তোমার জন্যে আনিয়েছিলাম—জন্মদিনে দেবো বলে। কাউকে জানাইনি।" বউদিব ছোট ভায়ের নাম অমর।

সোমনাথেব চোখে জল আসছে। সে একবার বলতে গেল, "কেন দিচ্ছো? এসব আমাকে মানায় না।" কিন্তু বউদির অসীম স্নেহভবা চোখেব দিকে তাকিয়ে সে কিছুই বলতে পাবলো না। সোমনাথেব বলতে ইচ্ছে করলো, "আগের জন্মে তুমি আমার কে ছিলে গো?" কিন্তু সোমনাথের গলা দিয়ে স্বর বেরুলো না।

কমলা বউদি বোধ হয় অন্তর্যামী। মুহূর্তেই সব বুঝে গেলেন। বললেন, "তোমার দেরি হয়ে যাচ্ছে, খোকন!"

যোধপুর পার্ক বাস স্ট্যাণ্ডেব কাছে সোমনাথের সঙ্গে এক ভদ্রলোকের দেখা হয়ে গেল। ভদ্রলোক নিজেই পরিচয় দিলেন, "সোমনাথ না? তোমার বন্ধু সুকুমারের বাবা আমি। বদ্ধ পাগল হয়ে গেছে সুকুমাব। দিনরাত জেনারেল নলেজের কোশ্চেন বলে যাচ্ছে। বোনদের মারধোর করেছে দু-একদিন। দড়ি দিয়ে হাত-পা বেঁধে রাখতে হয়েছিল ক'দিন। মাথায় ইলেকট্রিক শক দিতে বলছে—কিন্তু এক একবার বোলো টাকা খরচ।"

"লুম্বিনী পার্ক হাসপাতালে কাউকে চেনো নাকি? ওখানে ফ্রি দেখে শুনেছি!" সুকুমারের বাবা বীরেনবাবু জিজ্ঞেস করলেন। ভদ্রলোক রিটায়ার করেছেন। স্ত্রীর গুরুতর অসুখ—ওঁর আবার ফিটের রোগ আছে। মেয়েরাই সংসার চালাচ্ছে। মেজ মেয়ে একটা ছোটখাট কাজ পেয়েছে। না হলে কী যে হতো।

"আমি খোঁজ করে দেখবো," এই বলে সোমনাথ গোলপার্কের দিকে হাঁটতে

আরম্ভ করলো। বাস স্ট্যাণ্ডে দাঁড়াতে ভাল লাগলো না।

তাহলে পৃথিবীটা ভালই চলছে! শিল্প, সাহিত্য, সংগীত ও সংস্কৃতির কেন্দ্র-মণি সুসভ্য এই নগর কলকাতার চলমান জনস্রোতের দিকে তাকিয়ে আছে সোমনাথ। অভিজাত দক্ষিণ কলকাতার নতুন তৈরি উন্নাসিক প্রাসাদগুলো ভোরের সোনালী আলোয় ঝলমল করছে। চাকরি-চাকরি করে একটা নিরপরাধ সুস্থ ছেলে পাগল হয়ে গেল—এই সুসভ্য সমাজতান্ত্রিক সমাজে তার জন্যে কারও মনে কোনো দুঃখ নেই, কোনো চিন্তা নেই, কোনো লজ্জা নেই।

চোখের কোণে বোধ হয় জল আসছিল সোমনাথের। নিষ্ঠুরভাবে নিজেকে সংযত করলো সোমনাথ। "আমাকে ক্ষমা কর, সুকুমার। আমি তোর জন্যে চোখের জল পর্যন্ত ফেলতে পারছি না। আমি নিজেকে বাঁচাবার জন্য প্রাণপণে সাঁতার কাটছি। আমার ভয় হচ্ছে, তোর মতো আমিও বোধ হয় ক্রমশ ডুবে যাচ্ছি।"

কে বলে সোমনাথের মনোবল নেই? সব মানসিক দুর্বলতাকে সে কেমন নির্মমভাবে মন থেকে সরিয়ে দিয়ে ব্যবসার কথা ভাবছে।

হীরালাল সাহার কাছ থেকে লাভের টাকা আদায় করতে যাওয়ার পথে একটা কাপড়ের দোকান সোমনাথের নজরে পড়লো। জন্মদিনে বউদিকে সে কিছু দেবে বলে ঠিক করে রেখেছে। ওখান থেকে একটা তাঁতের শাড়ি কিনলো সোমনাথ। হীরালালবাবুর আগেকার দেড়শ' টাকা পকেটে পকেটেই ঘুরছে। কী ভেবে আর একটা শাড়ি কিনলে সোমনাথ। বুলবুল হয়তো এত কমদামী শাড়ি পরবেই না। লুকিয়ে বাপের বাড়ির ঝিকে দিয়ে দেবে। কিন্তু বড় বউদির যা স্বভাব, ওঁকে একলা দিলে নেবেনই না।

কাপড়ের দুটো প্যাকেট হাতে নিয়ে হীরালালবাবুর অফিসে যেতেই দুঃসংবাদটা পেলো সোমনাথ। হীরালাল সাহা তাকে ডুবিয়েছেন। দু হাজার টাকা বোধ হয় জলে গেল। কাতরভাবে সোমনাথ বললো, "হীরালালবাবু, আপনার অনেক টাকা আছে। কিন্তু ওই দু হাজার টাকাই আমার যথাসর্বস্ব।"

হীরালালবাবু কোনো পাত্তাই দিলেন না। দেঁতো হাসিতে মুখ ভরিয়ে বললেন, "বিজনেসে যখন নেমেছেন, তখন ঝুঁকি তো নিতেই হবে। আমি তো মশাই আপনাকে ঠকাচ্ছি না। এলগিন রোডের বাড়িটা নিয়ে যে এমন ফাঁপরে পড়ে যাবো, কে জানতো? লরি নিয়ে ভাঙতে গিয়ে পরশুদিন শুনলাম কারা বাড়ি ভাঙা বন্ধ রাখবার জন্যে আদালতে ইনজাংশন দিয়েছে।"

কপালে হাত দিয়ে বসে রইলো সোমনাথ। হীরালালবাবু বললেন, "সামান্য দু হাজার টাকার জন্যে আপনি যে বিধবাদের থেকেও ভেঙে পড়লেন। ইনজাংশন চিরকাল থাকবে না, বাড়িও ভাঙা হবে এবং টাকাও পাবেন। তবে সময় লাগবে।"

"কত সময়?" সোমনাথ করুণভাবে জিজ্ঞেস করলো।

সে-খবর হীরালালবাবুও রাখেন না। আদালতের ব্যাপার তো! দুটো তিনটে বছর কিছুই নয়।"

নিজের অফিসে এসে মুহ্যমান সোমনাথ পাথরের মতো বসে রইলো। জন্মদিনের শুরুটা ভালই হয়েছে! বউদির কাছে কী করে মুখ দেখাবে সে?

শান্তভাবে একটু বসে থাকবারও উপায় নেই। মিস্টার মাওজী ফোনে ডাকছেন। এখনই যেতে বললেন।

বউদির দেওয়া নতুন হাত-ঘড়িটার দিকে তাকালো সোমনাথ। হঠাৎ মনে পড়লো তপতীর আসবার সময় হয়েছে। সেনাপতিকে ডেকে বললো, এক দিদিমণি আসতে পারেন। তাকে যেন সেনাপতি বসতে বলে। জরুরী কাজে সোমনাথ বেরিয়ে যাচ্ছে।

সিঁড়ির মুখেই কিন্তু দিদিমণির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তপতী বললো, "বাসে বড্ড ভিড়। দেরি হয়ে গেল।"

সোমনাথ কিছুই বললো না। সময়ের বাজারেও বোধ হয় আগুন লেগেছে—যার যত সময় দরকার সে তত পাচ্ছে না।

তপতীর বোধহয় একটু বসবার ইচ্ছে। কিন্তু সোমনাথের সময় কই? মিস্টার মাওজী তার জন্যে অপেক্ষা করছেন।

তপতী তো জন্মদিনে তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে না। আজ যে ১লা আষাঢ় তা কি ওর মনে নেই?

এই ক'দিনে তপতী যেন শুকিয়ে অর্ধেক হয়ে গেছে। চোখের কোলে কালো দাগ পড়েছে তপতীর। মোটা ফ্রেমের চশমাও সে-দাগ ঢাকতে পারছে না। তপতী একটা অতি সাধারণ সাদা শাড়ি পরেছে। ফিকে নীল রঙের ব্লাউজটাও ভালভাবে ইস্তিরি করা নয়। তপতী বেচারা হাঁপাচ্ছে। প্রায় কাঁদ-কাঁদ হয়ে সে এবার সোমনাথকে বললে, "তুমি আমার কথা ভাবো না।"

কী হলো তপতীর ? একটা সমর্থ ছেলের সামনে একটা কমবয়সী মেয়েকে এমন অসহায়ভাবে কাঁদতে দেখলে, রাস্তার লোকেরা কী ভাববে ?

তপতী কাতরভাবে বললো, "তুমি চিঠি লেখো না, খবর নাও না, আমার সঙ্গে দেখাও করো না। অফিসটাইমে একটা মেয়ের পক্ষে এই চিৎপুর রোডে আসা যে কী কষ্টের। লোকগুলো সব জন্তু হয়ে গেছে। ভিড়ের মধ্যে বাসের দরজার কাছে মেয়েদের চেপে ধরবার জন্যে যা করে।"

চুপ করে আছে সোমনাথ। তপতী ওর মুখের দিকে তাকিয়ে করুণভাবে জিজ্ঞেস করলো, "কই ? তুমি তো রাগ করছো না ? আমার শাড়ির আঁচল ছিঁড়ে দিয়েছে। আর একটু হলে রাস্তায় গাড়ি চাপা পড়তাম।"

সোমনাথের মুখ লাল হয়ে উঠলো। দাঁতে দাঁত চেপে বললো, "কলকাতা শহরটা জঙ্গলের অধম হয়ে যাচ্ছে তপতী। বিশেষ করে এই অঞ্চলটায় কিছু গরিলা আছে।"

তপতী স্তব্ধ হয়ে ওর মুখের দিকে অসহায়ভাবে তাকিয়ে রইলো। তারপর বললো, "ঘড়ি দেখছো কেন ? তোমার সঙ্গে যে অনেক কথা আছে।"

"যে-লোকটার কাছে আমি বিজনেস পেতে পারি সে আমার জন্যে ওয়েট করছে, তপতী।"

তপতী বললো, "তাহলে তোমাকে আটকে রাখা যাবে না। শোনো, বাড়িতে ভীষণ বিয়ের জন্যে চাপ দিচ্ছে। আমার জন্য পরের ছুটো বোন অযথা কষ্ট পাচ্ছে—ওদেরও বিয়ের সময় হয়ে গেছে।"

যে-লোকের চাকরি নেই, রোজগার নেই, নিজস্ব আশ্রয় নেই—তাকে এসব কথা বলে অপমান করে কী লাভ ? সোমনাথ বললো, "বিয়ে করে ফেলো তপতী।"

"তুমি এখনও আমাকে এইভাবে কষ্ট দিতে চাও ?" তপতী কাতরভাবে বললো। "বাড়িতে তুমুল ঝগড়া হয়েছে। রাগ করে শ্রীরামপুরে মাসির বাড়ি চলে গিয়েছিলাম। সোম, আমাদের ব্যাপারটা পাকা করে ফেলা ভাল। চলো, আমরা বিয়েটা রেজিস্ট্রি করে ফেলি। বাড়ির লোকরা তখন চাপ দিয়েও আমার কিছু করতে পারবে না। প্রতিদিনের এই অশান্তি আমার ভাল লাগে না।"

সোমনাথের হ্যাঁ বলবার ক্ষমতা নেই। 'আজ এই জন্মদিনে, লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে, হে ঈশ্বর পরাশ্রিত বেকার সোমনাথকে কেন এমনভাবে অপদস্থ করছো ? আমাকে শাস্তি দিতে চাও দাও, কিন্তু একটা নিষ্কলঙ্ক মেয়েকে

প্রথম পবিত্র প্রেমকে কেন এমনভাবে অপমান করছো, হে ঈশ্বর ?'

কিন্তু কার কাছে প্রার্থনা করছে সোমনাথ ? কোথায় ঈশ্বর ?

সোমনাথের মুখের দিকে অধীর আগ্রহে তাকিয়ে আছে তপতী। গাঢ় স্বরে সে অনুরোধ করলো, "কই ? কিছু বলো।"

কোথাও যদি সামান্য একটু আশার আলো দেখতে পেত সোমনাথ, তাহলে এখনই তপতীকে এই অসহ্য অপমান থেকে মুক্তি দিত। আর তো চুপ করে থাকা চলে না। সোমনাথ কাতরভাবে বললো, "আমায় কিছু সময় ভিক্ষে দিতে পারো তপতী ?"

"তুমি আমার অবস্থাটা বুঝতে পারছো, সোম ?" কাঁদ-কাঁদ গলায় তপতী বললো, "বাবা মা ভাই বোন কেউ আমার দলে নেই। এখন তুমি পিছিয়ে গেলে আমার আর কী রইলো ?"

যার চাকরি নেই, রোজগার নেই, তাকে এই সমাজে যে মানুষ বলা চলে না—সে যে নির্ভবের অযোগ্য—এই সামান্য কথাটুকু বুদ্ধিমতী তপতী কেন বুঝতে পারছে না ?

তপতী বললো, "আমি তো তোমার কাছে কিছুই চাইছি না। শুধু আমাকে নিয়ে একবার রেজিস্ট্রি অফিসে চলো।"

"তপতী, স্ত্রীর ভবণপোষণের দায়িত্বটা পুরুষমানুষের—হাজার হাজার বছর ধরে এই নিয়ম চলে আসছে।" সোমনাথ কথা শেষ করতে পারলো না।

তপতী কিন্তু অবিচল। সে বললো, "ওসব আমি কিছুই বুঝতে চাই না—আগামীকাল আমি আবাব আসবো।"

মিস্টার মাওজীর অফিস থেকে ফিরে সোমনাথ বাহাত্তব নম্বর ঘরে এগারো নম্বর সীটে মাথা নিচু কবে বসে আছে। আজ এই ১লা আষাঢ়েই তার জীবনেব সবগুলো অধ্যায়ের একই সঙ্গে বিয়োগান্ত পরিণতি হতে চলেছে। বাবা নোটিশ দিয়েছেন, হীরালালবাবু ডুবিয়েছেন, তপতী আর সময় দিতে অক্ষম। বাকি ছিলেন মিস্টার মাওজী। তিনিও বললেন, দ্রুত কাজ না-দিলে আর সময় নষ্ট করতে পারবেন না। কেমিক্যাল বেচবার জন্যে মিলগুলোতে তিনি নতুন লোক পাঠাবেন। মিস্টার মাওজীর কাছেও সময় ভিক্ষা করেছে সোমনাথ। বলেছে অন্তত এক সপ্তাহ অপেক্ষা করবার জন্যে।

অতএব সাঙ্গ হলো খেলা। চাকরি হবে না। ব্যবসার নামে সামান্য যা পুঁজি ছিল তা জলাঞ্জলি দিয়ে অবসরপ্রাপ্ত ডবলু বি সি এস দ্বৈপায়ন ব্যানার্জির কনিষ্ঠপুত্র সোমনাথ ব্যানার্জি কোথায় যাবে এবার ?

ক্রিং ক্রিং। সেনাপতি ছিল না। সোমনাথ নিজে গিয়েই ফোন ধরলো।

"হ্যালো হ্যালো। মিস্টার ব্যানার্জি ?" মহাত্মা মিলসের সুদর্শন গোয়েঙ্কা ফোন করছেন। "মিস্টার ব্যানার্জি, সেদিন আপনার ফ্রেণ্ড নটবর মিটার সব বলেছেন। মেনি থ্যাংকস। হাতে একটু সময় পেয়েছি। আজ কলকাতায় যাচ্ছি। গ্রেট ইণ্ডিয়ান হোটেলে সন্ধ্যেবেলাটা আপনার জন্যে ফ্রি রাখবো··· হ্যালো, হ্যালো···কিন্তু হোল নাইট নয়।"

সোমনাথের হাতটা কাঁপছে, গোয়েঙ্কাকে যা বলবে ঠিক করে রেখেছিল তা বলবার আগেই গোয়েঙ্কা বললেন, "তখন আপনার কেস নিয়েও কথা হবে—কুছু গুড নিউজ থাকতে পারে।"

সোমনাথ যা বলতে চেয়েছিল তা বলবার আগেই লাইন কেটে গেল। সোমনাথ দু-তিনবার টেলিফোন ট্যাপ করে রিসিভারটা যথাস্থানে রেখে মাথায় হাত দিয়ে বসলো।

সোমনাথ এখন আর বাধা দেবে না। সময়ের স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দেবে। গোয়েঙ্কাকে ট্রাঙ্ককল করে বলবে না—সে ব্যস্ত আছে এবং নটবর মিটার যেসব কথা বলেছেন তার জন্যে সোমনাথ দায়ী নয়।

সোমনাথের আর কোনো উপায় নেই। এখন নটবরবাবুকে ধরতে পারলে হয়। ভদ্রলোক যদি আবার কলকাতার বাইরে গিয়ে থাকেন তাহলে কেলেঙ্কারি।

দ্রুত কাজ করতে হবে সোমনাথকে। সেনাপতি লুকিয়ে লুকিয়ে বন্ধকীর কাজ করে। নতুন সোনার ঘড়িটা জমা রেখে সেনাপতি শ'পাঁচেক টাকা ধার দেবে না ?

সেনাপতি এক কথায় রাজী হয়ে গেল। বললো, "পাঁচ-ছ'শ যা ইচ্ছে নিন বাবু।"

"তাহলে ছ'শই দাও। হঠাৎ একটা পার্টি কলকাতার বাইরে থেকে আসছে। কত খরচ হবে জানি না।" সোমনাথ বললো।

সেনাপতি বললো, "আপনাকে তো ধার দিতে ভাবনা নেই। আপনি মদও খান না, মেয়েমানুষের কাছেও যান না। বোসবাবু সন্ধ্যাবেলায় টাকা চাইলে আমার চিন্তা হয়। ব্যবসায় না লাগিয়ে উনি সব টাকা হোটেলে রেখে আসেন।"

গোয়েঙ্কাব প্রত্যাশিত ফোন এসেছে এবং সোমনাথের মত পাল্টেছে শুনে নটবর মিত্র বেশ খুশী হলেন। হ্যাণ্ডসেক করে বললেন, "এই তো চাই! সত্যি কথা বলতে কি, যে-পুজোব যে-মন্তব!"

নাকে এক টিপ নস্যি গুঁজে নটবরবাবু বললেন, "মেয়েমানুষকে ব্যবসার কাজে লাগাতে বাঙালীদেব যত আপত্তি—কিন্তু জাপানেব দিকে তাকিয়ে দেখুন। বড় বড় বিজনেস ট্রানজাকশন গীসা বাড়িতে বসেই হয়ে যাচ্ছে। মেয়েমানুষ-খরচাব রসিদ পর্যন্ত অফিসে জমা দিয়ে জাপানীবা টাকা নিচ্ছে—দেখুন তার ফলটা। পৃথিবীতে আজ খ্যাঁদা জাপানীব একটিও শত্রু নেই!"

সোমনাথ মাথা নিচু করে রইলো।

নটবর বললেন, "অত দূবেই বা যাবাব দরকাব কী? বাঙালী মেয়েদেব ব্যবসায় লাগিয়ে কত শেঠজী এই কলকাতা শহরে লাল হয়ে যাচ্ছে।"

সোমনাথ নিজেব স্নায়ুগুলো শান্ত করবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছে।

গোয়েঙ্কা যে আজই কলকাতায় আসছেন নটবববাবু বুঝতে পারেননি। খবরটা শুনেই তিনি লাফিয়ে উঠলেন। বললেন, "যেখানে বাঘেব ভয় সেখানে সন্ধ্যে হয়! গোয়েঙ্কা আব দিন পেলো না? আজকে আমি যে ভীষণ ব্যস্ত। এক বড় পার্টিকে মেয়েমানুষ দিয়ে খুশী করাতে হবে। অথচ এখনও কিছুই ব্যবস্থা করা হয়নি। বেরুবো বেরুবো কবছি, এমন সময় আপনি হাজির হলেন।"

ঘড়ির দিকে তাকালেন নটবরবাবু। বললেন, "আপনাব তো চুনোপুঁটি কেস। এই পার্টি আমাব এক বন্ধুকে দু মাসে ছেষট্টি হাজার টাকা পাইয়ে দিয়েছে। অনেক রিকোয়েস্টের পর পার্টি বন্ধুর নেমন্তন্ন নিয়েছে—আর আমার বন্ধুটি আপনাবই মতন। ব্যবসা করছে, টাকা কামাচ্ছে, কিন্তু এসব লাইনের কোনো খোঁজই রাখে না! আমার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে বসে আছে! সকাল থেকে তিনবার ফোন করেছে—দাদা খরচের জন্যে ভাববেন না। লোকটি বড় উপকারী বন্ধু। কোনো রকম বিপদ, কষ্ট বা ক্ষতি না হয় যেন ভদ্রলোকের। আমি বললুম, সেদিকে নিশ্চিন্ত থেকো। এ-লাইনে একবার যখন নটবর মিত্তিরের কাছে এসেছো, তখন নাকে মাস্টার্ড অয়েল গুঁজে ঘুমিয়ে থাকো। নটবর মিত্তির ইজ নটবর মিত্তির।"

সোমনাথের কথা হারিয়ে যাচ্ছে। সে শুধু শুনেই চলেছে। নটবরবাবু মাথা চুলকে দুঃখ করলেন, "দুটো কেস একসঙ্গে পড়ে গেল। তবে আপনি

"চিন্তা করবেন না। গোয়েঙ্কা যে আপনার কাছেও জীবনমরণের ব্যাপার, তা বুঝতে পারছি। আপনার একটা ব্যবস্থা করে দিতেই হবে। তবে ভাই আমার সঙ্গে ঘুরতে হবে—কারণ দুটো কেস একই সঙ্গে তো। একটার পুরো দায়িত্ব ঘাড়ে চেপে রয়েছে। বন্ধুও এখানে নেই—পার্টিকে আনতে গাড়ি নিয়ে কলকাতার বাইরে চলে গেছে।"

ঘড়ির দিকে তাকালেন নটবর। তারপর হেসে জিজ্ঞেস করলেন, "মুখটুখ শুকিয়ে যাচ্ছে কেন? ভাবছেন, নটবর মিত্তির অনেক খরচ করিয়ে দেবে? আপনার কেসে তা হবে না। ওই আপনার বাহাত্তর নম্বর ঘরের শ্রীধর শর্মা, ওর কাছ থেকে প্রতি কেসে কান মলে দেড় হাজার-দু হাজার টাকা আদায় করি। কিন্তু আপনার কেসে মা কালীর দিব্যি বলছি একটি পয়সা লাভ করবো না।"

আবার ঘড়ির দিকে তাকালেন নটবর মিত্তির। বললেন, "গোয়েঙ্কা উঠছে কোথায়? না, আপনাকেই জায়গার ব্যবস্থা করতে বলেছে?"

গ্রেট ইণ্ডিয়ান হোটেল শুনে খুশী হলেন নটবর মিটার। "একটুখানি সুবিধা হলো। আমার বন্ধুর পার্টিকেও ওখানে নিয়ে যাবো ভাবছিলাম।"

নটবরবাবু দশ মিনিট সময় চাইলেন। বললেন, "ঠিক দশ মিনিট পরে পোদ্দার কোর্টের সামনে আপনি অপেক্ষা করুন—আমি চলে আসবো।"

রবীন্দ্র সরণি ও নতুন সি-আই-টি রোডের মোড়ে একটা বিবর্ণ হতশ্রী ল্যাম্প পোস্টের কাছে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছে সোমনাথ ব্যানার্জি।

রিকশা, ঠেলাগাড়ি, বাস, লরি, টেম্পোর ভিড়ে ট্রাফিকের জট পাকিয়েছে। এরই মধ্যে একটা সেকেলে ট্রামের বৃদ্ধ ড্রাইভার বাগবাজার যাবার উৎকণ্ঠায় টংটং করে ঘণ্টা বাজাচ্ছে। সোমনাথের মনে হলো, একটা প্রাগৈতিহাসিক গিরগিটি কেমনভাবে কালের সতর্ক প্রহরীকে ফাঁকি দিয়ে কলকাতায় এই জন-অরণ্য দেখতে এসে আটকে পড়েছে। বৃদ্ধ গিরগিটি মৃত্যুযন্ত্রণায় মাঝে-মাঝে কাতরভাবে আর্তনাদ করছে। মায়া হচ্ছে সোমনাথের। পৃথিবীতে এত প্রশস্ত রাজপথ থাকতে কোন ভাগ্যদোষে বেচারা এই জ্যাম-জমাট রবীন্দ্র সরণিতে এসে আটকে পড়লো? আগেকার দিন হলে, সোমনাথ সত্যিই একটা কবিতা লিখে ফেলতো। নাম দিত জন-অরণ্যে প্রাগৈতিহাসিক গিরগিটি।

আজ যে ১লা আষাঢ় তা আবার সোমনাথের মনে পড়লো। আকাশের দিকে তাকালো সোমনাথ। না, ১লা আষাঢ়ের সেই বহু প্রত্যাশিত মেঘদূতের

কোনো ইঙ্গিত নেই আকাশে। বিরাট এই শহরটা মরুভূমি হয়ে গেছে—এখানে আর বৃষ্টি হবে না। বৃষ্টি হলে সোমনাথের কিন্তু খুব আনন্দ হতো। এখানে দাঁড়িয়ে সে ভিজতো। আষাঢ়ের প্রবল বর্ষণে যদি সব কিছু কালগর্ভে তলিয়ে যেত, তাহলে আরও ভাল হতো।

রবীন্দ্র সরণি ধরে কত লোক দ্রুত বেগে হাঁটছে। দু-একজন পথচারী সোমনাথের দিকে একবার তাকিয়েও গেল। এরা কি জানে তরুণ সোমনাথ ব্যানার্জি কেন রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে? কোথায় সে যাচ্ছে?

এইখানে দাঁড়িয়েই তো এক অন্তহীন অতীত পরিক্রমা করে এলো সোমনাথ। তার জীবনের প্রতিটি ঘটনা সোমনাথ এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। ঘড়ির দিকে তাকালো সোমনাথ। নটবর মিত্র দেরি করছেন। নির্ধারিত দশ মিনিট হয়ে গেছে।

দূর থেকে এবার হাঁপাতে হাঁপাতে নটবরবাবুকে আসতে দেখা গেল। বললেন, "কী ব্যাপার বলুন তো? আজ ১লা আষাঢ় বলে অনেকের মনেই রোমান্স জাগছে নাকি? অফিস থেকে উঠতে যাচ্ছি, এমন সময় আপনার বন্ধু শ্রীধরজীর ফোন। ওঁর এক পার্টির জন্যে একটু ব্যবস্থা করতে চান। আমি স্রেফ বলে দিলাম, আজ আমার পক্ষে আর কোনো কেস নেওয়া সম্ভব নয়। খুব যদি আটকে পড়ো, নিজে রিপন স্ট্রীটে মিস সাইমনের কাছে যাও।"

"চলুন চলুন মশাই, আগে গ্রেট ইণ্ডিয়ান হোটেলটা সেরে আসি।" নটবর-বাবু নিজের ঢলঢলে প্যান্ট কোমর পর্যন্ত তুলে সোমনাথকে তাড়া লাগালেন।

গ্রেট ইণ্ডিয়ান হোটেলে নিজের পার্টির জন্যে স্পেশাল কামরা রিজার্ভ করলেন মিস্টার মিটার। ওঁর সঙ্গে হোটেল রিসেপশনের লোকদের বেশ চেনা মনে হলো।

"আপনার বুকিং কে করবে?" নটবর মিত্র এবার সোমনাথকে জিজ্ঞেস করলেন।

সোমনাথ তা তো জানে না। নটবরবাবুকে মৃদু বকুনি লাগালেন। "ডোবাবেন মশাই? গোড়ার জিনিসগুলো খোঁজ নেবেন তো? গোয়েঙ্কা হোটেল বুকিং করেছেন কিনা—না আপনাকে করতে হবে? দেখি একবার খোঁজ নিয়ে।"

খবর নিয়ে জানা গেল মিস্টার গোয়েঙ্কার নামে একুশ নম্বর কামরা আজ সকালেই বুক করা রয়েছে। হাঁপ ছাড়লেন নটবর। "বাঁচা গেল—আজকাল হুট করলেই গ্রেট ইণ্ডিয়ানে বুকিং পাওয়া যায় না।"

হোটেল থেকে সোমনাথ বেরিয়ে আসছিল। নটবরবাবু আবার বকুনি লাগালেন। "বিজনেসে যদি টিকে থাকতে চান—জনসংযোগটা ভালভাবে শিখুন। আমাদের এসব কেউ বলে দেয়নি—ঠেকে ঠেকে, ধাক্কা খেতে খেতে টোয়েন্টি ইয়ার্স ধরে শিখতে হয়েছে। এখানে বসে গোয়েঙ্কাজীর নামে একটা মিষ্টি চিঠি লিখুন। বলুন ওয়েলকাম টু ক্যালকাটা। সব ব্যবস্থা পাকা। আপনি সন্ধ্যে সাতটার সময় আসছেন।"

মন্ত্রমুগ্ধের মতো সোমনাথ চিঠি লিখে ফেললো। নটবর মিত্তির বললেন, "খামের উপর গোয়েঙ্কাব নাম লিখুন—বাঁদিকের ওপরে লিখুন, টু অ্যাওয়েট অ্যারাইভাল।"

নস্যি নিলেন নটবর মিটার। জিজ্ঞেস করলেন, "এসব করলুম কেন বলুন তো? আপনাব পার্টি বুঝবে মিস্টাব ব্যানার্জির ম্যানেজমেণ্ট খুব ভাল। হোটেলে পা দিয়েই চিঠি পেলে গোয়েঙ্কার আর কোনো উদ্বেগ থাকবে না—উটকো পার্টি এসে সস্তা কোনো লোভ দেখিয়ে ভাঙিয়ে নিতে পারবে না।"

তারপর বললেন, "দিন দশটা টাকা। হচ্ছে যখন, সব কিছু ভালভাবে হোক।"

রিসেপশনিস্ট মিস্টার জেকবকে নটবর বললেন, "মিস্টার গোয়েঙ্কা আসা মাত্র একুশ নম্বর ঘরে কিছু ফ্লাওয়ার পাঠিয়ে দেবেন, ব্রাদার। ফুলের সঙ্গে মিস্টার ব্যানার্জির এই কার্ড দিয়ে দেবেন।"

আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে নটবর মিটার বললেন, "প্রাথমিক কাজ সব হয়ে গেল। রিটায়ার করে, লোকাল ছেলেদের ট্রেনিং-এর জন্যে একটা ইস্কুল খুলবো ভাবছি, মিস্টার ব্যানার্জি। বাঙালীদের সব গুণ আছে, শুধু এই জনসংযোগটা জানে না বলে কমপিটিশনে পিছিয়ে যাচ্ছে।"

"নাউ!" মিস্টার নটবর টাকে হাত রাখলেন। "এবার স্পেসিফিকেশন। আমার বন্ধুর পার্টি যা-স্পেসিফিকেশন দিয়েছে, তাতে আমি তো মাথায় হাত দিয়ে বসে আছি। গোয়েঙ্কাজীর পছন্দ কী বলুন?"

এবার সত্যিই বিরক্ত হলেন নটবর মিটার। "না মশাই, আপনার দ্বারা কিছু হবে না। বিজনেস লাইন ছেড়ে দিন। একজন সম্মানিত অতিথিকে আপ্যায়ন করবেন, অথচ তাঁর পছন্দ-অপছন্দ জেনে নিলেন না? যে-লোক কাটলেট ভালবাসে তাকে কমলানেবু দিলে সে কি পছন্দ করবে? এখন ভদ্রলোককে কোথায় পাই। ফোন করেও তো ধরা যাবে না।"

দুরূহ সমস্যার সমাধান নটবর মিটার নিজেই করলেন। বললেন, "কথাবার্তা

যতটুকু শুনেছি, তাতে মনে হয় ভদ্রলোকের গাউনে রুচি নেই—শাড়ির দিকেই ঝোঁক। জাতের কথা আমি মোটেই ভাবছি না। এই একটা ব্যাপারে নিজের জাতের ওপর টান নেই গোয়েঙ্কাজীদের। পছন্দসই বেঙ্গলী গার্ল পেলে খুব খুশী হবেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো, হাল্কা না ভারি? খুব ডিফিকাল্ট কোশ্চেন! এই পয়েন্টে বোকামি করেই তো শ্রীধরজী সেবার ফিফটি থাউজেণ্ড রুপিজের অর্ডার হারালেন! পারচেজ অফিসার একটু সেকেলেপন্থী—স্বাস্থ্যবতী মেয়েমানুষ পছন্দ করে। উনি সেসব না বুঝে, নিয়ে গেলেন আধুনিকা রত্না সাহাকে —একেবারে গাঁজার ছিলিমের মতো রোগা চেহারা, ফরাসী সাহেবরা যা প্রেফার করে। রত্নার বত্রিশ সাইজের জামার দিকে একবার নজর দিয়েই পার্টি বেঁকে বসলো—বললো, ছেলে না মেয়ে বুঝতে পারছি না, এখন খুব ব্যস্ত আছি, হঠাৎ একটা মিটিং পড়ে গেছে, পরে দেখা হবে। গেল অর্ডারটা। মাঝখান থেকে রত্না সাহাকেও টাকা গুনতে হলো শ্রীধরজীর। আবার শাঁসালো মেয়েমানুষে প্রচণ্ড অরুচি এমন পার্টিও যথেষ্ট দেখেছি। তারা কঞ্চির মতো সঙ্গিনী চায়।"

সোমনাথের মাথা ধরে গেল। ঘাড়ের কাছটা দপদপ করছে। চিন্তিত ও বিরক্ত নটবর বললেন, "ভেবে আর কী হবে? চলুন এনটালির দিকে। রিস্ক নেওয়া যাক। মলিনা গাঙ্গুলীর চেহারা মাঝামাঝি। রোগাও না মোটাও না। আপার বডিটা একটু হেভি, কিন্তু খুব টাইট—গোয়েঙ্কার অপছন্দ হবে না।"

গাড়ি চলছে। ধর্মতলা ও চৌরঙ্গীর মুখে দূর থেকে সোমনাথ যাকে দেখতে পেলো তাতে তার মুখ কালো হয়ে উঠলো। অনেকগুলো বই হাতে তপতী বাসের জন্যে অপেক্ষা করছে—নিশ্চয় কনসুলেট লাইব্রেরি থেকে বই নিয়েছে। তপতী বোধহয় সোমনাথকে লক্ষ্য করেছে—না-হলে অমনভাবে গাড়িটার দিকে তাকিয়ে আছে কেন?

সোমনাথ দ্রুত উল্টোদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলো। ব্যাপারটা নটবর মিত্তির দেখলেন এবং রসিকতা করলেন, "কী মিস্টার ব্যানার্জি? মেয়েমানুষরা কি বাঘ? অমনভাবে ঘামছেন কেন? বাস স্ট্যাণ্ডের এক মহিলা আপনার দিকে যেভাবে তাকালেন! এককালে আমাদেরও সময় ছিল! এখন এই চাপাটির মতো টাক পড়ায় কেউ তাকায় না!"

ইউরোপীয়ান অ্যাসাইলাম লেনের কাছে হলুদ রঙের একতলা বাড়ির সামনে গাড়ি থামাতে বললেন নটবর মিত্র। নিচু গলায় সোমনাথকে বললেন, "আপনি গাড়িতেই বসুন। একেবারে ভদ্রলোকের পাড়া। কারুর সন্দেহ হলেই মুশকিল। মিসেস গাঙ্গুলীও জেনুইন ফুল গেরস্ত। স্বামী কর্পোরেশনে ক্লার্ক—একটু মদ খাবার অভ্যাস আছে, তাই মাইনের টাকায় চালাতে পারেন না।"

সোমনাথ গাড়িতে বসে রইলো। মিস্টার মিটার দরজার কলিং বেল টিপলেন এবং ভিতরে ঢুকে গেলেন। একটু পরে হাসি মুখে বেরিয়ে এসে সোমনাথকে বললেন, "চলুন। মিসেস গাঙ্গুলীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।" নটবর এবার ফিসফিস করলেন, "একেবারে টাইট নারকুলে বাঁধাকপির মতো বুক—গোয়েঙ্কার খুব পছন্দ হবে।"

নটবরের পিছন পিছন সোমনাথ ঘরের মধ্যে ঢুকলো। পরিপাটি পরিচ্ছন্ন বসবার ঘর। সফ্ট-লেদার মোড়া নরম সোফাসেটে সোমনাথ বসলো। ঘরের এককোণে কিছু বাংলা এবং ইংরিজী বই। দেওয়ালে দু-তিনজন শ্রদ্ধেয় মনীষীর ছবি। এক কোণে একটা টাইমপিস ঘড়ি। এবং তার পাশেই নিকেল-করা সুদৃশ্য ফোল্ডিং ফ্রেমে মিসেস গাঙ্গুলী ও আর এক ভদ্রলোকের ছবি। নিশ্চয় মিস্টার গাঙ্গুলী হবেন।

মিসেস গাঙ্গুলীর বয়স একত্রিশ-বত্রিশের বেশী নয়। বেশ লম্বা এবং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা। মুখটি বেশ সরল—গৃহবধূর মতোই। কোথাও পাপের ছায়া নেই। মলিনা বোধহয় সবে ঘুম থেকে উঠেছেন। কারণ চোখদুটোতে এখনও দিবা-নিদ্রার রেশ রয়েছে। হাল্কা নীলরঙের ফুল ভয়েল শাড়ি পরেছেন মিসেস গাঙ্গুলী—সেই সঙ্গে চোলি টাইপের টাইট সাদা সংক্ষিপ্ত ব্লাউজ, ফলে বুকের অনেকখানি দৃশ্যমান।

ভদ্রমহিলা আড়চোখে সোমনাথের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন। সোমনাথ চোখ নামিয়ে নিলো। নটবর বললেন, "ইনিই আমার বন্ধু মিস্টার ব্যানার্জি। বুঝতেই পারছেন।"

মিসেস গাঙ্গুলী হাত দুটো তুলে এমনভাবে আলতো করে নমস্কার করলেন যে আন্দাজ করা যায় বালিকাবয়সে তিনি নাচের চর্চা করতেন।

"এবার একটা টেলিফোন নিন, মিসেস গাঙ্গুলী। টেলিফোন ছাড়া আপনাকে আর মানায় না।" অভিযোগ করলেন নটবরবাবু।

ফিক করে হাসলেন মিসেস গাঙ্গুলী। ডান কাঁধে ব্রা-এর যে স্ট্র্যাপ উঁকি মারছিল সেটা ব্লাউজের মধ্যে ঠেলে দিতে-দিতে ভদ্রমহিলা বললেন, "ওঁর ইচ্ছে নয়। বলেন, ফোন হলেই তোমাকে সব সময় জ্বালাবে। আজেবাজে লোকের তো অভাব নেই।"

নটবরবাবু বিনয়ের সঙ্গে বললেন, "আজেবাজে লোকের সঙ্গে আপনার কাজ কোথায়? আমি তো জানি, একদম হাইয়েস্ট লেভেলে খুব জানা শোনা পার্টি ছাড়া আপনাকে পাওয়াই যায় না।"

খুশী হলেন মিসেস গাঙ্গুলী। দেহ দুলিয়ে বললেন, "মুড়ি মিছরির তফাত যারা বোঝে তারা আমার কাছে আসে। আপনি তো জানেন, শুধু সুচেহারা গতর থাকলেই এ লাইনে কাজ হয় না। আজকালকার মানুষের কত উদ্বেগ মাথায় তাঁদের কত দুশ্চিন্তা। এইসব মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা বলে দুশ্চিন্তা ভুলিয়ে দেওয়া, আদর আপ্যায়ন করে দু দণ্ডের শান্তি দেওয়া, একটু প্রশ্রয় দিয়ে খেলায় নামানো কি সোজা কাজ। পেটে একটু বিদ্যে না-থাকলে এসব লাইনে নাম করা যায় না।"

"তা তো বটেই।" মিসেস গাঙ্গুলীর সঙ্গে নটবর একমত হলেন।

ঠোঁট উল্টে মিসেস গাঙ্গুলী বললেন, "আজকাল আনাড়ি যেসব মেয়ে আসছে, তারা পুরুষমানুষের মনের খিদের কথাই জানে না। তারা কী করে ভিতরের খবর বার করবে? টাকা খরচ করে যে বিজনেসম্যান গেস্ট পাঠালেন তাঁর কোনো লাভ হয় না।"

নটবর মিত্তির বললেন, "তা তো বটেই।"

ফিক করে হাসলেন মিসেস গাঙ্গুলী। তারপর নটবরকে আক্রমণ করলেন। বললেন, "আপনার তো কোনো পাত্তাই নেই।"

"কাজকর্ম তেমন কই? শরীরটাও ভাল যাচ্ছে না।" নটবর বেশ বিব্রত হয়ে পড়লেন।

বিশ্বাস করলেন না মিসেস গাঙ্গুলী। মুখে হাত চাপা দিয়ে ছোট্ট হাই তুললেন, তারপর আবার ফিক করে হেসে বললেন, "আমি ভাবলুম, মিসেস বিশ্বাসকে সব কাজকর্ম দিচ্ছেন। আমাকে ভুলেই গেলেন।"

"তা কখনো সম্ভব?" নটবরবাবু সুন্দর অভিনয় করলেন। "আমাদের বরং আপনাকে কাজ দিতে সঙ্কোচ হয়—আপনি ক্রমশ যে লেভেলে উঠে যাচ্ছেন। খোদ মিস্টার বাজোরিয়ার প্যানেলে ঢুকেছেন আপনি, সে খবর পেয়েছি আমি। আমাদের যেসব পার্টি তাদের বেশীর ভাগ মুড়ি কিনতে চায়।

আজ যেমনি শুনলাম এই বন্ধুটির মিছরি দরকার, সঙ্গে সঙ্গে আপনার কাছে পাকড়াও করে আনলুম। একবার ভাবলুম চিঠি লিখে দিই।"

"না-দিয়ে ভালই করেছেন।" লাল পাথর-বসানো কানের দুল নাড়িয়ে মিসেস গাঙ্গুলী বললেন, "অজানা-অচেনা লোকের সঙ্গে আমি কথা পর্যন্ত বলি না। যা-আজকাল অবস্থা হয়েছে! আপনাব মিসেস বিশ্বাস গোপনে পুলিশে খবর দিয়ে আমাদেব জানা-শোনা একটা মেয়েকে ধরিয়ে দিয়েছেন। অজন্তা মিত্র খুব ভাল কাজকর্ম কবছিল। মিসেস বিশ্বাসের সহ্য হলো না। এত হিংসের কী আছে বাবা? না-হয় তোমার দুজন বেগুলার খদ্দের অজন্তার কাছে যাচ্ছিলো। কই, আমি তো হিংসে করি না মিসেস বিশ্বাসকে। আমাব একটা সায়েব খদ্দেরকে উনি তো কব্জা করেছেন।"

নটবর মিত্তিব তাড়াতাড়ি কথা শেষ করতে চান। তাই বললেন, "তাহলে আমার এই বন্ধুর?"

"কবে?" হাই তুলে মুখের সামনে তিনবার টুসকি দিলেন মিসেস গাঙ্গুলী।

আজকেই শুনে মিসেস গাঙ্গুলী বিশেষ উৎসাহিত বোধ করলেন না। বললেন, "এ যে ওঠ ছুঁড়ি তোব বিয়ে হয়ে গেল, মিত্তির মশাই। আজ একটু বিশ্রাম নেবো ভাবছিলাম। পর পর ক'দিন বড় বেশী খাটাখাটনি চলেছে।"

"আজকেব দিনটা চালিয়ে দিন।" অনুরোধ করলেন নটবর মিত্তির। "কাছাকাছি ব্যাপার।"

বুকের আঁচল সামলাতে সামলাতে মিসেস গাঙ্গুলী বললেন, "বেশী রাতের কাজকম্ম আজকাল নিই না, নটবরবাবু। উনি বিরক্ত হন।"

এবার খুশী হলেন নটবরবাবু। "রাতের ব্যাপার হলে আপনাকে বলতামই না। পার্টি নিজেই দশটার মধ্যে ফাঁকা হয়ে যাবে।"

এবার টাকার অঙ্কটা জানতে চাইলেন নটবরবাবু।

"বসবেন কে?" সুগঠিত দেহটি পাতলা কাপড় দিয়ে ঢাকতে ঢাকতে প্রশ্ন করলেন মিসেস গাঙ্গুলী।

"খুবই ফার্স্ট ক্লাস ভদ্রলোক—আমাদের ছোটভাই-এর মতো। মিস্টার গোয়েঙ্কা।"

মুখ বেঁকালেন মিসেস গাঙ্গুলী। "লোকগুলো বড় পাজী হয়।"

"যা ভাবছেন—তা মোটেই নয়। কার্তিকের মতো চেহারা। অতি অমায়িক ভদ্রলোক।"

মিসেস গাঙ্গুলী বললেন, "গেস্ট হাউস বা বাড়ি হলে দুশো টাকা। এখান

থেকে নিয়ে যেতে হবে এবং পৌঁছে দিতে হবে। হোটেল হলে কিন্তু তিরিশ টাকা বেশী লাগবে, আগে থেকে বলে রাখছি।"

"আপনার সব কথা মেনে নিচ্ছি, মিসেস গাঙ্গুলী। আপনি তো জানেন আমি দরদাম পছন্দ করি না। কিন্তু ওই হোটেলের জন্যে রেট বাড়িয়ে দেওয়াটা কেমন যেন লাগছে।"

রেগে উঠলেন মিসেস গাঙ্গুলী। ঘাড় ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, "হোটেলে আমাদের বাড়তি খরচ আছে, নটবরবাবু। অকট্রয় দিতে হয়। একদিনের কাজ তো নয়—দারোয়ান থেকে আরম্ভ করে ম্যানেজারবাবু পর্যন্ত হোটেলের সবাইকে সন্তুষ্ট করতে তিরিশ টাকা লেগে যায়। ওরা আমাদের মুখ চিনে গেছে—বিনা কাজে কোনো গেস্টের সঙ্গে দেখা করতে গেলেও বিশ্বাস করে না। আজ যদি টাকা দিয়ে সন্তুষ্ট না করি, তাহলে আগামী কাল হোটেলে ঢুকতেই দেবে না। ঢুকতে দিলেও, ঘরে গিয়ে হাঙ্গামা বাধাবে। আগে থেকে বলে রাখা ভাল—না হলে অনেকে ভাবে, তালে পেয়ে তিরিশটা টাকা ঠকাচ্ছি।"

ঘড়ির দিকে তাকালেন মিসেস গাঙ্গুলী। জিজ্ঞেস করলেন, "একটু চা খাবেন ?"

সোমনাথ রাজী হলো না। নটবরবাবু বললেন, "আরেকদিন হবে। শুধু চা কেন, লুচি মাংস খেয়ে যাবো। মিস্টার গাঙ্গুলীকে বলবেন, পছন্দ মতো বাজার করে রাখতে।"

ফিক করে হাসলেন মিসেস গাঙ্গুলী। তারপর বললেন, "তাহলে, ঘণ্টাখানেক পরে আসুন। আমি তৈরি হয়ে নিই।"

সোমনাথকে সঙ্গে নিয়ে নটবর মিত্র সার্কুলার রোডে এসে দাঁড়ালেন। নটবর মিত্র এবার বিদায় নিতে চান। সোমনাথকে বললেন, "আপনার সমস্যা তো সমাধান হয়ে গেল। ঘণ্টাখানেক পরে এসে মিসেস গাঙ্গুলীকে নিয়ে সোজা গ্রেট ইণ্ডিয়ান হোটেলে চলে যাবেন।"

কিন্তু সোমনাথের ইচ্ছে নটবর যেন চলে না যান। সোমনাথের অনুরোধ ঠেলতে পারলেন না নটবরবাবু। বললেন, "আমার যে অনেক কাজ। এক নম্বর পার্টির এখনও ব্যবস্থা হলো না।"

সোমনাথ ভেবেছিল কোনো চায়ের দোকানে বসে একটা ঘণ্টা কাটিয়ে দেবে। কিন্তু নটবরবাবু বললেন, "কোথায় বসে থাকবেন ? চলুন, আমার সঙ্গে ঘুরে আসবেন।

নটবরবাবুর সত্যিই দুশ্চিন্তা! বিরক্তভাবে বললেন, "এ-লাইনে বাঙালী মেয়েদের এত সুনাম—আজকাল এক্সপোর্ট পর্যন্ত হচ্ছে! অথচ আমার ফ্রেণ্ডের পার্টি অদ্ভুত এক বায়না ধরেছে। পাঞ্জাবী, গুজরাতী, সিন্ধি মেয়ে পর্যন্ত সাপ্লাই করেছি—কিন্তু ইনি চান বড়বাজারী মেয়ে। কোথায় পাবো বলুন তো? এ-লাইনে সাপ্লাই নেই। অনেক কষ্টে একজন ফ্রেণ্ডের কাছে উষা জৈন বলে একটা মেয়ের খবর পেয়েছি। সায়েবপাড়ায় থাকে। যাই একবার দেখে আসি।"

রডন স্ট্রীটে গাড়ি থামলো। নটবরবাবু নাকে নস্যি গুঁজে বললেন, "চলুন না? আপনারও জানা-শোনা হয়ে থাকবে।"

সোমনাথ রাজী হলো না। তার মাথা ধরেছে। কপালটা টিপে ধরে সে গাড়ির মধ্যে চুপচাপ বসে রইলো।

বেশ কিছুক্ষণ পরে নটবরবাবু উষা জৈনের কাছ থেকে ফিরে এলেন। বিরক্তভাবে বললেন, "ভীষণ ডাঁট মশাই! স্নান করছিলো, আধঘণ্টা বসিয়ে রাখলো। আমি ভাবলুম, না জানি কি ডানাকাটা পরী হবেন! সাজুগুজু করে যখন অ্যাপিয়ারেন্স দিলেন তখন দেখলুম, মোস্ট অর্ডিনারি। গায়ের রঙটা ফর্সা, কিন্তু কেমন যেন টলটলে ঢলঢলে চেহারা—কোনো বাঁধুনি নেই। মিনিমাম ছত্রিশ বছর বয়স হবে, অথচ আমাকে বললে কিনা সবে পঁচিশে পড়েছে।" নিজের টাকে নটবরবাবু একবার হাত বুলিয়ে নিলেন। "ঐ গতর নিয়েই ধরাকে সরা জ্ঞান করছে! মিস্টার রামসহায় মোরে ওঁর এক বন্ধুর সঙ্গে শেয়ারে জয়পুর থেকে এই মেয়েকে আট মাস আগে কলকাতায় আনিয়েছিলেন। খরচাপাতি আধাআধি বখরা হচ্ছিল। বন্ধুর ব্লাড-প্রেসার বাড়ায়, ভদ্রলোককে দুষ্টুমি কমাতে হয়েছে। তাই এখন মেয়েটা কিছু কিছু প্রাইভেট প্র্যাকটিস করছে। স্বয়ং মিস্টার মোরে টেলিফোনে আমাকে ইনট্রোডিউস করে দিয়েছেন, বলেছেন আমার বুজম ফ্রেণ্ড। তবু উষা জৈন সাতশ' টাকার কমে রাজী হলো না। বললো, বম্বেতে নাকি এখন হাজার টাকা রেট। তা মশাই, লঙ্কাতে সোনার দাম চড়া হলে আমার কী বলুন তো? অন্য সময় হলে কোন শালা রাজী হতো—নেহাত ঐ উষা জৈন নামটার জন্যে! আমার কোনো চয়েস নেই। লোকাল মেয়ে হলে ছুঁড়ী একশ' টাকা পেতো না।"

মিসেস গাঙ্গুলী রেডি হয়েই বসে আছেন। এক ঘণ্টা ধরে সমস্ত দেহে ভদ্রমহিলা যথেষ্ট চুনকাম করেছেন। নাক, চোখ, কপাল, ঠোঁট, কাঁধ, গ্রীবা থেকে আরম্ভ করে হাতের নখ, এমন কি পায়ের পাতায় প্রসাধনের সযত্ন প্রলেপ নজরে আসছে। নটবর মিত্তির রসিকতা করলেন, "আপনাকে চেনাই যাচ্ছে না—দুগ্‌গা ঠাকুর মনে হচ্ছে!"

বেশ খুশী হলেন মিসেস গাঙ্গুলী। বললেন, "গোয়েঙ্কা তো—তাই এরকম সাজলাম। ওরা একটু ঝলমলে জামাকাপড় পছন্দ করে, চড়া রুজ ওদের খুব ভাল লাগে। কিন্তু লিপস্টিক সম্বন্ধে ওদের খুব ভয়—পাঞ্জাবিতে কিংবা গেঞ্জিতে লাগলে অনেক লিপস্টিকের রঙ উঠতেই চায় না। বাড়িতে বউ-এর কাছে ধরা পড়ে যাবার রিস্ক থাকে।"

মিসেস গাঙ্গুলী এবার সিগারেট ধরালেন। সামান্য একটু ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, "কাস্টমারের সামনে আমি কিন্তু স্মোক করি না। তাই এখন একটা খেয়ে নিচ্ছি।"

"একটা কেন, দশটা সিগারেট খেতে পারেন আপনি—হাতে যথেষ্ট সময় আছে," নটবর মিত্র বললেন।

সিগারেটে আর একটা টান দিয়ে, কমনীয় অথচ অটুট দেহখানি ঈষৎ দুলিয়ে মিসেস গাঙ্গুলী বললেন, "দুশো টাকায় আর চলে না মিত্তির মশাই। জিনিসপত্তরের দাম যেরকম বাড়ছে। একবার সাজগোজেই উনিশ-কুড়ি টাকা খরচ হয়ে যায়। এই কাপড় কাচতেই পাঁচ টাকা নিয়ে নেবে—আমি আবার যে কাপড় পরে একবার কাজে বেরিয়েছি তা দু'বার পরতে পারি না, ঘেন্না করে। তাছাড়া দামী ল্যাভেণ্ডার পাউডার এবং স্যাচেট সেন্ট আমি ব্যাগের মধ্যে নিয়ে যাই। এক একজন কাস্টমারের গায়ে যা ঘামের গন্ধ! আধ কৌটো পাউডার মাখাবার পরেও দুর্গন্ধে বমি ঠেলে আসে।"

"আপনার কাজের দাম কী আর টাকায় দেওয়া যায়?" বিনয়ে বিগলিত নটবর উত্তর দিলেন। "হাই-লেভেলের লোকদের আপনার মতো আপ্যায়ন করতে কে পারবে?"

"তা আপনাদের আশীর্বাদে অনেক বাঘ-সিংহকে বশ করে পায়ের কাছে লুটোপুটি খাইয়েছি!" বেশ গর্বের সঙ্গেই উত্তর দিলেন মিসেস গাঙ্গুলী। "পোষ মানাতে না-পারলে আপনারাই বা পয়সা ঢালবেন কেন? একটা কিছু উদ্দেশ্য

আছে বলেই তো পার্টির বিছানায় আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন।”

“আপনি তো সবই বোঝেন, মিসেস গাঙ্গুলী। বিলেত-আমেরিকা হলে আপনার মতো স্পেশালিস্ট লাখ-লাখ টাকা রোজগার করতেন,” বললেন নটবর মিত্র।

নাকের ডগায় পাউডার ঘষতে ঘষতে মিসেস গাঙ্গুলী বললেন, “গোয়েঙ্কার কাছ থেকে কোনো খবর-টবর বার করবার থাকলে এখনই বলে দিন। তাহলে ভাল করে মদ-টদ খাওয়াবো।”

হেঁ-হেঁ করে হাসলেন নটবর। “কোনোরকম বিজনেস নেই। স্রেফ সৌজন্যের জন্যে আপ্যায়ন। মিস্টার গোয়েঙ্কা পুরোপুরি স্যাটিসফ্যাকশন পেলেই আমরা খুশী।”

“ফলেন পরিচিয়তে! পনেরো দিনের মধ্যে আমাকে আবার নিয়ে যাবার জন্যে গোয়েঙ্কা যদি আপনাদের ব্যতিব্যস্ত না করে তাহলে আমার নামে কুকুর রাখবেন,” এই বলে মিসেস মলিনা গাঙ্গুলী সোফা ছেড়ে উঠলেন।

এবার বিরাট এক কাঁচের গেলাসে ডাবের জল খেলেন মিসেস গাঙ্গুলী। বললেন, “আপনাদের দিতে পারলাম না—ঠিক দুটি ডাব ছিল। এটা আমাদের লাইনে ওষুধের মতো। শরীর বাঁচাবার জন্যে কাজে বেরোবার ঠিক আগেই খেতে হয়।”

বেরোবার মুখেই কিন্তু গণ্ডগোল হলো। মিসেস গাঙ্গুলীর স্বামী ফিরলেন। অফিস থেকে বেরিয়ে পথে কোথাও মদ খেয়ে এসেছেন। মুখে ভকভক করে গন্ধ ছাড়ছে।

“তুমি কোথায় যাচ্ছ?” বেশ বিরক্তভাবে স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন ভদ্রলোক।

মিসেস গাঙ্গুলীর হাসি কোথায় মিলিয়ে গেল। বললেন, “কাজে। খুব তাড়াতাড়ি ফিরবো।”

ভদ্রলোক মদের ঝোঁকে বললেন, “তোমাকে এত ধকল সইতে আমি দেবো না, মলিনা। পর পর তিনদিন বেরোতে হয়েছে তোমাকে। আগামীকাল আবার মিস্টার আগরওয়ালা তোমাকে নিতে আসবেন।”

মিসেস গাঙ্গুলী স্বামীকে সামলাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ভদ্রলোক রেগে উঠলেন। “শালারা ভেবেছে কী? পয়সা দেয় বলে, তোমার ওপর যা-খুশী অত্যাচার করবে? কালকে তোমায় রাত দেড়টার সময় ফেরত পাঠিয়েছে। আমি তোমার স্বামী—আমি হুকুম করছি, আজ তোমাকে বিশ্রাম নিতে হবে।”

বিব্রত মিসেস গাঙ্গুলী মত্ত স্বামীকে আবার বোঝাবার চেষ্টা করলেন। বললেন, "এঁদের কথা দিয়েছি—এঁরা অসুবিধেয় পড়ে যাবেন।"

রক্তচক্ষু মিস্টার গাঙ্গুলী একবার সোমনাথ ও আরেকবার নটবরবাবুর দিকে তাকালেন। তারপর দাঁতে দাঁত চেপে স্ত্রীকে বললেন, "আমি তো ফরেন হুইস্কি ছেড়ে দিশী খাচ্ছি মলিনা। অত টাকা তোমায় রোজগার করতে হবে না।"

অপারগ মিসেস গাঙ্গুলী অত্যন্ত লজ্জার সঙ্গে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এলেন। ক্ষমা চেয়ে বললেন, "আমাকে ভুল বুঝবেন না। ওর মাথায় যখন ভূত চেপেছে, তখন ছাড়বে না। এখন যদি আপনাদের সঙ্গে বেরোই—বাড়ি ফিরে দেখবো সব ভেঙে-চুরে ফেলেছে। কী হাঙ্গামা বলুন তো—এসব রটে গেলে আমার যে কী সর্বনাশ হবে ভেবে দেখে না।"

সোমনাথ স্তম্ভিত। জেনে-শুনে স্বামী এইভাবে বউকে ব্যবসায় নামিয়েছে। 'আর সোমনাথ, তুমি কোথায় যাচ্ছ?' কোনো এক অতিদূর অন্ধকার গুহা থেকে আরেকজন সোমনাথ কাতরভাবে চিৎকার করছে।

কিন্তু সোমনাথ তো এই ডাকে বিচলিত হবে না। যে-সোমনাথ ভাল থাকতে চেয়েছিল তাকে তো সমাজের কেউ বেঁচে থাকতে দেয়নি। সোমনাথ এখন অরণ্যের আইনই মেনে চলবে।

নটবর মিত্রের অভিজ্ঞ মাথায় এখন নানা চিন্তা। টাকের ঘাম মুছে বললেন, "এই জন্যে বাঙালীদের কিছু হয় না। হতভাগা গাঙ্গুলীটা বাড়ি ফিরবার সময় পেলো না! কত পত্নীপ্রেম দেখলেন না? তোমার রেস্ট দরকার! তোমায় যেতে দেবো না! আর কিরকম সতী সাধ্বী স্ত্রী! স্বামীদেবতার আদেশ অমান্য করলেন না!"

সোমনাথের চিন্তা, কাজের শুরুতেই বাধা পড়লো। এবার কী হবে?

নটবরবাবু নিজেই বললেন, "চলুন চলুন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাথা চুলকোলে কাজ হবে না। সময় হাতে নেই। মিস্টার গোয়েঙ্কার কাছে আপনার মানসম্মান রাখতেই হবে!"

উড স্ট্রীটে এলেন নটবর মিত্র।

একটা নতুন বিরাট উঁচু ফ্ল্যাটবাড়ির অটোমেটিক লিফটে উঠে বোতাম টিপে দিলেন নটবরবাবু। "দেখি মিসেস চক্রবর্তীকে। আপনি আবার যা সরল, যেন বলে বসবেন না। অন্য জায়গায় সাপ্লাই না-পেয়ে এখানে এসেছি।" সোমনাথকে সাবধান করে দিলেন নটবরবাবু।

পাঁচতলায় দক্ষিণ দিকের ফ্ল্যাটে অনেকক্ষণ বেল টেপার পর মিসেস চক্রবর্তীর দরজা খুললো। একটা ম্যাড্রাসি চাকর ফ্যালফ্যাল করে কিছুক্ষণ অতিথির দিকে তাকিয়ে রইলো, তারপর কোনোকিছু না-বলে ভিতরে চলে গেল। নটবরবাবু নিজের মনেই বললেন, "মিসেস চক্রবর্তীর ফ্ল্যাট যেন ঝিমিয়ে পড়েছে।"

এবার প্রৌঢ়া কিন্তু সুদর্শনা মিসেস চক্রবর্তী ঘোমটা দিয়ে দরজার কাছে এলেন। নটবরবাবুকে দেখেই চিনতে পারলেন। মুখ শুকনো করে মিসেস চক্রবর্তী বললেন, "আপনি শোনেননি? আমার কপাল ভেঙেছে। মেয়েগুলোকে আচমকা পুলিসে ধরে নিয়ে গেল।"

আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করলেন নটবরবাবু।

মিসেস চক্রবর্তী বললেন, "আর জায়গা পেলে না। পুলিসের এক অফিসার রিটায়ার করে পাশের ফ্ল্যাটটা কিনলো। ওই লোকটাই সর্বনাশ করিয়েছে মনে হয়। এতগুলো মেয়ে ভদ্রভাবে করে খাচ্ছিল।"

গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করলেন নটবর মিত্র। কাঁদ-কাঁদ অবস্থায় মিসেস চক্রবর্তী বললেন, "বাঙালী পুলিস বাঙালীর রক্ত খাচ্ছে। ভদ্র পরিবেশে সাত-আটটি মেয়ে আমার এই ফ্ল্যাটে প্রোভাইডেড হচ্ছিলো। কয়েকটি কলেজের স্টুডেন্টকেও চান্স দিচ্ছিলাম—হপ্তায় দু-তিন দিন দুপুরবেলায় কয়েকঘণ্টা সৎভাবে খেটে মেয়েগুলো ভাল পয়সা তুলছিল। কিন্তু কপালে সহ্য হলো না।"

"গভরমেণ্ট, পুলিস এদের কথা যত কম বলা যায় তত ভাল," নটবরবাবু সান্ত্বনা দিলেন মিসেস চক্রবর্তীকে।

একটু থেমে মিসেস চক্রবর্তী বললেন, "নতুন একটা ফ্ল্যাটের খুব চেষ্টা করছি, মিত্তির মশাই। কলকাতায় বাড়ি ভাড়ার যা অবস্থা। সায়েবপাড়ায় মাসে দেড় হাজারের কম কেউ কথা বলছে না। আমি মেরে কেটে আটশ' পর্যন্ত দিতে পারি।"

নটবরবাবুকেও ফ্ল্যাট দেখবার জন্য অনুরোধ করলেন মিসেস চক্রবর্তী। বিদায় দেবার আগে বললেন, "আবার একটু গুছিয়ে বসি—তখন কিন্তু পায়ের ধুলো পড়া চাই।"

যথেষ্ট হয়েছে। জন্মদিনে আমার জন্যে কী অভিজ্ঞতা লিখে রেখেছিলে, হে বিধাতা? সোমনাথ এবার ফিরে যেতে চায়। কিন্তু নটবর মিত্তির এখন ডেসপারেট। তাঁর ধারণা সোমনাথের কাছে তিনি ছোট হয়ে যাচ্ছেন। পার্ক স্ট্রীটের দিকে যেতে যেতে নটবর বললেন, "কলকাতা শহরে আপনাদের আশীর্বাদে মেয়েমানুষের অভাব নেই। মিস সাহমনের ওখানে গেলে এখনই এক ডজন মেয়ে দেখিয়ে দেবে। কিন্তু ওই সব যা-তা জিনিস তো জানা-শোনা পার্টির পাতে দেওয়া যায় না। তবে আমি ছাড়ছি না—আমার নাম নটবর মিত্তির। করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে।"

মিসেস বিশ্বাসের ফ্ল্যাটের কাছে হাজির হলেন নটবরবাবু। রুমা এবং ঝুমা—নিজের দুই মেয়েকে মিসেস বিশ্বাস ব্যবসায় নামিয়েছেন শুনে সোমনাথ আর অবিশ্বাস করছে না।

মিসেস বিশ্বাসের ফ্ল্যাটে যাবার জন্য সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে নটবরবাবু বললেন, "মেয়েমানুষ সম্পর্কে সেন্টিমেন্ট-ফেন্ট বাংলা নভেল নাটকেই পড়বেন। আসলে ফিল্ডে কিছুই দেখতে পাবেন না। টাকা দিয়ে মায়ের কাছ থেকে মেয়েকে, ভায়ের কাছ থেকে বোনকে, স্বামীর কাছ থেকে বউকে, বাপের কাছ থেকে বেটীকে কতবার নিয়ে এসেছি—টাকার অ্যামাউন্ট ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে গার্জেনদের একটুও উদ্বিগ্ন হতে দেখিনি। লাস্ট দশ বছরে বাঙালীরা অনেক প্র্যাকটিক্যাল হয়ে উঠেছে—জাতটার পক্ষে একটাই একমাত্র আশার কথা।"

নটবর মিত্তির অমায়িক হাসিতে মুখ ভরিয়ে মিসেস বিশ্বাসকে জিজ্ঞেস করলেন, "কেমন আছেন? অনেকদিন আসতে পারিনি। ক্যালকাটার বাইরে যেতে হয়েছিল।"

"পাঁচজনের আশীর্বাদে" যে ভালই চলে যাচ্ছে তা মিসেস বিশ্বাস জানিয়ে দিলেন। বললেন, "পুরানো ফ্ল্যাট নতুন করে সাজাতে প্রায় টেন থাউজেণ্ড খরচা হয়ে গেল।"

এর থেকে নতুন কোনো ফ্ল্যাট ভাড়া নিলে অনেক সস্তা হতো। কিন্তু এই ঠিকানাটা দিল্লী, বম্বে, ম্যাড্রাসের অনেক ভাল ভাল পার্টির জানা হয়ে গেছে। কলকাতায় ট্যুরে এলেই তাঁরা এখানে চলে আসেন। ঠিকানা পাল্টালেই গোড়ার দিকে বিজনেস কমে যাবে।"

ঝকঝকে তকতকে হল ঘরটার দিকে তাকিয়ে খুশী হলেন নটবরবাবু। 'এ যে একেবারে ইন্দ্রপুরী বানিয়ে তুলেছেন!" নটবর মিত্তির প্রশংসা করলেন। "চারটে-পাঁচটা ছোট ছোট চেম্বার করেছেন, মনে হচ্ছে।"

"জায়গা তো আর বাড়ছে না, কিন্তু মাঝে-মাঝে অতিথি বেড়ে যায়। তাই এরই মধ্যে সাজিয়ে-গুজিয়ে বসতে হলো।" ঠোঁট উল্টিয়ে মিসেস বিশ্বাস বললেন, "যা জিনিসের দাম! কিন্তু প্রত্যেক চেম্বারে ডানলপিলোর তোষক দিলুম। নামকরা সব লোক সারাদিনের খাটুনির পর পায়ের ধুলো দেন, ওঁদের যাতে কোনো কষ্ট না হয় তা দেখা আমার কর্তব্য। ভগবান যদি মুখ তোলেন, সামনের মাসে দু'খানা চেম্বারে এয়ারকুলার বসাবো।"

"কাকে খোঁজ করছেন? রুমুকে না ঝুমুকে?" মিসেস বিশ্বাস জিজ্ঞেস করলেন। তারপর শান্তভাবে বললেন, "ঝুমু কাস্টমারের সঙ্গে রয়েছে। একটু বসুন না, মিনিট পনেরোর মধ্যে ফ্রি হয়ে যাবে।"

নটবর মিত্তির ঘড়ির দিকে তাকালেন। মিসেস বিশ্বাস একগাল হেসে বললেন, "ঝুমু আপনার ওপর খুব সন্তুষ্ট। সেবার সেই গ্রেট ইণ্ডিয়ান হোটেলে জাপানী গেস্ট দিলেন—ভারি চমৎকার লোক। ঝুমুকে একটা ডিজিট্যাল টাইমপিস উপহার দিয়েছে—এখানে পাওয়া যায় না। ঝুমুটাও চালাক। ছোট ভাই আছে, এই বলে সায়েবের কাছ থেকে একটা দামী ফাউনটেন পেনও নিয়ে এসেছে। অথচ জাপানী সায়েব পুরো দাম দিয়েছে—একটি পয়সাও কাটেনি।"

"মেয়ে আপনার হীরের টুকরো—সায়েবকে সন্তুষ্ট করেছে, তাই পেয়েছে," নটবরবাবু বললেন।

মিসেস বিশ্বাস মুখ বেঁকালেন। "সন্তুষ্ট তো অনেককেই করে। কিন্তু হাত তুলে কেউ তো দিতে চায় না। রুমুর অবস্থা দেখুন না।"

"আপনার বড় মেয়ে তো? কী হলো তার?" নটবরবাবু উদ্বেগ প্রকাশ করলেন।

"বলবেন না। আপনাদের মিস্টার কেদিয়া—পয়লা নম্বর শয়তান একটা। রুমুকে হংকং-এ বেড়াতে নিয়ে যাবার লোভ দেখালেন। এখানে বেশ

কয়েকবার এসেছেন। রুমু এবং ঝুমু দুজনের সঙ্গেই ঘণ্টাখানেক করে সময় কাটিয়ে গেছেন। তারপর রুমুর সঙ্গে ভাব বাড়লো। একবার ন'টার শোতে রুমুকে সিনেমা দেখিয়ে এনেছেন। আমাকে দেখলেই গলে যেতেন। ওঁর মাথায় যে এত দুষ্টুমি কী করে বুঝবো? ভদ্রলোক আমাকে বললেন, 'বিজনেসের কাজে হংকং যাচ্ছি। রুমুকে দু হপ্তার জন্য ছেড়ে দিন। মেয়ের রোজগারও হবে ফরেন ঘোরাও হবে।' হাজার টাকায় রফা হলো। ওখানকার সব খরচা—প্লেন ভাড়া, হোটেল ভাড়া উনি দেবেন। আমি তো বোকা—রুমুটা আমার থেকেও বোকা। হতভাগাটার শয়তানী বেচারা বুঝতে পারেনি। বিদেশে যাবার লোভে কচি মেয়েটা লাফালাফি কবতে লাগলো। কাজকর্ম বন্ধ রেখে পাসপোর্টের জন্য ছোটাছুটি আরম্ভ করলো। কেন মিথ্যে বলবো, কেদিয়ার ট্রাভেল এজেন্ট পাসপোর্টেব ব্যাপাবে সাহায্য করেছিল। আমি ভাবলাম, আহা, জানাশোনা ছেলের সঙ্গে বিদেশ ভ্রমণেব একটা সুযোগ যখন এসেছে, তখন মেয়েটা সাধ-আহ্লাদ মিটিয়ে আসুক। ক'দিন আমার কাজ-কর্মের ক্ষতি হয় হোক।"

"হাজাব হোক মায়ের প্রাণ তো!" নিজেব টাকে হাত বুলিয়ে নটবরবাবু ফোড়ন দিলেন।

নাটকীয় কায়দায় সজল চোখে মিসেস বিশ্বাস এবার বললেন, "মেয়েটাকে আমার চোখের সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে যা অত্যাচার করেছে না-বেচারার কিছু অবশিষ্ট রাখেনি।"

"কেদিয়া একটা নামকরা শয়তান," নটবরবাবু খবর দিলেন।

"শয়তান বলে শয়তান। মেয়ের মুখে যদি সব কথা শোনেন আপনার চোখে জল এসে যাবে। আমাকে বুঝিয়ে গেল, কেদিয়ার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। আমি কোথায় ভাবলাম, দুজনে স্বামী-স্ত্রীর মতো ঘুরে বেড়াবে। তা না, হোটেলে তুলে—বন্ধু-বান্ধব ইয়াব জুটিয়ে সে এক সর্বনাশা অবস্থা। মোটা মোটা টাকা নিজের পকেটে পুরে অসহায় মেয়েটাকে আধঘণ্টা অন্তর ভাড়া খাটিয়েছে। মেয়েটা পালিয়ে আসবার পথ পায় না। ভাগ্যে রিটার্ন টিকিট কাটা ছিল।"

একটু থেমে মিসেস বিশ্বাস বললেন, "আপনি শুনে অবাক হবেন, নিজের রোজগার থেকে রুমুকে একটা পয়সাও ঠেকায়নি। উল্টে বলেছে তুমি তো ফুর্তি করতে এসেছো!"

"রুমু কোথায়?" নটবর মিত্তির জিজ্ঞেস করলেন।

"ডাক্তারের কাছে গেছে। চেহারা দেখলে আপনি চিনতে পারবেন না।" আমার কী ক্ষতি বুঝুন। এই অবস্থায় কাজে লাগিয়ে মেয়েটাকে তো মেরে ফেলতে পারি না। ভাগ্যে একটা বদলি সিদ্ধি মেয়ে পেয়ে গেলাম। লীলা সামতানী—সকালবেলায় একটা ইস্কুলে পড়ায়। এখন পাশের ঘরে কাস্টমারের সঙ্গে রয়েছে।"

মিসেস বিশ্বাসের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লীলা চেম্বার থেকে বেরিয়ে এলো। পিছনে আঠারো-উনিশ বছরের এক ছোকরা। নিশ্চয় ছাত্র, কারণ হাতে কলেজের বই রয়েছে। মিশনারি কলেজের নামলেখা একটা খাতাও দেখা যাচ্ছে। লীলা বললো, "মিস্টার পোদ্দার আর একটা ডেট চাইছেন।" ব্যাগ থেকে ডাইরি বার করে, চোখে চশমা লাগিয়ে মিসেস বিশ্বাস বললেন, "ইট ইজ এ প্লেজার। কবে আসবেন বলুন?" তারিখ ও সময় ঠিক করে মিসেস বিশ্বাস ডাইরিতে লিখে রাখলেন। বললেন, "ঠিক সময়ে আসবেন কিন্তু ভাই—দেরি করলে আমাদের প্রোগ্রাম আপসেট হয়ে যায়।"

পোদ্দার চলে যেতেই মিসেস বিশ্বাস আবার ডাইরি দেখলেন। তারপর বললেন, "লীলা, তুমি একটু কফি খেয়ে বিশ্রাম নাও। আবদুলকে বলো, তোমার ঘরে বিছানার চাদর এবং তোয়ালে পাল্টে দিতে। মিনিট পঁচিশের মধ্যে মিস্টার নাগরাজন আসবেন। উনি আবার দেরি করতে পারবেন না। এখান থেকে সোজা এয়ারপোর্ট চলে যাবেন।"

লীলা ভিতরে চলে যেতেই মিসেস বিশ্বাস বললেন, "টাকা নিই বটে—কিন্তু সার্ভিসও দিই। প্রত্যেক কাস্টমারের জন্যে আমার এখানে ফ্রেস বেডশিট এবং তোয়ালের ব্যবস্থা। অ্যাটাচড্ বাথরুমে নতুন সাবান। প্রত্যেক ঘরে ট্যালকাম পাউডার, লোশন, অডিকোলন, ডেটল। যত খুশী কফি খাও—একটি পয়সা দিতে হবে না।"

নটবর মিত্রকে ঘড়ির দিকে তাকাতে দেখে মিসেস বিশ্বাস বললেন, "ঝুমুটার এখনও হলো না? দাঁড়ান, ফুটো দিয়ে দেখে আসি। মেয়েটার ঐ দোষ। খদ্দেরকে ঝটপট খুশী করে তাড়াতাড়ি বাড়ি পাঠিয়ে দিতে পারে না। ভাবছে, সবাই জাপানী সায়েব। বেশী সময় আদর পেলে, খুশী হয়ে ওকে মুক্তোর মালা দিয়ে যাবে! এসব ব্যাপারে লীলা চালাক। নতুন লাইনে এলেও কায়দাটা শিখে নিয়েছে। পোদ্দার একঘণ্টা থাকবে বলে এসেছিল, কিন্তু কুড়ি মিনিটের মধ্যে সন্তুষ্ট হয়ে চলে গেল। অথচ লীলার অনেক আগে ঝুমু খদ্দের নিয়ে দরজা বন্ধ করেছে।"

ফুটো দিয়ে মেয়ের লেটেস্ট অবস্থা দেখে হেলেদুলে ফিরে এলেন মিসেস বিশ্বাস। বললেন, "আর দেরি হবে না। টোকা দিয়ে এসেছি।" তারপর বললেন, "আপনাদের পাঁচজনের আশীর্বাদে ঝুমুর চেহারাটি বেশ হয়েছে। যে-ছাখে সেই সন্তুষ্ট হয়। টোকিও থেকে আপনার জাপানী সায়েব তো আবার বন্ধু পাঠিয়েছিল। হোটেলে মালপত্র রেখে সায়েব নিজে খোঁজখবর করে এখানে এসেছিলেন। ভাল ছবি তোলেন। খুব ইচ্ছে ছিল জামা-কাপড় খুলিয়ে ঝুমুর একটা রঙীন ছবি তোলেন। পাঁচশ' টাকা ফী দিতে চাইলেন! আমি রাজী হলাম না।"

নটবর এবার সুযোগ নিলেন। বললেন. "আমার এই ফ্রেণ্ডের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতাম ঝুমুর। ওকে ঘণ্টা দুয়েকের জন্যে একটু গ্রেট ইণ্ডিয়ানে নিয়ে যেতে চাই।"

মুখ বেঁকালেন মিসেস বিশ্বাস। তারপর সোমনাথকে বললেন, "হোটেলে কেন বাছা? আমার এখানেই বসো না। মিস্টার জয়সোয়াল চলে গেলেই ঝুমু ফ্রি হয়ে যাবে। আমার চেম্বারভাড়া হোটেলের অর্ধেক।"

হাঁ-হাঁ করে উঠলেন নটবরবাবু। "উনি নন, ওঁর এক পার্টি।"

মিসেস বিশ্বাস বললেন, "তাঁকেও নিয়ে আসুন এখানে। আমার লোকজন কম। মেয়েদের বাইরে পাঠালে বড্ড সময় নষ্ট হয়। তাছাড়া এখন কাজের চাপ খুব, মিস্টার মিত্তির! হোল নাইট বুকিং-এর জন্যে লোক হাতে-পায়ে ধরছে।"

অনেক অনুরোধ করলেন নটবরবাবু। কিন্তু মিসেস বিশ্বাস রাজী হলেন না। বললেন, "ঝুমু তো রইলো। আপনার সায়েবকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে এখানে নিয়ে আসুন। ঝুমুকে স্পেশাল আদর যত্ন করতে বলে দেবো। দেখবেন আপনার সায়েব কীরকম সন্তুষ্ট হন। ওদের দুজনকে কাজে বসিয়ে দিয়ে আমরা তিনজন চা খেতে খেতে গল্প করবো।"

রাস্তায় বেরিয়ে সোমনাথ দেখলো নটবর মিটার দুটো হাতেই ঘুষি পাকাচ্ছেন। সোমনাথের কাছে ছোট হয়ে গিয়েছেন মনে করছেন। অথচ সোমনাথ সেরকম ভাবছেই না। সামনের পানের দোকান থেকে সোমনাথ দুটো অ্যাসপ্রো কিনে খেয়ে ফেললো। বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সে মনকে তৈরি করে ফেলেছে। কিন্তু দেহটা কথা শুনতে চাইছে না। একটু বমি করলে শরীরটা বোধ হয় শান্ত হতো।

নটবরবাবু বললেন, "আপনার কপালটাই পোড়া। নটবর মিত্তির যা চাইছে, তা দিতে পারছে না আপনাকে। আর দেশটারই বা হলো কি!"

মেয়েমানুষের ডিমাণ্ড হুড়মুড় করে বেড়ে যাচ্ছে। ছ'মাস আগে এই মিসেস বিশ্বাস দুপুরবেলায় মেয়ে নিয়ে আমার অফিসে দেখা করেছেন—পার্টির জন্যে হাতে ধরেছেন। কতবার বলেছেন, শুধু তো খদ্দের আনছেন। একদিন নিজে রুনু কিংবা ঝুনুর সঙ্গে বসুন—কোনো খরচখরচা লাগবে না। কিন্তু মশাই, নটবর মিত্তির এসব থেকে একশ' গজ দূরে থাকে। নিজে যেন এসবের মধ্যে ঢুকে পড়বেন না—তাহলে কিন্তু সর্বনাশ হবে ওই বিশু বোসের মতন।"

কোনো কথা শুনলেন না নটবর। সোমনাথকে নিয়ে পার্ক স্ট্রীটের কোয়ালিটিতে বসে কফি খেলেন।

ওখান থেকে বেরিয়েই অলিম্পিয়া বারের সামনে বুড়ো চরণদাসের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

"চরণ না?" নটবর জিজ্ঞেস করলেন।

"আজ্ঞে, হ্যাঁ হুজুর," বহুদিন পরে নটবরকে দেখে খুশী হয়েছে চরণদাস।

"তোমার বোর্ডিং-এ না পুলিস হামলা হয়েছিল?" নটবর অনেক কিছু খবর রাখেন।

"শুধু পুলিস হামলা! আমাকে আসামীর কাঠগড়ায় তুলেছিল।" চরণ দুঃখ করলো। "কোনো রকমে ছাড়া পেয়ে বেরিয়ে এসেছি।"

চরণের বয়স হবে পঞ্চাশের বেশী। শুকনো দড়ি পাকানো চেহারা। কিন্তু দেখলেই বোঝা যায় নিরীহ প্রকৃতির মানুষ। সোমনাথকে নটবরবাবু বললেন, "চরণ এখানকার এক বোর্ডিং-এ বেয়ারা ছিল—মেয়ে সাপ্লাই করে টু-পাইস কামাতো।"

"এখন কী করছো চরণ?" নটবর মিত্তির জিজ্ঞেস করলেন।

"আগেকার দিন আর নেই হুজুর। এখন টুকটাক অর্ডার সাপ্লাই করছি। আমাদের ম্যানেজারবাবু করমচন্দানী জেল থেকে বেরিয়ে একটা ইস্কুল করেছেন। টেলিফোন অপ্রেটিং শেখবার নাম করে কিছু মেয়ে আসে—খুব জানাশোনা পার্টিরা খবর পেয়েছেন, কোনোরকমে চলে যায়।"

নটবর জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা চরণ. চাহিদার তুলনায় মেয়ের সাপ্লাই কি কমে গিয়েছে?"

"মোটেই না, হুজুর! গেরস্ত ঘর থেকে আজকাল অজস্র মেয়ে আসছে। কিন্তু তাদের আমরা জায়গা দিতে পারি না। এসব পাড়ায় জায়গার বড় অভাব।"

নটবর মিত্তির হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। বললেন, "চরণ, তুমি তো আমার বহুদিনের বন্ধু। এখনই একটি ভাল মেয়ে দিতে পারো?"

চরণ বললো, "কেন পারবো না হুজুর? এখনই চলুন, তিনটে মেয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি।"

"একেবারে টপ ক্লাস হওয়া চাই। রাস্তার জিনিস তুলে নেবার জন্যে, তোমার সাহায্য চাইছি না," নটবর বললেন।

চরণদাস এবার ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝলো। বললো, "তাহলে হুজুর, একটু অপেক্ষা করতে হবে।"

"মিনিট পনেরো পরেই একটি ভাল বাঙালী মেয়ে আসবে। তবে মেয়েটি খুব দূরে যেতে ভয় পায়। গেরস্ত ঘরের মেয়ে তো, লুকিয়ে আসে।"

"রাখো রাখো—সবাই গেরস্ত," ব্যঙ্গ করলেন নটবর।

চরণদাস উত্তর দিলো, "এই ভর সন্ধ্যেবেলায় আপনাকে মিথ্যে বলবো না,

"চরণদাস, ভেট হিসেবে দেবার মতো জিনিস তো?" নটবর মিত্তির খোলাখুলি জিজ্ঞেস করলেন।

"একদম নির্ভয়ে নিয়ে যেতে পারেন। বড় দিনের ডালিতে সাজিয়ে দেবার মতো মেয়ে, স্যর।" চরণদাস বেশ জোরের সঙ্গে বললো।

চরণদাসের ঘাড়ে সোমনাথকে চাপিয়ে নটবর এবার পালালেন। বললেন, "উষা জৈনকে এখন না তুললেই নয়। মাগীর যা দেমাক, হয়তো দেরি করলে অর্ডার ক্যানসেল করে দেবে—সঙ্গে আসবেই না। আপনি ভাববেন না সোমনাথবাবু, বার বার তিনবার। এবার সব ঠিক হয়ে যাবে।"

সোমনাথকে নিশ্চল পাথরের মতো স্তব্ধ হয়ে থাকতে দেখে নটবর বললেন, "ভয় কী? একটু পরেই তো গ্রেট ইণ্ডিয়াতে দেখা হচ্ছে। তেমন দরকার হলে আমি নিজে গোয়েঙ্কার সঙ্গে আপনার হয়ে কথা বলবো।"

"বাই-বাই," করে নটবর মিত্তির বেরিয়ে গেলেন। তাঁর দাঁতে দাঁত চেপে সোমনাথ এবার চরণদাসের সঙ্গে রাসেল স্ট্রীট ধরে উত্তর দিকে হাঁটতে লাগলো। দুটো অ্যাসপ্রো ট্যাবলেটেও শরীরের যন্ত্রণা কমেনি—কিন্তু অনেক চেষ্টায় মনকে পুরোপুরি নিজের তাঁবেতে এনেছে সোমনাথ।

কী আশ্চর্য! দ্বৈপায়ন ব্যানার্জির ভদ্র সভ্য সুশিক্ষিত ছোটছেলে এই অন্ধকারে মেয়েমানুষের জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে—অথচ তার কনসেন্স তাকে যন্ত্রণা দিচ্ছে না। সোমনাথ এখন বেপরোয়া। জলে যখন নেমেছেই, তখন এর চূড়ান্ত না দেখে আজ সে ফিরবে না। এই জন-অরণ্যে সে অনেকবার হেরেছে—কিন্তু শেষ রাউণ্ডে সে জিতবেই।

অন্ধকারের অবগুণ্ঠন নেমে এসেছে নগর কলকাতার ওপর। রাত্রি গভীর নয়—কিন্তু সোমনাথের মনে হচ্ছে গহন অরণ্যের ধার দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ সূর্য অস্ত গিয়ে সর্বত্র এক বিপজ্জনক অন্ধকার নেমে এসেছে।

চরণদাস বললো, "নটবরবাবু এ-লাইনের নাম করা লোক। ওঁকে ঠকিয়ে অর্ডার সাপ্লাই লাইনে আমি টিকতে পারবো না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনাকে খারাপ জিনিস দেবো না কিছুতেই।"

এই বৃদ্ধকে কে বোঝাবে, মানুষ কখনও খারাপ হয় না, সোমনাথ নিজের মনে বললো। চরণদাস তার সহযাত্রীর মনের খবর রাখলো না। বললো, "গভর্মেন্টের কী অন্যায় দেখুন তো? চাকবি দিতে পারবি না, অথচ বোর্ডিং-এ আট-দশটি মেয়ে এবং আমরা তিন-চারজন করে খাচ্ছিলাম তা সহ্য হলো না।"

চরণদাস বলে চললো, "বন্ধ করতে তো পারলে না, বাবা। শুধু কচি কচি মেয়েগুলোকে কষ্ট দেওয়া। জানেন, কতদূর থেকে সব আসে—গড়িয়া, নাকতলা, টালিগঞ্জ, বৈষ্ণবঘাটা। আর একদল আসে বারাসত, দত্তপুকুর, হাবড়া এবং গোবরডাঙ্গা থেকে। বোর্ডিং-এ অনেক বসার জায়গা ছিল। মেয়েগুলোর কষ্ট হতো না। এখন এই টেলিফোন ইস্কুলে কয়েকখানা ভাঙা চেয়ার ছাড়া কিছুই নেই। কখন পার্টি এসে তুলে নিয়ে যাবে এই আশায় মেয়েগুলোকে তীর্থকাকের মতো বসে থাকতে হয়।"

চরণদাসের বকা স্বভাব। নীরব শ্রোতা পেয়ে সে বলে যাচ্ছে, "যেসব মেয়ের চক্ষুলজ্জা নেই, তারা নাচের ইস্কুলে চলে যাচ্ছে। বলরুম নাচ শেখানো হয় বলে ওরা বিজ্ঞাপন দেয়—অনেক উটকো লোক আসে, কিছু চাপা থাকে না। আমাদের টেলিফোন ইস্কুলে সুবিধে—এখনও তেমন কেউ জানে না। ভদ্রঘরের মেয়েদের পক্ষে বাড়িতে বলতেও ভাল। সাতদিন 'অপ্রেটর ট্রেনিং'-এর পরই ডেলি রোজ-এ ক্যাজুয়েল চাকবি। বাপ-মা খুব চেপে ধরলে আমাদের মেয়েরা বলে, বদলী অপ্রেটরদের বিকেল তিনটে-দশটার চাকরিটাই সহজে পাওয়া যায়। কারণ এ-সময়ে অফিসের মাস-মাইনের মেয়েরা কাজ করতে চায় না। বাপেরা অনেক সময় আমাদের এখানে ফোন করে। আমরা বলি, লিভ ভেকান্সিতে কাজ করতে করতেই হঠাৎ 'পার্মেন্ট' চাকরি পেয়ে যাবে।"

চরণদাস এবার একটা পুরানো বাড়িতে ঢুকে পড়লো। দুটো মেয়ে টেলিফোন ইস্কুলে এখনও বসে আছে। একজন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান—বোধহয় দেহে কিছু নিগ্রো রক্ত আছে। উগ্র এবং অসভ্য বেশবাস করেছে মেয়েটি। আরেকজন সিন্ধি—হাল ফ্যাশনের লুঙ্গী পরেছে। সোমনাথকে দেখে দুজন

মেয়েই চাপা উত্তেজনায় দু'বার মুখ বাড়িয়ে দেখে গেল। চরণদাস বললো "আপনি মিত্তির সায়েবের লোক—এসব জিনিস আপনাকে দেওয়া চলবে না। এরা ভারি অসভ্য—একেবারে বাজারের বেশ্যা। একটু বসুন—আপনার জিনিস এখনই এসে পড়বে।"

ফিক করে হাসলো চরণদাস। "আপনি ভাবছেন, তিনটে থেকে ডিউটি. অথচ এখনও আসেনি কেন?"

চরণদাস নিজেই উত্তর দিলো, "একেবারে নতুন—দিন কয়েক হলো লাইনে জয়েন করেছে। গেরস্ত চাকরির জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরে ঘুরে, কিছু না-পেয়ে এ-লাইনে এসেছে। বিকেলের দিকে তো আমাদের খদ্দেরের কাজের চাপ থাকে না। আমাকে বলে গেছে একবার হাসপাতালে যাবে কীসের খোঁজ করতে।"

চরণদাস বললো, "খুব ভাল মেয়েমানুষ পাবেন স্যর। যিনি ভেট পাবেন. দেখবেন তিনি কীরকম খুশী হন। অনেকদিন তো এ-লাইনে হয়ে গেল। ছোটবেলা থেকে দেখছি, এ-লাইনে নতুন জিনিসের খুব কদর। আমাদের বোর্ডিং-এ গেরস্ত ঘর থেকে আনকোরা মেয়ে এলেই খদ্দেরের মধ্যে হৈ-হৈ পড়ে যেত। এক একবার দেখেছি, লাইন পড়ে যেত। এক খদ্দের ঢুকেছে—আরও দুজন খদ্দের সোফায় বসে সিগ্রেট টানছে। নতুন রিফিউজি মেয়েগুলো পাঁচমিনিট বিশ্রাম নেবার সময় পেত না।" একটা বিড়ি ধরালো চরণদাস। বললো, "আপনাকে যে-মেয়ে দেবো একেবারে ফ্রেশ জিনিস। ভয় পর্যন্ত ভাঙেনি। সাড়ে-ন'টার পর এক মিনিট বসবে না। আমাকে আবার বালিগঞ্জের মোড় পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসতে হয়। আমার বাড়ি অবশ্য একই রাস্তায় পড়ে—দুটো-একটা টাকাও পাওয়া যায়।"

মেয়েটি আসতেই চরণদাস সব ব্যবস্থা করে দিলো। বললো, "পাঁচটা মিনিট সময় দিন, স্যর। একটু ড্রেস করে নিক। আমাদের এখানে সব ব্যবস্থা আছে।"

পাঁচমিনিটের মধ্যেই মেয়েটি তৈরি হয়ে নিলো। চরণদাস এবার সোমনাথকে জিজ্ঞেস করলো, "শাড়ির রঙটা পছন্দ হয়েছে তো—না হলে বলুন। আমাদের এখানে স্পেশাল শাড়ি আছে—খদ্দেরের পছন্দ অনুযায়ী অনেক সময় মেয়েরা জামাকাপড় পাল্টে নেয়।"

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সোমনাথ দেখলো আর একটুও সময় নেই। মেয়েটিকে গাড়িতে তুলে দিয়ে চরণদাস এবার সোমনাথকে লম্বা সেলাম দিলো। সোমনাথ পকেট থেকে দশটা টাকা বার করে চরণদাসের হাতে

দিলো। বেজায় খুশী চরণদাস। বললো, "আপনারা যাচ্ছেন কোথায় ?"

"গ্রেট ইণ্ডিয়ান হোটেলে," সোমনাথ উত্তর দিলো। নিজের শান্ত কণ্ঠস্বরে সোমনাথ নিজেই অবাক হয়ে গেল। এই অবস্থাতেও তার গলা কেঁপে উঠলো না। মেয়েটাকে গাড়ির মধ্যে তুলে নিতে একটুও লজ্জা হলো না। 'কেন লজ্জা হবে ?' রক্তচক্ষু এক সোমনাথ আর এক শান্ত সুসভ্য সোমনাথকে জিজ্ঞেস করলো। 'তিন বছর যখন তিলে তিলে যন্ত্রণা সহ্য করেছি, তখন তো কেউ একবারও খবর করেনি, আমার কী হবে ? আমি কেমন আছি ?'

মেয়েটি একেবারে নতুন। এখনও গ্রেট ইণ্ডিয়ান হোটেল চেনে না! জিজ্ঞেস করলো, "অনেক দূরে নাকি ?"

মেয়েটিকে বেশ ভীতু মনে হচ্ছে সোমনাথের। এদেশের লাখ লাখ বোকা ছেলে-মেয়ের মতোই সদাশঙ্কিত হয়ে আছে। নিজের নাম বললো, শিউলি দাস। "আপনার কাছে একটা অনুরোধ আছে," শিউলির গলায় কাতর অনুনয়। "দয়া করে বেশী দেবি করবেন না। দশটার মধ্যে বাড়ি না-ফিরলে আমার মা অজ্ঞান হয়ে যাবেন।"

জনবিরল মেয়ো রোড ধরে গাড়িতে যেতে যেতে শিউলি জিজ্ঞেস করলো, "আপনার নাম ?" শিউলি যখন নিজের নাম দিয়েছে, তখন সোমনাথের নাম জানবার অধিকার তার আছে। কিন্তু সোমনাথ কেমন ইতস্তত বোধ করছে —জীবনে এই প্রথম নিজের পরিচয়টা লজ্জার উদ্রেক করছে। প্রশ্নটার পুরো উত্তর দিলো না সে। গম্ভীরভাবে বললো, "ব্যানার্জি।" মেয়েটা সত্যিই আনকোরা, কারণ ব্যানার্জির আগে কী আছে জানতে চাইলো না। চাইলেও অবশ্য সোমনাথ প্রস্তুত হয়েছিল—একটা মিথ্যে উত্তর দিত।

চিন্তাজালে জড়িয়ে পড়েছে সোমনাথ। যে-নগরীকে একদা গহন অরণ্য মনে হয়েছিল সেই অরণ্যের নিরীহ সদাসন্ত্রস্ত মেষশাবক সোমনাথ সহসা শক্তিমান সিংহশিশুতে রূপান্তরিত হয়েছে। নিরীহ এক হরিণীকে কেমন অবলীলাক্রমে সে চরম সর্বনাশের জন্যে নিয়ে চলেছে।

গ্রেট ইণ্ডিয়ান হোটেলের অভিজ্ঞ দারোয়ানজীও শিউলিকে দেখে কিছু সন্দেহ করলেন না। দারোয়ানজীর দোষ কী ? এই প্রথম দেখছেন শিউলিকে।

গোয়েঙ্কাজীর ঘরে টোকা পড়তেই তিনি নিজে দরজা খুলে দিলেন। সোমনাথের জন্যে তিনি অপেক্ষা করছেন।

আজ একটু স্পেশাল সাজগোজ করেছেন গোয়েঙ্কাজী। সাদা গরদের দামী পাঞ্জাবি পরেছেন তিনি। ধুতিটি জামাইবাবুদের মতো চুনোট করা। গায়ে বিলিতী সেন্টের গন্ধ ভুরভুর করছে। পানের পিচে ঠোঁট দুটো লাল হয়ে আছে। মুখের তেল চকচক ভাবটা নেই—এখানে এসে বোধ হয় আর এক দফা স্নান সেরে নিয়েছেন।

আড়চোখে শিউলিকে দেখলেন গোয়েঙ্কা। সাদরে বসতে দিলেন দুজনকে।

নটবরবাবু বার বার বলে দিয়েছিলেন, "গোয়েঙ্কাকে বোলো, ওঁর স্পেসিফিকেশন জানা না থাকায়, আমাদের বিদ্যেবুদ্ধি মতো মেয়েমানুষ চয়েস করেছি। একটু কেয়ারফুলি গোয়েঙ্কাকে স্টাডি কোরো। যদি বোঝো জিনিস তেমন পছন্দ হয়নি, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে বোলো, এর পরের বারে আপনি যেমনটি চাইবেন ঠিক তেমনটি এনে রাখবো।"

এসব প্রশ্ন উঠলো না। কারণ গোয়েঙ্কাজীর হাবভাবেই বোঝা যাচ্ছে সঙ্গিনীকে তাঁর বেশ পছন্দ হয়েছে।

সোমনাথের সমস্ত শরীর অকস্মাৎ মিশরের মমির মতো শক্ত হয়ে আসছে। তার চোয়াল খুলতে চাইছে না। নটবরবাবু বার বার বলেছিলেন, "জিজ্ঞেস করবে, কলকাতায় আসবার পথে গোয়েঙ্কাজীর কোনো কষ্ট হয়েছিল কিনা?"

গোয়েঙ্কাজী বললেন, "আমি এসেই আপনার চিঠি পেলাম। কষ্ট করে আবার ঘরে ফুল পাঠাতে গেলেন কেন?"

'তোমাকে জুতো মারা উচিত ছিল', এই বলতে পারলেই ভিতরের সোমনাথ শান্তি পেত। কিন্তু সোমনাথের মমিটা কিছুই বললো না।

গোয়েঙ্কাজী স্যুইট নিয়েছেন। সামনে ছোট একটু বসবার জায়গা। ভিতরে বেড্‌রুমটা উঁকি মারছে।

মানুষের চোখও যে জিভের মতো হয় তা সোমনাথ প্রথম দেখলো। শিউলির দিকে তাকাচ্ছেন গোয়েঙ্কা আর চোখের জিভ দিয়ে ওর দেহটা চেটে খাচ্ছেন।

শিউলি মাথা নিচু করে সোফায় বসে ছিল। তার লম্বা বেণীর ডগাটা শিউলি যে বার বার নিজের আঙুলে জড়াচ্ছে গোয়েঙ্কা তাও লক্ষ্য করলেন।

সঙ্গিনীকে সন্তুষ্ট করবার জন্যে গোয়েঙ্কা জিজ্ঞেস করলেন, সে কিছু খাবে কিনা। শিউলি না বললো। ভদ্রতার খাতিরে গোয়েঙ্কাজী এবার সোমনাথকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কী খাবেন বলুন?" সোমনাথ না বলায় ভদ্রলোক যেন আশ্বস্ত হলেন।

শিউলির দেহটা আর একবার চেটে খেয়ে গোয়েঙ্কা বললেন, "বসুন না, মিস্টার ব্যানার্জি। শিউলির সঙ্গে দুজনে গল্প করি।" নটবরবাবুর উপদেশ সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল। "খবরদার ওই কাজটি করবেন না। যার জন্যে ভেট নিয়ে গেছেন, মেয়েমানুষটি সেই সময়ের জন্যে তার একার, এই কথাটি কখনও ভুলবেন না। মেয়েমানুষের সঙ্গে যা কিছু রস-রসিকতা পার্টি করুক। শাস্ত্রে বলেছে, পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ।"

ঘড়ির দিকে তাকালো সোমনাথ। অধৈর্য গোয়েঙ্কাজী এবার সঙ্গিনীকে বেড রুমে যেতে অনুরোধ করলেন।

নিজের কালো হাতব্যাগটা তুলে নিয়ে শিউলি পাশের ঘরে যেতেই সোমনাথ উঠে দাঁড়ালো। গোয়েঙ্কাজী খুশী মেজাজে সোমনাথের কাঁধে হাত দিলেন।

গোয়েঙ্কাজী অসংখ্য ধন্যবাদ জানালেন সোমনাথকে। বললেন, "অনেক কথা আছে। এখনই বাড়ি চলে যাবেন না যেন।"

সোমনাথ জানিয়ে দিলো সে একটু ঘুরে আসছে। গোয়েঙ্কা নির্লজ্জভাবে বললেন, "আপনি ঘণ্টা দেড়েক পরে ফিরে এসে নিচে লাউঞ্জে অপেক্ষা করবেন। আমি আপনাকে ফোনে ডেকে নেবো।"

এই দেড় ঘণ্টা পাগলের মতো এসপ্ল্যানেডের পথে পথে ঘুরেছে সোমনাথ। ভিতরের পুরানো সোমনাথ তাকে জ্বালাবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সোমনাথ এক ঝটকায় তাকে দূর করে দিয়েছে।

অন্ধকারে অনেকক্ষণ ঘুরে ঘুরে এখন আশ্চর্য এক অনুভূতি আসছে। নিজেকে আর সিংহশিশু মনে হচ্ছে না। হঠাৎ ক্লান্ত এক গরিলার মতো মনে হচ্ছে সোমনাথের। বৃদ্ধ গরিলার ধীর পদক্ষেপে সোমনাথ এবার দি গ্রেট ইণ্ডিয়ান হোটেলে ফিরে এলো। এবং নিরীহ এক গরিলার মতোই লাউঞ্জের নরম সীটে বসে পড়লো।

দেড় ঘণ্টা থেকে মাত্র দশ মিনিট সময় বেশী নিলেন গোয়েঙ্কা। এক ঘণ্টা চল্লিশ মিনিটের মাথায় ফোনে সোমনাথকে ডাকলেন। গোয়েঙ্কাজীর গলায় গভীর প্রশান্তি ঝরে পড়ছে। "হ্যালো মিস্টার ব্যানার্জি, উই হ্যাভ ফিনিশড্।"

ফিনিশড্! তার মানে তো সোমনাথ এখন ওপরে গোয়েঙ্কাজীর ঘরে চলে যেতে পারে। নষ্ট করবার মতো সময় এখন নয়। অথচ ঠিক এই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে ভিতরের পুরানো সোমনাথ আবার নড়ে চড়ে ওঠবার চেষ্টা করলো। গরিলা সোমনাথকে সে জিজ্ঞেস করছে, 'ফিনিশ কথাটার মানে কী?' ওই সোমনাথ ফিসফিস করে বলছে, 'ফিনিশড্ মানে তো শেষ হয়ে যাওয়া। গোয়েঙ্কাজী শেষ হযে যেতে পারেন, কিন্তু উই হ্যাভ ফিনিশড্ বলবার তিনি কে? ওঁর সঙ্গে তাহলে আর কে কে শেষ হলো?' 'আঃ!' ওই সোমনাথের ওপর ভীষণ বিরক্ত হলো সোমনাথ। 'তোমাকে হাতে পায়ে দড়ি বেঁধে পাগলা সুকুমারের মতো রেখে দিয়েছি—তাও শান্তি দিচ্ছো না।'

ওই সোমনাথটার স্পর্ধা কম নয়—আবাব কিছু বলতে যাচ্ছিলো। কিন্তু ওসব বাজে বকুনি শোনবার সময় কোথায় সোমনাথের? মিস্টার গোয়েঙ্কার সঙ্গে বিজনেস সংক্রান্ত জরুরী কথাগুলো এখনই সেরে ফেলতে হবে। 'পড়োনি? স্ট্রাইক দ্য আয়রন হোয়েন ইট ইজ হট! গোয়েঙ্কা এখনও ফাবনেশ থেকে বেরুনো লাল লোহার মতো নবম হয়ে আছে, দেবি করা চলবে না।'

একটু দ্রুতবেগেই সোমনাথ যাচ্ছিলো। কিন্তু লিফটের সামনে নটবর মিত্র তাকে পাকড়াও করলেন। বেশ খুশীর সঙ্গে বললেন, "কোথায় গিয়েছিলেন মশাই? আমি খুঁজে খুঁজে হয়রান! গোয়েঙ্কার ঘরও বন্ধ—'ডোণ্ট ডিসটার্ব' বোর্ড ঝোলানো—আমি জ্বালাতন করতে সাহস পেলাম না।"

সোমনাথ হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, "গড়ের মাঠে ঘুরছিলাম।"

"বেশ মশাই! আপনি গড়ের মাঠে হাওয়া খাচ্ছেন। আমি তো উষা জৈনকে মিস্টার সুনীল ধরের ঘরে চালান করে দিয়ে দেড় ঘণ্টা বার-এ বসে আছি। না-বসে পারলাম না মশাই। মিস্টার ধর বিরাট গভরমেণ্ট ইঞ্জিনিয়ার। একেবারে কাঠ-বাঙাল। বিকেল থেকে মালে চুর হয়ে আছেন। ভদ্রলোক আমার সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করলেন। নেশার ঘোরে বললেন, 'মেয়েমানুষের গায়ে কখনও হাত দিইনি। আজ প্রথম ক্যারাকটার নষ্ট করবো। থ্যাংক ইউ ফর ইওর সিলেকশন।' আমি ভাবলাম উষা জৈনকে পেয়ে খুব খুশী হয়েছেন। কিন্তু মিস্টার ধর যা শোনালেন, তাতে একটা শর্ট স্টোরি হয়ে গেল! মিস্টার ধর বললেন, 'গুড়ের নাগরীগুলো আমাদের এই সোনার দেশকে শুষে শুষে

সর্বনাশ করে দিয়েছে। টাকার দেমাক দেখিয়ে বেটারা ভূতের নৃত্য করছে। আমাদের অসহায় ইনোসেণ্ট মেয়েগুলোকে পর্যন্ত আস্ত রাখছে না। তাই আজ আমি প্রতিশোধ নেবো।'

"শুনে তো মশাই আমার হাসি যায় না! হাসি চাপা দেবার জন্যে বাধ্য হয়ে আমাকে একটা ড্রিঙ্ক নিয়ে বারে বসতে হলো।"

নটবর মিত্তির বললেন, "যান আপনি গোয়েঙ্কার কাছে। বিজনেসের কথাবার্তা এই তালে সেরে ফেলুন। আমি পাঁচ মিনিট পরেই আপনাদের ঘরে গিয়ে মেয়েটাকে দেখে আসছি—গোয়েঙ্কাকে যদি সন্তুষ্ট করে থাকে তাহলে ফিউচারে আমার কাছ থেকে কাজকর্ম পাবে।"

টোকা পড়তেই গোয়েঙ্কাজী দরজা খুলে দিলেন। কেমন মনোহর প্রশান্ত সৌম্য মুখে তিনি সোমনাথকে ভিতরে আসতে বললেন। শিউলিকে দেখা যাচ্ছে না। সে কোথায় গেল? এখনও ভিতরের ঘরে শুয়ে আছে নাকি?

সোমনাথের আন্দাজ ঠিক হয়নি। শিউলি বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলো। সমুদ্রের আলোড়নের মতো ফ্লাশের আওয়াজ ভেসে আসছে। শিউলি কারো দিকে তাকাচ্ছে না। সে মুখ ফিরিয়ে রয়েছে। বেচারাকে ক্লান্ত বিধ্বস্ত মনে হচ্ছে।

কী আশ্চর্য! এই ঘরে শিউলি ছাড়া অন্য কারও চোখে মুখে লজ্জার আভাস নেই। গোয়েঙ্কাজী শান্তভাবে একটা সিগারেট টানছেন। সোমনাথ মাথা উঁচু করে বসে আছে। যত লজ্জা শুধু শিউলি দাসেরই। তার প্রাপ্য টাকা অনেক আগেই চুকিয়ে দিয়েছে সোমনাথ। নিজের ভ্যানিটি ব্যাগ নিয়ে মাথা নিচু করে আর একটিও কথা না বলে সন্ত্রস্ত হরিণীর মতো শিউলি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

গোয়েঙ্কা এবার একটু কপট ব্যস্ততা দেখালেন। শিউলির যা প্রাপ্য তা অনেক আগেই চুকিয়ে দেওয়া হয়েছে এই বলে সোমনাথ তাঁকে আশ্বস্ত করলো।

সন্তুষ্ট গোয়েঙ্কা বললেন, "শিউলি ইজ ভেরি গুড। কিন্তু, লাইক অল বেঙ্গলী, নিজের ব্যবসায় থাকতে চায় না। বিছানাতে শুয়েও বলছে, একটা ছেলের চাকরি করে দিন।"

আজ কল্পতরু হয়েছেন মিস্টার গোয়েঙ্কা। সোমনাথের করমর্দন করলেন। বললেন, "আপনার অর্ডারের চিঠি আমি টাইপ করে এনেছি। আপনি রেগুলার প্রতি মাসে কেমিক্যাল সাপ্লাই করে যান। দু নম্বর মিলের কাজটাও আপনাকে

দেবার চেষ্টা করবো। আর দেরি নয়। আমার শ্বশুরবাড়িতে এখন আবার ডিনারের নেমন্তন্ন রয়েছে," এই বলে মিস্টার গোয়েঙ্কা নিজের জিনিসপত্র গোছাতে শুরু করলেন।

প্রচণ্ড এক উল্লাস অনুভব করছে সোমনাথ। গোয়েঙ্কার লেখা চিঠিখানা সে আবার স্পর্শ করলো। সোমনাথ ব্যানার্জি তাহলে অবশেষে জিতেছে। সোমনাথ এখন প্রতিষ্ঠিত।

গোয়েঙ্কার ঘর থেকে বেরিয়ে সোমনাথ থমকে দাঁড়ালো। আবার চিঠিখানা স্পর্শ করলো।

করিডরেই নটবরবাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। হুঙ্কার দিয়ে নটবব বললেন, "আজকেই চিঠি পেয়ে গেলেন? গোয়েঙ্কা তাহলে আপনাকে বিজনেসে দাঁড় করিয়ে দিলো। কংগ্রাচ্যুলেশন, আমি আন্দাজ করেছিলাম, ব্যাটা চিঠি তৈরি করে নিয়ে আসবে।"

সোমনাথের ধন্যবাদের জন্যে অপেক্ষা করলেন না নটবরবাবু। বললেন, "পরে কথা হবে। মিসেস বিশ্বাসের দেমাক আমি ভাঙতে চাই। মেয়েটাকে একটু দেখে আসি—ঘরে আছে তো?"

এইমাত্র যে শিউলি দাস বেরিয়ে গেল তা জানালো সোমনাথ।

"এই মাত্র যে-মেয়েটার সঙ্গে করিডরে আমার দেখা হলো? লালরঙের তাঁতের শাড়ি-পরা? চোখে চশমা? হাতে কালো ব্যাগ?"

সোমনাথ বললে, "হ্যাঁ। ওই তো শিউলি দাস।"

"শিউলি দাস কোথায়?" একটু অবাক হলেন নটবর মিত্র। "ওকে তো আমি চিনি। আমাদের যাদবপুরের পাড়ায় থাকে। তাহলে নাম ভাঁড়িয়ে এ-লাইনে এসেছে। এ-লাইনে কোনো মেয়েই অবশ্য ঠিক নাম বলে না। ওর নাম তো কণা।" নটবরবাবু বললেন, "দাস হলো কবে থেকে? ওরা তো মিত্তির। ওর বাবাকেও চিনি—সবে রিটায়ার করেছে। আর ভাইটা মশাই ইদানীং ডাহা পাগল হয়ে গেছে—সুকুমার না কী নাম।"

অপ্রত্যাশিত আবিষ্কারের আনন্দে নটবব মিত্তির এখন বিমোহিত। বললেন, "কী আশ্চর্য দেখুন—সারা শহর খুঁজে খুঁজে শেষ পর্যন্ত যাকে নিয়ে আসা হলো সে পাশের বাড়ির লোক! খুব অভাব চলছিল ওদের, তা ভালই করেছে।"

হঠাৎ ভীষণ ভয় লাগছে সোমনাথের। কাল যখন তপতী তার সঙ্গে দেখা করতে আসবে তখন সোমনাথের মুখটা যদি গরিলার মতো দেখায়? তপতী

তখনও কি ভালবাসতে পারবে? তপতী যেন বলেছিল সোমনাথের নিষ্পাপ মুখের হাসি দেখেই সে হৃদয় দিয়েছিল।

"কণা, কণা, কণা," পাগলের মতো কণাকে ডাকতে ডাকতে সোমনাথ গ্রেট ইণ্ডিয়ান হোটেলের গাড়ি বারান্দা পর্যন্ত ছুটে এসেছিল। কিন্তু কোথায় সুকুমারের বোন? সে চলে গিয়েছে।

যোধপুর পার্কে নিজেদের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে মাতালের মতো টলছে সোমনাথ ব্যানার্জি। হাতে তার দুখানা উপহারের শাড়ি এবং পকেটে সেই চিঠিটা—যা তাকে সমস্ত অর্থনৈতিক অপমান থেকে মুক্তি দিয়েছে। সোমনাথ এখন আর চাকরির ভিখিরি নয়—সে এখন সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। প্রতি মাসে একটা অর্ডার থেকেই হাজার টাকা রোজগার করবে সে। কারুর কাছে আর ভিখিরি থাকতে হবে না সোমনাথকে। তপতীকে জানিয়ে দেবে সে আর কাউকে ভয় করে না।

কমলা বউদিকেই প্রথম খবরটা দিলো সোমনাথ। তারপর শাড়িটা এগিয়ে দিলো। কমলা বউদি বুঝলেন, সোমনাথ আজ বড় একটা কিছু করেছে। "তুমি আজ নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছো তাহলে?" কমলা বউদি গভীর আনন্দের সঙ্গে বললেন।

আনন্দে আত্মহারা হয়ে বউদি এবার দেওরের দেওয়া প্রথম উপহারের প্যাকেট খুলে ফেললেন। বললেন, "বাঃ।" সোমনাথকে খুশী করার জন্যে বউদি এখনই সেই শাড়ি পরতে গেলেন। বললেন, "এই শাড়ি পরেই জন্মদিনের পায়েস পরিবেশন করবো।"

বউদি পাশের ঘরে যেতে না যেতেই সোমনাথ কাতরভাবে ডাকলো, "বউদি!"

"কী হলো তোমার? অমনভাবে চিৎকার করছো কেন?" বউদি ফিরে এসে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

করুণভাবে সোমনাথ বললো, "বউদি কাপড়টা আপনি পরবেন না।"

"কেন? কী হলো?" কমলা কিছুই বুঝতে পারছেন না।

"ওতে অনেক নোংরা বউদি।" আমতা-আমতা করতে লাগলো সোমনাথ।

"সকালে যখন কিনেছিলাম তখনও বেশ পরিষ্কার ছিল। এই সন্ধ্যেবেলায় হঠাৎ নোংরা হয়ে গেল। ওতে অনেকরকম ময়লা আছে বউদি—আপনি পরবেন না।"

দেবরের এমন কথা বলার ভঙ্গী কমলা বউদি কোনোদিন দেখেননি। বললেন, "হাত থেকে নোংরার মধ্যে পড়ে গিয়েছিল বুঝি।"

সোমনাথ আবার বললো, "আপনাকে তো বারণ করলাম, ঐ কাপড় পরতে।" কমলা অগত্যা কাপড়টা কাচবার জন্যে সরিয়ে রাখলেন।

আরও রাত হয়েছে। অভিজিৎ আসানসোল ফ্যাকটরিতে গিয়েছে—আজ ফিরবে না। সোমনাথ খেতে আসছে না দেখে বুলবুল ওকে ডাকবার জন্যে ঘরে ঢুকে পড়েছিল। ভেবেছিল, সেই সময় অভিনন্দন জানিয়ে নিজের কাপড়টাও চেয়ে নেবে।

কিন্তু মুখ শুকনো করে সে সোমনাথের ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। দিদির কাছে দ্রুত এসে উদ্বেগের সঙ্গে ফিসফিস করে সে বললো, "দিদি কী ব্যাপার! বালিশে মুখ গুঁজে, লুকিয়ে লুকিয়ে সোম ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।"

কমলার চোখ দুটো ছলছল করে উঠলো। বললেন, 'নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে ওর বোধহয় মায়ের কথা মনে পড়ে গেছে।" বউদি কি ভাবলেন, তারপর বললেন, "ওকে লজ্জা দিও না—ওকে কাঁদতে দাও।"

জন-অরণ্যের নেপথ্য কাহিনী

কোনো গল্প-উপন্যাস পাঠক-পাঠিকাদের ভাল লাগলে, লেখকের যেমন আনন্দ, তেমনি নানা অসুবিধে। পথে-ঘাটে, ট্রামে-বাসে, আপিসে-রেস্তোরাঁয় পরিচিতজনরা এগিয়ে এসে বলেন, তোমার অমুক বইটা পড়লাম—দারুণ হয়েছে। ডাকপিওন অপরিচিতজনদের চিঠির ডালি উপহার দিয়ে যায়; সম্পাদক ও প্রকাশকের দপ্তর থেকে রি-ডাইরেকটেড হয়েও অনেক অভিনন্দন-পত্র হাতে আসে। এসব অবশ্যই ভাল লাগে। কিন্তু অসুবিধা শুরু হয় যখন উপন্যাসের মূল কাহিনী সম্পর্কে পাঠকের মনে কৌতূহল জমতে থাকে।

তখন প্রশ্ন ওঠে, অমুক কাহিনীটা কি সত্য? কেউ কেউ ধরে নেন, নির্জলা সত্যকেই গল্পের নামাবলী পরিয়ে লেখকরা আধুনিক সাহিত্যের আসরে উপস্থাপন করে থাকেন। আর একদল বিরক্তভাবে বলে ওঠেন, 'সব ঝুটা হ্যায়—জীবনে এসব কখনই ঘটে না, সস্তা হাততালি এবং জনপ্রিয়তার লোভে বানানো-গল্পকে সত্য-সত্য ঢঙে পরিবেশন করে লেখকরা দেশের সর্বনাশ করছেন।'

জন-অরণ্য উপন্যাস নিয়ে আমাকে এই ধরনের অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এই উপন্যাসের চলচ্চিত্ররূপ পাঠক ও দর্শকের কৌতূহলে ইন্ধন জুগিয়েছে। দেশের বিভিন্ন মহলে কাহিনীর পক্ষে এবং বিপক্ষে বিতর্কের ঝড় উঠেছে।

প্রত্যেক গল্পের পিছনেই একটা গল্প-লেখার গল্প থাকে এবং জন-অরণ্য লেখার সেই নেপথ্য কাহিনীটা স্বীকারোক্তি হিসেবে আদায় করবার জন্যে অনেকেই আমার উপর চাপ দিয়েছেন। কৌতূহলী পাঠকদের এতদিন আমি নানা তর্কজালে আবদ্ধ রাখবার চেষ্টা করেছি। বলেছি, "থিয়েটারের সাজঘর দেখলে নাটক দেখবার আকর্ষণ নষ্ট হতে পারে।" কিন্তু সে যুক্তি শেষ পর্যন্ত ধোপে টেকেনি।—বিদেশের লেখকরা নাকি গল্প-লেখার সাজঘরের গল্পটাও অনেক সময় উপন্যাসের সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ করছেন। বিখ্যাত এক সায়েব লেখকের নাম করে জনৈকা পাঠিকা জানালেন, "আপনি তো আর মিস্টার অমুকের থেকে কৃতী লেখক নন? তিনি যখন তার অমুক উপন্যাস রচনার ইতিহাসটা বই-আকারে লিখে ফেলেছেন, তখন আপনার আপত্তি কোথায়?"

মহিলার কথায় মনে পড়লো, উপন্যাস রচনার জন্য সংগৃহীত কাগজপত্র, নোটবই, প্রথম খসড়া ইত্যাদি সম্পর্কে এখন বিদেশে বেশ ঔৎসুক্য সৃষ্টি হয়েছে। ওয়াশিংটনে পৃথিবীর বৃহত্তম গ্রন্থাগার লাইব্রেরি অফ কংগ্রেসের পাণ্ডুলিপি বিভাগে এই ধরনের ওয়ার্কিং পেপার সযত্নে সংগ্রহ করা হচ্ছে। ১৯৬৭ সালের অক্টোবর মাসে ওই গ্রন্থাগারে আমাকে জেমস মিচনারের 'হাওয়াই' উপন্যাস সংক্রান্ত ওয়ার্কিং পেপারস-এর একটা বাক্স সগর্বে দেখানো হয়েছিল।

আমার পাঠিকাকে বলেছিলাম, "আমরা এখনও সাহেব হইনি। পড়াশোনা, অনুসন্ধান, গবেষণা, লেখালেখি, কাটাকাটির পরে শেষপর্যন্ত যে-বইটা বেরুলো তাই নিয়েই পাঠকদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। তার আগে কী হলো, তা নিয়ে লেখক ছাড়া আর কারুর মাথা-ব্যথার যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই।"

পাঠিকা মোটেই একমত হলেন না—সন্দেহজনক দৃষ্টিতে আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত নিরীক্ষণ করে বললেন, "লজ্জা পাবার মতো কিছু যদি না করে থাকেন, তাহলে কোনো কিছুই গোপন করবেন না।"

এরপর চুপচাপ থাকা বেশ শক্ত। কাতরভাবে নিবেদন করলাম, "এদেশে মূল উপন্যাসটাই লোকে পড়তে চায় না। উপন্যাসটা কীভাবে লেখা হলো সে-বিষয়ে কার মাথা-ব্যথা বলুন ?"

মহিলা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, "ওসব ছেলে-ভুলোনো কথায় মেয়ে ভুলোতে পারবেন না। আপনার জন-অরণ্য লেখার গল্পটা আমরা পড়তে চাই।"

অতএব আমার গত্যন্তর নেই। জন-অরণ্য উপন্যাসের গোড়ার কথা থেকেই শুরু করতে হয়।

এই উপন্যাস লেখার প্রথম পরিকল্পনা এসেছিল আমার বেকার জীবনে। সে অনেকদিন আগেকার কথা। বাবা হঠাৎ মারা গিয়ে বিরাট সংসারের বোঝা আমার মাথার ওপর চাপিয়েছেন। একটা চাকরির জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। অথচ আপিস অথবা কারখানায় কাউকে চিনি না—চাকরি কী করে জোগাড় করতে হয় তাও জানি না। এই অবস্থায় নতুন আপিসে গিয়ে লিফটে চড়তে সাহস পেতাম না—আমার ভয় ছিল লিফটে চড়তে হলে পয়সা দিতে হয়। চাকরির সন্ধানে সারাদিন ঘুরে ঘুরে কলকাতার আপিসপাড়া সম্বন্ধে আমার মনে বিচিত্র এক ছবি আঁকা হয়ে গিয়েছিল। একদিন এক পদস্থ ভদ্রলোক বিরক্ত হয়ে আমাকে বকুনি লাগালেন, "বাঙালীরা কি চাকরি ছাড়া আর কিছু জানবে না ? বিজনেস করুন না ?"

"কিসের বিজনেস ?"

ভদ্রলোক বললেন, "এনিথিং—ফ্রম আলপিন টু এলিফ্যাণ্ট।"

সেই শুরু। বিজনেসে নেমে পড়বার সিদ্ধান্ত নিলাম। এই সময় পাকে-চক্রে এক মাদ্রাজি ছোকরার সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল—মিস্টার ঘোষ নামে এক বাঙালী ফাইনানসিয়াবের সহযোগিতায় তিনি ওয়েস্ট পেপার বাস্কেট তৈরির ব্যবসা খুলেছেন। আমি ওই কোম্পানির এজেণ্ট।

বাস্কেট তৈরির সেই কারখানা এক আজব জায়গায়। তারের ঝুড়িগুলো রঙ হতো মধ্য কলকাতার এক পুরানো বাড়িতে। এই রঙ করতেন কয়েকজন সিন্ধি এবং অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মহিলা—সন্ধ্যেবেলায় যাঁদের অন্য পেশা ছিল। দেহবিক্রয় করেও দেহধারণ কঠিন হয়ে পড়েছিল বলে এঁরা এই পার্টটাইম কুটিরশিল্পে মনোযোগ দিয়েছিলেন। তখন আমার কম বয়স, কলকাতার অন্ধকার জীবনযাত্রা সম্পর্কে কিছুই জানি না। এই সব স্নেহশীলা মহিলাদের সাক্ষাৎ-সংস্পর্শে এসে অভিজ্ঞতার এক নতুন দিগন্ত আমার চোখের সামনে উন্মোচিত হলো।

অর্ডার সাপ্লাইয়ের ব্যবসায় নেমে অফিসপাড়াব যে-জীবনকে দেখলাম তার কিছুটা 'চৌরঙ্গী'র মুখবন্ধে নিবেদন করেছি। অনেক কোম্পানির কোট-প্যান্ট চশমাপরা ক্রেতা গোপনে বাড়তি কমিশন চাইতেন, হাতে কিছু গুঁজে না দিলে পাঁচ-ছ'টাকার অর্ডারও তাঁরা হাতছাড়া করতেন না। মানুষের এই অরণ্যে পথ হারিয়ে মানুষ সম্বন্ধে যখন আশা ছাড়তে বসেছিলাম তখন ডালহৌসি-পাড়াব সাহেবী আপিসে এক দারোয়ানজীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। দারোয়ানজী সস্নেহে আমার কাছ থেকে কয়েকটা ঝুড়ি কিনলেন, সঙ্গে সঙ্গে পেমেণ্টের ব্যবস্থা করে দিলেন। আমি ভাবলাম দারোয়ানজীর এই স্পেশাল আগ্রহের স্পেশাল কারণ আছে। বিক্রির টাকাটা হাতে পেয়ে দারোয়ানজীকে কমিশন দিতে গেলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়ে দিলেন। বললেন, "ছি ছি! ভেবেছো কী? তোমার কাছ থেকে পয়সা নেবার জন্যে এই কাজ করেছি আমি! ঘামে ভেজা তোমার অন্ধকার মুখখানা দেখে আমার কষ্ট হয়েছিল, তাই তোমাকে সাহায্য করেছি।"

দারোয়ানজী সেদিন আমাকে মাটির ভাঁড়ে চা খাইয়েছিলেন। নানা মূল্যবান উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন, মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ।

জীবনের এক সঙ্কট-মুহূর্তে ডালহৌসি-পাড়ার অশিক্ষিত দারোয়ান আমাকে বাঁচিয়েছিল—আমি হেরে যেতে যেতে হারলাম না।

আমার মনের সেই অনুভূতি আজও নিঃশেষ হয়নি—মানুষকে আমি

কিছুতেই পুরোপুরি অবিশ্বাস করতে পারি না। কিন্তু ওয়েস্ট-পেপার হাতে দোকানে-দোকানে, আপিসে-আপিসে ঘুরে মানুষের নির্লজ্জ নগ্নরূপ দেখেছি। দু-একটা জায়গায় ঝুড়ি জমা দিয়ে একটা পয়সাও আদায় করতে পারিনি। এক সপ্তাহ পায়ে হেঁটে আপিসপাড়ায় এসে এবং টিফিন না করে আমাকে সেই ক্ষতির খেসারৎ দিতে হয়েছে। ক্যানিং স্ট্রীটের একটা দোকানে ছ'টা ঝুড়ি কিনেছিল—অন্তত তিরিশবার গিয়েও পয়সা অথবা ঝুড়ি কোনোটাই উদ্ধার করতে পারিনি। তবু যে পুরোপুরি হতাশ হইনি, তার কারণ মধ্যদিনে মধ্য-কলকাতার বান্ধবীরা। তাঁরা আমাকে উৎসাহ দিতেন। বলতেন, দেহের ব্যবসাতেও অনেক সময় টাকা মারা যায়। কিন্তু মাঝে-মাঝে এমন সুযোগ আসে যখন সমস্ত-লোকসান সুদসমেত উসুল হয়ে যায়।

আমারও সামনে একদিন তেমন সম্ভাবনার ইঙ্গিত ঝলমল করে উঠলো। এক ভদ্রলোক বললেন, তিনি ডিসপোজাল থেকে খুব সস্তাদরে কিছু স্ত্রীল বেলিং হুফ কিনেছেন। দাম বললেন এবং জানালেন, এর ওপর চড়িয়ে আমি যত দামে মাল বিক্রি করতে পারবো সবটাই আমার প্রফিট।

এই সব বেলিং হুফ কাপড়ের কল এবং জুট মিলে লাগে। কয়েকদিন খোঁজ খবর নিয়ে জানলাম, ঠিক মতো পার্টি জোগাড় করতে পারলে বেশ কয়েক হাজার টাকা লাভের সম্ভাবনা আছে। বিজনেসে বড় লোক হবার স্বপ্নে বিভোর হয়ে অনেক অফিসে ঘুরলাম। কিন্তু কোনো ফল হয় না। শেষে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক আমার ওপর দয়াপরবশ হয়ে বললেন, "এইভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য হয় না ভাই—বড় বড় কারখানায় আপনার জানা শোনা কোনো অফিসার নেই? ওই রকম কারুর থ্রু দিয়ে পারচেজ অফিসারদের নরম করবার চেষ্টা করুন।"

অফিসারকে নরম করবার ব্যাপারটা তখনও বুঝে উঠতে পারিনি। একজন পরিচিত ভদ্রলোকের সাহায্যে এক মিলে কিছুটা এগোলাম। জিনিসের নমুনা দিলাম। দামও যে সস্তা জানিয়ে দিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই হলো না। পরিচিত ভদ্রলোক আমার দুঃখে কষ্ট পেয়ে বললেন, "পারচেজ অফিসার মালিকের আত্মীয়—ওরা নিজেদের খেয়াল-খুশি মতো চলে, ওদের সাতখুন মাপ।"

ভদ্রলোকের কাছে যাতায়াত করে জুতোর হাফসোল খইয়ে ফেলেছি, কিন্তু কিছুতেই কিছু করা গেল না। উনি কেন যে আমাকে অর্ডার দিলেন না তাও অজানা রয়ে গেল।

শেষ পর্যন্ত ছোটখাট একটা চাকরি জোগাড় হয়ে যাওয়ায় ব্যবসার লাইন ছেড়ে বিজনেসে বড়লোক হবার স্বপ্নটা চিরদিনের মতো বিসর্জন দিয়েছি। এমন সময় একদিন মধ্য-কলকাতার সেই বাড়িতে গিয়েছি, কিছু হিসেব পত্তর বাকি ছিল। তখন দুপুর তিনটে। রোজী নামে এক খ্রীস্টান দেহপসারিণীর সঙ্গে আমার খুব আলাপ ছিল। তার ঘরে ঢুকতে গিয়ে হোঁচট খেলাম—আমার পরিচিত পারচেজ অফিসার সেখানে বসেই ৬ দণ্ডের আনন্দ উপভোগ করছেন। মিনিট দশেকের মধ্যেই ভদ্রলোক বিদায় নিলেন।

পরে শুনেছি, আমাদের কোম্পানির মাদ্রাজী যুবকের বিশিষ্ট অতিথি হিসাবেই ভদ্রলোক রোজীর বিজন কক্ষে এসেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত সেই বেলিং হুফ যা আমি বেচতে পারিনি তা তিনি রোজীর দেহসান্নিধ্যে সন্তুষ্ট হয়ে চড়া দরে কিনেছেন। রোজী আমার বোকামিতে বিরক্ত হয়ে বলেছিল, "ইউ আর এ ব্লাডি ফুল। আমাকে আগে বলোনি কেন?"

অস্বস্তিকর এই ঘটনা আমার মনের গভীরে গেঁথে গিয়েছিল। কিন্তু তখন অন্য এক জগতে নতুন নতুন অভিজ্ঞতার নাটকে তুলতে আরম্ভ করেছি। আমার সামনে নতুন এক পৃথিবীর সিংহদ্বার সহসা উন্মীলিত হয়েছে, যার অন্তঃপুরে বসবাস করছেন বিচিত্র এক বিদেশী—নাম নেয়েল বারওয়েল।

সাহিত্যের নিত্য নূতন পথে ঘুরতে-ঘুরতে ব্যর্থ বিজনেসম্যান শংকরের ছবিটা আমার অজান্তেই অস্পষ্ট হতে আরম্ভ করেছিল। এ-সম্বন্ধে লেখবার ইচ্ছেও তেমন ছিল না। ইতিমধ্যে বেশ কয়েক বছর কেটে গিয়েছে। কিছু দিন আগে খেয়ালের বশে একলা পথে-পথে ঘুরতে-ঘুরতে লালবাজারের পূর্ব দিকে হাজির হয়েছি। কোন সময় রবীন্দ্র সরণি ধরে হ্যারিসন রোডের দিকে ছুটতে আরম্ভ করেছিলাম। নতুন সি আই টি রোডের মোড়ে এসে দেখলাম লোকে লোকারণ্য চিৎপুর রোডে ট্রাম বাস ট্যাক্সি এবং টেম্পোর জটিল জট পাকিয়েছে। জ্যাম জমাট এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে একটা সেকেলে ধরনের ট্রামগাড়ির বৃদ্ধ ড্রাইভার করুণভাবে ঘণ্টা বাজিয়ে চলেছে। বিরাট এই যন্ত্রদানবকে হঠাৎ প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় গিরগিটির মতো মনে হলো। বেশ কিছুক্ষণ আমি ওখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম। হঠাৎ দেখলাম পথের ধারে একটা বিবর্ণ মলিন ল্যাম্পপোস্টের তলায় তেইশ চব্বিশ বছরের এক ছোকরা দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার হাতে একটা অর্ডার সাপ্লায়ারের ব্যাগ। ভদ্রলোক যে অর্ডার সাপ্লায়ার তা বুঝতে আমার একটুও দেরি হলো না।

তরুণ এই ব্যবসায়ীর বিষণ্ণ সরল মুখখানি হঠাৎ কেন জানি না আমাকে

অভিভূত করলো। যুবকটি ঘন ঘন ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে। কার অপেক্ষায় সে এমন ভাবে এখানে দাঁড়িয়ে আছে কে জানে? চিৎপুর রোডের স্থবির ট্রাফিক ইতিমধ্যে আবার চলমান হয়েছে এবং একটা ট্যাক্সি হঠাৎ সামনে এসে দাঁড়ালো। এক অদ্ভুত স্টাইলের মধ্যবয়সী ভদ্রলোক ভারিক্কী চালে পাইপ টানতে টানতে ট্যাক্সির মধ্যে থেকে ছোকরার উদ্দেশ্যে বললেন, "মিস্টার ব্যানার্জি।" তরুণ ব্যবসায়ী দ্রুতবেগে ওই ট্যাক্সির মধ্যে উঠে পড়লো।

অতি সাধারণ এক দৃশ্য। কিন্তু হঠাৎ আমার মনে পড়লো আজ ১লা আষাঢ়।

কিন্তু চিৎপুর রোডের মানুষরা কেউ আষাঢ়স্য প্রথম দিবসের খোঁজ রাখে না। অপেক্ষমাণ যুবকের দ্বিধাগ্রস্ত মুখখানা এরপর কিছুদিন ধরে আমার চোখের সামনে সময়ে-অসময়ে ভেসে উঠতো। পরিচয়হীন মিস্টার ব্যানার্জির নিষ্পাপ সরল মুখে আমি যেন বর্ণনাতীত বেদনার মেঘ দেখতে পেলাম। আমার পুরানো দিনের কথা মনে পড়ে গেল। ভাবলাম, লক্ষ লক্ষ বেকার যুবকের হতভাগ্য এই দেশে বেকার এবং অর্দ্ধবেকারদের সুখ-দুঃখের খবরাখবর সাহিত্যের বিষয় হয় না কেন? আমি এ-বিষয়ে খোঁজ খবর আরম্ভ করলাম।

চাকরির ইণ্টারভিউ সংক্রান্ত বেশ কয়েকটা ম্যাগাজিন লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রি হয়। এই সব ম্যাগাজিনের প্রশ্নোত্তর বিভাগ মন দিয়ে পড়ে আমার চোখ খুলে গেল। ইণ্টারভিউতে এমন সব প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হয় যার উত্তর সেইসব প্রতিষ্ঠানের বড় কর্তারাও যে জানেন না তা হলফ করে বলা যায়। এ-বিষয়ে আরও কিছু অনুসন্ধান করতে গিয়ে একদিন হতভাগ্য সুকুমারের খবর পেলাম। শুনলাম, চাকরির পরীক্ষায় পাস করবার প্রচেষ্টায় বারবার ব্যর্থ হয়ে ছেলেটি উন্মাদ হয়ে গিয়েছে—পৃথিবীর যত রকম জেনারেল নলেজের প্রশ্ন ও উত্তর তার মুখস্থ। বাস স্ট্যাণ্ডের কাছে দাঁড়িয়ে অপরিচিতজনদের সে এইসব উদ্ভট প্রশ্ন করে এবং উত্তর না পেলে বিরক্ত হয়।

ছোট ব্যবসায়ে বাড়তি কমিশন, ঘুষ এবং ডালির ব্যাপারটা আমার অজানা নয়। কিন্তু সম্প্রতি সেখানে নতুন একটি বিষয়ের অবতারণা হয়েছে। ব্যাপারটা কতখানি বিশ্বাসযোগ্য তা যাচাই করবার জন্যে কয়েকজন সাকসেসফুল ব্যবসায়ীর সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। তাঁরা সুকৌশলে প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গেলেন—বললেন, ব্যবসার সব ব্যাপার সাহিত্যের উপাদান হতে পারে না। ঠিক সেই সময় আমার এক পরিচিত তরুণ বন্ধুর সঙ্গে অনেক দিন পরে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল।

একদিন স্ট্র্যাণ্ড রোডে গঙ্গার ধারে বসে শুনলাম এই যুবকের নানা অভিজ্ঞতার কাহিনী। সে বললো, "যে কোনোদিন সময় করে আসুন সব দেখিয়ে দেবো।"

নদীর ধারে ডাব বিক্রি হচ্ছিলো। বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলাম, "ডাব খাবে?" বন্ধু হেসে উত্তর দিলো, "আপনার সঙ্গে এমন একজন মহিলার পরিচয় করিয়ে দেবো যিনি অভিসারে বেরোবার আগে এক গেলাস ডাবের জল খাবেনই।"

এই মহিলাটির ঠিকানা আমার বিশেষ পরিচিত এক ভদ্র গলিতে। স্বামী বৃহৎ এক সংস্থার সামান্য কেরানি। নিজের নেশার খরচ চালাবার জন্যে বউকে দেহ ব্যবসায় নামিয়েছেন। অথচ বাড়িতে স্বামী বিবেকানন্দ এবং সুভাষচন্দ্রের ছবি ঝুলছে। এই মহিলা সত্যিই একদিন জানা-শোনা পার্টির সঙ্গে বেরুতে যাচ্ছেন, এমন সময় স্বামী মত্ত অবস্থায় ফিরলেন। সেজেগুজে বউকে বেরুতে দেখে ভদ্রলোক তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। বললেন, "পর পর ক'দিন তোমার ওপর খুব ধকল গিয়েছে। আগামীকালও তোমার অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট রয়েছে। আজ তোমায় বেরুতে হবে না। অত পয়সায় আমাব দরকার নেই।" এঁকে নিয়েই শেষ পর্যন্ত মলিনা গাঙ্গুলীর চরিত্র তৈরি হলো।

সবচেয়ে মজা হয়েছিল জন্য-অরণ্য উপন্যাস দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হবার পরে। মিসেস গাঙ্গুলী যত্ন করে গল্পটা পড়েছিলেন। পড়া শেষ করেই পরিচিত খদ্দেরের সঙ্গে তিনি হোটেলে গিয়েছিলেন বিখ্যাত এক বেওসাদারের মনোরঞ্জনের জন্যে। সেখানে আরাধ্য ভি-আই-পির শুভাগমনের জন্যে অপেক্ষা করতে করতে ভদ্রমহিলা বললেন, "শংকরের জন-অরণ্য উপন্যাসটা পড়েছেন? মিসেস গাঙ্গুলীর চরিত্রটা ঠিক যেন আমাকে নিয়েই লেখা।"

আমার তরুণ বন্ধুর সাহায্যে নগর কলকাতার এক নতুন দিক আমার চোখের সামনে উদ্ঘাটিত হয়েছিল। এই জগতে পয়সার বিনিময়ে মা তুলে দেয় মেয়েকে, ভাই নিয়ে আসে বোনকে, স্বামী এগিয়ে দেয় স্ত্রীকে। মিসেস বিশ্বাস এবং তাঁর দুই মেয়ের বিজনেসের যে ছবি আঁকা হয়েছে তা মোটেই কল্পনাপ্রসূত নয়। লোভের এই কলুষিত জগতে খদ্দেরের অঙ্কশায়িনী কন্যার আর কতক্ষণ দেরী-হবে তা জানবার জন্যে মা নির্দ্বিধায় দরজার ফুটো দিয়ে ওদের দেখে আসেন এবং শান্তভাবে ঘোষণা করেন, "আর দেরি হবে না, টোকা দিয়ে এসেছি। আপনারা বসুন। আমার এই মেয়েটার ঐ দোষ! কাস্টমারকে ঝটপট খুশী করে তাড়াতাড়ি বাড়ি পাঠিয়ে দিতে পারে না। বড্ড সময় নষ্ট করে।"

অভিজাত সায়েব পাড়ায় মিসেস চক্রবর্তী, মিসেস বিশ্বাসের দুই কন্যা রুমু ঝুমু, মিসেস গাঙ্গুলী এবং চরণদাসের টেলিফোন 'অপ্রেটিং' ইস্কুলের ছাত্রী ছাড়াও আরও অনেকের দুর্বিষহ অপমান ও লজ্জার কাহিনী এই সময় জানবার সুযোগ পেয়েছিলাম। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন মিসেস সিন্‌হা। বাইরে পরিচয় ইনসিওরেন্স এজেন্ট। কিন্তু আসলে মিসেস গাঙ্গুলীর সমব্যবসায়িনী। এই মহিলার জীবন বড়ই দুঃখের, এঁর কথা কোনো এক সময়ে লেখার ইচ্ছে আছে।

উপন্যাসের সমস্ত উপাদান বিভিন্ন মহল থেকে তিলে তিলে সংগ্রহ করে অবশেষে জন-অরণ্য লিখতে বসেছিলাম। সমকালের এই অপ্রিয় কাহিনী সকলের ভাল লাগবে কিনা সে-বিষয়ে মনে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য একটাই ছিল। আমাদের এই যুগে বাংলার কর্মহীন অসহায় যুবক-যুবতীদের ওপর যে চরম অপমান ও লাঞ্ছনা চলছে উপন্যাসের মাধ্যমে তার একটা নির্ভরযোগ্য চিত্র ভবিষ্যতের বাঙালীদের জন্যে রেখে যাওয়া; আর সেই সঙ্গে এদেশের ছেলেদের এবং তাদের বাবা-মায়েদের মনে করিয়ে দেওয়া যে বেকার সমস্যা সমাধানের জরুরী চেষ্টা না-হলে আমাদের সমাজ ও ব্যক্তিজীবনের বুনিয়াদ ধ্বসে পড়বে।

উদ্দেশ্য পুরোপুরি সফল হয়েছে এ-কথা অবশ্যই বলা যায় না। কিন্তু অনেকে এই বই পড়ে বিচলিত হয়েছেন। এই ডিসটার্বড মানসিক অবস্থায় কেউ কেউ অভিযোগ করেছেন, এই উপন্যাসের মধ্যে শুধুই নিরাশা, কোনো আশার আলো দেখানোর চেষ্টা হয়নি। তাঁদের প্রশ্ন: 'জন-অরণ্য পড়ে কার কী উপকার হবে?' আমার বিনীত উত্তর, দীর্ঘদিনের ঘুম ভাঙানোর জন্যেই তো এই উপন্যাসের সৃষ্টি এবং নিরাশার নিশ্ছিদ্র অন্ধকার থেকেই তো অবশেষে আশার আলো বেরিয়ে আসবে। এই উপন্যাস পড়ে কারও কোনো উপকার হবে কিনা বলা শক্ত, কিন্তু সত্যকে তার স্বরূপে প্রকাশিত হতে দিলে কারোও কোনো ক্ষতি হয় না। এই মুহূর্তে এর থেকে বেশী তো কিছু জানা নেই আমার।

পাণ্ডুলিপিতে এই উপন্যাস পড়ে আমার একান্ত আপনজন বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "বড্ড অপ্রিয় বিষয়ে কাজ করলে। লেখাটা শেষ পর্যন্ত কী হবে কে জানে।"

আমার মনেও যে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল না এমন নয়। তবু একটা সান্ত্বনা ছিল। বাংলার ঘরে ঘরে অসহায় সুকুমার ও সোমনাথরা তিলে তিলে ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাচ্ছে, এদের সঙ্গে সঙ্গে অভাগিনী কণারাও সর্বনাশের অন্ধকারে

তলিয়ে যাচ্ছে, সমকালের লেখক হিসেবে এদের সম্বন্ধে স্বদেশবাসীকে অবহিত করবার দায়িত্ব আমি অস্বীকার করিনি। অপ্রিয় ভাষণের ভয়ে সত্য থেকে মুখ সরিয়ে নিইনি।

বিদেশ থেকে বহু চেষ্টায় বিপ্লবী লেখক ফ্যাননের একখানা বই পেয়েছিলাম। সেই বইয়ের মুখবন্ধে ফরাসী মানব সার্তর জ্বালাময়ী ভাষায় লিখেছিলেন, 'হে আমার দেশবাসীগণ, আমি স্বীকার করতে রাজী আছি, তোমরা অনেক কিছুরই খবরাখবর রাখো না। কিন্তু এই বই পড়ার পর তোমরা বলতে পারবে না, নির্লজ্জ শোষণ এবং অন্যায় অবিচারের সংবাদ তোমাদের জানানো হয়নি। হে আমার দেশবাসীগণ, তোমরা অবহিত হও।' উপন্যাসের প্রথম পাতায় সার্তরের মহামূল্যবান সাবধানবাণীটি আবার পড়তে অনুরোধ জানাই।

জন-অরণ্য প্রথম প্রকাশিত হবার দিন আমি একটু দেরিতে বাড়ি ফিরেছিলাম। স্ত্রী বললেন, "তোমার উপন্যাসের প্রথম পাঠক সত্যজিৎ রায় ফোন করেছিলেন। যত রাতেই হোক, তুমি ফিরলেই যোগাযোগ করতে বলেছেন।"

পরের দিন ভোরে শুনলাম দু'টি ছেলে বরানগর থেকে দেখা করতে এসেছে। ছেলে দুটি বললো, "আমরা গতকালই আসতাম। গতকাল বহু চেষ্টা করেও রাত আটটার আগে আপনার ঠিকানা জোগাড় করতে পারিনি। আমরা দুই বেকার বন্ধু—অনেকটা আপনার সোমনাথ ও সুকুমারের মতন। আমরা আপনার কাছ থেকে সুধন্যবাবুর জামাই—যিনি কানাডায় থাকেন—তাঁর ঠিকানা নিতে এসেছি। এদেশে তো কিছু হবে না, বিদেশে পালিয়ে গিয়ে দেখি।" জন-অরণ্যর সুধন্যবাবু এবং তাঁর কানাডানিবাসী জামাই নিতান্তই কাল্পনিক চরিত্র—কিন্তু ছেলে দুটো আমাকে বিশ্বাস করলো না। ক্ষমা চাইলাম তাদের কাছ থেকে। বিষণ্ণ বদনে বিদায় নেবার আগে তারা সজল চোখে বললো, "জন-অরণ্য উপন্যাসের একটা লাইনও যে বানানো নয় তা বোঝবার মতো বিদ্যে আমাদেরও আছে শংকরবাবু। আপনি সুধন্যবাবুর জামাইয়ের ঠিকানা দেবেন না, তাই বলুন।"

সত্যজিৎ রায় জন-অরণ্য চলচ্চিত্রায়িত করবার কথা ভাবছেন জেনে বিগত রাত্রে যতটা আনন্দিত হয়েছিলাম, আজ সকালে ঠিক ততটাই দুঃখ হলো। দেশের লক্ষ লক্ষ বিপন্ন ছেলেমেয়েদের হৃদয়ে আশার আলোক জ্বালিয়ে দেবার ক্ষমতা আমার নেই ভেবে লজ্জায় মাথা নিচু করে অসহায়ভাবে বসে রইলাম।

—মার্চ, ১৯৭৬

"The whole duty of life is implied in the question, how to respire and aspire both at once."

H. D. Thoreau

সীমাবদ্ধ

মহাত্মা গান্ধির নি:সঙ্গ ব্রোঞ্জমূর্তিকে নীরব সাক্ষী রেখে কলকাতার চৌরঙ্গী রোড যেখানে জওহরলাল নেহরু রোডের কাঁধে সব দায়দায়িত্ব চাপিয়ে নিজেকে নিশ্চিহ্ন করেছে, তারই কাছে এই অফিসটা।

ভোরবেলায় গান্ধিদর্শন করে কেউ যদি চৌরঙ্গী রোডের ফুটপাথ দিয়ে এই ত্রিতলভূম আধুনিক ডিজাইনের বাড়িটার সামনে দিয়ে যান তাহলে তিনি দেখবেন, অফিসবাড়িটার স্বপ্নপূর্ণ ঘুম থেকে উঠবার অনেক আগেই চটপটে দাস একটা ব্রাসোর কৌটো হাতে করে নিশ্চিন্তমনে দুখানা পিতলের নেমপ্লেট ঘষছে, যার একটায় ইংরিজীতে অন্যটায় বাংলায় লেখা। সুন্দরী মহিলারা স্বামীর সঙ্গে ককটেল পার্টিতে যাবার আগে যেমনভাবে ড্রেসিংটেবিলের ধারে মুখ চুনকাম করেন, বেয়ারা চটপটে দাসও এখন তেমনি নিষ্ঠা ও যত্নের সঙ্গে বাংলা নেমপ্লেটের ওপর পাতলা কাপড় ঘষে চলেছে এবং খোদাই-করা কথাগুলো ক্রমশ আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠছে :

হিন্দুস্থান ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড
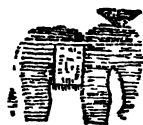
মহাত্মা গান্ধির নিঃসঙ্গ ধাতুমূর্তিকে নীরব সাক্ষী রেখে কলকাতার চৌরঙ্গী রোড যেখানে জওহরলাল নেহরু রোডের কাঁধে সব দায়দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে নিজেকে দ্বিধাবিভক্ত করেছে, তারই কাছে এই অফিসটা।

ভোরবেলায় গান্ধিদর্শন করে কেউ যদি চৌরঙ্গী রোডের ফুটপাথ দিয়ে এই ছিমছাম আধুনিক ডিজাইনের বাড়িটার সামনে দিয়ে যান তাহলে তিনি দেখবেন, অফিসপাড়াটা পুরোপুরি ঘুম থেকে ওঠবার আগেই জটাধর দাশ একটা ব্রাশোর কৌটো হাতে করে নিবিষ্টমনে দুখানা পিতলের নেমপ্লেট ঘষছে, যার একটা ইংরিজীতে আর একটা বাংলায় লেখা। সুন্দরী মহিলারা স্বামীর সঙ্গে ককটেল পার্টিতে যাবার আগে যেমনভাবে ঘণ্টাখানেক ধরে মুখ চুনকাম করেন, বেয়ারা জটাধর দাশও এখন তেমন নিষ্ঠা ও যত্নের সঙ্গে বাংলা নেমপ্লেটের ওপর পাতলা কাপড় ঘষে চলেছে এবং খোদাই করা কথাগুলো ক্রমশ আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠছে :

হিন্দুস্থান পিটারস্ লিমিটেড
ভারতে সমিতিভুক্ত
সভ্যগণের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ

জটাধরকে এই যে সাতসকালে নেমপ্লেট পরিষ্কার করতে হচ্ছে, তার কারণ কয়েকজন সায়েব নির্ধারিত সময়ের আগেই অফিসে হাজির হন। বড় সায়েব খাস বিলেতের লোক, তাঁর সময়জ্ঞান তীক্ষ্ণ। ঘড়িতে ন'টা বাজবার সঙ্গে সঙ্গেই

তাঁর ইমপোর্টেড ইমপালা গাড়িখানা আলিপুরের দিক থেকে চৌরঙ্গী রোড ধরে একেবারে ফযাবের সামনে এসে দাঁড়ায়। ফেরিস সাহেবের বেযারা ররকত আলী পাঁচমিনিট আগে থেকেই দরজার কাছে হাজির থাকে। মিলিটারি কাযদায ররকত আলী গাড়ির দরজার কাছে এগিয়ে আসে, নিপুণ হাতে দরজাটা খুলে দেয়। সাহেব কোটটা হাতে করে বেরিয়ে আসেন। ররকত আলী একটা সেলাম ঠোকে, তারপর সাহেব মাথা নিচু করে গেটের ভিতর দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যান। ররকত আলী এবার সাহেবের ব্যাগ এবং অন্য মালপত্র নিয়ে পিছন পিছন চলে যায়। ঘড়ির ছোট কাঁটাটা সঙ্গে সঙ্গে ন'য়ের ঘরে আর বড় কাঁটা বারোর ঘরে ঢুকে পড়ে। এই হচ্ছে খাঁটি ইংরেজ। মরদ কা বাত, হাতি কা দাঁত, সিপাই কা ঘোড়া এবং সাহেব কা ঘড়ি।

জটাধরের বাবাও এই অফিসে কাজ করতেন। তিনি বলতেন, "এই ঘড়ি ধরেই ইংরেজরা দুনিযা শাসন করছে, বুঝলি? অমন যে অমন জার্মানদের এরা যুদ্ধে ঘাযেল করলে, তাও জেনে রাখবি এই ঘড়ির জোরেই। সাহেবদের কাছে ৯টায আপিস মানে, ৮টা ৫৯ হয়ে এক মিনিট।"

এখন সে-ইংরেজও নেই, সে-ইণ্ডিয়াও নেই। জটাধর ভাবে, তার বুড়ো বাবা যদি উড়িষ্যার গ্রাম থেকে এখন একবার কলকাতায় এসে হাজির হন তাহলে মাথায় হাত দিয়ে বসবেন। এখন ৯টা মানে সওয়া আটটা থেকে সাড়ে ন'টা পর্যন্ত যে কোনো সময়। মাসে তিনদিন পর্যন্ত লেট মকুব, তাই মুকুন্দবাবু যদুবাবু, নগেনবাবু এঁরা হিসেব করে মাসে তিনদিন সাড়ে-ন'টায় হাজির হন। রমেশবাবু এই সেদিন পঁচিশ বছর পুরো চাকরি করবার জন্যে ফেরিস সাহেবের কাছ থেকে সোনার ঘড়ি পেলেন। সোনার ঘড়ি পেযে কী যে হলো রমেশবাবুর, এখন রোজ দেরিতে আসেন। এ অফিসে পঁচিশ বছর চাকরি হলে সাতখুন মাপ। রমেশবাবু নাকি দেরিতে আসবার স্পেশাল পারমিশন পেয়ে গেছেন।

দেরিতে যাঁরা আসেন তাঁদের তবু সহ্য হয়, কিন্তু গোলমাল বাধান "ফাস্ট" প্যাসেঞ্জাররা। আটটা বেজে তিন মিনিটে হাজির হন স্যালারি ডিপার্টমেণ্টের রামলিঙ্গম সাহেব। রামলিঙ্গম সাহেবের কপালে আঁকা থাকে চন্দনের নানা ইকড়ি-মিকড়ি। মঙ্গলবার শুধু রামলিঙ্গম সাহেব আটটা তিনের বদলে সাড়ে-আটটায় হাজির হন। রামলিঙ্গম সাহেব খুব মাইডিযার লোক। মঙ্গলবারে দেরি হওযার কারণ, প্রতি সপ্তাহে ঐদিন ভগবান ভেঙ্কটেশকে একশ' একটি রাঙা জবাফুল নিবেদন করতে হয়। ভগবানের প্রসাদী ফুলের এক-আধটা

রামলিঙ্গম সায়েব মাঝে-মাঝে জটাধরকে দেন। জটাধর কেন, এ অফিসের কারও কোনো বিপদ-আপদ হলেই, রামলিঙ্গম সায়েব ফুল দিয়ে দেবেন। বলবেন, "আর ভাবনা কী? স্বয়ং ভেঙ্কটেশের প্রসাদী ফুল রইলো তোমার কাছে, এখন তিনিই রক্ষা করবেন।"

অন্যদিকে ভয়ঙ্কর কৃপণ রামলিঙ্গম সায়েব। পয়সাকড়ি একেবারেই খরচা করেন না, এমন কি গত দশ বছরে একটা টাই পর্যন্ত কেনেননি। সেই এক টাই রোজ গলায় বেঁধে অফিসে আসেন। কিন্তু অত কৃপণ মানুষও নিজের হাতে বাজারের সেরা জবাফুল কেনেন। বড় বড় রাঙা জবা চাই-ই চাই—সে যত দামই হোক। আর বছরে একদিন রামলিঙ্গম সায়েব ক্যাজুয়েল লিভ নেন—সেদিন ওঁর লাগে এক হাজার একটি ফুল। প্রায় সারাদিনটাই কেটে যায় লর্ড ভেঙ্কটেশকে মন্ত্রপূত ফুল নিবেদন করতে।

মঙ্গলবার ছাড়া অন্য সবদিন আটটা তিন। রামলিঙ্গম সায়েবের জন্য জটাধর অত মাথা ঘামায় না। কিন্তু রামলিঙ্গম সায়েবকে গেটের ধারে দেখতে পেলেই জটাধর বুঝতে পারে এবার হাত চালানো দরকার, আর বেশী সময় নেই।

আজ জটাধরের সত্যিই দেরি হয়ে গিয়েছে। কারণ, নীল রঙের ফিয়াট গাড়িখানা অফিসের সামনে এসে দাঁড়ালো। এই গাড়ির ড্রাইভার সৃষ্টিধর বেরা জটাধরের ভগ্নীপতি। শালা-ভগ্নীপতিতে বেশ দহরম-মহরম। ছুটিছাটার দিনে দুজনে একসঙ্গে গাঁজা-টাঁজাও সেবন হয়। কিন্তু সৃষ্টিধরের গাড়ির পিছনে যিনি বসে থাকেন—তাঁর সম্পর্কে জটাধরের মনে এক মিশ্র অনুভূতি।

পিছনের সীটের লোকটি কাউকে গাড়ির দরজা খুলতে দেন না। ইনি চ্যাটার্জি সাহেব। এস চ্যাটার্জি সাহেব। আহা কতই বা বয়স। চোখে মোটা কালো ফ্রেমের চশমা। মাথার চুলগুলো শুকনো অথচ কেমন শাসনে রয়েছে। ফেরিস সায়েবের মতো ফর্সা না হলেও চ্যাটার্জি সায়েবকে কালো বলা চলে না। চ্যাটার্জি সায়েবের নাকটাও কেমন ছুঁচলো। মোটা চশমার কাঁচের মধ্য দিয়ে চ্যাটার্জি সায়েবের চোখ দুটো কেমন উদাস মনে হয়। যেন এই হিন্দুস্থান পিটারস্ লিমিটেডের অফিসে থেকেও তাঁর দৃষ্টি এখানে নেই।

চ্যাটার্জি সায়েব কারও সাহায্য না নিয়ে, নিজে দরজা খুলে নেমে পড়েন। জটাধর লক্ষ্য করেছে এই নামার মধ্যেও একটা স্টাইল আছে। ব্যাপারটা জটাধর কাউকে বলতে সাহস করেনি, একদিন সৃষ্টিধরের সঙ্গেই আলোচনা করতে হবে। চ্যাটার্জি সাহেব যেভাবে নামেন, ঠিক যেন সিনেমার হিরো। সৃষ্টিধরকে নিয়ে জটাধর একবার বাংলা সিনেমা দেখতে গিয়েছিল, তাতে নায়ক

নামি

ঠিক ওইভাবে গাড়ি থেকে নেমে পড়ে কোটটা কাঁধ থেকে পিঠের দিকে ঝুলিয়ে দিয়ে বাঁ হাতেব আঙুল দিয়ে ধরে রেখেছিল।

গাড়ি থেকে নেমে পড়ে চ্যাটার্জি সায়েব ডান হাতে নিজের অ্যাটাচি কেসটা ধরেন। আর বুড়ো আঙুল দিয়ে লাইটার এবং সিগারেটের বাক্সটা চেপে ধরেন। এই যে সিগারেট—রথম্যান না কী নাম—ইণ্ডিয়াতে তৈরিই হয় না। খাস বিলেত থেকে আসে। তবে সিগারেট যদি খেতেই হয় তবে ওইসব সিগারেট খাওয়া উচিত। সায়েব একবার ভুল কবে গাড়ির মধ্যে একটা খোলা প্যাকেট ফেলে গিয়েছিলেন। সৃষ্টিধরই গোপনে শ্যালককে একটা স্যাম্পল খাইয়েছিল। ঠিক দুটো সিগারেট ছিল। আঃ কি স্বাদ, কি গন্ধ! এখনও মুখে লেগে রয়েছে। জটাধর তারপর পুরো একদিন মুখে বিড়ি তুলতে পারেনি। জটাধরের ইচ্ছে আছে, এবার যখন দেশে যাবে, বোনাসের টাকা থেকে এক প্যাকেট রথম্যান কিনেই ফেলবে—ওই তো পার্ক স্ট্রীটের ফুটপাথে পয়সা ফেললেই পাওয়া যায় সব রকমের বিলিতী সিগ্রেট, বিলিতী রবারের জিনিস, বিলিতী সেণ্ট, বিলিতী সাবান।

টুল থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ে জটাধর এবার চ্যাটার্জি সায়েবকে সেলাম করলে। বরকত আলী ঠিক যেভাবে বড সায়েবকে সেলাম করে। মনে মনে জটাধরের একটু ভয়ও হলো—এখনও ইউনিফর্ম পরেনি সে। খাতায় কলমে আটটা থেকে ডিউটি তার। সেলাম শেষ করে আবার টুলে উঠে পড়লো জটাধর। চ্যাটার্জি সায়েব আড়চোখে বাংলা নেমপ্লেটের দুটো কথার ওপর চোখ রাখলেন: 'দায়িত্ব সীমাবদ্ধ'।

•

অটোমেটিক লিফটের দরজা বন্ধ করে দিয়ে ফ্যানটা চালিয়ে দিলো শ্যামলেন্দু চ্যাটার্জি। তারপর আলতোভাবে আঙুলের ডগা দিয়ে লিফটের বোতাম টিপে দিলো। এবার শ্যামলেন্দু চকচকে লিফটের দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো। শ্যামলেন্দুর মনে হলো, অনেকদিন পরে ওই অদ্ভুত কথা দুটোর ওপর আবার নজর পড়ে গেল। পৃথিবীতে এত জায়গা থাকতে, এই বিলিতী কোম্পানির দোরগোড়ায় খোদাই-করা বাংলা অক্ষরে সীমাবদ্ধ দায়িত্বের উল্লেখ কেন?

আজকে নয়, প্রথম যেদিন হিন্দুস্থান পিটারস্-এর অফিসে ঢুকেছিল শ্যামলেন্দু চ্যাটার্জি সেদিনও কথাটা নজরে পড়েছিল। তখনও মনের মধ্যে নানা প্রশ্ন উঠেছিল—কারাই বা এই প্রতিষ্ঠানের সভ্য? দায়িত্বই বা কী? এই অনিত্য

সংসারে কোন দায়িত্বই বা সীমাহীন ? আর দায়িত্ব যে সীমাবদ্ধ তা অমনভাবে ঢাক পিটিয়ে প্রচার করবারই বা প্রয়োজন কী ? শ্যামলেন্দু পরে অবশ্য খোঁজখবর নিয়ে জেনেছে, ওটা আইনের প্রয়োজনে লিখতে হয়।

কিন্তু আর ভাববার সময় নেই। কারণ তিনতলায় এসে একটা ঘটাং শব্দ করে অটোমেটিক লিফট থেমে গিয়েছে। এখন আর মাটিতে নেই শ্যামলেন্দু চ্যাটার্জি। আজকাল ভারি সুন্দর একটা কথা ওটিস লিফটের বিজ্ঞাপনে প্রায়ই ব্যবহার হচ্ছে। 'এটমসফিয়ার' নয়, 'স্ট্র্যাটসফিয়ার' নয়—স্রেফ 'ওটিসফিয়ার'। গেটটা টেনে খুলে দিয়ে, শ্যামলেন্দু ওটিসফিয়ার থেকে বেরিয়ে হিন্দুস্থান পিটারস্ কোম্পানির পিটারসফিয়ারে প্রবেশ করলো।

অফিসের এই ভোরবেলাটুকু ভারি ভাল লাগে শ্যামলেন্দুর। অনিন্দিত কুমারী পরিবেশ। ভার্জিন কথাটা ব্যবহার করলে বোধহয় আরও ভাল হয়। অভিধানে যাই বলুক, ভার্জিন এবং কুমারী ঠিক এক জিনিস নয়। বাঙালী সংসারে, কুমারী কথাটার মধ্যে 'আইবুড়ো' ভাবটা প্রবল হয়ে থাকে ; আর ভার্জিন হলো পবিত্র, অচ্ছিন্ন, অনাঘ্রাত—যা এখনও কারুর স্পর্শে মলিন অপবিত্র হয়নি, যা এখনও অব্যবহৃত অমর্দিত, যা এখনও দেবতাকে দেওয়া চলে।

হেসে ফেললো শ্যামলেন্দু চ্যাটার্জি। এইসব কলেজী ছেলেমানুষী হঠাৎ মনের মধ্যে উঁকি মারছে কেন ? কলেজের ছাত্র এবং অধ্যাপকরাই তো ভাষার এই সব কূট-কচালি নিয়ে চুল-চেরা বিশ্লেষণ করে। পাত্রাধারে তৈল না তৈলাধারে পাত্র নিয়ে বড় বড় রেফারেন্স বই ঘাঁটে এমনভাবে যেন তারই ওপর সমস্ত পৃথিবীর ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। ওদের তুলনায় এই আধুনিক কমার্শিয়াল ওয়ার্লডের লোকেরা অনেক সহজ ও সরল। এখানকার মানুষরা অনেক বেশী প্র্যাকটিকাল, মাটির অনেক কাছাকাছি তারা বাস করে। এখানে কোনো ধোঁয়াটে হেঁয়ালির বিলাসিতা চলে না, সব কিছুর আগেই 'উইথ রেফারেন্স টু'র প্রয়োজন হয়। কেবল শেক্সপীয়র এবং সক্রেটিসকে মাথায় তুলে নাচানাচি করলেই সংসার চলবে না। ম্যানেজমেণ্ট বিশেষজ্ঞদের নমস্য পিটম্যান এবং পিটার ড্রুকাররাও পৃথিবীর মানুষদের কম উপকার করেননি।

সমস্ত অফিসটার মধ্য দিয়ে একা খটখট করে হেঁটে হলের দক্ষিণতম প্রান্তে কাঁচের ঘরটার সামনে এসে দাঁড়ালো শ্যামলেন্দু। সেইখানেই ঝকঝকে পিতলের অক্ষরে লেখা এস চ্যাটার্জি। পা দিয়ে দরজাটা ঠেলে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়তেই আস্তে আস্তে দরজাটা আবার বন্ধ হয়ে গেল। টেবিলের ওপর নিজের ব্যাগটা নামাতে নামাতে শ্যামলেন্দুর মনে হলো : পৃথিবীর এই নিয়ম। নিজের

কেরিয়ারের দরজা খুলতেই যত সাধ্যসাধনা, যত পরিশ্রম। কিন্তু উন্নতির পথ আপনা থেকেই অবরুদ্ধ হয়ে যায়, তার জন্যে চেষ্টা করতে হয় না।

শ্যামলেন্দু এবার কাঁধ থেকে জলের ফ্লাস্কটা নামিয়ে রাখলো। "এই এক হাঙ্গামা হয়েছে কিছুদিন ধরে। এই অফিসে যতদিন কাজ করছে এখানকার বেয়ারাই জল এনে দিয়েছে। তারপর সেবার যেমনি প্রমোশন পেয়ে ম্যানেজার হলো শ্যামলেন্দু, অমনি দোলন বললে, "এখন থেকে ব্যাগের সঙ্গে জলের ফ্লাস্কও নিতে হবে।"

প্রথমে প্রবল আপত্তি করেছিল শ্যামলেন্দু। কিণ্ডারগার্টেন ইস্কুলের বাচ্চারা এবং বাতিকগ্রস্ত ফরেন ট্যুরিস্ট ছাড়া কলকাতা শহরে কে আবার নিজের খাবার জল বয়ে বেড়ায়? কিন্তু শ্যামলেন্দুর ওজর আপত্তি চলেনি। দোলন বলেছে, "তুমি তো চোখ খুলে দেখ না। এখনও সেই পাটনাইয়া রয়ে গেলে! তোমাদের কোম্পানির ম্যানেজাররা কেউ অফিসের জল খায় না।"

শ্যামলেন্দু স্থির চোখে দোলনের মুখের দিকে তাকিয়েছিল। দোলন বলেছিল, "এই ব্লু হ্যাভেনের দশতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমি সব লক্ষ্য করি। তোমাদের চিফ অ্যাকাউনটেন্ট চোপরা, ডেপুটি ফিনানস ম্যানেজার হ্যারিস, টেকনিক্যাল ম্যানেজার হার্টলে, এমনকি সেক্রেটারী সেনগুপ্ত সায়েবও সঙ্গে জলের বোতল নিয়ে যান।"

এরপর আর আপত্তি করতে পারেনি শ্যামলেন্দু। ভাল করে খুঁটিয়ে দেখেছে, জল খাবার ব্যবস্থা থেকেই এই অফিসে কার কি পদমর্যাদা তা বোঝা যায়। একেবারে নিচু যারা—অর্থাৎ বেয়ারারা কিভাবে জল খায় শ্যামলেন্দু জানে না। কোনো বেয়ারাকে এই এত বছরের চাকরিতে সে জল খেতে দেখেনি। শুনেছে, ফাইলিং ক্যাবিনেটের পিছন দিকে দুই একটা গেলাস লুকনো থাকে, তাই দিয়ে সবাই প্রয়োজন মতো জল খেয়ে আসে। তারপর বাবুরা। তাঁদের প্রত্যেকের টেবিলে জলের গেলাস আছে—পিছনে একটা লাল রঙের নম্বর। এই নম্বর দেখেই বেয়ারারা সকালে গেলাস ধোওয়ার পর বুঝতে পারে কোন গেলাসটা কার টেবিলে রাখতে হবে। সিনিয়র ক্লার্কদের গেলাস আকারে জুনিয়র বাবুদের গেলাসের দেড়া। তারপর লোকাল অ্যাসিসটেন্ট—কেউ কেউ যাঁদের ইণ্ডিয়ান অ্যাসিসটেন্ট বলেন। এঁদের গেলাসগুলো অত বড় নয়, কিন্তু বেশ পাতলা এবং সুদৃশ্য, গায়ে ফুলকাটা এবং সঙ্গে ছুটো রঙিন মিনেকরা ঢাকনা। এঁদের মাথার ওপরে জুনিয়র অফিসার। তাঁদের ঘরে টেবিলের ওপর একটা লাল রঙের কৌটো থাকে। তারই মধ্যে জলের গেলাস রাখার

ব্যবস্থা—ঢাকনার টোপর তুলে তবে জল খেতে হবে। সিনিয়র অফিসারদের জলের টোপরগুলোর ওপরে সূঁচের কারুকার্য করা। আর ম্যানেজার হলে তো অফিসের জলই চলবে না। সঙ্গে থাকবে ফ্লাস্ক। ডিরেকটরদের আবার দুটো ফ্লাস্ক। একটাতে ঠাণ্ডা জল, আর একটায় কী থাকে ভগবান জানেন! কেউ বলে কফির গরম জল, কেউ বলে হুইস্কি, আবার কেউ বলে স্রেফ খালি থাকে—ডিরেকটর তো, তাই দুটো আনতেই হয়।

শ্যামলেন্দু এবার কোটটা হ্যাঙারে ঝুলিয়ে সামনের আলমারিতে ঢুকিয়ে বন্ধ করে দিলো। তার আগে কোটের পকেটে ... কিয়ে কয়েকটা কাগজের টুকরো বার করে টেবিলে রাখলো।

এবার একটা সিগারেট ধরালে শ্যামলেন্দু—এ... সিগারেটের দাম প্রতি মাসেই বাড়ছে। বাড়িতে বাইরের অতিথি না থাকলে লুকিয়ে লুকিয়ে অনেক ম্যানেজার আজকাল নাকি দেশী সিগারেট টানছে। মন্দ কী—ইণ্ডিয়া কিং সিগারেটটা বেশ ভাল জাতের হয়েছে। কিন্তু তা বলে হিন্দুস্থান পিটারস্-এর কোনো ম্যানেজার প্রকাশ্যে দেশী সিগারেট টানতে পারে? মিস্টার সেনগুপ্ত অবশ্য সরল মানুষ। নিজে সিগারেটও খান না। বললেন, "মিস্টার চ্যাটার্জি, ভিতরে ভিতরে আজকাল কি হচ্ছে জানেন না! ইণ্ডিয়া কিং তো দূরের কথা, অনেক ম্যানেজার লুকিয়ে সিজার্‌স্ টানছে। আপনার স্ত্রীকে বলবেন, ব্লু হ্যাভেনের সুইপারকে কায়দা করে জিজ্ঞেস করতে। প্রত্যেক ম্যানেজারের ফ্ল্যাট তো ওরা ঝাঁট দিচ্ছে—ওদের কাছে কিছুই চাপা থাকে না।"

কাগজের ছোট ছোট গোলপাকানো টুকরোগুলো এবার শ্যামলেন্দু খুলতে লাগলো। দিল্লী অফিসের ম্যানেজারকে একটা কড়া চিঠি লিখতে হবে—মাল বিক্রি হচ্ছে, কিন্তু বকেয়া পাওনা বাড়ছে। মাদ্রাজেও ইদানীং আউটস্ট্যানডিং বেড়েছে। এদের প্রত্যেকের অফিসে বড় বড় করে লিখে দেওয়া দরকার—আজ নগদ কাল ধার। বম্বের ম্যানেজার শিবশৈলমকেও একটা নরম-গরম চিঠি ছাড়তে হবে। কনফারেন্সে তো বড় বড় কথা বলো, কিন্তু মহারাষ্ট্রের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তোমার বিক্রি বেড়ে চলছে না কেন? আমেদাবাদের এরিয়া ম্যানেজার ছোকরাটি বেশ ব্রাইট। গুজরাটের গ্রামাঞ্চলের গ্রীষ্মকালের আগেই কৃষকদের মধ্যে ফ্যান বিক্রির এক অভিনব পরিকল্পনা করেছে। এই সপ্তাহের মধ্যেই পরিকল্পনাটি পাকাপাকি করতে হবে।

আরও কয়েকটা কাগজের টুকরো রয়েছে। পকেটে কাগজের টুকরো রাখার কায়দাটা শ্যামলেন্দু শিখেছে মার্কেটিং ডিরেকটর ডেভিডসনের কাছে।

মিস্টার ডেভিডসনের স্মৃতিশক্তি আই-বি-এম কমপিউটরের মতো। কবে কাকে কী কাজ দিয়েছেন, কাকে কী প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, কাকে কী বাড়তি সাপ্লাই করবেন, সব ছবির মতো মনে রাখেন। কী করে ডেভিডসন মনে রাখেন তা শ্যামলেন্দু কিছুতেই বুঝতে পারতো না। সেবার এরিয়া-ম্যানেজারদের এক পার্টিতে ব্যাপারটা জানা গেল। সেল্‌স-এর সমস্ত লোকগুলো ছিনে জোঁকের মতো মিঃ ডেভিডসনকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল। এদের সর্বাগ্রে ছিল প্রিয়বন্ধু রুণু সান্যাল। ডেভিডসনকে বেশ ভালই কব্জা করেছে রুণু। আগে সানিয়াল বলে ডাকতো—এখন ডাকছে রুণু বলে। রুণুও এখন ডেভিডসনকে জন বলছে।

শ্যামলেন্দু আর ওখানে দাঁড়িয়ে সপ্তরথীর বৃ্হ ভেদ করে ডেভিডসনের কাছে পৌঁছবার চেষ্টা করেনি। গ্র্যাণ্ড হোটেলে ব্যাংকোয়েট রুমের এক কোণে দাঁড়ি[illegible] স্বামীর সলজ্জভাব দেখে দোলন দূর থেকে আড়চোখে তার [illegible]সন্তোষ প্রকাশ করেছে। চোখের ইশারায় স্বামীকে বলেছে, ‘রুণুর পায়ে বল ঠেলে দিয়ে তুমি ওইভাবে হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছো?’ কিন্তু শ্যামলেন্দু চোখ ফিরিয়ে নিয়ে মিসেস ডেভিডসনের কাছে হাজির হয়েছিল। কমার্সিয়াল ফার্মে বউয়েরা মিনিস্টারদের বউদের মতো শক্তিশালিনী নন। ডিরেকটরের বউকে ভিজিয়ে ড্রাইভার, ক্লার্ক, বড়জোর ইণ্ডিয়ান অ্যাসিসটেণ্টরা কাজ গুছোতে পারে —কিন্তু তার থেকে উঁচু লেভেলে সায়েবরা নিজেরাই ডিসিশন নেন। সেখানে বউদের কথায় তাঁরা ওঠেন না—বসেন না।

মিসেস ডেভিডসনকে শ্যামলেন্দু বলেছিল, “আপনার স্বামীর কর্মদক্ষতা আমার কাছে একটা বিস্ময়। কেমন করে যে সবকিছু মনে রাখেন! ঠিক ন’টায় এসে এমনভাবে আট-দশটা বিষয়ে আলোচনা করেন যে, মনে হয় এইমাত্র সব ফাইলগুলো পড়ে এলেন।”

ডেভিডসন-গৃহিণী হাতে জিন-এর গেলাসটা ধরে, সিগারেটে একটা টান লাগিয়ে বলেছিলেন, “তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, তুমি আমাকে একটা আইডিয়া দিলে।”

ভ্যাবাচাকা খেয়ে শ্যামলেন্দু জিজ্ঞেস করলো, “মানে!”

ডেভিডসন-গৃহিণী বললেন, “বাড়িতে যখন কোনো আইডিয়া আসে, জন তখনই একটুকরো কাগজে লিখে সেটা দলা পাকিয়ে কোটের বাঁ পকেটে রেখে দেয়। পরে সেগুলো অফিসে গিয়ে নোট করে নেয়। কিন্তু জন বাড়ির কোনো কথা অফিসে মনে রাখে না। এবার বাড়ির ব্যাপারগুলো টুকরো টুকরো স্লিপে লিখে ওর কোটের ডান পকেটে রেখে দেবো। দেখি কেমন কাজ হয়!”

সেই থেকেই ডেভিডসন-পদ্ধতিটা কাজে লাগিয়েছে শ্যামলেন্দু। সংসারের অন্য মানুষদের মতো ম্যানেজারও দুরকম—কেউ দেখে শেখে, কেউ ঠেকে শেখে। দেখে দেখে শিখতে পারলেই আরও ওঠা যাবে। শ্যামলেন্দুও কোটের বাঁ পকেটে বাড়িতে যত আইডিয়া আসে তার স্লিপগুলো রেখে দেয়; আর অফিসে বসে বাড়ি সম্বন্ধে কোনো আইডিয়া এলে প্যান্টের বাঁ পকেটে রেখে দেয়। এখনই মনে পড়লো, ক্যালকাটা ম্যানেজমেণ্ট অ্যাসোসিয়েশনের সেমিনারে যে প্রবন্ধটা পড়তে হবে, তা আজকেই বাড়িতে ঠিকঠাক করতে হবে। অন্ততঃ প্রধান প্রধান পয়েণ্টগুলো। অফিসে ওসব কাজ করবার সময় থাকে না। একটা স্লিপ লিখে শ্যামলেন্দু প্যান্টের পকেটে পুরে ফেললো।

এবার ড্রয়ার থেকে কয়েকটা ফাইল বার করে ফেললে শ্যামলেন্দু। নিজের স্ক্রিবলিং প্যাডে কয়েকটা পয়েণ্ট লিখে নিলো। মিসেস অ্যাণ্ডারসন এলেই চিঠিগুলো ডিকটেট করে ফেলবে।

ঘড়ির দিকে তাকালে শ্যামলেন্দু। মিসেস অ্যাণ্ডারসনকে একটু আগে আসতে বলেছিল আজ। নোটটা যেটা গতকাল ডিকটেশন দিয়েছিল, সেটা ন'টার আগেই রেডি করে ফেলতে চায় শ্যামলেন্দু!

মিসেস অ্যাণ্ডারসন এবার বোধহয় এসে পড়লেন। ওঁর ঘরে আলো জ্বলে উঠলো। এই অফিসের কড়া নিয়ম, ঘরে লোক না থাকলে আলো জ্বলবে না। মিস্টার ফেরিস নতুন ম্যানেজিং ডিরেকটর হয়েই এই সার্কুলার দিয়েছিলেন—'আগামী দিনের চ্যালেঞ্জের সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্যে এবং ভারতবর্ষকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে হিন্দুস্থান পিটারস্ লিমিটেডের সব কর্মীকে সহযোগিতা করতে হবে। খরচ কমাতে হবে। আসুন আমরা সবাই নয়াপয়সার দিকে নজর রাখি, তাহলে টাকারা নিজেদের সামলে নেবে। আমি চাই, আমাদের মিতব্যয়িতা একেবারে গোড়া থেকেই শুরু হোক। কোনো ঘরে যেন অযথা বাতি না জ্বলে।' সার্কুলারটা অবশ্য ফেরিস সায়েব নিজে লেখেননি। শ্যামলেন্দুকে ডেকে ফেরিস সায়েব বলেছিলেন, "চ্যাটার্জি, সাধারণ লোকের সঙ্গে সহজভাবে কথাবার্তা বলার ফ্লেয়ার আছে তোমার। আমি দেখছি, এই অফিসের 'রাগার'রা ইলেকট্রিসিটির অপচয় করে। তুমি একটা স্যুটেবল সার্কুলার ড্রাফট করো, বাগারদের মনে করিয়ে দাও, প্রত্যেকটা বাতির সঙ্গে একটা করে সুইচ আছে।"

ফেরিস সায়েব পেশায় ইনজিনীয়ার। অনেকদিন কারখানায় কাজ করেছেন। তাই ওঁর মুখ থেকে খিস্তিখেউড় একটু সহজেই বেরিয়ে পড়ে। শ্যামলেন্দুর

ড্রাফট পড়ে বলেছিলেন, "গুড্ জব। এইসব রাইটারদের স্বইচ নিভোতে বললেও ইণ্ডিয়ার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার রেফারেন্স দিতে হবে। আফটার অল, ইণ্ডিয়া তোমাদের দেশ, এসব তোমরাই ভাল বুঝবে।"

ফেরিস সাহেবের সার্কুলারে ছোটবড় সকলেই খুব খুশী হয়েছিল। বাবুরা টিফিন রুমে বলেছিলেন, "বড়সাহেব সত্যি ইণ্ডিয়াকে খুব ভালবাসেন।"

আসলে সব বড়সাহেবই কোনো না কোনো একটা স্মরণীয় কাজ করে যেতে চান। আগেকার বড়সাহেব মিস্টার গ্রাহাম নাকি চার্জ নিয়েই হুকুম জারি করেছিলেন—কলঘরের কলগুলো ভাল করে বন্ধ করতে হবে। কিন্তু এমন ভাষায় সে সার্কুলার লেখা হয়েছিল যে পড়ে অফিসের সবাই চটিতং। প্রায় স্ট্রাইক হয়ে যায় এমন অবস্থা।

মিসেস অ্যাণ্ডারসন এবার ঘরে ঢুকলেন। 'গুড মর্নিং, মিঃ চ্যাটার্জি।"

"মর্নিং," চ্যাটার্জি সাহেব উত্তর দিলেন।

"স্যরি মিঃ চ্যাটার্জি, তোমাকে যে কথা দিয়েছিলাম, তা রাখতে পারলাম না, আসতে দেরি হয়ে গেল।"

মিঃ চ্যাটার্জি একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, "কালকে যেটা ডিকটেট করেছি, সেটা এখনই চাই।"

"আমি দশ মিনিটের মধ্যে দিচ্ছি, মিঃ চ্যাটার্জি।"

মিসেস অ্যাণ্ডারসন নিজের ঘরে ফিরে গেলেন। বিরক্তির রেখা ফুটে উঠলো শ্যামলেন্দুর মুখে। বিয়ের পর থেকেই একেবারে ট্যাডস বনে যাচ্ছে এই মহিলাটি। আগে নাম ছিল মিস উড। তখন ঝড়ের বেগে টাইপ করতো, টেবিল পত্তর, ফাইলিং সব সময় আপ-টু-ডেট রাখতো। এখন অফিস-আওয়ারের পরে দু মিনিট রাখা যায় না। ওই মিস্টার অ্যাণ্ডারসন না কে পাঁচটা না-বাজতেই ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। মাঝে-মাঝে বেশ বিরক্তি ধরে শ্যামলেন্দুর। একদিন গল্পচ্ছলে দোলনকে বলেছে, "ভাবছি ভদ্রলোককে বলবো এতোই যদি আঠা, তাহলে বউকে চাকরিতে পাঠানো কেন?"

"আহা! বেচারি এখনও হনিমুনের ঘোরে রয়েছে, কিছু বোলো না। সবাই তো আর তোমার মতো কর্মযোগী নয় যে, বউ বেঁচে রইলো কি মরলো তার খবর করবে না!"

আজকে কিন্তু সত্যি রাগ হচ্ছে, কারণ নোটটা সকালেই লাগবে। কিন্তু কিছুই বলা চলবে না। মহিলা আবার এরই মধ্যে সন্তানসম্ভবা হয়ে বসে আছেন। আর এই বাচ্চাটাচ্চার ব্যাপারটা মেয়েদের একটা অ্যানিম্যাল

ইনসটিংকট। রাজ-রাজেশ্বরী থেকে আরম্ভ করে, ফিল্মস্টার, মেয়ে-বৈজ্ঞানিক, ডিরেকটরের বউ, লেডি সেক্রেটারী, মেথরানি সব একরকম ব্যবহার করে—তার সঙ্গে নতুন বাচ্চা-হওয়া মেনী বেড়ালের কোনো পার্থক্য নেই। এই কথাগুলো অবশ্য শ্যামলেন্দুর নিজস্ব নয়। বলেছিল রুণু সান্যাল। তখন রুণুর সঙ্গে প্রায়ই আড্ডা জমতো। সুযোগ পেলেই শ্যামলেন্দু দোলনকে নিয়ে হাজির হতো রুণুর বাড়িতে। আর সস্ত্রীক রুণুও আসতো শ্যামলেন্দুর টাউনসেণ্ড রোডের বাসায়। রুণু তখন খুব চোখা-চোখা ডায়ালগ বলতো।

শ্যামলেন্দু একবার বলেও ছিল অনিন্দিতাকে, "আপনার কর্তা যেসব ডায়ালগ ছাড়েন, তার কয়েকটা বার্নার্ড শ'-এর কানে গেলে তিনিও ব্যবহার করে ফেলতেন।"

"তাতে আমার আর কী লাভ হতো? বার্নার্ড শ' আমাকে কোট করেছেন এই কারণে কোম্পানি এক পয়সাও মাইনে বাড়াতো না। মাঝখান থেকে বার্নার্ড শ' রয়ালটি বাবদ আরও দু পয়সা বেশী রোজগার করে বসতেন।" রুণু সান্যাল কফির কাপে চুমুক দিয়ে বলেছিলেন।

না, মিসেস অ্যাণ্ডারসন সন্তানসম্ভবা হলেও, এখনও অকর্মণ্য হয়ে পড়েননি। অল্প সময়ের মধ্যেই নোটটা টাইপ করে নিয়ে এলেন। শ্যামলেন্দু মনে মনে লজ্জা পেলো—ভদ্রমহিলার ওপর অতটা চটা ঠিক হয়নি। হাজার হোক বেচারা মা হতে চলেছে। শরীরের এই অবস্থায় কে আর শখ করে চাকরি করতে আসে?

নোটটার ওপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিলো শ্যামলেন্দু। তারপর সোজা উঠে পড়ে আলমারি থেকে কোটটা বার করে নিলো। ঘড়িতে ন'টা বেজে পনেরো হয়ে গিয়েছে।

মার্কেটিং ডিরেকটর ডেভিডসন সাহেব কিছুদিন হলো বিলেতে রয়েছেন। তাঁর অধীনে যে দুটো ডিভিশন তার একটা দেখছে শ্যামলেন্দু।

ম্যানেজিং ডিরেকটরের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে পড়লো শ্যামলেন্দু! তারপর আলতো দু বার টোকা মেরে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলো। একটা দরজা খুললেই এম-ডি'র দেখা পাওয়া যায় না। প্রথমেই বসে আছেন, সেক্রেটারী মিসেস ডিক। মিসেস ডিকের দেহসৌষ্ঠব হিন্দুস্থান পিটারস্-এর সর্বস্তরের বহু আলোচ্য বিষয়। একই ড্রেসে পর পর দু দিন কেউ মিসেস ডিককে অফিসে

আসতে দেখেনি। আজকাল মাঝে-মাঝে আবার কি দুর্বুদ্ধি চাপে—একেবারে ফিনফিনে ইমপোর্টেড সিফন শাড়ি আর সঙ্গে ম্যাচিং চোলি পরে অফিসে আসেন মহিলা। আবার হয়তো তার পরের দিনই মিনি স্কার্ট। মিনি স্কার্ট পরার নানা জ্বালা—বিশেষ করে টেবিলে যাদের টাইপরাইটার চালাতে হয়। বিলেতের কোন ফ্যাশান ম্যাগাজিন দেখে মিসেস ডিক নিজের টেবিলের আধখানা ঢেকে নিয়েছেন—এর নাম মডেস্টি বোর্ড!—যাতে আগন্তুকদের সরাসরি দৃষ্টি তাঁর অধমাঙ্গকে বিব্রত না করে।

দম্ভে নাকি মিসেস ডিকের মাটিতে পা পড়ে না; সবার সঙ্গেই খারাপ ব্যবহার করে। কিন্তু শ্যামলেন্দুর সঙ্গে ওঁর বেশ সদ্ভাব। দুজনের মধ্যে একটু-আধটু রসিকতা বিনিময় হয়। শ্যামলেন্দু বলে, "বস-এর সঙ্গে ঝগড়া করা চলে, কিন্তু মনিবের সেক্রেটারীর সঙ্গে নৈব নৈব চ!"

মিসেস ডিক তির্যক দৃষ্টি হেনে বলেন, "মিস্টার চ্যাটার্জি, আমাকে 'কিড' কোরো না।" এই কিডিং কথাটা মহিলার প্রায় মুদ্রাদোষে দাঁড়িয়েছে।

শ্যামলেন্দু বলে, "মিসেস ডিক, পৃথিবীতে দু রকমের মহিলা সেক্রেটারী আছে—গুড সেক্রেটারী অথবা গুড-লুকিং সেক্রেটারী! সমস্ত ক্যালকাটায় একাধারে গুড এবং গুড-লুকিং সেক্রেটারী বলতে একটি মহিলাকেই বোঝায়।"

"আবার কিড করছো!" মিসেস ডিক বেশ খুশী হয়েই অভিযোগ করেন।

শ্যামলেন্দু বলে, "আমার শুধু একটি ভয়! হোম বোর্ডের মেম্বার মিঃ ক্রিফোর্ড ইণ্ডিয়া ট্যুরে আসছেন। তারপর যদি তোমার হোম পোস্টিং হয়ে যায়, তাহলে আমাদের দোষ দিও না!"

"ইংলণ্ড! রক্ষে করো, মিস্টার চ্যাটার্জি। আমি লণ্ডনে কাজ করতে পারবো না। ওখানে সেক্রেটারীর খুব অভাব, চাকরি পাওয়া মোটেই শক্ত নয়। কিন্তু আমি ঠিক করেছি, কানাডা ছাড়া আর কোথাও যাবো না।"

আজ কিন্তু কোনো রসিকতা হলো না। শ্যামলেন্দু দেখলে এম-ডি ঘরের বাইরে লাল আলো জ্বালিয়ে দিয়েছেন। মিসেস ডিক বললেন, "ঘরে কেউ নেই, উনি বোর্ড মিটিংয়ের জন্যে তৈরি হচ্ছেন।"

"এই নোটটা ওঁকে পাঠিয়ে দিও। বোর্ড মিটিংয়ে লাগবে। আমার সঙ্গে গতকাল চারটের সময় আলোচনার পর, এম-ডি নোটটা তৈরি করতে বলেছিলেন।"

"তুমি দেখা করতে চাও? ওকে বলবো?" সেক্রেটারী জানতে চায়।

"কিছু দরকার নেই। আমি নিজের সীটে ফিরে যাচ্ছি, দরকার হলে ডেকে পাঠিও।"

ঘর থেকে বেরিয়ে শ্যামলেন্দু গম্ভীরভাবে আবার করিডর দিয়ে হাঁটতে লাগলো। এই হাঁটার সময় সে কোনোদিকে তাকায় না। হাই অফিসারদের বহু সাধ্যসাধনা করে এই মুদ্রা অভ্যাস করতে হয়। ভিড়ের মধ্যে হাঁটবেন, কিন্তু দৃষ্টি যে কোনদিকে নিবদ্ধ তা কেউ বুঝতে পারবে না। শ্যামলেন্দুর প্রথম হেড ক্লার্ক অবনীবাবু বহুদিন আগে বলেছিলেন, "যাক স্যর, আপনি একটা বাঙালীর ছেলে এই অফিসে এলেন। আমাদের কত আনন্দ। আমরা কেরানি হলেও বাঙালীর উন্নতি দেখলে খুশী হই, মনে ভরসা পাই।" অবনীবাবু আরও বলেছিলেন, "আপনি *born*-অফিসার। আপনি স্যর সায়েবদের মতো আদবকায়দা করবেন। এই নিচু থেকে ওঠা পেটি অফিসারদের মতো পেটি ব্যাপারে থাকবেন না। যখন অফিসের ভিতর দিয়ে হেঁটে যাবেন তখন কোনোদিকে তাকাবেন না।"

অবনীবাবুর কথাগুলো শুনে তখন হাসি লেগেছিল শ্যামলেন্দুর। জন্মেই মানুষ কেমন করে অফিসার হতে পারে? ভিড়ের মধ্যে হাঁটবে অথচ কাউকে দেখবে না, তা কেমন করে হয়? কিন্তু এখন আর হাসি আসে না শ্যামলেন্দুর। শ্যামলেন্দু চ্যাটার্জি এখন হিন্দুস্থান পিটারস্-এর আবহাওয়ার সঙ্গে নিজেকে পুরোপুরি মানিয়ে নিয়েছে।

নিজের ঘরের মধ্যে এসে বসবার কিছুক্ষণ পরই শ্যামলেন্দুর ইনটারন্যাল টেলিফোন বেজে উঠলো। কোম্পানির সেক্রেটারী নীলাম্বর সেনগুপ্ত কথা বলছেন। "মিস্টার চ্যাটার্জি ফ্রি আছেন নাকি?"

"আপনার জন্যে সব সময়ই ফ্রি আছি, সেনগুপ্ত সায়েব," শ্যামলেন্দু চ্যাটার্জি উত্তর দিলো।

খানকয়েক ফাইল হাতে নীলাম্বর সেনগুপ্ত এবার ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন।

"বোর্ড মিটিং আজ কখন আরম্ভ করছেন সেনগুপ্ত সায়েব?" শ্যামলেন্দু জিজ্ঞেস করে।

"সাড়ে-এগারোটায় ঘড়ি ধরে ডিরেকটরদের মিটিং আরম্ভ করবো। তারপর ওখান থেকে সোজা ওঁরা চলে যাবে সুতানুটি ক্লাবে লাঞ্চ করতে। এইটাই আমাদের ট্রাডিশন। আগে মিটিং, পরে লাঞ্চ, না হয় পরে মিটিং আগে লাঞ্চ!"

"বসুন সেনগুপ্ত সায়েব, অন্তত এক কাপ কফি খেয়ে যান," শ্যামলেন্দু অনুরোধ জানায়।

"না মশাই, এই কোম্পানি ল' আর ডিরেকটর বোর্ড নিয়ে পাগল হয়ে গেলাম। বিলেতের ডিরেকটররা তো বোঝেন না, এখানে কোম্পানি আইনের কত ফ্যাচাং—পান থেকে চুন খসলেই আজকাল কোম্পানি ল' বোর্ড লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে দেবে। আর তখন তো, বুঝতেই পারছেন, সব ব্যাটাকে ছেড়ে দিয়ে এই বেঁড়ে সেক্রেটারীকেই ধবা হবে।"

"কি ব্যাপাব সেনগুপ্ত সায়েব? ঘন ঘন বোর্ডেব মিটিং ডাকছেন আজকাল!"

"কী আর হবে? ডিবেকটর বোর্ডই তো দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। ওঁদের ডাকতে হয় মাঝে-মাঝে। আর মাঝে-মাঝে মিটিং না হলে বাইরের ডিরেকটররা কিছু ফি পান না।"

কফির কাপে চুমুক দিয়ে সেনগুপ্ত সায়েব বললেন, "মার্কেটিং ডিরেকটর ডেভিডসন সায়েব নেই। আপনি বোধ হয় কি একটা নোট দিয়েছেন আজ সকালে এম-ডিকে। এম-ডি বললেন, আপনাকে বোর্ড রুমের কাছে অপেক্ষা করতে। যদি কোনোরকম দরকার হয় উনি ডেকে পাঠাবেন আপনাকে।"

বোর্ড মিটিং দেখেনি কখনও শ্যামলেন্দু। ডিরেকটরদের মিটিংয়ে কী আবার জিজ্ঞেস করে বসবে কে জানে।

"ভাবিয়ে তুললেন স্যর।" হেসে বললো শ্যামলেন্দু।

"আপনারা মশাই, ম্যানেজিং ডিবেকটবকে হাতের পুতুল করে রেখেছেন, আপনাদের আবাব বোর্ডকে ভয়!" সেনগুপ্ত সায়েব উত্তর দেন।

"না, সারাক্ষণের ডিবেকটর যাঁবা—ফিনানস ডিরেকটর মিস্টার গর্ডন, দিল্লীর রেসিডেণ্ট ডিবেকটর মিঃ মূর্তি এবং খোদ ম্যানেজিং-ডিরেকটর মিস্টার ফেরিসকে তো বুঝি, কাজকর্মও করছি। ভয় বাইরের ডিরেকটরদের নিয়ে। কি কোশ্চেন করে বসবে কে জানে। সেসব প্রশ্নের খোলাখুলি উত্তর দেওয়া ঠিক হবে কিনা তাও তো জানি না। এসব প্রবলেম তো মিস্টার ডেভিডসন নিজে সামলান। আপনি একটু আলো দেখান স্যর।"

"আর হাসাবেন না মিস্টার চ্যাটার্জি! আপনি আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দিন দেখি? বলুন তো বোর্ড ক'রকমের হয়?"

"আমাকে আবার বিপদে ফেলছেন কেন, সেনগুপ্ত সায়েব? ইণ্ডিয়ান কোম্পানিজ অ্যাক্ট অনুযায়ী বোর্ড তো একরকমই হয়—এবং সেই বোর্ডের ডিরেকটররা শেয়ারহোল্ডাদের সভায় নির্বাচিত হন। আপনিই তো লেখেন মশাই: মিস্টার অমুক চন্দ্র অমুক রোটেশনে অবসর নিলেন; এণ্ড বিং

এলিজিবল অফারস হিমসেলফ ফর রিইলেকশন। সোজা বাংলায় যা দাঁড়ায়—পালা অনুযায়ী অবসর নিচ্ছেন, কিন্তু সমর্থ থাকায় আবার ঘর করতে প্রস্তুত!"

সেনগুপ্ত সায়েব বললেন, "শুনুন, আমার প্রশ্নের উত্তর হলো বোর্ড দু রকম। হার্ড বোর্ড এবং সফট্ বোর্ড। ওই যে আমাদের ম্যানেজিং ডিরেকটর এবং ফিনানস ডিরেকটর এ রাই আসল হার্ড বোর্ড। বাকি সব বুঝতেই পারছেন। একজন কোম্পানির সলিসিটর পাঁচু বড়াল। আর রয়েছেন ক্যামাক স্ট্রীটের স্যর বরেন রায়, ইংরেজ আমলে সবাই যাঁকে স্যর ব্রায়ান রে বলে জানতো এবং কুমার জগদীশ।"

কফি শেষ করে সেনগুপ্ত আর সময় নষ্ট করলেন না। ওঁকে বোর্ড মিটিংয়ের কাগজপত্র গোছাতে হবে।

শ্যামলেন্দু নিজেও এবার একটা প্লাস্টিকের ফোল্ডারের মধ্যে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র গুছিয়ে নিলো। তারপর সোজা রওনা দিলো একতলায় ভিজিটরস রুমে।

আগাগোড়া দামী কার্পেটে মোড়া ভিজিটরস রুম। হঠাৎ ঢুকলে মনে হয় যেন কোনো প্রথম শ্রেণীর সিনেমা হলে ঢুকলাম। ফেরিস সায়েবের এদিকে কড়া নজর। উনি বলেন, "প্রেমের মতো, ব্যবসাতেও প্রথম ইমপ্রেশনটা খুবই প্রয়োজনীয়। হিন্দুস্থান পিটারস্-এর বাড়িতে পা দিয়েই যেন লোকে বুঝতে পারে তারা যা-তা জায়গায় আসেনি।"

এই ঘরের সাজসজ্জা নিয়েও অনেক পরিকল্পনা হয়েছে। ফেরিস সায়েব সেবার শ্যামলেন্দু ও রুণু দুজনকেই ডেকে পাঠিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "ইয়ংমেন, আমার ইচ্ছে তোমরা দুজনে এই ওয়েটিং রুম নিয়ে একটু মাথা ঘামাও। প্রয়োজন হলে তোমাদের ওয়াইফদের সঙ্গে কনসাল্ট করো।"

সেই ঘর-সাজাবার গল্পটাই তো বিরাট। কেমন করে দোলন ও মিসেস সান্যালের মধ্যে একটু মতবিরোধও যেন দেখা দিয়েছিল। রুণু কেমন করে কলকাতা এবং বোম্বাইয়ের বাঘা বাঘা ইনটিরিয়র ডেকরেটরদের সঙ্গে একের পর এক পরামর্শ করেছিল। তারপর বাজেট তৈরি হয়েছিল। একটা ঘরের পক্ষে খরচটা বোধ হয় সামান্য একটু বেশী। এই দু লক্ষ টাকা।

খবরটা কেউ বোধ হয় ইউনিয়নের কানে পৌঁছে দিয়েছিল। কিন্তু ফেরিস সায়েব তাতে পিছিয়ে যাননি। ইউনিয়নের লীডার সুজয় মিত্তিরকে বলেছিলেন, "আপনারা আপনাদের কাজ করুন, আর আমাকে আমার কাজ করতে দিন।"

ফিনানসের লোককে ফেরিস সায়েব বলেছিলেন, "আমি তো ভেবেছিলাম

তিন লাখ টাকা লাগবে। তার মানে আমরা এক লক্ষ টাকা বাঁচাচ্ছি। আমাদের কোম্পানি এখন খুব বড় না হলেও, একদিন বড় হবে। আমাদের বাৎসরিক বিক্রি সামনের বছরেই দশ কোটি টাকা পেরিয়ে যাবে। তাছাড়া মনে রাখবেন আমরা এখন পৃথিবীর নানা দেশে রপ্তানি শুরু করেছি। ফরেনের ক্রেতারা আমাদের অফিসে এলে কী ভাববেন? তাঁদের কীভাবে আমরা ইমপ্রেস করবো? কীভাবে বোঝাবো তাঁরা পৃথিবীর একটা প্রখ্যাত কোম্পানির কাছে জিনিস কিনতে এসেছেন?"

এই বাইরের দেশের লোকদের পয়েন্টটা কিন্তু রুণু সান্যালের মাথায় আসেনি। এটা শ্যামলেন্দুই শিখে দিয়েছিল। সত্যি কথা বলতে কি, খরচা একটু বেশী বলেই শ্যামলেন্দুর মনে হয়েছিল, বিশেষ করে যে-কোম্পানির বছরে বিক্রি মাত্র ছ'সাত কোটি টাকা। কিন্তু রুণুর বউ নাছোড়বান্দা। স্বামীকে বলেছিল, "এই সব সামান্য ব্যাপারে কখনও 'mean' হবে না, কখনও নিম্ন-মধ্যবিত্তের মতো নজর নিচু করবে না।"

রুণু বলেছিল, "কিন্তু ডার্লিং, ফেরিস সায়েবকে ব্যাপারটা বোঝাতে হবে, একটা জাস্টিফিকেশন তো চাই!"

রুণুর গিন্নী উত্তরটা সঙ্গে সঙ্গেই দিয়েছিল। "তুমিই তো সেদিন বলেছিলে, ফিনানসিয়াল জাস্টিফিকেশন দেখাতে হলে সম্রাট শাজাহান কোনোদিন তাজমহল তৈরি করতে পারতেন না।"

এ-যুগে রপ্তানি এবং প্রতিরক্ষার কথা তুললে বজ্রমুষ্টিও আলগা হয়ে যায়। এর জন্যে সাতখুন মাপ। তবে মজা এই, খরচের মতলব দিলো রুণু অথচ রপ্তানির কথাটা তুললো শ্যামলেন্দু। হিন্দুস্থান পিটারস্-এর সমস্ত এক্সপোর্টের দায়িত্ব শ্যামলেন্দুর। রুণু যে-বিভাগের বিক্রি দেখাশোনা করে সেখানে রপ্তানির কোনো সম্ভাবনা আজও নেই।

ভিজিটরস রুমে শ্যামলেন্দুকে দেখে রিসেপশনিস্ট মিস শ্রীলা চক্রবর্তী সুপ্রভাত জানালে, "গুড মর্নিং মিস্টার চ্যাটার্জি।"

অভ্যস্ত কায়দায় গুড মর্নিংটা ফিরিয়ে দিলো শ্যামলেন্দু। শ্রীলার টেবিলে দুটো ফুলদানিতে টাটকা ফুলের গুচ্ছ। রোজ সকালে রকমারি ফুল দিয়ে যায় নিউ মার্কেটের দোকান থেকে। আর এই শ্রীলাও নতুন নতুন সাজে দেখা দেয় প্রতিদিন। রিসেপশনিস্টের কাজে শাড়িপরা মেয়ে নেওয়ার পরিকল্পনাটা বড় সায়েবের। পার্সোনেল অফিসার তালুকদারকে ডেকে বলে দিয়েছিলেন, কেমন রিসেপশনিস্ট দরকার।

তারপর কয়েক সপ্তাহ ধরে বেচারা তালুকদার নাস্তানাবুদ হয়েছিল। প্রতিদিন গোটা দশ বারো সুন্দরী মেয়েকে ভদ্রলোক ইনটারভিউ করেছেন এবং রিজেক্ট করেছেন। তালুকদার একদিন দুঃখ করে শ্যামলেন্দুকে বলেছিলেন, 'আর তো পারি না, মিঃ চ্যাটার্জি। বুড়ো বয়সে কি ফ্যাসাদে পড়লাম বলুন তো। সায়েব তো কাউকে পছন্দ করছেন না। ক্যাণ্ডিডেটের মুখশ্রী পছন্দ হলে কণ্ঠস্বর পছন্দ হয় না, কণ্ঠস্বর পছন্দ হলে দেহবল্লরী পছন্দ হয় না।"

মৃদু হাসতে হাসতে শ্যামলেন্দু ওঁর কথা শুনে যাচ্ছিলো। তালুকদার নিজেই এবার বললেন, "সায়েব এক ঢিলে দুই পাখি ধরতে চাচ্ছেন—দেখতে হবে খাঁটি ইণ্ডিয়ানের মতো, অথচ শুনতে হবে ঠিক মেমসাহেবের মতো। খাঁটি ভারতীয় সুন্দরী না হয় পাওয়া যায়, কিন্তু যেমনি তার সঙ্গে কনভেণ্ট উচ্চারণ চাইলেন অমনি গোলমাল বাধলো।"

শেষ পর্যন্ত কুমারী শ্রীলা চক্রবর্তীকে পাওয়া গেল। এখন শুধু তালুকদারের চিন্তা মেয়েটা টিকলে হয়। "যা দিনকাল, এই সব মেয়ের বিয়ে হয়ে যেতে বেশীক্ষণ লাগে না। আর বিয়ের পরে বাঙালী মেয়েগুলোর যে কি হয়! একেবারে বাসি পাঁপড়ের মতো মিইয়ে যায়, কোনো কাজে লাগে না। সেদিকে যাই বলুন, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েগুলোকে দেখুন, বিয়ে অর নো-বিয়ে সব সময় মচমচে, মুড়মুড়ে।"

শ্রীলা চক্রবর্তী এবার শ্যামলেন্দুকে জিজ্ঞেস করলে, "আপনিও কি বোর্ড মিটিংয়ে থাকবেন?"

"না, আমি বাইরে একটু অপেক্ষা করবো। ডিরেকটররা এসে গিয়েছেন নাকি?"

"না, এইবার বোধহয় এসে পড়বেন," শ্রীলা ফুলদানির ফুলগুলো গোছাতে গোছাতে উত্তর দিলো।

সেনগুপ্ত সায়েবও হাজির হলেন এবার খাতাপত্র হাতে। দিল্লীর রেসিডেণ্ট ডিরেকটর মূর্তি সায়েবকেও দেখা গেল। "হ্যালো সেনগুপ্ত, হ্যালো চ্যাটার্জি", বলে মূর্তি সায়েব ডান হাত বাড়িয়ে দিলেন।

করমর্দনের পর সেনগুপ্ত সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, "আজকের ফ্লাইটে এলেন নাকি?"

"না, না, গতকাল ইভনিং প্লেনে এসেছি। বোর্ড মিটিং বলে কথা, কোনো রকম রিস্ক নেওয়া যায় না।"

দিল্লীর রেসিডেণ্ট ডিরেকটর মিস্টার জগন্নাথ ভেঙ্কটচারি মূর্তি এবার বোর্ড-

রুমের মধ্যে ঢুকে পড়লেন।

"চীজ একটি!" সেনগুপ্ত সায়েব মন্তব্য করলেন।

হিন্দুস্থান পিটারস্ লিমিটেডের সামনে এবার একটা পুরানো বেণ্টলে গাড়ি থামলো। বিরাট গাড়িটার পিছনে এক শীর্ণকায় বৃদ্ধ প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছেন। ড্রাইভার নেমে এসে দরজা খুলে দিয়ে বেশ জোর গলায় ডাকলো, "স্যার!"

লণ্ডনে টেলর করা তিন-পিসের স্যুটের মধ্যে যে হাড়-জির-জিরে লোকটি রয়েছেন, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "টমলিন কোম্পানি?"

ড্রাইভার উত্তর দিলো, "হিন্দুস্থান পিটারস্ কোম্পানি। আপনি তো ওখানেই যেতে বললেন।"

"তাইতো, আমিই তো তোমাকে হিন্দুস্থান পিটারস্-এ যেতে বললাম।"

ফাইল হাতে করে ভদ্রলোক ধীর পদক্ষেপে এবার অফিসের ভিতরে ঢুকে পড়লেন। শ্রীলা চক্রবর্তী এই ভদ্রলোককে আগে কখনও দেখেনি। ভাবলে, এই সকালে বুড়োটা আবার জ্বালাতন করতে আসছে কাকে? ঘাড়টা নিচু করে, কোটের হাতটা একটু নেড়ে নিয়ে, ভদ্রলোক শ্রীলার সামনে দাঁড়াতেই, সেনগুপ্ত সায়েব ফিস ফিস করে শ্যামলেন্দুকে বললেন, "স্যর ব্রায়ান এসে গিয়েছেন। কলুটোলার রায় বাড়ির ছেলে বরেন রায়, আই-সি-এস (রিটায়ার্ড)। ইংরেজ আমলের দোর্দণ্ডপ্রতাপ লোক।"

সেনগুপ্ত সায়েব এগিয়ে এসে শ্রদ্ধার সঙ্গে বললেন, "গুড মর্নিং, স্যর ব্রায়ান। কেমন আছেন?"

"এই যে নীলাম্বর। দেখে কেমন বুঝছ?" উত্তর দিলেন স্যর বরেন রায়।

"দেখে তো আপনাকে নামকরা কোম্পানির চায়ের মতো গার্ডেন-ফ্রেশ মনে হচ্ছে।"

সেনগুপ্তের উত্তর একদা দিল্লীর ঝানু আই-সি-এস বরেন রায়কে বেশ খুশী করলো। তিনি বললেন, "বেশ অ্যাকটিভ আছি—এখনও নিয়মিত গল্ফ ক্লাবে যাচ্ছি, গোবিন্দপুর ক্লাবে ঢুঁ মারছি, বোর্ড মিটিং অ্যাটেণ্ড করছি, যা-খাচ্ছি, তাই হজম হচ্ছে। হোয়াট মোর? তুমি তো হেনরি ফোর্ডের ব্যাপার জানো? অত টাকা, অত প্রতিপত্তি, কিন্তু একখানা ডিম সেদ্ধ খেয়ে হজম করতে পারতেন না। আমি ভাইসরয় লর্ড লিনলিথগোর অ্যাডভাইস মতো এখনো ব্রেকফাস্টে দুটো কোয়ার্টার-বয়েল মুরগীর ডিম চালিয়ে যাচ্ছি।"

নীলাম্বর সেনগুপ্তের উত্তর তৈরি ছিল। "আপনি হলেন স্যর সেকালের রোলস রয়েস গাড়ির মতো। যত পুরানো হচ্ছেন তত দাম বাড়ছে। একি

আর আজকালকার মেড-ইন-ইণ্ডিয়া মোটর গাড়ি!"

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বরেন রায় দেখলেন এখনও একটু সময় আছে। তাই গল্প আরম্ভ করলেন। "ঠিক বলেছ নীলাম্বর। তাছাড়া আমরা ফাইটার, চিরকালই ফাইট করে গেলাম। এখনকার ফাইট আর ইংরেজ আমলের ফাইট তো এক জিনিস ছিল না। এখনকার আই-এ-এসগুলো কী করছে? আমাদের সময় এরাই তো হেড অ্যাসিসটেণ্ট হতো, দু-একটা ছিটকে-ছাটকে বি-সি-এসে ঢুকে পড়তো। এদের হাতে দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে দেশের উন্নতি কী করে আশা করতে পারো?"

"সে তো বটেই," সেনগুপ্ত সায় দিলেন।

স্যর ব্রায়ান রে বললেন, "এখন তো গোটাকয়েক টুপি পরা এম-পি আর এক-আধটা মিনিস্টার সামলাতে আই-এ-এস বাবাজীদের জিভ বেরিয়ে পড়ছে। আমাদের সময় আমরা তো এদের বুড়ো আঙুলের তলায় চেপে রেখেছি, দরকার হলে এদের যেটা যোগ্য জায়গা সেই জেলখানায় পাঠিয়েছি, তারপর বাঘা বাঘা ইংরেজের সঙ্গে সমানে পাঞ্জা লড়েছি।"

"সেসব সত্যি গল্পের মতো শোনায়," সেনগুপ্ত এবার স্যর ব্রায়ানকে উৎসাহ দেন।

"তুমি তো জানো, আমরা তখন পাবলিকের কাছে ছিলাম ব্রিটিশের সাপোর্টার; কিন্তু ইংরেজদের কাছে ছিলাম গোঁড়া স্বদেশী। সুযোগ পেয়েছো কি, ইংরেজদের এগেনস্টে কড়া নোট ছাড়ো, এই ছিল আমাদের পলিসি।"

শ্যামলেন্দু ও সেনগুপ্ত দুজনেই স্যর ব্রায়ানের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। সেনগুপ্ত বললেন, "আপনার সঙ্গে সেই সেবার ফিল্ডমার্শাল অকিনলেকের কি একটা ঠোকাঠুকি লেগে গেল!"

বেজায় খুশী হলেন কলুটোলার স্যর বরেন রায়। "তোমার দেখছি সব মনে আছে। যুদ্ধ তখনও পুরোদমে চলছে। তারই মধ্যে আমি অকিনলেকের একটা টি-এ বিল তিন দিন দেরি করে দিয়েছিলাম। এমন একখানি নোট ছেড়েছিলুম, যে ফিল্ডমার্শাল অকিনলেকের টি-এ বিল নাকচ হয়ে যায় আর কী! সে এক বিরাট গল্প। ভাইসরয় পর্যন্ত ব্যাপারটা গড়িয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ফিনান্স সেক্রেটারীর পার্সোনাল রিকোয়েস্টে ওয়ার এফর্টের কথা ভেবে নরম হলুম। অকিনলেকের বিল পাস হলো। একদিন বাড়িতে এসো, হোল এপিসোডটা তোমাকে বলবো। তোমরা তাজ্জব বনে যাবে। আর ইংরেজের গ্রেটনেস দেখ, এই ইনসিডেণ্টের পরও আমাকে নাইটহুড দিলে তো!"

স্তর ব্রায়ান রে বললেন, "তোমাদের বোর্ড মিটিং ক'টায় আরম্ভ করছো?"

"ঠিক সাড়ে-এগারোটায়।"

"আমি তো জানো ভুল করে টমলিন্‌স লিমিটেডে চলে যাচ্ছিলাম। তারপর খেয়াল হলো ওদের বোর্ড মিটিং সাড়ে-তিনটের সময়।"

"রিটায়ার করেও যে একটু বিশ্রাম পাবেন তার উপায় নেই," সেনগুপ্ত দুঃখ প্রকাশ করেন।

মাথা নাড়লেন স্তর বরেন রে। বললেন, "তোমাকে কী বলবো, নীলাম্বর। প্রায় রোজই বোর্ড মিটিং লেগে বয়েছে। একটা নয়, দুটো নয়, কুড়িটা কোম্পানির ডিরেকটর, বুঝতেই পারছো।"

"তাও ভাগ্যে কোম্পানিজ অ্যাক্‌টে বলেছে যে, কুড়িটা কোম্পানির বেশী ডিরেকটর হওয়া যাবে না, তাই! না হলে আরও অনেক কোম্পানি আপনাকে ধরাধরি করতো!"

"ধরাধরি করলে কী হবে? আমি তো আর তোমাদের জন্মে দশভুজা হতে পারবো না!"

স্তর বরেন এবাব আপন মনে বিড়বিড় করতে করতে বোর্ড-রুমের মধ্যে ঢুকে পড়লেন।

সেনগুপ্ত সায়েব ফিসফিস করে বললেন, "একেবারে আদর্শ ডিরেকটব। বাহাত্তর বছর বয়স। সারাক্ষণ চেয়ারে বসে ঢোলেন, কখনও একটা প্রশ্ন করেন না। তারপর ভোটের কথা উঠলে ব ', মস্টার ফেরিসের সঙ্গে আমি একমত। আজকাল অবশ্য একটু শরীব খারাপ হয়েছে—গতবার তো মিটিংয়ের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, গলা দিয়ে ঘড়ঘড় করে আওয়াজ বেরুচ্ছিল।"

স্তর বরেন রে-র প্রায় পিছন পিছন ঢুকলেন কুমার জগদীশ। স্তর বরেনের সঙ্গে ম্যাচ করেই যেন ওঁকে বোর্ডে নেওয়া হয়েছে। স্তর বরেন যেমন রোগা, ইনি আকারে তেমনি বিশাল। কুমার জগদীশ অত্যন্ত ফর্মাল মানুষ। সেনগুপ্তকে গ্রীট করে গম্ভীরভাবে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলেন। সেনগুপ্ত বললেন, "আমাদের বোর্ডের গুরুত্ব যে এঁর জন্মে বেড়েছে একথা সবাইকে স্বীকার করতে হবে। ভদ্রলোকের বাবা ছিলেন রাজা হরিদাস অফ উলুবেড়িয়া। কিন্তু ইনি এতই কৃপণ যে বাবার মৃত্যুর পরে ওয়ার ফাণ্ডে চাঁদা দিয়ে এবং অন্য খরচ-খরচা করে আর রাজা উপাধি নিলেন না। ইংরেজের খাতায় চিরকুমার রয়ে গেলেন। উলুবেড়েতে বেশীর ভাগ সময় থাকেন, ওখান থেকেই রেগুলার যাতায়াত করেন।"

বোর্ডের অন্যান্য ডিরেক্টরদের এবার মিস্টার ফেরিসের সঙ্গে দেখা গেল। কফি সম্পর্কে মিস চক্রবর্তীকে নির্দেশ দিয়ে, সেনগুপ্তও এবার অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

বোর্ড-রুমটা খালি অবস্থায় অনেকবার দেখেছে শ্যামলেন্দু। কিন্তু বোর্ডের কোনো মিটিং সে দেখেনি। আজ এই ভিজিটরস রুমে বসে হঠাৎ যেন বোর্ডরুম সম্বন্ধে একটা বিশেষ কৌতূহল জাগছে তার মনে। আফটার অল, যে-পোস্টে সে রয়েছে, তার ঠিক ওপরেই তো কোম্পানির সর্বক্ষণের ডিরেক্টররা। আর এই বোর্ডেই তো কোম্পানির ভাগ্য নির্ধারিত হয়। বোর্ডই তো সর্বেসর্বা।

"গুড মর্নিং", রুণু সান্যালের গলা।

একটা স্বচ্ছ প্লাসটিক ফোল্ডার হাতে সান্যাল এসে সামনে দাঁড়ালো। রুণু এবার শ্যামলেন্দুর পাশে বসে পড়লো। পকেট থেকে সিগারেট বার করে অফার করলে। তারপর নিজের সিগারেটটা লাইটারের উপর ঠুকতে ঠুকতে বললে, "আর বলো কেন, বোর্ডের তলব। সব কাজকর্ম ফেলে ছুটে আসতে হলো। ফেরিস সায়েবের সেক্রেটারী বলে পাঠালেন, কাছাকাছি ওয়েট করো। গতকাল যে নোটটা দিয়েছ, সে-সম্বন্ধে দরকার হলে কোশ্চেন করতে পারে।"

"আমাকেও তো একই কারণে বসে থাকতে বললে," শ্যামলেন্দু উত্তর দেয়।

"আর পারা যায় না, ডেভিডসন সায়েব ফিরলে বাঁচি। সেই যে বিলেত গিয়ে বসে রইলেন।"

এরপর দুজনে আর বেশী কথা হয়নি। দুজনেই চুপচাপ সিগারেট টেনে গিয়েছে। শ্রীলা চক্রবর্তী শুধু একবার ভিতরে কফি পাঠাবার সময় জিজ্ঞেস করে গেল, কফি দেবে কিনা।

সিগারেটের সঙ্গে কফিও শেষ করেছে দুজনে—অর্থাৎ হিন্দুস্থান পিটারস্ সেল্স-এর দুই ডিভিশনের দুই তরুণ প্রধান, শ্যামলেন্দু চ্যাটার্জি এবং রণবীর সান্যাল।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু ডাক হলো না। সেনগুপ্ত সায়েব একবার বেরিয়ে এসে বলে গেলেন, "বোর্ড আজকে অন্য ব্যাপারে আলোচনা করছেন। ফেরিস সায়েব আপনাদের ধন্যবাদ দিয়েছেন। বলেছেন আপনাদের আর অপেক্ষা করবার দরকার নেই।"

"আঃ বাঁচা গেল।" দুজনেই একসঙ্গে প্রকাশ্যে স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লে। একটা অপ্রিয় দায়িত্বের বোঝা যেন ঘাড় থেকে নেমে গেল। দুজনে একসঙ্গে এবার লিফটে উঠল।

প্লাসটিকেব ফোল্ডার আলতোভাবে হাতে ঝুলিযে, এগজিকিউটিভ স্টাইলে মার্চ করে দুজন এবাব দুজনের কেবিনে ঢুকে পড়লো।

ঘবে ঢুকে শ্যামলেন্দু চেযাবে বসে বইলো কযেক মিনিট। মুখে যাই বলুক, একটু হতাশ হযেছে সে। মনেব মধ্যে একটা মধুব প্রত্যাশা জেগেছিল। বোর্ডের সামনে দাঁড়িযে, মুখোমুখি প্রশ্নেব উওব দেওযাব মধ্যে একটা সম্মান আছে, একটা নাটকীযতা আছে, একটা গুরুতব দাযিত্বেব স্বীকৃতি আছে। সেই সুযোগটা অল্পেব জন্য হাতছাড়া হযে গেল।

রুণু সান্যাল তাব ঘব থেকে আর্জেন্ট কল বুক কবলে, "মাই ফ্ল্যাট প্লিজ।"

"হ্যালো, বিবি? আমি বলছি।"

"বলো কী হলো? বোর্ড মিটিং শেষ হ'ে গেল?"

"শোনো ব্যাপাবটা তেমন কিছু ইমপর্ট্যান্ট না, মনে হচ্ছে। আমি অবশ্য ফেবিস সাযেবেব কাছ থেকে খবব পেযেই তোমাকে জানিযে দিযেছিলাম। এই ফিবলাম। ভাবলাম এখনই বলে দিই না হলে তুমি হযতো চিন্তা কববে।"

"চিন্তার কথাই তো। আমি তো ফেবাজিনিব লেডিজ কফি মিটে যেতে পাবলাম না! খববটা শোনা পর্যন্ত টেলিফোনেব কাছে বসে আছি। যাই হোক, বাড়িতে এলে সব শুনবো। তবে, এটা একটা সম্মানও বটে। ডেভিডসন সাহেবেব অনুপস্থিতিতে তোমাকে ডেকে পাঠালো," সান্যাল গৃহিণী মন্তব্য করলেন।

রুণু সান্যালেব কণ্ঠস্বব এবাব বিব্রত শোনালো। "বিবি, আমি ভেবেছিলাম, শুধু আমাকেই ডেকেছে। কিন্তু গিযে দেখি শ্যামলেন্দুও বসে আছে। ওকেও ডেকেছিল নিশ্চয।"

"ডাকুক গে যাক। তুমি চিন্তা কোবো না। যদি তুমি প্রয়োজন মনে করো, আমি বাঙা মাসিমাকে ফোন কবে বাখি। মেসোমশায তোমাদেব বোর্ড মিটিং থেকে ফিবলেই যেন জিজ্ঞেস কবে রাখে ব্যাপাবটা কী। তাবপব তোমায জানিযে দেবো।"

"তুমি শুব ববেনের কথা বলছো? উনি তাড়াতাড়ি ফিববেন না। বোর্ডের মিটিংয়ের পর লাঞ্চ আছে নিশ্চয। তাছাড়া টেলিফোন কবাটা ভাল দেখাবে না।"

"বা-রে, আমি আমার মাযেব দিদিকে ফোন করতে পাবি না? তোমার বউ হলেও, এটা আমার ফাণ্ডামেণ্টাল বাইট!"

"বিবি, ভেবে দেখি একটু। আফটার অল, ডিরেক্টর। আর যা-তা

কোম্পানির ডিরেকটর নয়, হিন্দুস্থান পিটারস্-এর ডিরেকটর।"

"তোমাদের কাছে ডিরেকটর। কিন্তু আমাদের কাছে, নতুন মেসোমশায়," বিবি উত্তর দেয়।

"ইয়েস, কিন্তু—।"

"এতে আবার কিন্তু কি?"

"তোমাদের মেসোমশায় হলেন পুরানো আই-সি-এস। এঁরা হলেন স্টীল ফ্রেম। জানো তো? হয়তো ব্যাপারটা পছন্দ নাও করতে পারেন।"

"অল রাইট। তুমি যখন হেজিটেট করছো, ডার্লিং, তখন আমি রাঙা মাসিমাকে জাস্ট একটা কার্টসি ফোন করছি। শ্রেফ সৌজন্যের জন্যে। অর্ডিনারি, হ্যালো মাসি কেমন আছো, মেসো কেমন, এটসেটরা, এটসেটরা।"

"সেটা ব্যাড আইডিয়া নয়," রুণু স্বীকার করে।

গৃহিণী বললেন, "আচ্ছা ডার্লিং ড্রাইভারকে বোলো আমার সিগারেটটা একেবারে ফুরিয়ে গিয়েছে। বেশ মুশকিলে পড়ে গেছি। যত তাড়াতাড়ি পারে যেন পাঁচ প্যাকেট বেনসন এণ্ড হেজেস নিয়ে আসে। এখন রাখছি।"

শ্যামলেন্দু ইতিমধ্যে কিছু চিঠি ডিকটেশন শেষ করে ফেলেছে। কয়েকটা টেলেক্সের জবাবও দিয়েছে।

আজকাল এই নতুন উৎপাত শুরু হয়েছে—টেলেক্স। টেলিগ্রাম তবু ফেলে রাখা চলতো। যারা পাঠাচ্ছে, তারা তো জানতে পারছে না কখন টেলিগ্রাম হেড অফিসে এসে পৌঁচচ্ছে। এখন প্রতিটা ব্রাঞ্চ অফিসে টেলেক্স মেশিন বসানো হয়েছে। কথায় কথায় টেলিফোনের মতো ডায়াল ঘুরিয়ে মেসেজ টাইপ করে দিচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে হেড অফিসের টেলেক্স রুমের মেশিনে তা ছাপা হয়ে যাচ্ছে। মেসেজের শেষে লেখা থাকে—আপনার টেলেক্স উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করছি। ফলে সিদ্ধান্ত না নিয়ে উপায় নেই। অনেক ম্যানেজার তো চিঠি লেখাই ছেড়ে দিয়েছে—সারাক্ষণই টেলেক্সের ওপরে রয়েছে। এ সম্বন্ধে একটা সার্কুলার দেওয়া দরকার—এ বছরে টেলেক্সের বিলই কয়েক লাখ টাকা হবে। বিশেষ জরুরী দরকার না হলে যেন এই যন্ত্র ব্যবহার না করা হয়—কারণ ডাক ও তার বিভাগ বিল বাড়িয়ে যাবে।

শ্যামলেন্দুর ফোনটাও এবার বেজে উঠলো।

"চ্যাটার্জি।" শ্যামলেন্দু টেলিফোনে নিজের নাম ঘোষণা করলে।

"আমি বলছি।" গলার স্বর শুনেই 'আমি' কে বুঝে নিতে দেরি হলো না। দোলন বললে, "আগে একবার ফোন করেছিলাম। মিসেস অ্যাণ্ডারসন

বললে, "তুমি বোর্ড মিটিং অ্যাটেণ্ড করতে গিয়েছ। কী ব্যাপার? স্পেশাল কিছু নাকি? আগে তো বলোনি?"

"ঠিক ছিল না কিছু দোলন। আজ সকালেই এম-ডি হুকুম করলেন। ডেভিডসন সাহেব নেই তো," শ্যামলেন্দু উত্তর দেয়।

"তাহলে তো ভাল খবর। ডেভিডসন সাহেব না থাকলে বড় সাহেব তোমাকেই ডাকছেন," অন্য প্রান্ত থেকে দোলনের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো।

"আমাকে একা ডাকেননি, দোলন। কুণ্ডুকেও এম-ডি ডেকেছিলেন," শ্যামলেন্দু নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে দোলনের উৎসাহ-অনলে জল ছিটিয়ে দিলো।

দোলন বললে, "শোনো, একটা সুখবর আছে। একটু আগেই টেলিগ্রাম পেলাম। সুদর্শনা আসছে। কাল সকালের ট্রেনে। স্টেশন অ্যাটেণ্ড করতে লিখেছে।"

"তাই নাকি? আগে তো কোনো চিঠিপত্তর দেয়নি?"

"ওদের রকম-সকমই ওই রকম, জানো তো। কিন্তু খুব আনন্দ হচ্ছে আমার।"

"আনন্দ হবারই তো কথা, দোলন। ক'টা দিন হৈ-হৈ করা যাবে।"
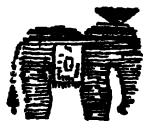
হাওড়া স্টেশনের এই ভোরবেলাটা যে এত সুন্দর তা শ্যামলেন্দুর খেয়াল ছিল না। অনেকদিন রেলওয়ে স্টেশনের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। যাতায়াত এখন যা-কিছু হয় তা দমদম বিমান বন্দর থেকে। হিন্দুস্থান পিটারস্-এর ছোকরা সেল্সম্যান ছাড়া আর কেউই আজকাল ট্রেনে চড়ে না।

সিগারেট টানতে টানতে শ্যামলেন্দু বললে, "দোলন তোমার মনে পড়ে কলেজে আমরা দুজনেই যাযাবরের লেখা 'দৃষ্টিপাত' প্রায় মুখস্থ করে ফেলেছিলাম। তাতে এই রেল-ভারসাস-এরোপ্লেন সম্বন্ধে একটা কথা ছিল: "বিজ্ঞান দিয়েছে বেগ, কেড়ে নিয়েছে আবেগ।"

দোলন হেসে ফেলে। "বেশ মনে আছে। তুমিই তো আমার জন্মদিনে বইটা উপহার দিয়েছিলে। পাটনার কোথাও বইটা নিশ্চয় পড়ে আছে। সুদর্শনাকে বললে হতো, ও নিয়ে আসতে পারতো। হাজার হোক তোমার দেওয়া প্রথম উপহার।"

"এখন বইটা রিভাইজ করলে, যাযাবর নিশ্চয় লাইনটা সংশোধন করতেন। এখন রেলে চড়া মানে হাজার রকমের দুশ্চিন্তা। টিকিট কাটার দুশ্চিন্তা, হাওড়া ব্রিজে ট্রাফিক জ্যামের দুশ্চিন্তা, কুলির সঙ্গে মারামারির দুশ্চিন্তা। তাছাড়া আছে স্ট্রাইক, তামার তার চুরি, ফিস প্লেট অপসারণ, বাংলা বন্ধ, বিহার বন্ধ, আরও কত কি! এর মধ্যে কী আবেগ আছে বাবা! এরোপ্লেন এখন অতটা খারাপ হয়নি।"

দোলন বললে, "মনে আছে তোমার? তখন নতুন চাকরিতে ঢুকেছ তুমি। আমি তখন পাটনায়। তোমার দিল্লী যাবার কথা। তুমি ঠিক করলে দিল্লী এক্সপ্রেসে যাবে, যাতে পাটনা স্টেশনে অন্তত কিছুক্ষণ দেখা হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তুমি এলে না। আমি লজ্জায় যাই। কাউকে না বলে, সুদর্শনাকে সঙ্গে করে স্টেশনে এসে অত বড় ট্রেনটার এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত ঘুরে বেড়াচ্ছি। কিন্তু কোথায় তুমি! আমার তখন এমন অভিমান হয়েছিল কী বলবো। চোখে জল এসে গিয়েছিল। সুদর্শনা বলেছিল, 'দিদি তোর চোখে জল এসে গেল কেন? এই তো দু সপ্তাহ হলো কলকাতা থেকে এসেছিস।' আমি মনে মনে বলেছিলুম আর একটু বয়স বাড়ুক। বিয়ে হোক, তখন বুঝবি দু সপ্তাহ জিনিসটা কি। একটা চোদ্দ বছরের মেয়ে কি করে বুঝবে, একজনকে খুঁজে না পেয়ে দিদির চোখে জল আসছে কেন?"

শ্যামলেন্দু হাসলো। "আমার কিন্তু দোষ ছিল না। ডেভিডসন সায়েব বললেন, না তোমাকে প্লেনে যেতে হবে। রেলে ভাড়া কম, কিন্তু সময় বেশী লাগে। আর সময়ের দামটা আমাদের কাছে অনেক। জেট প্লেনের যুগে অফিসারের সময় ট্রেনে বসে নষ্ট করবার জন্য নয়।"

"কাগজের রিপোর্ট পড়ে পড়ে ট্রেনে চড়তে ভয় ধরে গিয়েছে। কিন্তু দোলন, আজকে হাওড়া স্টেশনটা বেশ ভাল লাগছে," শ্যামলেন্দু বললে।

"সেটা স্টেশনের জন্যে, না শ্যালিকার জন্যে?" দোলন রসিকতা করে।

"শ্যালিকা তো এখনও আবির্ভূতা হননি, দোলন!" শ্যামলেন্দু উত্তর দেয়।

দূরে ডিসট্যান্ট সিগন্যালের কাছে এবার ইলেকট্রিক ট্রেনের এঞ্জিনটা দেখা গেল। একেবারে নির্ধারিত সময়েই গাড়িটা আসছে।

ইলেকট্রিক ট্রেনের এঞ্জিন শ্যামলেন্দুর ভাল লাগলো না। কেমন যেন উন্নাসিক। সুন্দরী মহিলার মতো বৈদ্যুতিক ঔদ্ধত্যে ছুটে এসে টুক করে থেমে গেল। অথচ আগেকার বাষ্পীয় এঞ্জিনগুলো কেমন হাঁপাতো—লম্বা দৌড়ের পর ম্যারাথন রানাররা যেমনভাবে হাঁপায়। এবারের বিজনেস উইক-

কাগজে বিলেতের সবচেয়ে বড কোম্পানিব চেয়ারম্যানের জীবনী বেরিয়েছে। অফিসের বাইরে, তাঁব শখ হলো রেল এঞ্জিন মেবামত করা। নিজের বাড়িতে একটা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড বাষ্পীয় লোকোমোটিভ কিনে রেখেছেন। সেইখানেই শনি-ববিবার খুটখাট করেন। তাঁর মতে শিল্প-বিপ্লবের পর থেকে মানুষ আজ পর্যন্ত যত কল তৈরি করেছে, তার মধ্যে সবচেয়ে মনোহারী এবং সবচেয়ে মানবিক হলো এই বাষ্পীয় এঞ্জিন।

হাওডা স্টেশনটা হঠাৎ যেন ঘুম ভেঙে উঠে পডলো। নিঃশব্দ ছ'নম্বর প্ল্যাটফরমটা এবার সবব শিশুর কলহাস্যে মুখরিত হয়ে উঠলো।

শ্যামলেন্দু বললে, "দোলন, তুমি কি এক কোণে দাঁড়াবে? আমি সুদর্শনাকে খুঁজে বার করি।"

"উঁহু। আমার বোনকে আমি বুঝি খুঁজে বার করতে পারি না?" গম্ভীর-ভাবে দোলন ছেলেমানুষের মতো উত্তর দেয়। তারপর দুজনে একসঙ্গে হেসে ওঠে।

থার্ড ক্লাস স্লিপিং কম্পার্টমেণ্টের দরজার সামনেই সুদর্শনা ভট্টাচার্যকে দেখা গেল। সাধারণ বাঙালী মেয়ের তুলনায় একটু লম্বাই বটে। সুদর্শনার রঙটা দিদির থেকেও হলুদ। আর আছে পশ্চিমী লাবণ্য, যা স্বাস্থ্য থেকে আসে, যাকে কলকাতার মেয়েরা চিরকাল হিংসে করে এসেছে। স্নিগ্ধ লাবণ্যের সঙ্গে বুদ্ধির দীপ্তি ছড়িয়ে রয়েছে সুদর্শনার সমস্ত মুখে। কিন্তু সে দীপ্তি চোখ ধাঁধায় না—ঠিক যেন দুধ সাদা পিটারস ল্যাম্প, যা আলো ছড়ায় কিন্তু জ্বালা দেয় না!

দিদি জামাইবাবুকে দেখে সুদর্শনা হাত নাডতে লাগলো। তারপর কুলিদের পাশ কাটিয়ে ট্রেন থেকে নেমে এসে দিদিকে জড়িয়ে ধরলে। "তুই কেমন আছিস দিদি? কতদিন তোর সঙ্গে দেখা হয় না।"

শ্যামলেন্দু এবার কপট গাম্ভীর্যের সঙ্গে শ্যালিকাকে মনে করিয়ে দিলো, "দিদির পাশে শ্যামলদাও দাঁড়িয়ে আছেন। দিদিকে যেভাবে গ্রীটিং জানালে, ঠিক সেইভাবে এবার তাঁকেও অভিনন্দন জানানো উচিত।"

"ইস্! দিদি আর জামাইবাবু এক জিনিস নাকি?" সুদর্শনা প্রথমে মুখ কুঁচকে এবং পরে মিষ্টি হেসে শ্যামলদার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে।

দিদিও কম যায় না! গম্ভীরভাবে বললে, "দিদির থেকে জামাইবাবু কুমারী মেয়েদের কাছে অনেক আদরের, অনেক মূল্যবান।"

জামাইবাবু বললেন, "দাঁড়াও আগে লাগেজগুলোর খোঁজ করি। না হলে ওগুলো লোপাট হবে।"

"লাগেজ বলতে আমার ওই চামড়ার ব্যাগটা," সুদর্শনা হেসে দেখিয়ে দিলো। "আর কাঁধে-ঝোলানো এই থলেটা।"

"শান্তিনিকেতনী থলেতে অনেক জিনিস ধরে—কিন্তু ওটা কলকাতায় এখন আর ফ্যাশন নেই," দোলন বলে।

"আমাদের পশ্চিমে, দিদি এই ব্যাগটা এখনও আউট-অফ-ফ্যাশন হয়নি," সুদর্শনা উত্তর দেয়।

দিদি ফিস ফিস করে বললে, "এখানেও হতো না। কিন্তু জানিস···" দিদি একটু থামলো।

"কী জানিস?" সুদর্শনা জানতে চায়।

"এখন যেসব মেয়ে পলিটিক্স করে, মিছিলে বেরোয়, আমাদের দাবি মানতে হবে বলে চিৎকার করে, তাদের কাঁধে এই ব্যাগ থাকে। আর এই ব্যাগ ব্যবহার করে আমেরিকান হিপিনীরা। গুচারালি, গেরস্ত মেয়েমহলে এটা এখন দেখলে একটু ঘাবড়ে যায়!"

কুলির হাতে ব্যাগটা দিয়ে ওরা সকলে ক্যাব রোডের দিকে হাঁটতে আরম্ভ করলে। ওইখানেই শ্যামলেন্দুর গাড়িটা পার্ক করে রেখেছে।

যেতে যেতে দোলন জিজ্ঞেস করলে, "ট্রেনে তোর কোনো অসুবিধে হয়নি তো?"

"অসুবিধে কি বলছিস দিদি? বাজার হালে ঘুমিয়ে চলে এলাম।"

"ব্যাকরণে ভুল হলো—রানীর হালে বলো।" শ্যামলেন্দু রসিকতা করলে।

"আজকালকার থার্ড ক্লাশগুলো ভালই করেছে, তাই না?" দোলন জিজ্ঞেস করে। থার্ড ক্লাশের ভিতরটা সে প্রায় ভুলেই গিয়েছে। বিয়ের পর একবার না দু বার ট্রেনে চড়েছিল—তাও এয়ারকণ্ডিশন ক্লাশে। সত্যি কথা বলতে কি থার্ড ক্লাশের কথা মনে হলেই তার ভয় লাগে।

ক্যাব রোডের ওপরেই শ্যামলেন্দুর গাড়িটা অপেক্ষা করছিল। মালপত্তর পিছনে রেখে শ্যামলেন্দু গাড়ির দরজা খুলে দিলো।

সুদর্শনা বললে, "দাঁড়াও, তোমাদের দুজনকে একটু ভাল করে দেখে নিই।"

"শ্যামলদা, ঠিক মনে হচ্ছে সিনেমা দেখছি। আপনাকে একেবারে উত্তমকুমার মনে হচ্ছে। চেহারাটা ফিল্মস্টারের মতোই স্মার্ট রেখেছেন। তারপর আবার সাদা শার্ট আর হাফ প্যান্ট পরে স্টেশনে এসেছেন।"

"সেটা অবশ্য সিনেমা স্টারের জন্যে নয়। সকালে গল্‌ফ খেলা ছিল। তোর

পাঁচটায় উঠে প্র্যাকটিশে গিয়েছিলাম। মার্চেণ্টস কাপ গল্‌ফ তা এসে গেল। আমাদের স্কোরের ওপরেই হিন্দুস্থান পিটার্‌স্‌ লিমিটেডের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।"

"অতশত বুঝি না, তবে এই খেলোয়াড়ের ড্রেসে শ্যামলদাকে একেবারে ফিল্মস্টার মনে হচ্ছে। গল্পের হিরো যেন কাউকে রিসিভ করার জন্যে হাওড়া স্টেশনে এসেছে।"

সুদর্শনা এবার দিদির দিকে তাকালে। "শ্যামলদা যখন উত্তমকুমার, তখন তুই হলি সুচিত্রা সেন।" সেদিকে একটু খুঁটিয়ে দেখে বললে, "সুচিত্রা সেন কিন্তু একটু মোটা হয়ে গিয়েছে। এই হিরোর সঙ্গে ম্যাচ করতে গেলে আর একটু তন্বী হতে হবে।"

"বিয়ে হোক, তখন বুঝবি। বিয়ে-ওলা মেয়েদের ওপর ভগবানের রাগ আছে। যতই সাবধানে থাকো, যতই কম খাও, ঠিক ওজন বেড়ে যাবে," দোলন হেসে বলে।

"ও-সব বুঝি না দিদি। তুই শুধু মনে রাখবি তোর পুরো নাম দোলনচাঁপা —যে চাঁপা ফুল মৃদু-মন্দ বাতাসে দোলে!"

"সত্যি কি অদ্ভুত একটা নাম আমার ঘাড়ে চেপেছে," দোলন বলে।

"অদ্ভুত নাম! বল, কি মিষ্টি নাম! তাই না শ্যামলদা?" সুদর্শনা এবার জামাইবাবুকে দলে টানবার চেষ্টা করলে।

শ্যামলেন্দু বললে, "মিষ্টি নাম এবং আনকমন নাম।"

"কমন কী করে হবে?" সুদর্শনা বলে। "দিদির নামটা কে দিয়েছিলেন সেটা দেখতে হবে তো! পথের পাঁচালীর লেখক স্বয়ং বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। দিদি, তোকে কোলে করে বিভূতিবাবু দাঁড়িয়ে আছেন যে-ছবিটায় সেটা সেদিন অ্যালবামে দেখলাম। অ্যালবামটা সেদিন হঠাৎ খুঁজে পাওয়া গেল। বাবা বললেন, বিভূতিবাবু সেবার পাটনায় এসে আমাদের বাড়িতে উঠেছিলেন। বাবা ওঁকে ধরেছিলেন, তোর একটা নাম দিয়ে দিতে। তুই নাকি মেঝেতে বসে বসে খুব দোল খাচ্ছিলি। তাই বিভূতিবাবু লিখে দিলেন—দোলনচাঁপা।"

"আঃ টুটুল, তুই গাড়িতে ওঠ," দোলন একটু লজ্জা পেয়ে সুদর্শনাকে ঠেলে দিলো।

"আগে কথাটা শেষ করতে দে। আগে নিজে দোল খেতিস, এখন শ্যামলদাকে দোলা দিচ্ছিস।"

শ্যামলেন্দু বললে, "শুধু দোলা নয়, রেগে গেলে ঝাঁকুনিও দিচ্ছে তোমার দিদি।"

"তাছাড়া উপায় কী? দেখিস না ওষুধের শিশিতে লেখা থাকে, *Shake the bottle before use*—ব্যবহারের আগে ভাল করে ঝাঁকিয়ে নাও।"

দোলনের কথায় হাসির ফোয়ারা উঠলো। সুদর্শনা এবার গাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লো। ড্রাইভারের সীটে বসতে বসতে শ্যামলেন্দু বললে, "ড্রাইভারের পাশে সুদর্শনাকে দিচ্ছ, তারপর যদি মনোসংযোগের অভাবে ড্রাইভার অ্যাক্সিডেন্ট করে বসে!"

"আঃ শ্যামলদা! দিদি পাশে না থাকলে ড্রাইভারের অনুপ্রেরণা আসবে না, সেইটা বলুন।"

"কমার্সিয়াল ফার্মের এগজিকিউটিভ। ওদের অনুপ্রেরণার দরকার হয় না —বোতাম টিপে দিলেই যন্ত্রের মতো ওরা চলতে আরম্ভ করে।" দোলন বলে বসলো।

শ্যামলেন্দু কথাটা শুনলো, কিন্তু উত্তর দিলো না।

গাড়ি চলতে শুরু করেছে। টুটুল বললে, "কতদিন পরে তোমাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। দিদি তবু আড়াই বছর আগে একবার পাটনায় গিয়েছিল। আর শ্যামলদা, আপনি তো ডুমুরের ফুল।"

"সত্যি, তোমাদের সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয় না," শ্যামলেন্দু স্বীকার করে।

"ভাবছেন দোষ স্বীকার করে নিলেই শাস্তি মকুব হবে। মোটেই তা নয়। আমি তো ঠিক করে এসেছিলাম আপনার সঙ্গে কথাই বলবো না।"

"এমন সুন্দরী, শিক্ষিতা, স্বাস্থ্যবতী শ্যালিকা কাছে থেকেও যদি কথা না বলে তা হলে বেঁচে লাভ কী?" ষ্টিয়ারিং ঘুরোতে ঘুরোতে শ্যামলেন্দু বলে।

"দিদিটাকে বিয়ে করে সেই যে পাটনা ত্যাগ করলেন, তারপর আর পাটনার কথা মনে পড়ে না, তাই না?" সুদর্শনা আবার মধুর অনুযোগ করে।

"তা ঠিক নয়, টুটুল। পাকে-চক্রে হয়ে ওঠে না। হিন্দুস্থান পিটারস্-এর অফিসে কীভাবে যে দিনগুলো কেটে যাচ্ছে তার হিসেবই থাকে না।"

"দিদি যদি আপনার গলায় মালা না দিয়ে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাতো, দেখতাম কেমন পাটনায় না হাজির হতেন।"

"রসিকতা করছি না টুটুল। পাটনায় আমার অফিসের তেমন কাজ পড়ে না। আমাকে দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ এই মেট্রোপলিটান শহরগুলো চষে বেড়াতে হয়।"

"কেন, পাটনায় কি কেউ হিন্দুস্থান পিটারস্‌-এর ইলেকট্রিক পাখা কেনে না? আমিই তো একমাস আগে স্কলারশিপের টাকা জমিয়ে একটা পিটারস্‌ ফ্যান কিনলুম! দোকানদার তো অন্য ফ্যান গছাবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু বাবা জামাই-স্নেহে অন্ধ এবং মা জামাই-গরবে গরবিনী। ওরা দুজনে বলে দিয়েছিলেন পিটারস্‌ ফ্যান ছাড়া যেন অন্য কিছু না কিনি! আমি সত্যি বলছি, এত রেগেছিলুম যে অন্য ফ্যান কিনতুম। নেহাত পিতৃআদেশ, তাই দশ টাকা বেশী দিয়ে আপনাদের ফ্যান কিনতে হলো।"

"পৃথিবীব কোনো ভাল জিনিসই সস্তায় পাওয়া যায় না, টুটুল।" গাড়ির মোড় ঘোরাতে ঘোরাতে শ্যালিকার সঙ্গে রসিকতা করলে শ্যামলেন্দু।

"দাম বেশী হলেই জিনিস ভাল হয় না শ্যামলদা। ভ্যালু এবং প্রাইস এক নয়," সুদর্শনা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়।

মিটমিট করে হেসে শ্যামলেন্দু বললে, "পিটারস্‌ ফ্যান কাজে সেরা তাই দামেও সেরা হতে বাধা কী? এই কথাই তো আমাদের কর্মচারীদের সব সময় বলছি।"

"রাখুন রাখুন, শ্যামলদা। বিজ্ঞাপনের মোহজাল রচনা করে আপনারা স্বাধীন সমাজের সরল খরিদ্দারদের একধরনেব দাস করে তুলছেন। সোস্যালিজমেব একটু আধটু হাওয়া পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়েও পৌঁছে গিয়েছে। ভুলবেন না, আপনার শ্যালিকা দুটো বছর ইকনমিকস মন দিয়ে পড়ে সবে এম এ পরীক্ষা দিয়ে পাটনা ত্যাগ করেছে।"

"ওরে বাবা! টুটুল তুমি যে ক্যাপিটালিস্টদের বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক কথাবার্তা শুরু করলে, তোমাব বক্তব্যটা কী?"

'খুব সোজা! সেরা জিনিসের লোভ দেখিয়ে ব্যবসাদাররা বেশী পয়সা আদায় করছে, অথচ পৃথিবীর আসল সেরা জিনিসগুলো রোদ, হাওয়া, সূর্যের আলো, চাঁদের জ্যোৎস্না এখনও কোনো দাম না দিয়েই পাওয়া যায়। আর মানুষও এখনো তার সেরা জিনিস বিলিয়ে দেয়, যেমন আপনি আপনার হৃদয়টি আমার দিদি কুমারী দোলনচাঁপা ভট্টাচার্যকে দিয়েছিলেন। শোনেননি রবীন্দ্রনাথের গান—'দেবো তারে যারে বিনামূল্যে দিতে পারি'।"

"বিনামূল্যে পিটারস্‌ ফ্যান দেবার কথা আমরা এখনও ভাবিনি, তবে সহজ কিস্তিতে গ্রামে এবং শহরাঞ্চলে ফ্যান বিক্রি করবার একটা পরিকল্পনা আমরা বিবেচনা করে দেখছি।" শ্যামলেন্দু জবাব দিলো।

দোলন বলে উঠলো, "টুটুল, তুই দেখছি জামাইবাবুকে একটা মস্ত

সার্টিফিকেট দিয়ে দিলি। ভদ্রলোক মোটেই বিনামূল্যে হৃদয়টিকে আমার কাছে বিলিযে দেননি। আমার কাছে ওই কিস্তিতে বিক্রি করেছেন—'এখন হাওয়া খাও, পরে দাম দিও' স্কিমে। তখন বুঝিনি, এমন ঝানু সেল্‌সম্যানের খপ্পরে পডেছি। এখন দণ্ডে দণ্ডে মারছে—সুদ সমেত দাম তুলছে!"

দোলনের সরস মন্তব্যে দুজনেই হেসে উঠলো। টুটুল বললে, "ওঃ দিদি, তুই তো দেখছি বেশ চ্যাটাং চ্যাটাং কথা শিখেছিস। আগে তো একেবারে তোর মুখ দিযে আওযাজ বেরতো না। কী করে যে শ্যামলদার সঙ্গে তুই প্রেম করলি তাই তোর বান্ধবীরা বুঝতে পারেনি।"

দোলন এবার কথা ফিরিযে ফেললে। বললে, "সেসব ওযান্স-আপন-এ-টাইমের ব্যাপার। তুই তখন পুঁচকে মেযেটা। এখন তুই বাডির কথা বল। বাবা মা কেমন আছেন?"

"বাবা ভাল আছেন। মাইনে পেলেই ইংরিজী সমালোচনা সাহিত্যের আরও বই কিনে আনছেন। আর মা রেগে উঠছেন। বলেছেন, এসব কোথায রাখব? বাবার সেদিকে খেযাল নেই। তাছাড়া মারের খবর মন্দ নয। মাঝে-মাঝে তোমাদের চিঠি না পেলে মেজাজ খারাপ করেন। একটু অভিমানও আছে—বিযে করে বড মেযে পর হযে গিযেছে। আসে না।"

"কথাটা মিথ্যে নয। কিন্তু কী করি বল? গত বছর যাওযা হয়নি, কাশ্মীরে ওঁদের সেল্‌স কনফারেন্স হলো। সেখান থেকে আমরা ছুটিতে গেলাম। এ-বছরের শেষে আবার বিলেত যাবার কথা রযেছে।"

"তার মানে ছুটি নিযে হোমে যাচ্ছ?"

"দূর বোকা। বিলিতী অফিসে সাহেবরা হোমলিভ পান বিলেতে যাবার জন্যে। বিজাভ ব্যাঙ্কের যত রাগ ইণ্ডিযান অফিসারদের ওপর। তাদের হোমলিভ বললে ফরেন এক্সচেঞ্জ আসে না, ওদের ক্ষেত্রে বলতে হয় ওভারসিজ ট্রেনিং অথবা এসাইনমেণ্ট।"

"শ্যামলদা তো এর আগে অফিসের কাজে পাঁচ-ছ'বার ইউরোপ ঘুরে এসেছে। এবার তুই শ্যামলদার সঙ্গে বিলেত যাচ্ছিস, সেইটাই বল না।"

"ঠিকই ধরেছিস।"

"ওঃ হাউ লাকি ইউ আর দিদি। কী কপাল করে তোর সঙ্গে শ্যামলদার দেখা হযেছিল।"

"বলো তো একটু সুদর্শনা। তোমার দিদি ব্যাপারটা স্বীকার তো করেই না, উল্টে বলে আমার সঙ্গে বিয়ে হয়েই তোমার কপালটা খুললো। তুমি

মানুষ হয়ে গেলে।”

সুদর্শনা রসিকতা করে উত্তর দিলো, “বিছানায় শুয়ে শুয়ে তোমরা দুজনে এ-বিষয়ে ঝগড়া কোরো। আমার নিবেদন : শ্যামলদা, আপনি শুধু বউকে বিলেত নিয়ে যাবেন ? আপনার একটি মাত্র শ্যালিকা, সে কী দোষ করলে ?”

“কোনো দোষ করেনি। সত্যি কথা বলতে কি শ্যালিকা অরিজিন্যাল গৃহিণী অপেক্ষাও আদরের। সাধে কি কবি লিখেছেন শ্যালিকার উদ্দেশে -

নহ মাতা নহ পিসী নহ শিশু নহ নাবালিকা
হে অনন্তযৌবনা শ্যালিকা।
ওষ্ঠে যবে আলতা দিয়া ভালে পর খয়েরের টিপ্,
চাহিয়া তোমার পানে বুক মোর করে টিপ্‌টিপ্,
মনে হয়, কেন আমি হলাম না দিল্লী বাদশাহ,
অথবা কুলিনপুত্র—গুষ্টিসুদ্ধ করিয়া বিবাহ
জীবন নির্বাহ
করিতাম মহানন্দে কুসুমে কুসুমে
পরিমল চুমে।”

দুই বোনেরই এবার হাসবার পালা। হাসতে হাসতে সুদর্শনার সুন্দর মুখ আরও লাল হয়ে উঠেছে। বললে, “উঃ, শ্যামলদা, আপনার পেটে পেটে এত রস।”

দোলন বললে, ‘কবিতাটা কবে স্টক করলে ? কই আগে তো বলোনি ?”

“আঃ! কী করে বলবো ? তুমি তো ডানাকাটা পরী সম প্রস্ফুটিত যৌবন শ্যালিকা নও, তুমি যে ওয়াইফ।”

লর্ড সিনহা রোডের নতুন বাড়িটা এবার দেখা যাচ্ছে। দোলন দূর থেকে বাড়িটা টুটুলকে দেখিয়ে দিলো। “ওই আমাদের বাড়ি।”

“ভারি সুন্দর নামটা দিয়েছে—ব্লু হ্যাভেন”, সুদর্শনা বললে। “ব্লু হেভেন বললেও কোনো আপত্তি ছিল না—সুনীল স্বর্গ—বেশ মিষ্টি নাম হতো।”

দোলন বললে, “আমরা থাকি দশ তলায়। বছরখানেক হলো বাড়িটা তৈরি হয়েছে, ত্রিশটা ফ্ল্যাট আছে। “তার মধ্যে দশটা এদের কোম্পানির।”

দারোয়ানের জিম্মায় গাড়িটা রেখে শ্যামলেন্দু এবার স্ত্রী ও শ্যালিকাকে লিফটে চড়ালো। সুদর্শনা অবাক হয়ে দেখছে সামনের ফোয়ারাটা। খুব ভাল লাগছে। সুদর্শনা বললে, “দিদি, ঠিক যেন আমেরিকা আমেরিকা মনে

হচ্ছে, সিনেমায় আমেরিকাকে এমনি দেখায়।"

"একবার যখন এসেছিস তখন সহজে ছাড়ছি না। সব দেখবি আস্তে আস্তে," দোলন উত্তর দেয়।

সুদর্শনা বললে, "তোমাদের এই অঞ্চলটাও তো কলকাতা—কিন্তু কাগজে কলকাতা বলতে বোঝায় শুধু নোংরা, বোমা আর মিছিল।"

"তুই চুপ কর টুটুল। আজকে ছুটির দিনে আর ওসব কথা মনে করিয়ে দিস না। তোর জামাইবাবু সোমবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত অফিসে এত পরিশ্রম করে যে ছুটির দিনে ওকে কোনো অপ্রিয় কথার মধ্যে ঢুকতে দিই না।"

'শনিবারে আপনাদের বুঝি ছুটি?' সুদর্শনা জিজ্ঞেস করে।

"অন্যদিন আমরা একঘণ্টা বেশী কাজ করে পুষিয়ে দিই। তার বদলে শনিবার ছুটি। ছোটবেলায় অবশ্য আমরা দেখতাম একমাত্র মেয়ে-ইস্কুলেই শনিবারে ক্লাশ হতো না," শ্যামলেন্দু স্বীকার করে।

দোলন হাসলো। "মেয়ে-ইস্কুল আর কলকাতা বোম্বাইয়ের সমস্ত সায়েব অফিস এক পর্যায়ে পড়ে গিয়েছে, বুঝলি?"

শ্যামলেন্দু এবার লিফটের বোতামটা টিপে দিলো। হু হু করে অটোমেটিক লিফট উপরে উঠে যাচ্ছে।

সুদর্শনার মুখে বিস্ময়ের ছাপ। "এরকম চালকহীন লিফটে আমি কখনও চড়িনি শ্যামলদা।"

"পাটনায় কে আর চড়েছে বলো?" শ্যামলেন্দু আশ্বাস দেয়। "আমারও কয়েক বছর আগে একই অবস্থা ছিল। তুমি বললে বিশ্বাস করবে না, প্রথম যখন হিন্দুস্থান পিটারস্-এর অফিসে ফাইনাল অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্যে এলাম, তখন লিফটে চড়তে সাহস হচ্ছিলো না। আমার ধারণা ছিল, লিফটে চড়তে হলে আলাদা পয়সা দিতে হয়।"

হেসে ফেললে দোলন। "তুমি আর লোক হাসিও না। তুমি বলতে চাও ন' বছর আগে তুমি এমনি হাঁদাগঙ্গারাম ছিলে।"

"ন' বছর আগে কেন, দোলন, এখনও তো হাঁদাগঙ্গারাম রয়েছি," শ্যামলেন্দু উত্তর দেয়।

"আচ্ছা, এই লিফট যদি মাঝপথে খারাপ হয়ে যায়, তাহলে?" টুটুল সরল মনে প্রশ্ন করে।

"তাহলে লিফটের মধ্যেই গল্পসল্প করে সময় কাটিয়ে দেওয়া যাবে যতক্ষণ

না ফায়ার ব্রিগেডের লোকেরা মই নিয়ে আসে।" শ্যামলেন্দু হাসতে হাসতে উত্তর দিলো।

"কেন বেচারাকে শুধু শুধু ভয় পাইয়ে দিচ্ছ," দোলন স্বামীকে বকুনি দিলো। তারপর বোনকে আশ্বাস দিলো, "কী আর হবে? কোম্পানির মেকানিক রয়েছে সব সময়—ছুটে এসে ঠিক করে দেবে।"

শ্যামলেন্দু তবু রসিকতা বন্ধ করলে না। বললে, "যদি নিউইয়র্কের মতো হঠাৎ বিদ্যুৎ বন্ধ হয়ে যায়? টাইম ম্যাগাজিনে রিপোর্ট পড়নি? বহুলোক কয়েক ঘণ্টার জন্যে লিফটে আটকে পড়েছিল। বাইরে কী হচ্ছে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। টোটাল ডার্কনেস। এমন ঘুটঘুটে অন্ধকার যে অনেকে ভাবল বোধহয় কাছাকাছি এটম বোমা পড়েছে—কিংবা শেষের সেই ভয়ংকর দিন সমাগত।"

"তারপর?" সুদর্শনা জিজ্ঞেস করে। নিয়মিত টাইম ম্যাগাজিন পড়া ওর অভ্যাস নেই।

"তারপর?" শ্যামলেন্দুর মুখে দুষ্টু হাসি ফুটে উঠলো। "তুমি এখন সাবালিকা হয়েছ, তোমাকে বলা চলে। ঠিক মাস সপ্তাহ হিসেব করে যথাসময়ে দেখা গেল অনেক বেশী বাচ্চা জন্মালো নিউইয়র্কের হাসপাতালগুলোতে। বিখ্যাত বেবি বুম্।"

"যতসব ডার্টি জোক্‌স তোমার। ওসব আমেরিকানদের একটা পাবলিসিটি স্টান্ট। অন্য সব সমস্যা ভোঁতা হলো, করে কোথায় হঠাৎ আলো নিভে গিয়েছিল বলে ক'টা বাচ্চা বেশী জন্মালো তাই হিসেব করতে বসলো," দোলন এবার স্বামীকে বকুনি লাগালো।

শ্যামলেন্দু মাথা চুলকে বললে, বেশ, মন্তব্য প্রত্যাহার করলাম "

দশতলায় উঠে লিফটও এবার দাঁড়িয়ে গিয়েছে। লিফটের দরজাটা আপনা আপনি খুলে গেল। ওরা ল্যান্ডিং এ নেমে পড়লো। বাঁদিকের দরজাতেই স্টেনলেস স্টীলের চকচকে ইংরিজী অক্ষরে লেখা রয়েছে—এস চ্যাটার্জি।

ব্যাগ থেকে চাবি বার করে ফ্ল্যাটের দরজা খুলে ফেললে দোলন।

সুদর্শনার ব্যাগটা ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে শ্যামলেন্দু বললে, "এবার আমাকে কিছুক্ষণের জন্যে মাপ করতে হবে "আমি বোঁ করে একবার অফিসটা ঘুরে আসি। কিছু এরিয়ার পড়ে আছে। লাঞ্চের আগেই কাজ সেরে চলে আসবো।"

"এক কাপ কফি খেয়ে যাবে না?" গৃহিণী জিজ্ঞেস করে।

"এখন আর নয়। গল্‌ফ ক্লাবে আমি এবং ফিনান্স ডিরেক্টর মিস্টার

গর্ডন একসঙ্গে কফি খেয়ে নিয়েছি। তাছাড়া মিসেস অ্যাণ্ডারসন আমার জন্যে অপেক্ষা করবেন। ওঁকে এক ঘণ্টার জন্যে আসতে বলেছি।"

"টানটা কাজের ওপর, না লেডি সেক্রেটারীর ওপর কে জানে," দোলন এবার বোনের কাছে অনুযোগ করে।

"এসব কি শুনছি, শ্যামলদা?" সুদর্শনা চোখ পাকায়।

"জামাইবাবুর অনুপস্থিতিতে দিদির কাছে আরও কত কি শুনবে!" বলে হাসতে হাসতে শ্যামলেন্দু বিদায় নেয়।
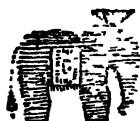
"এই হচ্ছে তোর দিদির বাসা," বোনকে জড়িয়ে ধরে দোলন বললে। "আমাদের এই ফ্ল্যাটে সবসমেত ঢাকা জায়গা আছে ২৭৮০ স্কোয়ার ফুট।"

ড্রয়িং রুমটা দেখেই তো সুদর্শনা তাজ্জব। "একে তোরা ঘর বলিস দিদি? এ তো হল। এখানে মাইক লাগিয়ে মিটিং করা যায়।"

"তা যায়। যারা এই হলটা দেখে তারাই প্রশংসা করে। ইচ্ছে করলে গানের আসর বসানো যায়।"

গানের নেশা আছে সুদর্শনার। বললে, "কলকাতা হলো গানের কেন্দ্র। বড় বড় গাইয়েদের নিশ্চয় তোরা বাড়িতে ডাকিস। শ্যামলদা তো রবীন্দ্র-সঙ্গীতের খুব ভক্ত ছিল। আর তুই তো সে তাব শুনতে পাগল ছিলিস।"

"সেসব অনেকদিন আগেকার কথা রে। ইচ্ছে ছিল, বাড়িতে মাঝে-মাঝে গানবাজনার ব্যবস্থা করি। কিন্তু নানা ঝঞ্ঝাটে ওসব হয়ে ওঠে না। তোর জামাইবাবু ব্যস্ত থাকে। তাছাড়া ককটেল পার্টি, ডিনার পার্টি লেগেই রয়েছে। কথা অনেক হবে, তুই যখন এসে পড়েছিস। চল আগে তোকে তোর ঘরটা দেখিয়ে দিই।"

সুদর্শনা ব্যাগটা তুলতে যাচ্ছিলো। দোলন বললে, "তুই রেখে দে। আব্দুলকে ডাকছি।"

"ইউনিভারসিটির ট্যুরে দু'বার বেরিয়ে মাল-বওয়া আমার অভ্যাস হয়ে গেছে, দিদি।"

"বাজে বকিস না। ওরাও একটু কাজ করুক। দু-দুটো লোককে কোম্পানি মাস মাস মাইনে দিচ্ছে কেন?" দোলন উত্তর দেয়।

অগত্যা টুটুলকে খালি হাতেই এগোতে হলো। "দিদি তোদের কার্পেটটা তো অদ্ভুত রকমের। তলায় যেন স্প্রিং লাগানো আছে।"

"না রে, পার্সিয়ান কার্পেট নয়। তবে জেনুইন মির্জাপুরে তৈরি। দেওয়াল-থেকে-দেওয়াল মাপ নিয়ে স্পেশাল অর্ডার দেওয়া হয়েছিল! আর তলায় ডানলোপিলো আণ্ডারলে পাতা আছে। এটাও কোম্পানি কিনে দিয়েছে।"

"বাবে ভারি মজা তো!" সুদর্শনা তার বিস্ময় চেপে রাখতে পারে না।

"জেনুইন পার্সিয়ান বোখারা কার্পেট পায় ডিরেকটররা। সে কার্পেটে পা পড়লে তুই তফাৎটা বুঝতে পারবি," দোলন কোমরে ঝোলানো ঝুমকো, লাগানো চাবির রিং সামলাতে সামলাতে বলে।

দোলন আবার বলতে আরম্ভ করলো, "ড্রইং হল ছাড়া, আছে আরও দুটো বেড রুম, একটায় আমরা শুই আর একটায় রাজা যখন আজমীরের পাবলিক স্কুল থেকে ফেরে তখন শোয়। আর একটা গেস্ট রুম। তাছাড়া আছে ওর স্টাডি, ডাইনিং রুম, কিচেন, প্যানট্রি, ঢাকা ব্যালকনি এবং বক্স রুম। বাইরে আছে চাকরদের কোয়ার্টার। ১২০ স্কোয়ার ফুট। প্লাস গাড়ির জন্যে পার্কিং স্পেস।"

সুদর্শনা সত্যিই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছে। শ্যামলদা যে ভাল অফিসে চাকরি করে তা সে জানতো, চাকরিতে কয়েকবার প্রমোশন হয়েছে তাও শুনেছে, কিন্তু তা বলে এমন বাড়ি। এ যেন রূপকথার রাজ্য।

সুদর্শনা এবার যে-ঘরে ঢুকলো সেইটাই গেস্ট রুম। দুটো খাট পাশাপাশি লাগানো আছে। দোলন বললে, "এইটেই তোর শোবার ঘর। দুখানা খাট দেখেই বুঝছিস, স্বামী স্ত্রীকেও আমরা অ্যাকমডেট করতে পারি। সুতরাং বিয়ে-থা হয়ে গেলে জোড়েও চলে আসতে পারবি।"

আঁচলটা সামলে নিয়ে দোলন বললে, "দেখতেই পাচ্ছিস ঘরে কনসিল্‌ড্‌ ইলেকট্রিক ওয়ারিং। পিয়ানো টাইপের সুইচগুলো সব মেঝের কাছে, যাতে খাটে শুয়ে শুয়েই সুইচগুলো জ্বালাতে নেভাতে পারা যায়। শুধু একটা জিনিস বিশ্রী হয়ে আছে—দেওয়ালের প্লাসটিক ইমালশন রঙের সঙ্গে পিয়ানো সুইচের রঙগুলো ম্যাচ করেনি। একেবারে হরিব্‌ল রঙ সুইচগুলোর। আমি আগে লক্ষ্য করিনি। কাল তোর টেলিগ্রাম পেয়ে ঘর সাজাতে গিয়ে সুইচ-গুলোর দিকে নজর পড়লো। আমি সঙ্গে সঙ্গে মেনটেন্যান্স ডিপার্টমেণ্টে ফোন করে দিয়েছি। সোমবারের মধ্যেই নিশ্চয় পাল্টে দিয়ে যাবে। তোর জামাইবাবুকেও একটু মনে করিয়ে দিতে হবে, ফলো আপের জন্যে।"

একটা স্লিপের ওপর ঘস ঘস করে কি লিখে ফেললো দোলন। "কী

লিখছিস দিদি ?” সুদর্শনা একটু ঘাবড়ে গিয়েছে।

“স্লিপ লিখছি। ওইটা তোর জামাইবাবুর কোটের পকেটে দিয়ে দেবো, সোমবার সকালে অফিসে গিয়েই মনে পড়ে যাবে, সুইচ পাল্টানোর কথা।”

সুদর্শনা ঘরটার দিকে তাকিয়ে দেখছে। দিদি বললে, “বস না বিছানায়।”

“উঃ দিদি, এ যে ডুবে যাচ্ছি।”

“দূর বোকা—এ যে ছ' ইঞ্চি ফোম রবারের গদি। মনে হবে তুই ভাসছিস, শরীরের যেন কোনো ওজন নেই।”

“এই বিছানায় শুয়ে শুয়ে তোর অভ্যেস হয়ে গিয়েছে দিদি, তাই না ?”

“কেন বল তো ?”

“আমি ভাবছি, গতবার যখন তুই পাটনায় আমাদের বাড়িতে গেলি তখন দশবছরের পুরানো তোশকের বিছানায় শুতে তোর খুব কষ্ট হয়েছিল। সেই জন্যে বোধ হয় তোর ঘুম আসতো না। তোর পাশে আমি তো ঘুমোতাম। একদিন হঠাৎ ঘুম ভেঙে গিয়ে দেখলাম, তুই জেগে আছিস। তখন বুঝতে পারিনি, ভেবেছিলাম, বিরহ-যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছিস। রাত্রে শ্যামলদার অনুপস্থিতিটা বেশী করে অনুভব করছিস।”

ফিক করে হেসে ফেললো দোলন। “আজকালকার মেয়ে তোরা, বড্ড পেকে গেছিস। বিয়ের আগে থেকেই বুঝতে পারিস বিরহ কাকে বলে।”

“দিদি তুই আবার হাস।” সুদর্শনা বলে।

“কেন বল তো ?” দোলন প্রশ্ন করে।

“তুই হাসলে গালে ভারি সুন্দর টোল পড়ে। শ্যামলদা ওটা নোটিশ করেনি ?”

“তোর শ্যামলদার আজকাল ওসব নজর করবার সময় নেই। অফিসে কত কাজ, কত দায়িত্ব !”

“সে বললে শুনছি না। আজই শ্যামলদাকে শাসন করছি। যত কাজের লোকই হও, বউয়ের গালে টোল পড়লে কেমন দেখায় তা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় দিতেই হবে।” সুদর্শনা হাসতে হাসতে নিজের মতামত জানিয়ে দিলো।

দিদি বললে, “ডানদিকের এই সুইচটা দেখে রাখ। এটা সকাল বেলায় টিপবি। তাহলে প্যান্ট্রি থেকে গোমেজ এসে তোকে বেড্-টী দিয়ে যাবে।

“আগে গোমেজ সকাল ছ'টায় চা করে দরজায় নক্ করতো। কিন্তু এখন এই নিয়ম করেছি। অনেক সময় সকালে বড় কুড়েমি লাগে। বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করে না।”

বোতামটা এখনই টিপে দিলো দোলন। গোমেজ এসে দরজায় নক্ করলে। দিদি বললে, "কাম ইন্।"

গোমেজ ভিতবে এসে সেলাম করলে।

দিদি পবিচয় কবিয়ে দিলো, "মেমসাহেব এখানে কিছু দিন থাকবেন। আমাব বোন।"

গোমেজ আবাব সেলাম কবলে।

দোলন জানতে চাইল, "টুটুল এখন কী খাবি? চা না কফি?"

"বাড়িতে আমবা তো চা ছাড়া কিছু খাই না দিদি, জানিস তো।"

"এখন তুই তো বাড়িতে নেই, দিদিব কাছে বেড়াতে এসেছিস। সুতবাং কফি খা। এসপ্রেসো কফি কবতে বলি। কিচেনে আমবা একটা এসপ্রেসো মেশিন বসিয়েছি। ওব গেস্টবা অনেকে এসপ্রেসো পছন্দ করে।"

"এসপ্রেসো।"

"কেন পাটনাতেও নিশ্চয় এসপ্রেসো কফিব দোকান হয়েছে।"

"হ্যাঁ, সোঁ সোঁ কবে বেল এঞ্জিনেব মতো শব্দ হয়, আব কফিটা ফেনায় ভবে ওঠে," সুদর্শনা বললে।

দোলন বললে, "তোব ঘবেব সঙ্গে অ্যাটাচড বাথ বয়েছে। ওখানে তোব তোয়ালে নতুন সাবান, টুথব্রাশ, পেস্ট, তেল, শ্যাম্পু, থোট গার্গল লোশন, ডেটল সব দেওয়া আছে। আব কাপড়চোপড় এই বিল্ট ইন ওয়াবড্রোবে রাখতে পাববি।"

একটু থেমে দোলন বললে "তোব যদি বাইবেব পৃথিবী দেখতে ইচ্ছে কবে, পূর্ব্ব-দক্ষিণেব পর্দাটা আলতোভাবে টেনে সবিয়ে দিবি। খুব ভাল ভিউ পাবি —সমস্ত কলকাতা শহবটাকেই একটা রূপকথাব দেশ মনে হবে তোব। আব যদি ভালো না লাগে, তাহলে আবাব পর্দা টেনে দিবি।"

সুদর্শনা দিদিব মুখেব দিকে তাকিয়ে থাকে। দিদি বললে, "এই পর্দার বঙটা আমাব তেমন ভাল লাগে না। যখন চয়েস কবেছিলুম, অন্য বকম ছিল। কিন্তু একবার ধোপাব-বাড়ি গিয়েই কেমন হয়ে গেল। এখনও তিন মাস সহ্য কবতে হবে। ম্যানেজাববা বছবে একবাব কবে পর্দা পালটাতে পাবে। ডিরেকটব হলে ওসব হাঙ্গামা নেই। যখন ইচ্ছে, বলে দিলেই হলো।"

দিদি আবও বললে, "এই ঘবটা মন্দ নয়। কিন্তু এয়াবকণ্ডিশন নেই। আমাদেব মাত্র একটা রুমে এয়াবকণ্ডিশন। ডিবেকটববা নিজেদেব বেড রুম, চিলড্রেনস রুম এবং গেস্ট রুম, সব এয়ারকণ্ডিশন কবাতে পাবে। এটা যেন

কেমন। ওর বন্ধু, মিস্টার সান্যালের ওয়াইফও সেদিন বলছিলেন, এটা কোম্পানির খাটো নজরের পরিচয়। ডিরেক্টরদের গেস্ট গেস্ট আর আমাদের গেস্ট যেন গেস্ট নয়।"

গোমেজ এবার কফি হাতে ঘরে ঢুকলো। দিদি বললে, "এখানে খাবি, না আমার ঘরটা দেখবি ?"

"চল, তোর ঘরটাও দেখা যাক," সুদর্শনা তার মতামত দেয়। তারপর যে-যার কাপ হাতে করে ওরা শ্যামলেন্দুর বেড-রুমে ঢুকলো। এই ঘরটা বেশ বড়। পাশের ঘরের সঙ্গে একটা লাগোয়া দরজা রয়েছে। দিদি বললে, "দেখছিস, এমনভাবে প্ল্যান করা যে পাশের ঘরটা বাচ্চাদের বেড-রুম হিসেবে ব্যবহার করা যায়।"

দোলন আরও বললে, "এই যে খাট দুটো দেখছিস, এর একটা ইতিহাস আছে। এ-ধরনের খাট এই ঘরে মানায় না। একটু উঁচুও বটে। তোর বিয়েতে বাবাকে নিচু খাট দিতে বলবি। আচ্ছা, তোকে বলতে হবে না, আমিই বাবাকে প্ল্যানটা দিয়ে দেবো।"

"বেশ তো নিজের ঘরদোর দেখাচ্ছিস, এর মধ্যে আবার বিয়ের কথা কেন ?" সুদর্শনা প্রতিবাদ করলো।

দোলন বললে, "যা বলছিলাম। তোর জামাইবাবুর এসব সেন্টিমেন্ট প্রবল। ও বললে, তোমার বাবার দেওয়া খাট, তার ওপর ফুলশয্যার স্মৃতিচিহ্ন, খাট পালটাতে হবে না।"

সুদর্শনা দিদির মুখের দিকে তাকায়। দিদি ব্যাখ্যা করলে, "এতে অবশ্য আমাদেরই লোকসান। কারণ খাটের খরচ দিত কোম্পানি।"

"শোবে তোমরা, আর খরচ দেবে কোম্পানি !" সুদর্শনা বিস্ময় প্রকাশ করে।

"আজ্ঞে, হ্যাঁ স্যার। এই নিয়ম! সারাদিন খাটিয়ে খাটিয়ে কভেনেন্টেড ম্যানেজারদের রক্ত নিংড়ে বার করে নিচ্ছ, আর রাত্রে তারা যাতে একটু নিশ্চিন্তে বউ ছেলে নিয়ে ঘুমোতে পারে তাঁর ব্যবস্থা করবে না ?"

"উঃ দিদি ! তুই খুব ভাল শ্রমিক নেতা হতে পারতিস, কীভাবে স্বামীর পক্ষে ওকালতী করছিস !"

দিদি হেসে বলে, "তুই জানিস না, টুটুল। এক-আধটা স্বার্থপর ডিরেক্টর আছে, যারা চায় শুধু তাদের জন্যই সব কিছু হোক—আর এরা ভেসে যাক। কভেনেন্টেডরা মুখের রক্ত তুলে কাজ করে যায়, অথচ মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে না।"

"তুই ভাল কথা মনে কবিয়ে দিলি, দিদি। আমার অনেকদিনের জানবাব ইচ্ছে এই কভেনেণ্টেড কথাব মানে।"

"আগে কথাটা শুনেছিস তাহলে।"

"খববেব কাগজে বিযেব বিজ্ঞাপনে প্রায়ই দেখি। আমাদেব ক্লাশফ্রেণ্ড ললিতা, সেও আমাকে জিজ্ঞেস কবেছিল। কাবণ ওব বিযেব বিজ্ঞাপনে মাসিমা কথাটা লিখে দিযেছেন। খুব দেখতে ভাল তো, তাই কভেনেণ্টেড পাত্র চাই। ললিতা ওর মাকে জিজ্ঞেস কবেছিল। মাসিমা বললে, ঠিক জানি না। তবে নিশ্চয খুব ভাল কিছু হবে, না হলে সুন্দরী মেযেব বাবা-মাবা কেন পযসা খবচ কবে ডাক্তাব, সি-এ, কভেনেণ্টেড পাত্র চায ?"

"তুই আব বসিকতা কবিস না টুটুল! ও শুনলে হাসতে হাসতে পাগল হযে যাবে," দোলন উত্তব দেয।

"তোকে সত্যি কথা বলছি, দিদি! ওই সি-এ ব্যাপাবটা জানি। কলেজে আমবা সি-আই-এব বিরুদ্ধে শ্লোগান দিযেছি। আমবা সি-আই-এ চাই না, কিন্তু সি-এব গলায মালা দিতে বাজী আছি। সি-আই-এ হলো মার্কিন গুপ্তচব: আব আইটা তুলে দিলেই চার্টার্ড অ্যাকাউনট্যাণ্ট, বব হবাব পক্ষে আদর্শ মেটিবিযাল। বিলিতী চার্টার্ড হলে তো কথাই নেই, দেশী চার্টাডও মন্দ নয। যদিও আমাদেব বন্ধু নন্দিতাব স্বামী সেদিন বললে দিশী সি-এ হলো 'শ্যাটার্ড অ্যাকাউনট্যাণ্ট'।"

দিদি বললে, "কভেনেণ্টেড মানে সোজা বাংলায মার্চেণ্ট অফিসেব ভেবি হাই অফিসাব। তোব জামাইবাবু কভেনেণ্টেড—হিন্দুস্থান পিটাবস-এ এবকম মাত্র সাত-আট জন আছে। কভেনেণ্ট মানে কনট্রাক্ট, তিন বছব কিংবা পাঁচ বছর অন্তর চুক্তি হয়। তোব জামাইবাবুব দলিলটা তোকে একদিন দেখাবো। ওটা লকারের মধ্যে রযেছে। বহু কিছু লেখা আছে তাতে, আমি সব কথাব মানে বুঝতে পারি না।"

দিদির খাটের কাছেই ছোট্ট টেবিলে চারটে ছবি দাঁড করানো রযেছে। শ্যামলদার বাবা-মা ও দোলনেব বাবা-মা। শ্যামলদার বাবাকে দেখেছে টুটুল। দানাপুব ইস্কুলে ইংরিজীর টিচাব ছিলেন। ইংরিজী গ্রামারের একখানা বই লিখে নাম করেছিলেন। আব শ্যামলদার মা অবশ্য আগেই দেহ রেখেছিলেন। শ্যামলদাব মা ছিলেন আবার দোলনের মায়ের বন্ধু, ছোটবেলায় ওঁরা বকুলফুল পাতিয়েছিলেন।

টেবিলের ওপর আরও দুটো ছবি মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রয়েছে। একটা

শ্যামলদার আর একটা দিদির। বিয়ের ক'দিন পরেই পাটনার স্টুডিওতে তোলা। সুদর্শনা না বলে পারলো না, "দিদি, তোর এই ছবিটা দেখলে আমার হাসি পায়। তুই তখন ঠিক আমার মতো গাঁইয়া ছিলি। তোকে হিন্দুস্থান পিটারস্-এর কভেনেণ্টেড অফিসারের বউ মনে হচ্ছে না। মাথায় ঘোমটা-টোমটা লাগিয়ে কী করেছিস ? আর শ্যামলদাকেও কেমন কেমন লাগছে।"

"মফস্বলের স্টুডিওতে তোলা ছবি আর কত ভাল হবে বল ? আমি ওকে কতবার বলেছি, চলো একদিন বোর্ন শেফার্ড, আমেদ আলী বা বম্বে ফটো থেকে একটা ছবি তুলিয়ে আনি। তোর জামাইবাবু রাজী হয় না। এই ছবিটার দিকে তাকিয়ে ও বলে, ছবি তুলতে দুটো জিনিস লাগে—ফটোগ্রাফার এবং যাদের ছবি তোলা হবে। ভাল ফটোগ্রাফার নিশ্চয় পাওয়া যাবে। কিন্তু আমাদের জীবনের দশ বছর আগের মুহূর্তটা তো কেউ ফিরিয়ে দিতে পারবে না।"

"ও বাবা! তোমরা এখনও চান্স পেলে প্রেম চালাও। শ্যামলদাকে পাকড়াও করতে হবে তো।"

দোলনের মুখ উজ্জল হয়ে উঠলো। কিন্তু পরমুহূর্তেই প্রতিবাদ করলো, "দূর। তোর শ্যামলদার মাথায় সব সময় অফিসের কথা ঘুরছে! দারাপুত্রপরিবার এখন মাইনর ব্যাপার হয়ে পড়েছে। বেচারার দোষও নেই। হিন্দুস্থান পিটারস্-এর কর্তারা যত পারছে ওর ঘাড়ে দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে যাচ্ছে।"

"দায়িত্ব দেবার মতো লোক বলেই তো দায়িত্ব দিচ্ছে," সুদর্শনা দিদিকে ভরসা দেবার চেষ্টা করে।

"সব বাজে কথা। সায়েবরা এই শনিবার এখন ঘোড়ার বই মুখস্থ করছে। আমাদের এই বাড়ির মিস্টার কুণু সান্যাল, মিস্টার হরগোবিন্দ চোপরা, মিস্টার পিল্লাই, মিস্টার নিগম, মিস্টার জৈন সবাই এতক্ষণে সস্ত্রীক রেসকোর্সে যাবার জন্যে তৈরি হয়ে পড়েছেন। ওখানে সায়েবদের সঙ্গে দেখা হবে। আর তোর জামাইবাবু শনিবারেও অফিসে গেল।"

"রেসে গেলে কী হয় দিদি ?"

"ভগবান জানেন। ছোট ছোট বই নিয়ে সবাই সমস্ত সপ্তাহ ধরে ঘোড়ার নাম মুখস্থ করে। আমাদের সেক্রেটারী সেনগুপ্ত সায়েব, উনি তোর শ্যামলদাকে খুব ভালবাসেন। উনি একদিন বললেন, 'করছেন কী চ্যাটার্জি। আমি কোনো কথা শুনতে চাই না, ঘোড়ার ক্লাবের মেম্বার হোন।' ও বলেছিল, 'ভাল লাগে না আমার।' সেনগুপ্ত সায়েব বলেছিলেন, 'সব জিনিস প্রথমে

ভাল লাগে না। তাছাড়া ভাল লাগবার জন্যে আমরা সব কাজ করি না। যে পুজোর যে মন্ত্র!' "

"তারপর?"

"এখন তোর শ্যামলদা মাঝে-মাঝে যায়, টার্ফ ক্লাবের মেম্বারও হয়েছে।"

সুদর্শনার মুখটা শুকিয়ে গেল। "তোর ভয় করে না দিদি?"

"ভয় করবে কেন?"

"এই যে শুনি ঘোড়ার মাঠে লোকে সর্বস্বান্ত হয়ে যায়।"

"ওসব বাংলা নভেল-নাটকে হয়। লিমিটের মধ্যে থাকলে চিন্তার কিছু নেই। ও তো পঞ্চাশ টাকার বেশী খেলে না, তাছাড়া এটা একটা স্পোর্টসও বটে। দেখিস না খবরের কাগজে খেলাধুলোব পাতায় ঘোড়দৌড়ের খবব থাকে। লাটসায়েবও একদিন মাঠে আসেন। খাবাপ জিনিস হলে লাটসায়েব নিশ্চয় যেতেন না।"

রাজার ছবিটাও দেখতে পাচ্ছে সুদর্শনা। দিদিকে বললে, "বাজা থাকলে বেশ মজা হতো। কতদিন যে দুষ্টু ছেলেটাকে দেখিনি।"

"গরমের ছুটিতে ইস্কুল থেকে ফিরবে, তখন যদি পারিস একবার চলে আসিস।"

"কলকাতায় তো অনেক ভাল ভাল ইস্কুল আছে। সেখানে কোথাও পড়ালে পারতিস। একটা মাত্র ছেলে, তাকেও যদি এই বয়স থেকে চোখের আড়াল করে রাখলি, তাহলে আর কী হলো?"

খানিকটা রাজী হয় দোলন। রাজার প্রসঙ্গ উঠতেই বেচারার চোখ ছলছল করে ওঠে। একটু ভেবে বললো, "মাঝে-মাঝে যে তা মনে হয় না, এমন নয়। আফটার অল, বাচ্চাদের এই বয়সটা বাবা-মায়ের কাছে সবচেযে আনন্দের। কোথায় যেন পড়েছিলাম, সন্তানকে ক্রমশঃ বড় হতে দেখার মতো মধুর অভিজ্ঞতা বাবা-মায়ের নেই। কিন্তু···"

"কিন্তু আবার কী?" সুদর্শনা জিজ্ঞেস করে।

"কমারসিয়াল একজিকিউটিভের বউ হলে অনেক কিছু ত্যাগ করার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হয়, বুঝলি টুটুল।"

"কেন? অফিসে কেউ বলে দিয়েছে ছেলেকে নিজের কাছে রাখতে পারবে না?"

"তা নয়। কিন্তু বদলির চাকরি। বিয়ের পর দিল্লীতে বদলি হলো, তারপর মাদ্রাজে। তারপর বোম্বাই। এখন অবশ্য হেড অফিস থেকে আবার ট্রান্সফার

হবার চান্স নেই। মাদ্রাজ থেকে আমরা বোম্বাই বদলি হয়েছিলাম চব্বিশ ঘণ্টার নোটিশে। তুই বিশ্বাস করবি, ডেভিডসন সায়েব ট্রাঙ্ককল করে বললেন, 'চ্যাটার্জি তোমাকে যদি বোম্বাইতে পোস্ট করি?' ও বললে, 'আনন্দের সঙ্গে, তাতে যদি কোম্পানির সুবিধে হয়। কবে থেকে যেতে হবে বলুন।' ডেভিডসন সায়েব বললেন, 'আমি তোমাকে কম সময় দেওয়ার জন্যে দুঃখিত। কিন্তু যদি বলি পরশুদিন থেকে।' ও রাজী। বললে, 'পরশুদিনই আমি বোম্বাই অফিসে রিপোর্ট করবো।' আমি তো শুনে রেগে লাল। বললুম, ইচ্ছে করলে, তুমি সায়েবের কাছে দশটা দিন সময় নিতে পারতে। সায়েব তোমাকে অত ভালবাসেন ' কিন্তু তোর জামাইবাবু কী উত্তর দিলো জানিস? বললে, 'দোলন, কখনও ভুলো না তুমি কমার্বসিয়াল একজিকিউটিভের বউ। আমরা হলাম মিলিটারির মতো। সব সময় মার্চিং অর্ডারের জন্যে রেডি।' "

সুদর্শনা কফির কাপটা নামিয়ে রেখে বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে দিদির দিকে। "বলিস কি! এইসব মানপত্তর বাঁধাবাঁধির ব্যাপারে তুই তো একেবারে ল্যাদাড়ু ছিলি।"

'সে দিদি আর নেই, মাকে বলিস। চাপে পড়ে, আর শাসনে-শাসনে দিদি এখন টিট হয়ে গিয়েছে। তোর শ্যামলদার আর কি, আমাকে ফেলে রেখেই পরের দিন বোম্বাই পালালো। আর আমি ওই গন্ধমাদন পর্বত প্যাকিং করিয়ে অফিসের গুদামে তুলে দিয়ে স্বামীসন্ধানে বোম্বাই গেলাম। ওখানে গিয়েও দেড়মাস তাজমহল হোটেলে থাকতে হলো। কোম্পানি অবশ্য হোটেলের খরচ দিয়েছিল। কিন্তু খরচটাই কি সব? হোটেলে থাকার কষ্টটা যে কি, তা সায়েবরা মোটেই বোঝে না।"

'জানিস দিদি, আমি কিন্তু কখনও হোটেলে থাকিনি।"

"থাকবি থাকবি। বয়স তো এখনও সবটাই পড়ে রয়েছে। তখন হোটেল সম্বন্ধে ঘেন্না ধরে যাবে। তখন বুঝবি, হোমই হলো সব কিছু। তা যা বলছিলাম, আমি ওকে সোজাসুজি জানিয়ে দিলুম আমি বউ, আমার ওপর যত পারো অত্যাচার করো। কিন্তু আমার রাজার ওপর এসব চলবে না। ওকে প্রথম সুযোগেই ভাল বোর্ডিং স্কুলে দিয়ে দাও।"

"মিসেস ডেভিডসন বলেছিলেন, বিলেতের নামকরা পাবলিক স্কুল রেনটনে ঢুকিয়ে দেবেন। কিন্তু আজকাল খোদার ওপর খোদগারি করবার জন্যে গভরমেণ্ট আছেন। ওঁরা বললেন, বিদেশী মুদ্রা দিতে পারবেন না। তার মানে সায়েবদের ছেলেগুলো শুধু মানুষ হোক আর আমাদের ছেলেগুলো

উচ্ছন্নে যাক। কিন্তু গভরমেণ্টের ওপর কে কথা বলবে? তাই ইণ্ডিয়ান পাবলিক স্কুলেই রাজাকে ি চ হলো।"

এসব শুনেও, রাজার জন্যে মন কেমন করছে সুদর্শনার। থাকলে বেশ মজা করা যেত। রাজা পাটনাতেই হয়েছিল। তখন দিদিকে নিয়ে সবার কি দুশ্চিন্তা। বাবা ও শ্যামলদা দুজনে হাসপাতালের বাইরে বসে আছে। তারপব রাজা এলো। ছোটবেলায় কি দুষ্টু ছিল। গালগুলো ছিল রাজভোগের মতো। সুদর্শনা বললে, "তোর মনে আছে দিদি, আমি রাজার গাল টিপে রাগিয়ে দিতাম। আর গাবু বলে ডাকলেই বেজায় চটে উঠতো।"

"এখন আর শ্রীমান সেই গাব্বু নেই। আমাকেই কথাবার্তা বলতে হয় সমীহ করে। বাবাকে প্রায়ই ইংরিজীতে চিঠি লেখে!"

"বলিস কী?"

"হ্যাঁরে, তোকে সব দেখাবো। এখন তুই একটু বিশ্রাম নিবি নাকি? সারারাত ট্রেনের ধকল সয়ে এসেছিস। বরং কিছু খেয়ে নে, তারপর স্নান সেরে ফেল। ততক্ষণে তোর জামাইবাবুও এসে পড়বে। সদ্যস্নাতা বিদ্যুৎশিখা বিদুষী শ্যালিকাকে দেখে জামাইবাবু বেশ খুশী হবে।"

"দাঁড়া, শ্যামলদা আসুক! তারপব তোব মজা দেখাচ্ছি," এই বলে সুদর্শনা নিজের ঘবে ঢুকে পড়লো।

ঘরের দরজা বন্ধ করে সুদর্শনা কিছুক্ষণের জন্য বিছানার ওপর বসলো। তারপর ব্যাগ খুলে নিজের কাপড়-চোপড় গুছিয়ে নিলো। স্নান সারবাব জন্যে এবার সে বাথরুমে ঢুকে পড়লো।

বাথরুমটা দেখেও অবাক হবার পালা। সাদা টালিগুলো যেন আজকেই বসানো হয়েছে! নতুনের মতো ঝক ঝক করছে। এক কোণে বাথটব রয়েছে। না-বাপু এই টবে বসে স্নান করা চলবে না। যদিও এক ইংরিজী সিনেমাতে নায়িকাকে বাথটবে স্নান করতে দেখেছে সুদর্শনা। ভদ্রমহিলা সাবান ঘষে ঘষে এত ফেনা করেছেন, যে ফেনায় সমস্ত দেহ ঢেকে গিয়েছে। সেই সময় হঠাৎ কীভাবে যেন বাথরুমের দরজা খুলে গেল। সে এক বিশ্রী ব্যাপার। হাঁদাগঙ্গারাম নায়ক সেই অবস্থায় ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। শেষে ওই ফেনাতেই শ্লীলতা রক্ষা হলো! ইংরিজী সিনেমার লোকগুলো মাথা খাটিয়ে খাটিয়ে সিনও বার করতে পারে। আইনও বাঁচলো অথচ যা দেখাবার তাও দেখানো গেল।

হাতে করে তোয়ালে ও সাবান এনেছিল সুদর্শনা। কিন্তু দিদি দেখছি আগে থেকেই সব ব্যবস্থা করে রেখেছে। গোটা চার-পাঁচেক বিভিন্ন আকারের তোয়ালে টাঙানো রয়েছে। একটা লোকের স্নান করতে এতগুলো তোয়ালে কী হয় রে বাবা। তাছাড়া দিদি সাজিয়ে দিয়েছে, নতুন সাবান, নতুন এগ্‌শ্যামপু, নতুন টুথ ব্রাশ, নতুন পেস্ট, নতুন জবাকুসুম। আরও গোটা কয়েক শিশি রয়েছে, যা সুদর্শনা কখনও দেখেনি—বাথ সল্ট, ডি অডারেণ্ট লোসন, ক্লিনসিং মিল্ক, আরও কত কী।

পাটনার বাড়ির দৃশ্যটা চোখের সামনে ভেসে উঠছে সুদর্শনার। ওদের বাড়িতে তবু বাথরুমের মেঝেটা মোজেক করা। মাথায় একটা পুরানো শাওয়ার আছে—তা প্রায়ই খারাপ হয়ে থাকে। একেবারে পাগলা শাওয়ার—কখনও হুড় হুড় করে জল পড়ে, কখনও একেবারেই নয়। কখনও খুলবার দু মিনিট পরে হঠাৎ বৃষ্টি শুরু করে দেয়। শ্যামলেন্দুদার বাড়ির কথা মনে পড়ছে সুদর্শনার। শ্যামলেন্দুদার বাবা খুব যত্ন করতেন বাড়িতে গেলে। ওখানে তো বাথরুমের মধ্যে একটা চৌবাচ্চা ছিল। সেখান থেকে ফুটো মগ নিয়ে মাথায় জল ঢালতে হতো। দরজার গায়ে কয়েকটা পেরেক পোঁতা ছিল—সেখানেই কাপড় রাখতে হতো। উঃ, পেরেকগুলোতে কাপড় রাখা বেশ শক্ত ছিল। একবার তো সুদর্শনার ফ্রক জলের মধ্যে পড়ে গিয়ে ভিজে গেল। দিদি তখন বিয়ের পর সবে শ্বশুরবাড়িতে এসেছে, সুদর্শনাও সঙ্গে করে অন্য কোনো ফ্রক আনেনি। দিদি লজ্জায় কিছু বলতে পারলে না।

কিন্তু শ্যামলেন্দুদার নজর এড়ায়নি। শ্যামলদা বলেছিলেন, "টুটুল, তোমার জামাটা যেন ভিজে মনে হচ্ছে।"

খুব লজ্জা পেয়ে গিয়েছিল টুটুল এবং দিদি। টুটুল বলেছিল, "এই মানে স্নান করতে গিয়ে একটু জল লেগে গিয়েছে।"

শ্যামলদা বুঝতে পেরেছিলেন। বলেছিলেন, "নিশ্চয় বাথরুমের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। ওই পেরেকগুলো কোনো কাজের নয়। ওখানে একটা র‍্যাক লাগাতে হবে!"

সেসব দিনের কথা শ্যামলদার মনে আছে কী? দিদির?

শ্যামলদাকে কিন্তু টুটুলের খুব ভাল লাগতো। সত্যি কথা বলতে কি, দিদিও শ্যামলদাকে অত ভালবাসত কিনা সন্দেহ। দিনরাত পড়াশোনার মধ্যে ডুবে থাকতেন শ্যামলদা। আর তাছাড়া শ্যামলদার মধ্যে একটা আদর্শ ছিল। পৃথিবীর মানুষদের সমস্যাগুলো জানবার এবং বোঝবার একটা আন্তরিক চেষ্টা

ছিল শ্যামলদার মধ্যে।

শ্যামলদা বলতেন,"এই বিরাট দেশের কোটি কোটি মানুষের দারিদ্র্য দিল্লীর কয়েকটা লোক ঘোচাতে পারবে না। দেশ তো কেবল রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেয়েছে—তার মানে তো ইউনিয়ন জ্যাকের বদলে তেরঙা পতাকা ওড়ানোর স্বাধীনতা। এরপরের সব কাজটাই পড়ে রয়েছে। কবে যে কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙবে কে জানে। কিন্তু সে এক যুগান্তরের দিন। আসমুদ্র হিমাচলের কোটি কোটি মানুষ জানতে চাইবে কেন আমাদের অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, স্বাস্থ্য নেই, সুখ নেই, স্বাচ্ছন্দ্য নেই। তারপর হয়তো শুরু হবে প্রলয় নাচন। সুতরাং ঘুম ভাঙার আগেই আমাদের অনেক কিছু করে ফেলতে হবে।"

টুটুল এবার কলটা খুলে দিয়ে টেলিফোন শাওয়ারটা হাতে তুলে নিলো। টেলিফোনের মতো ঝাবিটা যেদিকে ইচ্ছে বেঁকিয়ে দেওয়া যায়। মুখের ওপর বৃষ্টিধারার মতো জল ঝরছে, আর সুদর্শনা তখন অনেকদিন আগের সেই শ্যামলেন্দু চ্যাটার্জি, যে ইউনিভার্সিটিতে ইংরেজী পড়তো, তাকে দেখতে পাচ্ছে। শেক্সপীয়র থেকে কী সুন্দর আবৃত্তি করতো শ্যামলদা ওই ভারি গলায়।

শ্যামলেন্দুদা তাঁর মাকে সঙ্গে নিয়েই প্রথম টুটুলদের বাড়িতে এসেছিল। শ্যামলেন্দুদার মাকে দেখে টুটুলের মার কী আনন্দ। "কমলা যে। পথ ভুলে নাকি ভাই? কত দিন পরে এলি। অথচ থাকিস তো কয়েক পা দূরে।"

কমলা মাসিমা বলেছিলেন, "জানিস তো ভাই, ইস্কুল-মাস্টারের সংসার। সব কিছু সামলাতে সামলাতেই সূয্যি অস্ত যায়।"

টুটুলের মা বলেছিলেন, "সঙ্গে কাকে এনেছিস।"

"আমার সবেধন নীলমণি শ্যামলকে," কমলা মাসিমা উত্তর দিয়েছিলেন।

"ওমা কী লজ্জা! শ্যামল তো আমার ছেলের মতো, আর ওকেই বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছিস?"

"আমি বলেছিলাম ভিতরে আসতে। কিন্তু বেজায় লাজুক, বাইরে দাঁড়িয়ে রইলো," কমলা মাসিমা উত্তর দিয়েছিলেন।

"সে কি কথা! তুই আমার ছোটবেলার বকুলফুল বলে কথা, আর তোর ছেলে রইলো বাইরে দাঁড়িয়ে?" টুটুলের মা বলেছিলেন।

সামনে তখন দোলন আর টুটুল দুজন বসে খেলা করছিল। মা বললেন, "ওরে তোরা গিয়ে তোদের শ্যামলদাকে ভিতরে এনে বসা।"

দোলন লজ্জা পেয়েগিয়েছিল। টুটুলকে বলেছিল, "তুই ডেকে নিয়ে আয়।"

টুটুল রাজী হয়নি। "আহা আমার বুঝি লজ্জা লাগে না?"

অগত্যা দুই বোনে ঠিক করেছিল, "চল আমরা দুজনে একসঙ্গে গিয়ে কমলা মাসির ছেলেকে ডেকে আনি।"

টুটুল তখন আর কতটুকু? ফ্রক পরে। দোলন তখন শাড়ি পরছে। ওরা দুজনে একসঙ্গে ছুটে গিয়ে দেখলে, ওদের বাইরের ঘরের সামনের বারান্দায় মোটা চশমা-পরা, কোঁকড়া চুল এক ছোকরা উদাস হয়ে বাইরের ল্যাম্পপোস্টের দিকে তাকিয়ে আছে।

বাইরে তখন পড়ন্ত বিকেল, সোনালী সূর্যের শেষ রশ্মি 'পূর্বাচল'-এর ওপর সোনার জল মাখিয়ে দিচ্ছে। (বাড়িটার নাম বাবাই রেখেছিলেন পূর্বাচল।) এই আলোকেই বোধহয় কনে-দেখা-আলো বলে, টুটুল বড় হয়ে শুনেছে। সেদিন এই আলোতেই দিদি আর টুটুল শ্যামলদাকে প্রথম দেখেছিল।

দোলন এবার টুটুলকে আঙুলের খোঁচা দিয়ে বলেছিল, "তুই ডাক।"

টুটুল মোটেই রাজী হয়নি। ফিসফিস করে বলেছিল, "তুই বুড়োধাড়ি মেয়ে, তোর যদি সাহস না হয়, তাহলে আমার কী করে সাহস হবে?"

দিদি বেচারা বোনের কাছে প্রেস্টিজ নষ্ট হওয়ার ভয়ে, সাহস সঞ্চয় করে, আরও কাছে এগিয়ে গিয়ে বলেছিল, "শুনুন"।

শ্যামলদা নিশ্চয় তখন কবিতা-টবিতা লিখতো। না হলে, কেউ অমন হাঁদাগঙ্গারামের মতো আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে? দিদির কথাটা ঠিক যেন কানে গেল না। তাছাড়া দিদি বোধহয় ডেকেওছিল খুব মিহি স্বরে; একেই দিদির গলাটা নিচু। টুটুলের তখন রাগ হয়ে গিয়েছিল। শ্যামলদার খুব কাছে এগিয়ে গিয়ে বলেছিল, "শুনছেন?"

শ্যামলদা এবার সংবিৎ ফিরে পেয়ে ধড়মড় করে ওদের দিকে তাকিয়েছিল। "কিছু বলছো খুকী?"

"হ্যাঁ। আমার দিদি দোলন আপনাকে ডাকছে, শুনতে পাচ্ছেন না?"

শ্যামলদা এবার দিদির দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে এমন বোকার মতো চেয়েছিল যে টুটুল আজও ভুলতে পারেনি। দিদিও লজ্জা পেয়ে গিয়েছিল।

দিদি তাড়াতাড়ি বলেছিল, "আমি নয়, আমার মা আপনাকে ডাকছেন। আপনি কমলা মাসিমার ছেলে তো?"

তখন কে জানতো, খাল কেটে বাড়ির মধ্যে কুমীর ডেকে আনছে দিদি নিজে!

কমলা মাসিমা বলেছিলেন, "লজ্জা কি খোকা? তুই এখানে বোস।"

আর মাকে বলেছিলেন, "আশা, আমার ছেলেকে তুই অনেকদিন দেখিসনি।"

"হ্যাঁ, তোর ছেলে তো অনেক ডাগর হয়ে গিয়েছে। তোর আর কি ভাই, ছেলে তো মানুষ করে ফেললি। তারপর ঠ্যাঙের ওপর ঠ্যাঙ দিয়ে, ছেলের রোজগার আর বউ-এর সেবা খাবি।"

বেচারা কমলা মাসিমা। ছেলের রোজগার, বউ-এর সেবা কোনোটাই ভোগ করে যেতে পারলেন না।

টুটুলের মা জিজ্ঞেস করেছিলেন, "কমলা, তোর ছেলে এখন কী পড়ছে?"

কমলা মাসিমা উত্তর দিয়েছিলেন, "তা তোদের আশীর্বাদে, খোকা আমার পড়াশোনায় ভাল। এবারেই তো বি এ অনার্স পরীক্ষা দিয়েছিল, ইংরিজীতে ফার্স্ট হয়েছে।"

টুটুল নিজে, দিদি, মা সবাই একসঙ্গে চমকে উঠেছিল। শ্যামলদার আলোটা নেভানো ছিল, কমলা মাসিমা যেন সুইচ টিপে ১০০ পাওয়ারের বাতি জ্বালিয়ে দিলেন।

"ফার্স্ট হয়েছেন, ইংরিজীতে? ক'দিন আগেই তো কাগজে নাম বেরিয়েছিল আপনার?" দোলন বলেছিল।

কমলা মাসিমার ছেলে ঘাড় নেড়ে জানিয়েছিল, হ্যাঁ।

দিদি এমনিতে এত লাজুক। কিন্তু উত্তেজনার মাথায় তখন বলে বসেছিল, "দাঁড়ান, আপনি বলবেন না। আমি আপনার নাম বলে দিচ্ছি।"

টুটুল অবাক হয়ে দেখলে, দিদি সত্যি সত্যিই নামটা বলে দিলো। একটু থেমে দিদি বললে, "আপনার নাম নিশ্চই শ্যামলেন্দু চ্যাটার্জি।"

শ্যামলদা তখনও লজ্জা কাটিয়ে উঠতে পারেননি। কিন্তু কমলা মাসিমা বলেছিলেন, "ঠিক বলেছিস মা। কেমন করে বুঝলি?"

"বাঃ রে, আমাদের পাটনা উইমেন্স কলেজে যে আলোচনা হয়। আজকেই তো কমন রুমে কথা হচ্ছিলো। আপনি তো এম এ ক্লাসে খুব গম্ভীর হয়ে থাকেন। কারুর সঙ্গে কথা বলেন না।"

শ্যামলদা তখনও মুখ বন্ধ করেছিল। কমলা মাসিমা বলেছিলেন, "তাই নাকি? তুই ক্লাসে মুখ গোমড়া করে বসে থাকিস কেন, খোকা? এ তো ভাল কথা নয়। তা তোরা জানলি কি করে মা?"

দোলন তখন গল্পের ডিটেকটিভের মতো আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে। বলেছিল, "আপনি অসীমা ঝাকে চেনেন? আপনাদের সঙ্গে সেকেণ্ড ক্লাস

ফার্স্ট হয়েছে। অসীমাই বাড়িতে বলেছে। ওর বোন সীতা আমাদের সঙ্গে পড়ে। ওর কাছেই শুনেছি।"

টুটুলের মা অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "দেখ বাবা ভাল রেজাল্ট করার কি ফল! সবাই তোমাদের সম্বন্ধে আলোচনা করে। দোলনও তো ইংরিজীতে অনার্স পড়ছে, পাটনা উইমেন্স কলেজে। সামনের বছরে পরীক্ষা দেবে।"

তারপর চায়ের ব্যবস্থা করেছিলেন মা। বলেছিলেন, "তাহলে কমলা, সব ভাই বলা চলবে না, ঘরামির ঘর ফুটো। তোর কর্তা ইস্কুলে পরের ছেলে পড়াচ্ছেন, আবার নিজের ছেলেকেও মানুষ করছেন।"

কমলা মাসিমা ভারি সরল মানুষ ছিলেন। বললেন, "আমি ভাই মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ। ওসব বুঝি না। তবে ছেলে নিজের মনেই লেখাপড়া করে। আর উনি তো সারাক্ষণ ওঁর গ্রামারের বই নিয়ে পড়ে আছেন। সারা বছর ধরে গ্রামার সংশোধন করছেন, যাতে পরের বারে আরও ভাল করে ছাপা হয়। আর ভাই, আমার চেপে রাখা ঠিক হবে না, এবার আমাকে ছ' গাছা চুড়ি গড়িয়ে দিয়েছেন, গ্রামার নাকি ভাল বিক্রি হয়েছে।"

"তা কমলা, তুই নতুন চুড়ি পরে এলি না কেন? আমরা দেখতুম," টুটুলের মা বলেছিলেন।

"বুড়ো বয়সে আর চুড়ি পরে কাকে দেখাবো? রেখে দিচ্ছি যত্ন করে, যাতে পালিশ নষ্ট না হয়। ছেলের বউ হলে, ছ' গাছা চুড়ি দিয়ে মুখ দেখবো," কমলা মাসিমা উত্তর দিয়েছিলেন।

মা এবার শ্যামলদাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "এম এ ক্লাসে যখন ঢুকেছ, তখন ওঁর সঙ্গে নিশ্চয় আলাপ হয়েছে।" টুটুলের বাবা ইংরিজীর লেকচারার।

"উনি আমাদের শেক্সপীয়র পড়ান।" শ্যামলদা বলেছিল।

"হ্যাঁ বাবা, উনি তো শেক্সপীয়র শেক্সপীয়র করেই জীবনটা নষ্ট করলেন। ভদ্রলোক নিজে আর ক'খানা বই লিখেছিলেন? কিন্তু তার মানে-বইতে উনি লাইব্রেরি ভরিয়ে ফেলেছেন। আমাদের একটা মেয়েলী কথা আছে, বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচি।"

শ্যামলদা ও দোলন দুজনেই এক সঙ্গে হেসে উঠেছিল। দোলন তারপর মাকে সাবধান করে দিয়েছিল, "তুমি কার কাছে এসব বলছ? শেক্সপীয়র পেপারে শ্যামলদা রেকর্ড নম্বর পেয়েছে।"

"বাঃ, দিদি! শ্যামলবাবু এক মিনিটেই শ্যামলদা হয়ে গেল। ফার্স্ট হলে

অনেক লাভ দেখছি। ফার্স্ট না হলে জীবনে সুখ নেই।" টুটুল পাকা মেয়ের মতোই বলেছিল।

কমলা মাসিমা বললেন, "খোকা কিছুতেই আসতে চাচ্ছিলো না। আমি বললাম, আশা আমার আইবুড়ো বেলার বন্ধু। চল, বটুবাবুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। কখন কি কাজে লাগে।"

"তা বেশ করেছিস, কমলা। ছেলের জন্যে এবার যদি তোর সঙ্গে মাঝে-মাঝে দেখা হয়," মা আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। তারপর দোলনকে বলে ছিলেন, "তোর বাপের কথা শ্যামলদাকে বল।"

দোলন বলেছিল, "বাবা ভাগলপুরে গিয়েছেন। ওখানকার ইউনিভার্সিটির কী একটা কাজে। ফিরবেন গতকাল।"

খিল খিল করে হেসে উঠেছিল টুটুল। "গতকাল কিরে দিদি? গতকাল মানে তো ইয়েসটারডে। বল আসছে কাল—টু-মরো।"

লজ্জায় দোলনের কান লাল হয়ে উঠেছিল। 'কিছু মনে করবেন না।"

"জানেন শ্যামলদা, গতকাল আর আগামী কালের মধ্যে দিদি প্রায়ই গোলমাল করে ফেলে।"

শ্যামলদা বোধহয় দোলনের এই নিগ্রহ সহ্য করতে পারলে না। দোলনকে বাঁচাবার জন্যে টুটুলকে বললে, "তুমি যখন বড় হবে তখন দেখবে, একটা মতবাদ আছে গতকাল বা আগামীকাল বলে কিছুই নেই। যা কিছু আছে তা হলো বর্তমান—অর্থাৎ এই মুহূর্ত।"

দোলন বলেছিল, "বাবা ফিরলেই আপনার কথা বলা হবে।"

মা বলেছিলেন, "এ-বাড়ি তোমার নিজের মতো। যখন খুশী চলে আসবে।"

বাল্যসখীকে নিয়ে মা এবার রান্নাঘরে গিয়ে গল্প শুরু করেছিলেন। আর টুটুল ও দোলন নতুন অতিথিকে নিয়ে বাবার পড়ার ঘরে ঢুকেছিল। বড্ড পাকা ছিল টুটুল। শ্যামলদাকে সে ছাড়বে না। দিদিকে হেনস্তা করবার এমন সুবর্ণসুযোগ শ্যামলদা নষ্ট করে দিলো। পাকা পাকা কথায় টুটুল ঝগড়া করেছিল সেদিন। "আপনি কী বলবেন? বাবা নেই বলে পার পেয়ে যাবেন ভাবছেন? গতকাল এবং আগামীকাল যদি না থাকে, তাহলে আমাদের বইতে তিন রকম টেন্স আছে কেন—অতীত কাল, বর্তমান কাল, ভবিষ্যৎ কাল?"

"বা, সুন্দর বলেছ তুমি," শ্যামলদা হেসে উত্তর দিয়েছিল।

দোলন তখন শ্যামলদার দিকে তাকিয়ে ছিল। শ্যামলদাও দিদির দিকে তাকিয়ে বলেছিল, "আপনি ক্রিস্টোফার ফ্রাই পড়েছেন? উনি এক জায়গায়

বলছেন, বর্তমান বলেই কিছু নেই। আসলে, বর্তমান হলো অতীত এবং ভবিষ্যতের মধ্যে একটা বিন্দুমাত্র।"

শ্যামলদা তখন ছিলেন একটা রিয়েল ইনটেলেকচুয়াল। বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি ছিল ক্ষুরের মতো। সাধে কি আর বাবা শ্যামলেন্দু বলতে অজ্ঞান হতেন। বাবা বলতেন, "ভাল ইংরেজী জানলেই শেক্সপীয়রকে বোঝা যায় না। শেক্সপীয়রের ভিতরে ঢুকতে গেলে ভাল মানুষ হতে হয়। নিজের অন্তরে সোনা থাকলে তবে শেক্সপীয়রের খনি থেকে সোনা তোলা যায়। এবং সেই সোনা ঠিক মতো তুলতে পারলে, পৃথিবীতে মানুষ আর নাবালক থাকবে না। আমি বলে রাখলাম. শ্যামলেন্দু এই কাজ করতে পারবে, তোমরা দেখে নিও।"

দিদির এবং শ্যামলদার এসব কথা মনে আছে? কে জানে! শাওয়ারটা বন্ধ করতে করতে টুটুল ভাবলো। দিদির রাখা টাওয়েলটার কী সাইজ, বাবা—ঠিক যেন একখানা শাড়ি।

এবার দরজায় টোকা পড়লো। "টুটুল আমি দিদি বলছি। তুই এখন নিজের কাপড় পরিস না। আমার কাপড় একটা এখানে রেখে গেলাম।"

দিদির দেওয়া কাপড়টা পরেই সুদর্শনা ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। দোলন বললে, "তুই আমার ঘরে ড্রেসিং টেবিলে চুল আঁচড়ে নে।"

"শ্যামলদা এসে গিয়েছে?"

"হ্যাঁ", দোলন উত্তর দেয়।

শ্যালমলেন্দু প্যাণ্ট পরেই নিজের বিছানায় চিৎপটাং হয়ে শুয়ে পড়েছিল। দোলন বললে, "তুমি বাইরে গিয়ে বোসো। টুটুল মেক-আপ করবে।"

"সদ্যস্নাতা শ্যালিকার কেশচর্চা অবলোকনের সুযোগ থেকে আমাকে বঞ্চিত করবে?" শ্যামলেন্দু রসিকতা করলে।

"আজকাল আপনি বাজে বকছেন, শ্যামলদা," হেসে উত্তর দিয়েছিল সুদর্শনা।

"যাই বল, আমি ভাবছি সেই অতীতের টুটুলের কথা, যার নাক দিয়ে সর্দি গড়াতো। 'কোনো কালে ছিলে কিগো পিলেরোগা কাঁদুনে বালিকা হে সর্বদাহাসিনী শ্যালিকা?' "

"আঃ শ্যামলদা!" সুদর্শনা কপট রাগ দেখায়।

"বেশ অতীতের কথা তুলবো না। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বলি:

চাহিয়া তোমার পানে অচঞ্চল রহে আঁখিতারা
ভায়রা ভায়ের জন্য ভাবি ভাবি চিত্ত আত্মহারা
বহে অশ্রুধারা।"

দোলন বললে, "কেন বেচারাকে রাগাচ্ছো ?"

চিরুনিটা হাতে নিয়ে আয়নার সামনে বসে সুদর্শনা উত্তর দিলো, "আপনিই না একদিন বলেছিলেন, অতীতও নেই ভবিষ্যৎও নেই। আছে শুধু বর্তমান।"

"আমি বলেছিলাম ? কবে ?" শ্যামলেন্দু অবাক হয়ে যায়।

"আপনি যে মিনিস্টারদের মতো হয়ে গেলেন শ্যামলদা। কোথায় কী বলে আসেন মনে থাকে না।"

দিদির দিকে তাকিয়ে সুদর্শনা জিজ্ঞেস করলে, "তোর মনে পড়ছে ?"

অতীতের গর্ভে ডুব দিয়ে প্রথম দিনের স্মৃতিরত্ন খুঁজে পেলো দোলন। মুখটা হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

"কবে বলেছিলাম ?" শ্যামলেন্দু জানতে চাইলো।

"সেদিন প্রাণের দায়ে কথাটা বলেছিলেন শ্যামলদা। তখন দিদিকে খুশী করাটা আপনার কাছে জীবন-মরণ সমস্যা ছিল। এখন নেই, তাই বেমালুম অস্বীকার করছেন ?"

সুদর্শনার উত্তর শুনে দোলন ও শ্যামলেন্দু এবার এক সঙ্গে হেসে উঠলো। বহুদিন আগেকার দৃশ্যটা মনে পড়ে গিয়ে দুজনেই খুশীতে ভরপুর হয়ে উঠলো।

দিদির স্নান সারা হয়ে গিয়েছিল। শ্যামলেন্দুও এবার বাথরুমে ঢুকে পড়ল। সুদর্শনা জিজ্ঞেস করেছিল, "একটা ঘরে দুটো বাথরুম কেন দিদি ?"

"এইটেই তো লেটেস্ট। স্বামী এবং স্ত্রীর আলাদা বাথরুম। ওঁর অফিসের মেমসায়েবরা বলেন, 'এক সঙ্গে বাস করছি বলে এক বাথরুমে শেয়ার করতে হবে এটা ভাবা যায় না। কোনদিন হয়তো বলে বসবে একই তোয়ালেতে দুজন স্নান করো।' তাই এখানকার সব ফ্ল্যাটে বড় বেডরুমের সঙ্গে দুটো কলঘর—হিজ বাথরুম এবং হার বাথরুম।"

সুদর্শনা বলেছিল, "তোদের যতগুলো কলঘর আছে তাতে বাড়িতে ত্রিশজন লোক থাকলেও স্নানের অসুবিধে হবে না।"

"সে-উপায় নেই রে", দোলন দুঃখ করে বলে। "সায়েবদের নিয়ম-কানুনও অদ্ভুত।"

"মানে ?" সুদর্শনা প্রশ্ন করে।

"স্ত্রী এবং ছেলেপুলে ছাড়া কাউকে পাকাপাকিভাবে রাখা চলবে না এই ফ্ল্যাটে।"

"বলিস কি দিদি ?"

"সত্যি বলছি, টুটুল। নিজের মা-বাবাকেও নয়। মা-বাবা তো ফ্যামিলির

অংশ নয়," দোলন বলে।

"তাহলে মা-বাবা কি ফ্যামিলির খোসা?" টুটুল জিজ্ঞেস করে।

"অনেক মার্চেন্ট অফিসের নিয়মই তাই।"

"কেউ কিছু প্রতিবাদ করে না দিদি?" টুটুল জিজ্ঞেস করে।

"প্রতিবাদ করবে কী? অনেকে তো খুশী হয়। গিন্নীরা বলে বেড়ায়, আমাদের কোম্পানি এত স্ট্রিক্‌ট যে ওর মা-বাবাকে ফ্ল্যাটে থাকবার পারমিশন দেয় না।"

টুটুল মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। আর দিদি বলে, "আমাদের চোপরা সাহেব, সাততলায় থাকেন। উনি তো নিজের বাবাকে স্রেফ বলে দিলেন, কোম্পানির মানা আছে, এখানে থাকা চলবে না! বুড়ো বাবা বেচারা ভবানী-পুরে একটা আধা-বস্তিতে থাকেন। মাঝে-মাঝে গিন্নীর তৈরি আচার নাতি-নাতনীদের দিতে আসেন।"

চুপ করে থাকে টুটুল। আর দোলন বলে, "এইসব শুনলে তোর শ্যামলদা ভয়ঙ্কর রেগে যায়। ওর চোখ লাল হয়ে উঠে। ও বলে, বাবা-মা বেঁচে থাকলে একটা হট্টগোল বাধাতাম। দেখতাম কার সাধ্য বাধা দেয়।"

টুটুল চুপ করে থাকে। দোলন বলে, "এখানে আরও সব নিয়ম আছে। ভারি জিনিস থাকলে চাকরদের লিফট ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না। চাকরদের কোয়ার্টারে মেয়ে থাকবে না। আমাদের গোমেজ বেচারার বউ অসুস্থ, তাই হাসপাতালে দেখবার জন্যে কলকাতায় আনিয়েছিল। তিনদিন পরেই প্রপার্টি অফিসারের টেলিফোন। আপনার স্টাফ তার কোয়ার্টারে মেয়েমানুষ রেখেছে। আমি বললুম, 'ব্যাপারটা কী।' কিন্তু ভদ্রলোক খুশী হলেন না। বললেন, 'এতে ডিসিপ্লিন নষ্ট হয়।' বললুম, 'নিজের স্ত্রীকে নিজের ঘরে রাখার মধ্যে অপরাধ কী?' উনি উত্তর দিলেন, 'মিসেস চ্যাটার্জি এই চাকর ক্লাসটাকে আপনারা এখনও চিনে উঠতে পারেননি। কোনটা বউ, আর কোনটা বউ নয়, আমি বা দারোয়ানরা কী করে বুঝবো?"

"তুই বললি না কেন, কোনটা বিয়ে-করা বউ নয়, সায়েবদের বেলায় কী-ভাবে বোঝেন?"

"আমি আর হাঙ্গামা বাড়াইনি, ভাই। আর ফরচুনেটলি গোমেজের বউ-এর চিকিৎসাও সেদিন শেষ হয়ে গেল," দোলন বললে।

শ্যামলেন্দুর স্নান শেষ হয়ে গিয়েছে। তিনজনে একসঙ্গেই খেতে বসলো। শ্যামলেন্দু বললে, "মাকে নিয়ে এলে না কেন?"

"বাবাকে দেখবে কে ?" সুদর্শনা উত্তর দেয়। "তাছাড়া, বাবা আজকাল এমন হয়ে গিয়েছেন যে, মাকে ছেড়ে একদম থাকতে পারেন না।"

"মা-বাবা দুজনকেই ধরে নিয়ে এলে পারতিস," দোলন বললেঁ।

"তাহলে আমার অবস্থাটা কী হতো ? মা তোমার সঙ্গে আলু-পটলের হিসেব নিয়ে বসতো, আর বাবা তাঁর প্রিয় জামাইয়ের সঙ্গে শেক্সপীয়র নিয়ে আলোচনায় বুঁদ হয়ে থাকতেন। (শেক্সপীয়র ছাড়া আরও অনেক পীর যে পৃথিবীতে রয়েছেন তা বাবার খেয়ালই থাকে না।) মাঝখান থেকে আমার দিকে তোরা নজরই দিতিস না।"

টুটুলের কথায় হেসে ফেললে শ্যামলেন্দু। তারপর জিজ্ঞেস করলে, "পরীক্ষার রেজাল্ট কেমন আশা করছো ?"

"আপনি যা করে এসেছেন, তা তো আর পারবো না। ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হবার কোনো চান্স নেই।"

"আমাদের সময় পড়াশোনা অনেক সহজ ছিল, টুটুল।"

"অত জানি না, তবে আপনি বাবা-মার অভ্যাস খারাপ করে দিয়েছেন। ফার্স্ট না হলে ওঁদের মন ভরে না।"

"পরীক্ষার পরে কী ?" শ্যামলেন্দু প্রশ্ন করে।

"দিন না আপনাদের হিন্দুস্থান পিটারস্-এ একটা চাকরি। শহরে শহরে ঘুরে ঘুরে পিটারস্ ফ্যান আর পিটারস্ ল্যাম্প বিক্রি করবো।"

"এইরকম সুন্দরীরা আমাদের ফ্যান ফিরি করলে, আমরা গুলমার্গেও ফ্যান বিক্রি করতে পারবো !"

দোলন এবার বোনকে বললে, "ওই সব বাজে কথা ছাড়। মেয়েদের চাকরি-বাকরিটাই সবচেয়ে বড় কথা নয়।"

"এসব কি প্রতিক্রিয়াশীল কথাবার্তা বলছিস, দিদি ?" সুদর্শনা খাওয়া বন্ধ রেখে দিদির মুখের দিকে তাকিয়ে হাসে।

শ্যামলেন্দু বললে, "মেয়েদের এই একটা অসুবিধে। এম এ পাস করার পরও বিয়ে পরীক্ষায় বসতে হয় !"

ঘড়ির দিকে তাকালো দোলন। "তুমি বরং দেরি কোরো না। একবার টার্ফ ক্লাব থেকে ঘুরে এসো।"

"না-গেলে কেমন হয় ?" শ্যামলেন্দু জিজ্ঞেস করে।

"আজকে সমস্ত ডিরেকটররা নিশ্চয় যাবেন ?" দোলন জিজ্ঞেস করে।

"হ্যাঁ, দিল্লী থেকে মিস্টার মূর্তিও এসেছেন। নিশ্চয় মাঠে যাবেন।"

"তুমি তাহলে একবার ঘুরে এসো," আবার ঘড়ির দিকে তাকালে দোলন। "রুণু সান্যাল এতক্ষণে নিশ্চয় বেরিয়ে গিয়েছে।"

"রুণুর ঘোড়ার নেশা আছে, আমার নেই," শ্যামলেন্দু এবার শ্যালিকাকে জানায়। কিন্তু স্ত্রীর ইচ্ছা অনুযায়ী তাকে উঠতে হয়।

বিলেতের মতো কলকাতার রেসও একটা সামাজিক ব্যাপার। বুশ শার্ট এখানে অচল। তাই সায়েবদের মতো ঘন নীল রঙের স্যুট এবং ম্যাচিং টাই পরে ফেললো শ্যামলেন্দু। তারপর চোখে কালো চশমা লাগিয়ে এবং বাইনোকুলারটা কাঁধে চড়িয়ে শ্যামলেন্দু বেরিয়ে পড়লো।

স্বামীকে বেস্ট অফ লাক জানিয়ে দোলন দরজা বন্ধ করে দিলো। তারপর একটু সোফাতে বসলো। এবং বোনকে জিজ্ঞেস করলে, "কোথায় শুবি তুই? আমার ঘরে চলে আয়, শুয়ে শুয়ে গল্প করা যাবে।"

এয়ারকণ্ডিশনারটা চালু করে দিয়ে দুই বোন পাশাপাশি বসলো। দেওয়ালের পর্দাগুলো টানা রয়েছে। ঘরের মধ্যে তাই প্রায় রাত্রের অন্ধকার। এয়ারকুলার মেশিনের একটানা গোঙানি কিছুক্ষণ পরে গা-সওয়া হয়ে যায়।

হংকং স্লিপারটা কার্পেটের ওপর রেখে, বিছানার ওপর পা মুড়ে বসলো দোলন। একটা ক্রিমের জার হাতে নিয়ে বললে, "মুখে একটু মাখবি নাকি? খুব ভাল ক্রিম, প্যারিসে তৈরি। ইমপোর্ট বন্ধ, নিউ মার্কেটের রহিম অনেক কষ্ট করে আনিয়ে দেয়। নামটা যদিও বিশ্রী।"

"কী নাম দিদি?"

"এই নে, দেখ না—বুর্জোয়া।"

একটু ক্রিম নিয়ে নিজের গালে ঘষতে ঘষতে দোলন বললে, "কি জানি ভাই, নামটা শুনলে আজকাল আমার ভয় করে। কলকাতার যা ব্যাপার-স্যাপার! যাকে-তাকে ক্যাপিটালিস্ট, বুর্জোয়া এইসব মার্কা করে দিচ্ছে।"

ক্রিমটা সযত্নে ঘষতে ঘষতে দিদি বললে, "তোরও তো আমার মতো ড্রাই স্কিন, সুতরাং বুর্জোয়া নাম্বার ওয়ান লাগবে। যাদের অয়েলি স্কিন, তাদের জন্যে বুর্জোয়া নাম্বার টু। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, কলকাতায় লোকেরা আজকাল কিছুই বোঝে না। কেউ সারাদিন খাটছে, রাত্রে বসেও অফিসের কথা চিন্তা করছে, অফিসের চিন্তায় ঘুম নেই, তার জন্যে যদি দুটো পয়সা বেশী পায়, অমনি সে ক্যাপিটালিস্ট হয়ে গেল। এটা কী ধরনের কথা? তুমিও চেষ্টা করো, তুমিও রোজগার করো। এই যে তোর শ্যামলদা, তুই তো জানিস যখন আমাকে বিয়ে করলে, কলেজের প্রফেসরিতে তখন ক'টাকা পেত?

আর এখন নিজের চেষ্টায় পাঁচ হাজার একশ' টাকা মাইনে পাচ্ছে। সায়েবরা তো মুখ দেখে এই টাকা দেয় না, কাজ পায় বলেই দেয়।"

সুদর্শনা দিদির মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। দিদি বললে, "ক্রিমটা খুব আলতো ভাবে মাখবি—না হলে মাসলগুলো মিসেস সান্যালের মতো চোয়াড়ে হয়ে যাবে। আর আঙুলটা ঘোরাবি ক্লক-ওয়াইজ, ঘড়ির কাঁটা যে দিকে ঘোরে।"

দিদির দেখাদেখি টুটুলও গালের ওপর আঙুল ঘোরাচ্ছে। দিদি বললে, "কীরে, খুব ঠাণ্ডা লাগছে না? মনে হচ্ছে না, কে যেন মুখে বরফ স্প্রে করছে। এটা হলো ইভ-২২'এর এফেক্ট। ইভ-২২ একটা স্পেশাল কেমিক্যাল যা বুর্জোয়া ছাড়া কেউ ব্যবহার করতে পারে না।"

এবার ড্রয়ার থেকে দুটো এবজরভ্যাণ্ট পেপার টাওয়েল বার করলে দোলন। একটা বোনকে দিয়ে, আর একটা নিজের গালে চেপে ধরলে। "খুব আলতোভাবে, মোটেই না-ঘষে, কেবল আস্তে আস্তে প্যাট কর।"

দোলন বললে, "মাঝে-মাঝে জানিস, অত্যন্ত বিশ্রী লাগে। দেওয়ালের গায়ে পোস্টার মেরেছে: ধনীর চামড়া দিয়ে গরীবের পায়ের জুতো তৈরি হবে, সেদিন বেশী দূর নয়। আমার খুব খারাপ লাগে ভাই। হোল ইণ্ডিয়াতে ক'টা বড়লোক আছে? তাদের পিঠের চামড়ায় ক'খানা জুতো তৈরি হবে? প্রত্যেকে তাতে এক জোড়া জুতো পাবে না। আর তাছাড়া, সেদিন মিস্টার সেন এসেছিলেন, বাটানগরে ওঁর যাতায়াত আছে। উনি বললেন, মানুষের চামড়া ট্যান করার অনেক হাঙ্গামা, তাতে জুতোও টেকসই হবে বলে মনে হয় না।"

"তুই আজকাল খুব ভাবিস, তাই না দিদি?" টুটুল জিজ্ঞেস করে।

"হাতের গোড়ায় কিছুই নেই। ও সারাদিন কাজে ডুবে আছে। আমি আর কি করি? ফ্যাশনের ম্যাগাজিনগুলো পড়ি। নিউ মার্কেটে যাই, দশতলার জানলা থেকে কলকাতাকে দেখি, রাজাকে চিঠি লিখি, বাবা-মা, তোর কথা ভাবি। এইভাবেই একদিন বুড়ো হয়ে যাবো।"

"নে শুয়ে পড়," দিদি এবার ফ্ল্যাট হয়ে শুয়ে পড়লো।

টুটুলও দিদির দেখাদেখি চুল এলিয়ে শুয়ে পড়লো শ্যামলেন্দুর বিছানায়।

দিদি বললে, "যদি তোর শীত-শীত লাগে তাহলে পায়ের গোড়ায় চাদরটা টেনে নিস।"

"দিদি, তোর এখানে বাবা-মা এলে খুব আনন্দ পেতেন। মা রোজ একবার অন্তত জামাই-এর গুণগান করে।"

দোলন বলে, "একবার অন্তত পাকড়াও করে ধরে নিয়ে আসতে হবে।"

"মা আমাকে কি বলে জানিস? নিজে বড় হওয়া থেকে বড়লোকের বউ হওয়ার মধ্যে সুখ অনেক বেশী। আমি মার সঙ্গে তর্ক করি। তাহলে, এই যে আজকাল মেয়েরা বৈজ্ঞানিক হচ্ছে, রাষ্ট্রদূত হচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী হচ্ছে, বিখ্যাত লেখিকা হচ্ছে, এসব বৃথা?"

"মা তোকে কী বলে?" দোলন জিজ্ঞেস করে।

"মা বলে, আরও বয়স হোক তখন বুঝবি। সাফল্য আর সুখ এক জিনিস নয়।"

দোলন বললে, "আমি ভাই, আজকাল খুব গভীর কোনো চিন্তা করতে পারি না। কোনো বড় বইও পড়তে পারি না, হাঁফ ধরে যায়। আমি তো তোর মতো লেখাপড়া করলাম না। আমার এখন একটামাত্র চিন্তা—ও কবে ডিরেকটর হবে। তারপর আছে ছেলের চিন্তা।"

"দিদি, তুই এখান থেকে এম এ পরীক্ষায় বসলে পারিস। দু বছর তো পড়েছিলি।"

"দূর, শিং ভেঙে আর বাছুরের দলে ঢোকা যায় না। তাছাড়া তোকে বললাম না, আমি এখন ম্যাগাজিন আর ডিটেকটিভ বই ছাড়া কিছুই পড়তে পারি না। ও-বেচারার তাই অবস্থা হয়েছে।"

"ওটা বাজে কথা দিদি। পড়াশোনায় তুই তো খারাপ ছিলি না। শুধু বিয়ের জন্যেই তোর পরীক্ষা দেওয়া হলো না।"

"কপালে লেখাপড়া ছিল না। তোর শ্যামলদাই সব নষ্ট করে দিলো।"

"দিদি, তোর সেইসব দিনের কথা মনে পড়ে? শ্যামলদা আসতো বাবার কাছে, আর তুই দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ওদের আলোচনা শুনতিস। তারপর তুই নিজেই শ্যামলদার অনার্সের খাতাগুলো চেয়ে নিয়েছিলি। তখন বড় সিরিয়াস ছিল শ্যামলদা, তাই না?"

"যা কিছু করে, তাতেই ও সিরিয়াস," দোলন বলে। "এই যে চাকরি। কত লোক তো গায়ে হাওয়া লাগিয়ে, গল্‌ফ, ককটেল, টার্ফ ক্লাব করে চাকরি সামলাচ্ছে। ও কিন্তু তা পারে না। আমি যখন রেগে যাই, তখন ও বলে আমাদের তো ওই গতরটুকুই সম্বল, দোলন। গতর খাটিয়েই তো আমাদের অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হবে।"

"প্রেমে এবং কর্মে শ্যামলদার সমান নিষ্ঠা, তুই বলছিস!"

"আঃ, দিদির সঙ্গে ফচকেমি," দোলন হাসে।

"আচ্ছা দিদি, তুই তো ছিলি মুখচোরা। আর শ্যামলদা ছিল গম্ভীর। কেমন করে তোরা প্রেম করলি ?"

"আমার ওকে সেই প্রথম যেদিন দেখেছিলাম সেদিনই ভাল লেগে গিয়েছিল।"

"প্রথম বছরটা তোমরা লুকোচুরি খেলেছিলে। তারপর তুই যেমনি বি এ পাস করে ইউনিভার্সিটিতে এসে জুটলি, খুব সুবিধে হয়ে গেল," সুদর্শনা মন্তব্য করে।

"তুই বিশ্বাস করবি না টুটুল, তোর শ্যামলদা, পড়াশোনার ব্যাপারে বড্ড সিরিয়াস ছিল। দেখা হলে গজর গজর করে শুধু শেক্সপীয়র, শ' আর হার্ডির কথাই বলতো।"

"অন্য কিছুই বলতো না ?" সুদর্শনা মুখ টিপে হেসে দিদিকে জেরা করে।

"এই তোর গা ছুঁয়ে বলছি। গজর গজর করে শেক্সপীয়র এবং বানার্ড শ' সম্পর্কে আলোচনা করতো। আর উপদেশ দিত, মন দিয়ে লেখাপড়া করুন, পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করা মোটেই শক্ত নয়। তাছাড়া আপনার কত সুবিধে। বাড়িতে অমন লাইব্রেরি রয়েছে। আমি ভয়ে সিঁটকে থাকতাম, সাহস করে বলতেও পারতাম না পড়াশোনা আমার ভাল লাগে না।"

"তাহলে বলতে চাস, প্রেমটা আপনা-আপনিই হয়ে গেল ?" টুটুল এবার বোনকে বিপদে ফেলবার চেষ্টা করলে।

দোলন ছোটমেয়ের মতো বললে, "প্রায় তাই। তবে মিথ্যে কথা কেন বলবো, মাঝে-মাঝে কেমন ওই মোটা চশমার মধ্য দিয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাতো।"

"তুই বাবা, চালাক মেয়ে, তাতেই সন্তুষ্ট। বুঝেছিলি, ভাল আমটিই পেড়ে খাবার সুযোগ এসেছে।"

"দেখ, টুটুল, তুই আমাকে রাগাস না বলছি। তখন কে জানতো তোর শ্যামলদা একদিন ব্লু হ্যাভেনে আসবে ? তখন তো আশ্রয় বলতে কদমকুয়ার ভাঁড়া বাড়িটা। আর জানতাম, ভালভাবে পাস করলে অন্তত একটা কলেজে চাকরি পাবে। আমার ভাল লাগতো ওর চোখ দুটো, আর ওর ব্রাইট কথাবার্তা বিশেষ করে বাবার সঙ্গে যখন তর্ক করতো।"

দিদির অবস্থা দেখে টুটুল মিটমিট করে হাসছে। শুয়ে শুয়ে আড়চোখে দিদি তা লক্ষ্য করলে। তারপর বললে, "এই টুটুল ! কিছুদিন আগে কাগজে দিয়েছিল, হ্যারল্ড উইলসন তখন ইংলণ্ডের প্রাইম মিনিস্টার। রিপোর্টাররা

ওঁর বউকে জিজ্ঞেস করলে, প্রধানমন্ত্রী সম্বন্ধে আপনার মতামত কী? মিসেস উইলসন গম্ভীরভাবে বললেন, 'ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের শুধু মনে করিয়ে দিতে চাই, ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রীকে আমি কোনোদিন বিয়ে করতে চাইনি। আমি যাঁকে বিয়ে করেছিলাম, তিনি অক্সফোর্ডের একজন শিক্ষক।' আমাকেও যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, সোজা বলবো, আমি হিন্দুস্থান পিটারস্-এর কভেনেন্টেড অফিসারকে বিয়ে করিনি, আমি বিয়ে করেছিলাম পাটনা কলেজের এক ছোকরা অধ্যাপককে, যার মাইনে ছিল ১৯০ টাকা, যে সাইকেলে করে কলেজে যেত এবং সাইকেলে ফিরতো।"

টুটুল উত্তর দিচ্ছে না কেন? ঘুমিয়ে পড়লো নাকি? পাশ ফিরে দোলন দেখলো টুটুল সত্যি ঘুমিয়ে পড়েছে। হাতটা ওর মুখের ওপর এসে পড়েছে। টুটুলকে ভারি মিষ্টি দেখাচ্ছে। আহা বেচারা সারারাত থার্ড ক্লাস ট্রেনের ধকল সয়ে এসেছে, একটু ঘুমোক।

কিন্তু দোলনের চোখে ঘুম আসছে না। হিন্দুস্থান পিটারস্-এর কর্তাব্যক্তিরা এতক্ষণ রেসকোর্সে ঘোড়ার পিছনে সব কিছু ঢালছেন। মিসেস ফেরিস তাঁর হাতির দাঁতের কৌটো থেকে নস্যি নিচ্ছেন। মেয়েদের সিগারেটটা এখন চোখ-সওয়া হয়ে গিয়েছে, কিন্তু নস্যিটা নয়! অথচ বড় সায়েবের বউ-এর দেখাদেখি ব্লু হ্যাভেনের অনেক বউই নস্যি কৌটোর ব্যবস্থা করেছে। মিসেস ফেরিসকে কেউ জিজ্ঞেস করতে সাহস করেনি। কিন্তু গোপনে গোয়েন্দাগিরি করে, মিসেস সান্যাল বার করে ফেলেছেন, কোথা থেকে কি নস্যি কেনেন মিসেস ফেরিস।

তবে দোলন নস্যি নিতে কিছুতেই পারবে না। সে কথা দোলন সেদিন শ্যামলেন্দুকে বলে দিয়েছে, "তাতে তুমি ডিরেকটর হলে আর না হলে। এই মদের গেলাস ধরতেই কী খারাপ লাগে। যদি বাবা-মা কোনোদিন দেখেন, তাহলে কী ভাববেন বলো তো?"

"কেন? মদ খেলে লোক খারাপ হয়ে যায়? এই হিন্দুস্থান পিটারস্-এ যত অফিসার আছে খারাপ?" শ্যামলেন্দু জিজ্ঞেস করেছিল।

"তা নিশ্চয় নয়। কিন্তু ছোটবেলায় মদ খায় শুনলেই আমার ভীষণ ভয় করতো। মদ খেয়ে এসে আমাদের পাশের বস্তির সনাতন তার বউকে মারতো। উঃ! সে মদের গন্ধ আমার এখনও নাকে লেগে আছে।"

"সে যে দিশী মদ, আর এ যে বিলিতী জিনিস।" শ্যামলেন্দু উত্তর দিয়েছিল।

মিস্টার সান্যাল একদিন পার্টিতে বলেছিলেন, "মধ্যবিত্ত সেন্টিমেণ্ট নিয়ে বাঙালী জাতটার সর্বনাশ হতে চলেছে। মদ খাওয়া খারাপ, ঘোড়ার মাঠে যাওয়া পাপ, মেয়েরা সিগ্রেট খাবে না, নস্যি শুধু ছেলেরাই নেবে? হোয়াই? মেয়েরা কী দোষ করেছে? ভাবুন তো, মেয়েরা নস্যি নিলে নস্যির বিক্রি কত বাড়বে! চাষারা তাহলে তামাক বিক্রি করে আরও দুটো পয়সা পাবে, নস্যির কারখানায় বেকার লোকেরা চাকরি পাবে, ইনডাসট্রির উন্নতি হবে, আবার গভরমেণ্টও সমাজ উন্নয়নের জন্যে আবগারী কর থেকে টাকা পাবে। ফলে বস্তি উন্নয়ন হবে, শিক্ষা বাড়বে, পথঘাটের জন্যে শ্রমিক লাগবে, আরও লোক চাকরি পাবে। একেবারে চেইন রি-একশন।"

রুণু সান্যাল সেদিন একটু নেশার ঘোরে রঙিন হয়েছিলেন। হঠাৎ বলে ফেলেছিলেন, "আসলে ব্যাপার কি জানেন, এ-দেশে আমরা এখনও শিল্প-বিপ্লবের জন্যে তৈরি হইনি। আর একটা জিনিস মনে রাখতে হবে। শিল্প-বিপ্লব সফল করতে হলে একজিকিউটিভ চাই। কিন্তু কিলিয়ে কাঁঠাল পাকানো যায় না। এক জেনারেশনে কমার্সিয়াল একজিকিউটিভ তৈরি হয় না। এই মার্চেণ্ট অফিসের উঁচু পোস্ট, এটা ঠিক চাকরি না। এটা একটা আলাদা কালচার—আলাদা সংস্কৃতি। আলাদা ওয়ে অফ্ লাইফ—একটা নতুন জীবন-দর্শন।"

গেলাস থেকে আর একটু হুইস্কি গলায় ঢেলে, মিসেস চোপরার ঘাড়ে হাত রেখে, রুণু বলেছিল, "সোজা কথায় যা দাঁড়ায়, প্রথম জেনারেশন একজিকিউটিভরা একটু প্যাচপেচে সেন্টিমেণ্টাল, একটু ভ্যাদভেদে আদর্শবাদী হবেই। কোনো উপায় নেই। তারা নিজেরাও জ্বলবে, অপরকেও জ্বালাবে। দোলনকে রুণু বলেছিল, আপনি তো লেখাপড়া-জানা মহিলা। আপনি বিবর্তনবাদ মানেন? প্রকৃতিতে ডবল প্রমোশন বলে কোনো জিনিস নেই। কেরানি বা ইস্কুল মাস্টারের ছেলে, খেলাৎ মেমোরিয়াল ইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করে, বঙ্গবাসী কলেজ থেকে পাইকারী ডিগ্রি নিয়ে, কখনও লাফ দিয়ে একজিকিউটিভ হতে পারে না। হ্যাঁ বাবা, এখন থেকে চেষ্টা করো, যাতে তোমার ছেলে বা নাতি তা হতে পারে। সেটা সম্ভব।"

মিসেস সান্যাল সেই সময় হঠাৎ এসে পড়েছিলেন! তাড়াতাড়ি স্বামীকে সামলে নিয়ে বলেছিলেন, "তুমি কী সব বকছো?"

"শোনো ডার্লিং, আমি যা বোঝাতে চাইছি, তা হলো আমি প্রথম পুরুষের অফিসার নই। আমার বাবাও অফিসার ছিলেন শ' ওয়ালেসে।"

জোর করে স্বামীকে সরিয়ে নিয়ে মিসেস সান্যাল ক্ষমা চেয়েছিলেন। বলেছিলেন, "ও আজকে একটু ডিসটার্বড আছে—একটু বেশী খেয়ে ফেলেছে, কিছু মনে করবেন না।"

শ্যামলেন্দু সেদিন বাড়ি ফিরে এসে দোলনকে জিজ্ঞেস করেছিল, "রুণুর সঙ্গে তোমার কী হয়েছিল?"

"তুমি কি করে জানলে?"

"রুণু নিজে এসে আমার কাছে ক্ষমা চাইলো। বিবি বলে গেল কিছু মনে করবেন না।"

"আমি ঠিক বুঝলাম না। হঠাৎ এসে ফার্স্ট জেনারেশন, সেকেণ্ড জেনারেশন, প্রথম পুরুষ, দ্বিতীয় পুরুষ কী সব বকে গেল।"

শ্যামলেন্দু গম্ভীর হয়ে উঠেছিল। বললে, "বুঝলে না? আমি সাধারণ ঘর থেকে এসেছি, বাবা ইস্কুল-মাস্টার। ফার্স্ট জেনারেশন অফিসার—আর রুণু দু পুরুষের অফিসার।"

ওকে ওসব কথা বলা বোধহয় ঠিক হয়নি। সেদিন থেকেই কেমন একটু পাল্টে গেল শ্যামলেন্দু। ওর মাথায় যেন কী একটা গোঁ চেপে বসেছে। তারপর গল্ফ ক্লাবে যাওয়ায় আর বাদ পড়ে না। ককটেলও ফাঁক পড়ে না। গোবিন্দপুর ক্লাবে নিয়মিত ঢুঁ মেরে আসে। আর রেস তো আছেই।

একবার দোলনের মনে হয়েছে শ্যামলেন্দুর এসব মানায় না। মার্চেন্ট অফিসের এই ক্ষুদে লোকগুলোর তুলনায় শ্যামলেন্দু অনেক বড়। কিন্তু শ্যামলেন্দু বলেছে, "এইসব যে আমি ভালবাসি তা নয়। কিন্তু আমি কিছুতেই হেরে যেতে রাজী নই। একটু-আধটু এসব করা দরকার, যদিও ককটেল ম্যানেজারদের দিয়ে আর কাজ হবে না। কর্তারা বুঝতে পেরেছেন একচেটিয়া বাণিজ্যের যুগ শেষ হতে চলেছে। প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়ে এখন ভারতবর্ষে ব্যবসা টিকিয়ে রাখতে হলে কোম্পানিকে কাজ করতে হবে। তাই বিদেশী কর্তারা এখন কাজের লোক চান—তাঁরা মানুষ যাচাই করে নিতে শিখছেন।"

পাশ ফিরে শুলো দোলন। আহা বেচারা শ্যামলেন্দু, এতক্ষণ একটু ঘুমোতে পারতো। ওর একটু বিশ্রাম দরকার ছিল। তা নয়, এই দুপুর রোদে ঘোড়া-রোগ!

দুপুর গড়িয়ে কখন বিকেল এসেছে খেয়াল হয়নি। দুই বোন বেঘোরে ঘুমোচ্ছে। শ্যামলেন্দু কখন বাড়ি ফিরেছে তাও খেয়াল করেনি।

বিকেলবেলায় বাড়ি ঢোকবার সময় বেল বাজায়নি শ্যামলেন্দু। পকেট থেকে ডুপ্লিকেট চাবি বার করে চুপি চুপি ঢুকে পড়েছিল। ঘুমোবার একটু ইচ্ছে যে ছিল না এমন নয়। কিন্তু ঘরে ঢুকেই টুটুলকে দেখতে পেলে।

বাইরে সোফায় এসে বসলে শ্যামলেন্দু। একটা সিগারেট ধরালে। ফেরিস সায়েবের কপালটা আজ খারাপ। পুরো দেড়শ' টাকাই হেরেছেন। ওঁর নিজস্ব ঘোড়াটাও সুবিধে করতে পারেনি। মিসেস ফেরিস অবশ্য কিছু জিতেছেন। ভাগ্যে শ্যামলেন্দু হেরেছে আজ! যারা জিতেছে আজ তাদের সবার ওপরই বেশ চটিতং হয়ে আছেন হিন্দুস্থান পিটারস্-এর ম্যানেজিং ডিরেকটর।

না, একটু গড়িয়ে নিতে পারলে মন্দ হতো না। শ্যামলেন্দু এবার গেস্টরুমে ঢুকে পড়লো।

সিগারেট টানতে টানতে আস্তে আস্তে পায়ের আঙুলগুলো নাচাচ্ছিল শ্যামলেন্দু। ঘরের কোণে একটা বুককেসে শেক্সপীয়রের গ্রন্থাবলী চকচক করছে। দশটা খণ্ডে সোনার জল দিয়ে নাম লেখা। হিন্দুস্থান পিটারস্-এর প্রথম মাসের মাইনে পেয়ে দোলন নিজে কিনে দিয়েছিল। কী? হাসি আসছে?

কিন্তু সত্যি কথা। বিশ্বাস করুন, প্রথম মাসের মাইনে থেকেই এই দামী সংস্করণ কেনা হয়েছিল। তার আগে তো কলেজে মাইনে ছিল ১৯০ টাকা। আর প্রথম মাসেই হিন্দুস্থান পিটারস্ থেকে পাওয়া গিয়েছিল আটশ' টাকা! দোলন তখন পাটনায়। নীল খামে চিঠি লিখে দিয়েছিল, "আমি কোনো কথা শুনতে চাই না। আমি মনে করবো আরও একমাস তুমি প্রফেসরি করছো। তুমি অবশ্যই শেক্সপীয়রের নতুন সিরিজটা কিনবে—আমার মাথার দিব্যি রইলো।"

স্ট্র্যাটফোর্ড-অন-অ্যাভনের ঐ দাড়িওয়ালা ভদ্রলোক আজ এই অপরাহ্নে যেন কাঁচের বন্দীশালার ভিতর থেকে উদীয়মান কোম্পানি-একজিকিউটিভ শ্যামলেন্দু চ্যাটার্জির দিকে রোষকষায়িত নেত্রে তাকিয়ে আছেন।

শেক্সপীয়র লোকে মন দিয়ে পড়ে কেন? দোলনের বাবা যখন বলতেন, 'শ্যামল, শেক্সপীয়রের মধ্যে ডুবে থাকো। এ এক অপূর্ব জগৎ', তখন কেন তা বলতেন তিনি? শেক্সপীয়র ভাঙিয়ে যুগ যুগ ধরে ছাত্ররা পরীক্ষায় ভাল করছে। শেক্সপীয়রকে বার বার পড়া মানে তাঁকে বোঝা, আর বোঝা মানে পরীক্ষায় ভাল নম্বর পাওয়া, আর ভাল নম্বর পাওয়া মানে ভাল চাকরি পাওয়ার সুবিধা। তারপর শেক্সপীয়র শেষ। তারপর আমার জন্যে বাড়ি, গাড়ি, বউ, ক্লাব, ককটেল, কনট্রাক্ট ব্রীজ, ডিনার, ডান্স, পেরিমেসন এবং টাইম ম্যাগাজিন। সিন্ধুপারের বিশ্বকবি, আপনি মাথায় থাকুন। আপনাকে যে বাড়ির শোভাবৃদ্ধির জন্যে ফার্নিচার হিসেবে রেখেছি, জঞ্জাল কমাবার জন্যে আব্দুলকে বাইরে ফেলে দিতে বলিনি, এই যথেষ্ট। মোর দ্যান এনাফ্!

শ্যামলেন্দু বললে, "মিস্টার উইলিয়ম শেক্সপীয়র, আপনি আমার দিকে ওইভাবে তাকাবেন না। আমি আপনাকে সত্যি কথা বলছি আপনি যেসব কথা কায়দা করে লিখে গিয়েছেন, তাতে আমাদের হিন্দুস্থান পিটারস্-এর ফ্যান বা ইলেকট্রিক ল্যাম্প কোনোটাই বিক্রি করতে সুবিধে হয় না। আমি তো আপনার লেখা একসময় তন্ন তন্ন করে পড়েছি, বলুন তো একটা লাইন, যা দিয়ে আমি ফোরকাস্ট করতে পারি, আগামী তিন বছরে ইণ্ডিয়াতে কত ইলেকট্রিক ফ্যান বিক্রি করা যাবে? তার মধ্যে আটচল্লিশ ইঞ্চি এবং ছাপ্পান্ন ইঞ্চির অনুপাত কত হবে? বলুন তো, ওয়েস্ট বেঙ্গলের অর্থনৈতিক অধঃপতনের জন্যে পশ্চিমবঙ্গে ফ্যানের বিক্রি কমবে কিনা? মিস্টার শেক্সপীয়র, আপনি চুপ করে বসে আছেন কেন? আপনার তো বিশ্বজোড়া নাম, আপনি তো মানুষের সমস্ত বড় বড় সমস্যা সম্পর্কে নিজস্ব মতামত দিয়ে গিয়েছেন—প্রেম, বিরহ, হিংসা, উচ্চাশা, হত্যা, মৃত্যু কোনো সাবজেক্টই তো ছাড়েননি। কিন্তু বলুন তো, নির্দিষ্ট তারিখের পনেরো দিন আগে গরম পড়লে ইলেকট্রিক পাখার বাজারে তার কী প্রতিক্রিয়া হবে? এসব আপনার কাছে হাস্যকর হতে পারে, কিন্তু আমাদের কাছে জীবন-মরণের প্রশ্ন। এই সব প্রশ্নের ভুল উত্তর দিলে এই দশতলার ফ্ল্যাট থেকে বিতাড়িত হয়ে স্ত্রীর হাত ধরে আমাকে রাস্তায় দাঁড়াতে হতে পারে। এই যে আমার সুখী সংসার, এই এয়ার-কণ্ডিশন ঘর, কার্পেট, ফ্রীজ, টেলিফোন, বয়, বাবুর্চি, বাড়ি, গাড়ি সবার সঙ্গে পিটারস্ ফ্যানের অদৃষ্ট তার জড়িয়ে জটপাকিয়ে রয়েছে। অথচ আপনি দর্শনের বিলাসিতায় বুঁদ হয়ে রয়েছেন। 'টু বি অর নট টু বি', এই সব প্রশ্ন তুলে সস্তা হাততালি কুড়োচ্ছেন তাদের কাছ থেকে, যাদের মনে থাকে না কত সাধ্য-

সাধনা করে মাটির বুক থেকে কৃষক শস্য সংগ্রহ করে, কত যন্ত্রণার মধ্যে ধরিত্রীর গর্ভ থেকে কয়লা এবং লোহা ছিনিয়ে আনতে হয়, কত কষ্ট করে ব্লাস্ট ফার্নেসের অগ্নিপরীক্ষায় ইস্পাত শুদ্ধ করতে হয়; তিল তিল করে কত মানুষের চেষ্টায় একখানা পিটারস্ ফ্যান গড়ে ওঠে; তারপর সেই ফ্যানের বিক্রির জন্যে আমাদের কী প্রাণান্তকর পরিশ্রম করতে হয়। কিছু মনে করবেন না, মিস্টার শেক্সপীয়র, আমাদের এই শিল্পযুগে আপনি অচল। নিতান্ত করুণাবশতই ইস্কুলে কলেজে আপনাকে এখনও স্থান দেওয়া হচ্ছে—কিন্তু আপনি আমায় অফিসের কেরানি সুধন্যবাবুর মতো ভেবে বসবেন না যে আপনাকে এক্সটেনশন দেওয়া হয়েছে বলেই আপনাকে আমাদের খুব প্রয়োজন আছে, আপনাকে ছাড়া আমাদের চলবে না।

"শেক্সপীয়র সাহেব, আপনি মিটিমিটি হাসবেন না। আপনার ওই দাড়িওয়ালা মুখের চাপা হাসির পিছনে একটা চাপা মোনালিসা ঔদ্ধত্য উঁকি মারছে। আমি আপনাকে সত্য কথা বলছি, আপনার বই আমার পড়তে ভাল লাগতো। ভারি মজার মজার কথা লিখেছেন—তার কিছু সত্যি, কিছু আজগুবী। এই সব কথা শিখে ভাল থিয়েটার করা যায়, ভাল ক্রসওয়ার্ড চক্র সমাধান করা যায়, ভাল ইংরিজীর মাস্টার হওয়া যায়। আমি মাস্টার হয়েছিলাম। কিন্তু মাসে আপনার সমস্ত বুলি কপচিয়েও ১৯০ টাকার বেশী পাওয়ার পথ নেই। তার থেকে আবার সাড়ে-আট টাকা প্রভিডেন্ট ফাণ্ড এবং দশ পয়সা রেভিনিউ টিকিট কেটে নিলে, হাতে থাকে ১৮১ টাকা চল্লিশ পয়সা। তার থেকে বাড়িভাড়া বাদ দিন ৩১ টাকা, তাও বাবার আমলে ভাড়া নেওয়া তাই। রইলো কত? একশ' পঞ্চাশ টাকা। এই ১৫০ টাকা হাতে নিয়ে যদি শোনেন আপনার বাবার স্বাস্থ্য ভাল নয়, চাকরি বন্ধ, এখনই এক্স-রে ইত্যাদি করাতে হবে এবং আরও শোনেন স্ত্রী সন্তানসম্ভবা, যে স্ত্রীকে আপনি অনেক আদর করে ভালবেসে কলেজের লেখাপড়া ছাড়িয়ে নিয়ে এসেছেন, তাহলে আপনার মনের অবস্থা কেমন হয়? আপনার সময় ডাক্তাররা কি লিখতো জানি না, কিন্তু এখন এক্স-রে পরীক্ষায় ফুসফুসের দোষ দেখলে ডাক্তাররা বিরাট বিরাট ওষুধের সঙ্গে লেখেন দুধ, ঘি, ছানা, ডিম, ফল। সন্তানসম্ভবা মেয়েদের স্বামীদের ডেকে ভিটামিনের নাম বলেন, আর সাবধান করে দেন, দেখবেন খাওয়া-দাওয়া যেন কমতি না হয়, মাছ মাংস ডিম দুধ ইত্যাদি। একজনের নাম করে দুজন খাচ্ছে এটা মনে রাখবেন।

"এই অবস্থায় কেউ যদি কাগজে দেখে কোনো বিলিতী কোম্পানি বিজ্ঞাপন

দিয়েছে মার্কেটিং ডিপার্টমেণ্টে লোক চাই—মাইনে যোগ্যতা অনুসারে। সঙ্গে নানা সুবিধা, যেমন বাড়িভাড়া, বিনাপয়সায় স্বামী-স্ত্রীর চিকিৎসা, বোনাস ইত্যাদি, তাহলে আপনি কি হাতগুটিয়ে বসে থাকবেন? আপনি নিজে এই বিজ্ঞাপন দেখলে কী করতেন, বুকে হাত দিয়ে বলুন তো? তাতে না হয় আপনার মিডসামার নাইটস ড্রিম লেখা না-ই হতো।

"তাহলে বুঝতে পারছেন কেন আমি অ্যাপ্লিকেশন করেছিলাম বক্স নম্বর ধরে। তারপর হিন্দুস্থান পিটারস্ লিমিটেড থেকে একদিন উত্তর এসেছিল। খোদ সেল্স ম্যানেজার ডেভিডসন সায়েব কী কাজে পাটনায় এসেছিলেন; সেই সময় ইনটারভিউ।

"আমার আবার সেদিন কলেজ। জীবনে কখনও ইনটারভিউ দিইনি। তবু সাইকেলখানা নিয়ে বোঁ বোঁ করে চালিয়ে ডেভিডসনের হোটেলে হাজির হয়েছিলাম। জিজ্ঞেস করলেন, 'কোন বিষয়ে এম-এ পড়েছো?' বললাম, 'ইংরিজী। এখনকার বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম।' জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার ফেভারিট অথর?' তা আমি আপনারই নাম করলাম। আমি কী করে জানবো ডেভিডসন সায়েব নিজে আপনার অমন ভক্ত। বেলিয়ল কলেজ, অক্সফোর্ডে, এক সময় মন দিয়ে শেক্সপীয়র অধ্যয়ন করে ভদ্রলোক এখন ইণ্ডিয়াতে ফ্যান এবং ল্যাম্প বিক্রি করছেন। আমাকে আপনার সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞেস করলেন। আমার স্মৃতিশক্তি খারাপ ছিল না, তাছাড়া দোলনের বাবা সারাজীবন ধরে সাধনা করে আপনার সম্পর্কে যা-যা অনুভব করেছেন, তার নির্যাস ভাবী জামাতাকে জানিয়ে দিয়েছিলেন, তার কিছু কিছু ছাড়লাম। কথায় কথায় অ্যামবিশনের কথা উঠলো। ইণ্টারভিউয়ের কথা ভুলে ভদ্রলোক আপনার অষ্টম হেনরী নাটকের সেই বিখ্যাত বচন মুখস্থ বললেন—'*As ambitious as Lady Macbeth, Cromwell I charge thee, fling away ambition ; By that sin fell the angels.*'

"দোলনের বাবার সঙ্গে এ বিষয়ে একবার অনেক আলোচনা হয়েছিল। বললাম, শেক্সপীয়রের সমগ্র রচনায় ছেচল্লিশবার অ্যামবিশন প্রসঙ্গ উঠেছে। কিন্তু 'অ্যামবিশাস' কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে ছত্রিশবার, কেন জানি না।

"আমার উত্তর শুনে অবাক হয়ে গেলেন ডেভিডসন। জিজ্ঞেস করলেন, 'কলেজে কত পাও?' ফিগারটা শুনে ভদ্রলোক একটু ঘাবড়ে গেলেন। 'ইণ্ডিয়াতে মাস্টারদের এই মাইনে!' বললাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ স্যর।' আমি এই সময় ঘড়ির দিকে তাকালাম। ডেভিডসন জিজ্ঞেস করলেন, 'ঘড়ির দিকে

তাকাচ্ছ কেন ?' বললুম, 'বেলা একটা থেকে অনার্সের ছেলেদের হ্যামলেট পড়াতে হবে। এখন বারোটা বেজে চুয়াল্লিশ। ভাবছিলাম, জোরে সাইকেল চালিয়ে গেলে, ক্লাসটা নেওয়া যায়। ছেলেগুলোর ক্ষতি হয় না।'

"'তুমি সাইকেল চড়ে ইনটারভিউ দিতে এসেছো!' বলেছিলুম, 'হ্যাঁ।' হাজার হোক অক্সফোর্ডের সায়েব। আমার শেক্সপীয়র জ্ঞান, ইংরিজী ভাষার ওপর দখল এবং আমার মফস্বলীনিষ্ঠা তাঁর মনে দাগ কেটেছিল। বলেছিলেন, 'চ্যাটার্জি, তোমাকে বলে যাচ্ছি চাকরি তুমি পাবে। আমরা কিন্তু সবসুদ্ধ সাড়ে আটশোর বেশী দিতে পারবো না।'

"আমি প্রথমে ভাবলাম, ভুল শুনছি। তারপর দেখলাম, না, সায়েব তো বলছেন সাতশ' টাকা মাইনে, দেড়শ' টাকা বাড়িভাড়া।

"ডেভিডসন লোকটা একটু অদ্ভুত ধরনের। হোটেলের বাইরে এসেছিলেন। আমি তখন সাইকেলে চড়ে বসেছি। সায়েব জিজ্ঞেস করলেন, 'চ্যাটার্জি, কিন্তু শেক্সপীয়রের কী হবে ? আমাদের ওখানে তো মাল বেচার কাজ!'

"আমি ঘাবড়ে গেলাম। চাকরিটা আবার পিছলে বেরিয়ে না যায়! বললাম, 'আপনি চিন্তা করবেন না মিঃ ডেভিডসন। শেক্সপীয়র আমার মাথার ওপরে থাকবেন। একবার যে শেক্সপীয়রের রস পেয়েছে, সে কখনও শেক্সপীয়রকে ছাড়তে পারে ?'

"আমার ওই শেষ কথাটা একটু অসত্য বলতে পারেন। কিন্তু, মিস্টার শেক্সপীয়র, মানুষের মনের কোনো রহস্য তো আপনার দুর্জ্ঞেয় নয়, আপনি তো জানেন, চাকরিটা রক্ষা করবার জন্যে আমি তখন সব কিছু করতেই রাজী ছিলাম। আর তাছাড়া আমি তখনও ভাবিনি আমি এমন হয়ে যাবো—লিমিটেড কোম্পানির শেয়ার হোল্ডারদের দায়িত্বের মতো, আমি নিজেও সীমাবদ্ধ হয়ে পড়বো।

"কী হলো ? এখনও আমার মুখের দিকে এমনভাবে তাকিয়ে রয়েছেন যেন আপনার কাছে টাকা ধার নিয়ে শোধ দিইনি, আপনাকে ঠকিয়েছি ? আমি তো বলছি, প্রথম দিকে আমি ভেবেছিলাম, শ্যামও রাখবো কুলও রাখবো। আমার বউ, ইংরিজীর রীডার বটুকেশ্বর ভট্টাচার্যর মেয়ে দোলনও তাই চেয়েছিল। না হলে প্রথম মাসের মাইনে পেয়ে গয়না না গড়িয়ে কেউ স্বামীকে ওই রকম দামী শেক্সপীয়র এডিশন কিনতে বলে ?

"আরও কত প্ল্যান ছিল। ট্রেনিং-এ থাকার সময় তো দু-একটা রিপোর্টের মধ্যেও লিখেছি—লাভস্ লেবার লস্ট। অথবা মাচ এডো অ্যাবাউট নাথিং।

বিশ্বাস না হলে আপনি হিন্দুস্থান পিটারস্-এর পুরানো রেকর্ড দেখতে পারেন। হাজার হোক বিলিতী কোম্পানি, স্বয়ং আপনি দেখতে চেয়েছেন শুনলে খুব গোপনীয় নোটও বার করে দেবে। তাছাড়া, আপনি তো জানেন ইংরেজদের যত দোষই থাকুক তারা জোচ্চর নয়। এট দেয়ার ওয়াস্ট্, কিছু ইংরেজ খল হতে পারে, কিন্তু আমাদের দেশের ব্যবসাদার বলে পরিচিত পেটমোটা গুড়ের নাগড়িগুলোর মতো তারা ডাকাত এবং শয়তান হতে পারে না। দেখুন, বিলিতী কোম্পানিরা সৎপথে ব্যবসা করে, খদ্দেরদের ঠকায় না, ব্ল্যাকমার্কেটে নিজেদের কালো করে না, কর্মচারীদের বেশ ভাল মাইনে দেয় এবং প্রতিভা দেখাতে পারলে যে-কেউ ওপরে উঠে যেতে পারে, তার জন্যে গুড়ের নাগরির মতো পেট হবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এসব তো অন্য কথা! যা বলছিলাম আপনাকে, শেক্সপীয়র থেকে কোটেশন দেওয়া নোট লিখে আমার বেশ নাম হয়েছিল।

"তখন আমাদের ডিপার্টমেণ্টের ডিরেকটর ছিলেন এন কে মেনন। কেরালার খ্রীস্টান, ক্ষুরের মতো বুদ্ধি। দোষের মধ্যে, ছোটবেলায় আপনার খপ্পরে পড়েছিলেন। মেনন আমাকে ডেকে একদিন কফি খাইয়েছিলেন। ডিরেকটরের ঘরে ছোকরা সেল্সম্যান কফিতে নিমন্ত্রিত হলে মনের অবস্থা কী হয়, আপনি বুঝবেন না। আপনার তো ইনডাসট্রিয়াল রেভলিউশন, মানে শিল্প-বিপ্লবের কোনো সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা নেই! মেনন সায়েব আমার প্রশংসা করে বলেছিলেন, 'এই কোম্পানিতে তোমার ভবিষ্যৎ আছে। কিন্তু তোমার লক্ষ্যকে আরও ছুঁচলো করে তুলতে হবে। স্থচের মতো পয়েণ্টেড হতে হবে।'

"মিস্টার মেনন বলেছিলেন, 'জানো তো আমাদের এই হিন্দুস্থান পিটারস্-এর ইতিহাস! মিস্টার জন পিটারস্ ছিলেন ওয়েলস্-এর এক কয়লাখনির শ্রমিক। একবার খনিতে আহত হয়ে বাড়িতে বসেছিলেন। ইংলণ্ডে যা আশ্চর্য তাই হলো সেবার। হঠাৎ বেজায় গরম পড়লো ওয়েলসে। আর কয়লাখনির ওয়ার্কারদের বাড়ি! বুঝতেই পারছো, কোনো-বাতাস নেই। অসহ্য গরমে পচতে পচতে হঠাৎ পিটারস্-এর মাথায় একটা বুদ্ধি এসে গেল। কেমন করে একটা চাকাকে বিদ্যুতের সাহায্যে ঘুরিয়ে হাওয়া সৃষ্টি করা যায়। সামান্য একটা আইডিয়া, তার থেকেই আবিষ্কার হলো পিটারস্ ফ্যান। সাধারণ একটা পেটেণ্ট থেকে এই জগৎ-জোড়া কোম্পানি। দুনিয়ার যেখানে যাবে সেখানেই দেখবে পিটারস্ লিমিটেড্, পিটারস্ ইনকরপোরেটেড, পিটারস্ ইনডাসট্রিজ ইত্যাদি। ফ্যান ছাড়াও ইলেকট্রিক ল্যাম্প তৈরি আরম্ভ করেছে

পিটারস্ কোম্পানি। ল্যাম্পের আবিষ্কর্তা আলভা এডিসনের সঙ্গে ওদের কী একটা দূর সম্পর্কের আত্মীয়তা ছিল। তারপর থেকে এরা কখনও পিছনে তাকায়নি। নেভার, নেভার। ইণ্ডিয়াতেও এসেছে হিন্দুস্থান পিটারস্, যদিও এখানে আমরা তেমন একটা বড় কোম্পানি নই। কিন্তু মনে রেখো, সেনসাস রিপোর্ট অনুযায়ী ইণ্ডিয়াতে সাড়ে-নয় কোটি হাউসহোল্ড আছে। একটু অবস্থা ভাল হলেই এইসব পরিবারে লোকরা বাড়িতে ইলেকট্রিক আলো জ্বালাবে এবং পাখা টাঙাবে।'

"মিস্টার শেক্সপীয়র, আবার তাকাচ্ছেন আমার দিকে? ভাবছেন আউট অফ পয়েন্ট বকে চলেছি? মোটেই তা নয়। শুনুন, মিস্টার মেনন তারপর আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'বলো তো তোমাদের এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য কী?' আমি বলেছিলাম, মানুষের মঙ্গল করা, ওই যে পিটার সায়েবের সচিত্র জীবনীতে লেখা আছে। মেনন সায়েব সোজাসুজি বলেছিলেন, 'শোনো চ্যাটার্জি, আমাদের উদ্দেশ্য একটা। আরও পিটারস্ ফ্যান এবং লাইট তৈরি করা; আরও পিটারস্ ফ্যান ও লাইট বিক্রি করা এবং শুধু বিক্রি করা নয়, আরও লাভ করা।' আমি প্রশ্ন করেছিলাম, তারপর? মেনন সায়েব বলেছিলেন, 'আরও উৎপাদন বাড়ানো এবং বিক্রি করা, তারপর আরও…' আমি ওঁর মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন, 'এই লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্যে যা প্রয়োজন আমরা তাই করবো, যা প্রয়োজন নয় তা করবো না।'

"এখন আপনি বলুন, আপনাকে এই জীবনের মধ্যে কী করে আমি বা মেনন সায়েব ঢোকাতে পারতাম? আর আপনাকে বলে রাখছি, শুনুন, জেনুইন একজিকিউটিভ হলো যুদ্ধের সুইসাইড স্কোয়াডের মতো। তারা নিজেদের টার্গেটে পৌঁছনোর জন্যে সুইসাইড করতে পারে। সুইসাইড বলতে আপনি যেন আবার অভিধানের অর্থ নিয়ে নেবেন না। মানে আপনি নিজেই আপনাকে মেরে ফেলে, আপনার বডির মধ্যে আর একটা লোককে ঢুকিয়ে দিতে পারেন। আরও ভাল হয় যদি আপনার হৃদয় এবং মস্তিষ্ক কেটে ফেলে দিয়ে সেই জায়গায় একখানা আই-বি-এম কমপিউটর বসাতে পারেন। জানেন তো, আই-বি-কম কমপিউটরের যতই বুদ্ধি থাকুক, নিজে কিছু করতে পারে না! যারা তাকে কেনে বা ভাড়া করে তারা হুকুম করে, আর কমপিউটর মন্ত্রের মতো উত্তর দিয়ে যায়।

"আমি অবশ্য তখনও অতটা বুঝিনি। একশ' নব্বই থেকে সাড়ে-আটশ'র

ঝোঁকে দিনরাত সেল্‌সের কথা ভেবেছি। ভক্ত যেভাবে ঈশ্বরের মধ্যে নিজেকে বিলীন করে দেবার চেষ্টা করে, তেমনি ভাবে হিন্দুস্থান পিটারস্-এর সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দেবার চেষ্টা করেছি। আপনাকে বলছি, ফল হয়েছে।

"আমাকে দিল্লীতে পাঠানো হয়েছে। যেখানে দশ হাজার ফ্যান বিক্রি হতো না, সেখানে আমি কুড়ি হাজার ফ্যান বিক্রি করেছি। আপনি বিশ্বাস করবেন, দিল্লীর দারুণ শীতেও আমি পিটারস্ ফ্যান বিক্রি করেছি। মেনন সায়েব জানতে চেয়েছিলেন, কী করে পারলে? আমি বলেছিলুম, চেষ্টায় ভগবানকে পাওয়া যায়, আর শীতকালে পাখা বিক্রি হবে না? এরপর আমি গিয়েছিলাম রাউরকেল্লা, ভিলাই, দুর্গাপুর, জামসেদপুর এবং বার্ণপুরে। তৈরি করেছিলাম সেই বিখ্যাত *Sales forecast*—যাতে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম সরকারের ইস্পাত পরিকল্পনার সুযোগ নিয়ে আমরা ওইসব শহরে আগামী দশ বছরে কেমনভাবে পিটারস্ ফ্যানের বিক্রি বাড়াতে পারবো।

"তারপর আপনি জানেন না, এই কোম্পানি কীভাবে গুণের আদর করেছে। প্রথম বছরের শেষে মেনন সায়েব বলেছেন, 'তোমার ইনক্রিমেণ্ট কত হলে খুশী হবে?'

"আমি লজ্জার মাথা খেয়ে বলেছি, দেড়শ' টাকা বাড়িয়ে পুরোপুরি এক হাজার হলে আর প্রত্যাশার কিছু থাকে না। হেসে ফেলে ভদ্রলোক বলেছিলেন, 'এই নাও তোমার চিঠি। খুলে দেখ।' চিঠি খুলে আমি অবাক! আপনার কখনও এমন হয়েছে? আমার মাইনে বেড়ে হয়েছে বারো শ' টাকা।

"তারপর দীর্ঘ ঘটনা। সেসব বর্ণনা করতে বসে আপনাকে বিব্রত করতে চাই না। শুধু বলতে চাই, আমি এর পরে আর পিছন ফিরিনি। ক্রমশ এগিয়ে গিয়েছি। একের পর এক দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, আমি তা পালন করেছি। লোকে বলেছে, মিটিয়রিক রাইজ—মানে উল্কার মতো এস চ্যাটার্জি শুধু উঠছে, আর উঠছে।

"কিন্তু মিস্টার মেনন বলেছেন, 'এ আর এমন কি? তোমাকে এবং সানিয়ালকে আরও উঠতে হবে।'

"শুধু আমার নামটাই করতে পারতেন ভদ্রলোক, সঙ্গে আবার সানিয়ালের নাম কেন? সানিয়ালও আমাদের সেল্‌সে রয়েছে। এখন ল্যাম্প বিক্রি করে। না, আপনি সানিয়ালকে চিনতে পারবেন না। আপনি মিস্টার মেননের ব্যাপারটা শুনুন। লোকটা অনেক ফাইট করেছিল, কিন্তু আপনি এই কেরলী খ্রীস্টানের সর্বনাশ করলেন।

"মিস্টার মেননের মধ্যে, কী একটা জিনিস ছিল। কনসেন্স না কি বলে। আপনি তো ও বিষয়ে স্পেশালিস্ট। আরও ফ্যান এবং আরও লাইট বেচে-বেচে ক্লান্ত হয়ে একদিন ভদ্রলোক চাকরিতে ইস্তফা দিলেন। বললেন, কোথাকার এক কলেজে ছেলে পড়াবেন, আর দেশের মানুষের উপকার হয়, এমন কোনো কাজ করবেন।

"আপনি কপিলাবস্তুর রাজকুমার সিদ্ধার্থের নাম শুনেছেন? আপনাদের থেকে কিছু বয়সে বড় ভদ্রলোক। উনি যখন বিরাট রাজত্ব আর সুন্দরী বউ ছেড়ে চলে গেলেন, লোকে বুঝতে পারেনি কেন? আমাদের এই মিস্টার মেনন বউকে রাখলেন, কিন্তু রাজত্ব ত্যাগ করলেন। আপনি ভাবছেন, অফিসে ঝগড়া হয়েছিল? মোটেই তা নয়। আপনি ভাবছেন কোনো শোক পেয়েছিলেন? মোটেই নয়। জাস্ট এমনি। আপনার কোনো এক ভজখট লেখার দোষে—ম্যাকবেথ নামে বইতে আপনি উচ্চাশার বিরুদ্ধে কী সব লিখেছেন, সেই পড়ে।

"কিন্তু দেখুন, মেনন সায়েবের বাবার অনেক টাকা। আমি ইস্কুল মাস্টারের ছেলে। আমি নিজেই মাইনে পেতাম ১৯০ টাকা। আমাকে খেটে খেতে হয়। মেনন সায়েব আপনার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাতে পারেন, কিন্তু আপনার সঙ্গে সম্পর্ক রাখাটা আমার কাছে বিলাসিতা, বুঝছেন?

"কী হলো, এখনও হাসছেন? দেখুন, ফের যদি হাসেন, তাহলে বলবো, আপনি নিজেই জাল। শেক্সপীয়র বলে কেউ কোথাও ছিল না। আপনি যে আপনার বইগুলো লেখেননি তার সপক্ষে অনেক এভিডেন্স আছে। সেগুলো যদি আমি মেনে নিই। তখন?"

"এই শ্যামলদা, শ্যামলদা!" কে যেন গায়ে খোঁচা দিলো। ধড়মড় করে উঠে বসলো শ্যামলেন্দু। সুদর্শনা ডাকছে।

"বাঃ, কখন চুপি চুপি এসে ঘুমিয়ে পড়েছেন," সুদর্শনা বলছে। "ডাকলেন না কেন? আমি তাহলে বেরিয়ে আসতাম। নিজের বউ-এর কাছে শুতে পারতেন!"

দোলনও এসে দাঁড়িয়েছে কাছে। শ্যামলেন্দু এখনও ঠিক যেন সংবিৎ ফিরে পায়নি! "জানো, আজকে বিশ্রী একটা ব্যাপার হতে যাচ্ছিলো। স্বয়ং উইলিয়ম শেক্সপীয়র স্বপ্নে দেখা দিয়েছিলেন। ভদ্রলোকের সঙ্গে খুব কথা-কাটাকাটি হচ্ছিলো, হয়তো হাতাহাতি হতো, এমন সময় টুটুল এসে ঘুম ভাঙিয়ে দিলো।"

"কেন ? দুপুরে কিছু খেয়েছ নাকি ?" দোলন জিজ্ঞেস করে।

"এমন কিছু নয়। ক্লাবে তিনটে জিন। ফেরিস সায়েব সবাইকে নিয়ে গিয়ে খাওয়ালেন।"

"তিনটে জিনে তোমার তো কিছু হয় না। নিশ্চয় শরীর দুর্বল হয়ে আছে।" দোলন উদ্বেগ প্রকাশ করে।

"কফি খাবেন তো ? না আরও ঘুমোবেন ?" সুদর্শনা জিজ্ঞেস করে।

"আর ঘুম নয়। কী ঘুম তোরে পেয়েছিল হতভাগা, অমন শ্যালিকা পাশে এসে বসেছিল তবু জাগোনি !" শ্যামলেন্দু আবৃত্তি করতে করতে নিজেই হেসে ওঠবার চেষ্টা করলো।

বেয়ারা জটাধর দাশ ইংরিজী নেমপ্লেটটা মোছা শেষ করে কোম্পানির বাংলা নেমপ্লেটটা ধরেছে, ঠিক সেই সময় চ্যাটার্জি সায়েবের গাড়িটা হিন্দুস্থান পিটারস্ অফিসের সামনে এসে দাঁড়ালো।

জটাধর টুল থেকে নেমে সায়েবকে সেলাম করতে গিয়ে দেখলো গাড়ির মধ্যে মেমসায়েব ছাড়াও আরও একটি মেয়ে রয়েছে। মেমসায়েবের মুখের সঙ্গে নতুন দিদিমণির মুখের আদল দেখেই প্রখরবুদ্ধি জটাধরের বুঝতে বাকি রইলো না, ইনি মেমসায়েবের বোন না হয়ে যায় না। সুতরাং মেমসায়েবকে সেলাম করার আগে সায়েবের শালীকেও একটা সেলাম ঠুকে দিলো জটাধর। তারপর আবার টুলের ওপর উঠে নিজের কাজে মন দিলো।

জামাইবাবুর সঙ্গে সুদর্শনাও গাড়ি থেকে নেমে পড়লো। বললে, "আপনাদের অফিস বাড়িটা কী সুন্দর দেখতে, শ্যামলদা ! একেবারে ইন্দ্রপুরী করে রেখেছেন।"

"ইন্দ্রপুরী করে না রাখলে কর্মচারীদের কাজে মন বসবে কেন ? সবাই বাড়ি ফেরবার জন্যে ছটফট করবে !" শ্যামলেন্দু হেসে উত্তর দিলো।

চ্যাটার্জি সায়েবও তাহলে সব সময় গম্ভীর নন, মাঝে-মাঝে রসিকতা করেন। দেওয়ালের নেমপ্লেটে ব্রাশো লাগাতে লাগাতে জটাধর নিজের মনেই বললে।

সুদর্শনার নজর এবার নেমপ্লেটের দিকেই গেল। "শ্যামলদা শ্যামলদা,

অবাক কাণ্ড! আপনারা তাহলে বাংলা ব্যবহার করেন? কোম্পানির নাম বাংলায় লিখে রেখে দিয়েছেন!"

প্লেটটা একটু খুঁটিয়ে দেখে, সুদর্শনা বলে উঠলো, "এ আবার কি ধাঁধা—'ভারতে সমিতিভুক্ত ও সভ্যগণের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ'। এটা লিখে আপনারা কী বোঝাতে চাইছেন শ্যামলদা?"

শালীদের কাছে মিলিটারিরা পর্যন্ত নরম! চ্যাটার্জি সায়েবের মিষ্টি কথা শুনতে জটাধরের ভারি মজা লাগছে। চ্যাটার্জি সায়েব বললেন, "প্রথম যেদিন চাকরিতে ঢুকেছিলাম, আমার কাছেও ব্যাপারটা ধাঁধার মতো মনে হয়েছিল। তারপর কোম্পানির সেক্রেটারী সেনগুপ্ত সায়েবকে ধরেছিলাম। উনি বলেছিলেন, 'ওর অনেক আইনের প্যাঁচ আছে। এর মানে লিমিটেড কোম্পানি, শেয়ারহোল্ডারদের দায়িত্ব পার্টনারশিপ ব্যবসার মতো সীমাহীন নয়। সোজা কথায়, কোম্পানি আইনে বলছে, কয়েকটি প্রয়োজনীয় তথ্য ইংরিজী এবং স্থানীয় ভাষায় কোম্পানির দরজাগোড়ায় লিখে রাখতে হবে!"

"মার্চেণ্ট অফিসেও কত মজার জিনিস থাকে তাহলে। অথচ লোকে বলে, মার্চেণ্ট অফিস মানে হচ্ছে কড়াক্রান্তির হিসেব এবং একঘেয়ে জীবন," সুদর্শনা বললে।

দোলন গাড়ির ভিতর থেকে তার মতামত সোজাসুজি জানিয়ে দিলো। "ওসব কথা অফিসের লোকরা বাড়িতে ফিরে বউদের বলে। আসলে, অফিসে এরা বেশ মজায় কাটায়।"

প্যাণ্ট-কোট-টাই-এর সঙ্গে কপালে মস্ত দই-এর টিপ লাগিয়ে এক ভদ্রলোককে দূর থেকে দেখা গেল। দোলন ফিসফিস করে টুটুলকে বললে, "রামলিঙ্গম সায়েব, ওঁদের মাইনে দেন। এখানকার সবচেয়ে পুরানো কর্মী।"

রামলিঙ্গম সায়েব আজ একটু দেরি করে ফেলেছেন। রামলিঙ্গম দূর থেকেই সস্নেহে চীৎকার করে উঠলেন, "গুড মর্নিং মিঃ চ্যাটার্জি।"

শ্যামলেন্দুর তুলনায় রামলিঙ্গম অনেক ছোট অফিসার। কিন্তু বৃদ্ধ রামলিঙ্গম বড় বড় অফিসারদের প্রথম চাকরিতে ঢোকার দিন থেকে দেখছেন। তাছাড়া রামলিঙ্গম কাউকে তেমন তোয়াক্কাও করেন না। নিজের খেয়ালে থাকেন। বলেন, "রাজা মহারাজা, ম্যানেজিং ডিরেকটর, এঁরা আর ক'দিনের জন্যে। আসল হলো তোমার বাবা-মা এবং লর্ড ভেঙ্কটেশ।"

রামলিঙ্গম বললেন, "মিঃ চ্যাটার্জি, আজ স্টেলার পোজিশন খুব ভাল। ভেনাস সকাল ৬টা ৪৫ মিনিটে মকরে প্রবেশ করলেন। তাই ভেঙ্কটেশকে

আজ পঞ্চাশটা বেশী ফুল দিলাম। একটু দেরি হয়ে গেল।"

তারপর রামলিঙ্গমের নজর টুটুলের দিকে পড়ে গেল। ওর মুখের দিকে খুঁটিয়ে তাকিয়ে রামলিঙ্গম বললেন, "খুবই সৌভাগ্যবতী।"

"আমার সিস্টার-ইন-ল," শ্যামলেন্দু পরিচয় করিয়ে দিলো।

রামলিঙ্গম বললেন, "দেখে নিও, একদিন এই সিস্টার-ইন-ল-এর জন্যে তোমরা সকলে প্রাউড ফিল করবে।"

"টেক্ দিস," পকেট থেকে পূজোর জবাফুল বার করে রামলিঙ্গম টুটুলের হাতে দিলেন। টুটুল ফুলটা মাথায় ছোঁয়ালো।

দোলন বললে, "মিস্টার রামলিঙ্গম, ওর বিবাহযোগটা একটু দেখুন তো।"

"খুবই ভাল স্বামী-ভাগ্য, তবে সামনের বারো মাসের মধ্যে নয়। ইচ্ছে করলে, লর্ড শিভাকে প্রতেক বুধবার দুটো করে বেলপাতা দিতে পারো।"

নিজের সম্বন্ধেও দু-একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবার ছিল। কিন্তু সকলের সামনে লজ্জা পেলো দোলন।

"টুটুল, তুই গাড়িতে এসে বস," দোলন এবার বোনকে ডাকলো। একটু নিউ মার্কেট ঘুরে আসবার ইচ্ছে।

"তোমার তো এখন গাড়ির দরকার নেই?" দোলন স্বামীকে জিজ্ঞেস করে নেয়।

"না। তুমি টুটুলকে সব ঘুরিয়ে-টুরিয়ে দেখাও।" শ্যামলেন্দু উত্তর দিলো।

গাড়িটা চলে যেতেই রামলিঙ্গম ও শ্যামলেন্দু একসঙ্গে ভিতরে ঢুকলো।

"সেদিনে ফিনানস ডিরেকটরের পার্টিতে দেখলাম না কেন?" শ্যামলেন্দু এবার রামলিঙ্গমকে জিজ্ঞেস করে।

"ট্রাইং টু উইথড্রা...", রামলিঙ্গম চীৎকার করেই বললেন। "মিস্টার চ্যাটার্জি এবার নিজেকে গুটিয়ে ফেলতে হবে, রিটায়ারমেণ্টের তো আর তিন মাস বাকি।"

"মাত্র তিন মাস! সে কি!" শ্যামলেন্দু বিস্ময় প্রকাশ করে।

"দেখতে যাই হই, মিস্টার চ্যাটার্জি, বয়স হচ্ছে তো। ইন দি ইয়ার নাইনটিন হাণ্ড্রেড থার্টিফাইভ আমি মাদ্রাজ থেকে ক্যালকাটায় এসেছিলাম। তখন তোমরা কোথায়?"

"আমি তখনও জন্মাইনি।"

রামলিঙ্গম সায়েব এই ভোরবেলায় শ্যামলেন্দুর ঘরে এসে বসলেন। "শোনো মিস্টার চ্যাটার্জি, আমি আমার ফাদারের আশীর্বাদ নিয়ে, লর্ড ভেঙ্কটেশকে-

পুজো দেবার প্রমিস করে নাইনটিন থার্টি ফাইভের সেভেনথ মার্চ ম্যাড্রাস মেলের থার্ড ক্লাসে চেপে বসেছিলাম। তখন জানো তো, কি বাজারের অবস্থা। চারিদিকে মন্দা চলছে। সবাই বললে, এখন কোলকাতায় যাচ্ছ চাকরির সন্ধানে! ম্যাড্। আমি বললাম, ফাদারের আশীর্বাদ পেয়েছি আমার আর কোনো চিন্তা নেই।"

শ্যামলেন্দুর বেশ লাগছে রামলিঙ্গমের কথা শুনতে। অফিস আরম্ভ হতে এখনও কুড়ি মিনিট বাকি।

"আমার পকেটে তখন বারোটা টাকা, মায়ের গয়না বেচে মা দিয়েছেন। তখন অবশ্য বারো টাকা মানে অনেক টাকা। তিন মাস পরে আমি যখন তামিলনাড়ুতে ফিরে যাবো তখন আমার সঙ্গে থাকবে দু লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার সাতশ' ছত্রিশ টাকা। তুমি তো জানো আমি মিথ্যে কথা বলি না।"

সেটা সত্যি কথা, রামলিঙ্গম সায়েব অন্য ধরনের মানুষ।

রামলিঙ্গম বললেন, "আমার ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স তখন ৪৫।১২০।"

"অ্যাঁ! মাদ্রাজে পুরুষ মানুষেরও মেয়েদের মতো স্ট্যাটিসটিক্স নেওয়া হয়?" শ্যামলেন্দু জানতো না।

"নো, নো, মিঃ চ্যাটার্জি, আমি তোমাকে টাইপরাইটিং ও শর্টহ্যাণ্ড স্পিডের কথা বলছি। ম্যাড্রাসে বেকার ছেলেদের এইটাই ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স ছিল, বুঝতেই পারছো জীবন-মরণের প্রশ্ন!"

রামলিঙ্গম বলে চললেন, "ক্যালকাটায় পনেরো দিনেও কিছু হলো না। ফাদারের কাছে ফ্রেশ আশীর্বাদ চেয়ে চিঠি ছাড়লাম। কিন্তু কোনো রেজাল্ট নেই। তিন সপ্তাহ পরে বেশ নার্ভাস হয়ে গেলাম। শেষে একদিন ভোরবেলায় গঙ্গাস্নান সেরে, উপবাস করলাম। চোখ বুজে লর্ড ভেঙ্কটেশকে বললাম, 'এই পবিত্র মুহূর্তে তুমি আমার মুখের দিকে তাকাও। যদি দয়া করে একটা চাকরি দাও, তোমাকে রোজ জবা ফুল দিয়ে পুজো করবো।' মিস্টার চ্যাটার্জি, আজকালের ছেলেরা প্রেয়ারে বিশ্বাস করে না, কিন্তু সেদিনই আমি পিটারস্ কোম্পানিতে চাকরি পেয়েছিলাম। পিটারস্ কোম্পানির তখন ছোট্ট অফিস বৌবাজার স্ট্রীটে। বিলেত থেকে ফ্যান নিয়ে এসে বিক্রি করে। আমি যেমন অন্য সব অফিসে ঢুঁ মারতে যাই, সেদিন প্রেয়ারের পর প্রথম ঢুকে পড়লাম পিটারস্ কোম্পানিতে। তখন সর্বেসর্বা ছিলেন মিলার সায়েব, আর তাঁর বড়বাবু মিস্টার বাসুদেবন! মিস্টার বাসুদেবন আমার সব কথা শুনলেন, আমার অ্যাপ্লিকেশন পড়লেন, তারপর জিজ্ঞেস করলেন বিয়ে করেছি কি না। বললাম,

নিজে খেতে পাচ্ছি না, বউকে কী করে খাওয়াবো ? বাসুদেবন আমাকে মিলারের কাছে নিয়ে গেলেন। সায়েব ডিকটেশন দিলেন, চাকরি হয়ে গেল। তখনকার দিনকাল অন্য।

"কয়েক সপ্তাহ পরে মিলার সায়েব নিজেই একদিন বললেন, 'রামলিঙ্গম তুমি তো জানো, বাসুদেবনের স্পেশাল অনুরোধেই তোমাকে চাকরি দিয়েছি। এখনও কনফার্ম হওনি। এদিকে বাসুদেবন বেচারা এলডেস্ট ডটারের বিয়ের জন্য চিন্তিত।' আমি ব্যাপারটা বুঝলাম। বললাম, 'আমার আপত্তি নেই। যদি না আমার পেরেণ্টস আপত্তি করেন।' বাবাকে লম্বা চিঠি লিখে দিলাম, চাকরির এই অবস্থা। মিস্টার বাসুদেবনের দাদা গিয়ে বাবার সঙ্গে দেখা করলেন। শেষ পর্যন্ত বিয়ে হয়ে গেল—তবে কনফারমেশনের পরে।"

"তাহলে ভগবান ভেঙ্কটেশ আপনাকে অর্ধেক রাজত্ব এবং রাজকন্যা একসঙ্গে দিলেন," শ্যামলেন্দু হেসে মন্তব্য করলো।

"সেই জন্যেই তো মিঃ চ্যাটার্জি, ফুলের এত দাম হওয়া সত্ত্বেও রোজ ভেঙ্কটেশকে পূজো দিয়ে যাচ্ছি," মিস্টার রামলিঙ্গম উত্তর দিলেন।

একটু থেমে মিস্টার রামলিঙ্গম বললেন, "দেখ আমি হ্যাপি—আমার কোনো দুঃখ নেই। স্টেনো হয়ে ঢুকেছিলাম, পরে ফ্যানের গায়ে লেবেলও এঁটেছি। তখন ছোট্ট অফিস, মাসে একশখানা ফ্যান বিক্রি হলে হৈ-হৈ পড়ে যেত, মিলার সায়েব সকলকে চা খাইয়ে দিতেন। তারপর কোম্পানি বড় হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে আমিও বড় হয়েছি। আমার নিজেরই আজে সাড়ে-তিন হাজার মাইনে। দুটো ছেলেকেও ঢুকিয়েছি। জামাইও এখানে কাজ করে। আর কি চাই ? বলো!"

রামলিঙ্গম সায়েব অভিযোগ করলেন, "আজকালকার ছেলেরা বিশ্বাস করবে না, কিন্তু এ সবই ভেঙ্কটেশের আশীর্বাদ, আর বাবার অবাধ্য হইনি বলে। বাবা যখন খবর পেলেন আমার চাকরি হয়েছে, তখন আমাকে একটা চিঠি লিখেছিলেন। জানো, সেই চিঠিটা আমি সব সময় কাছে রেখে দিই।"

রামলিঙ্গম পকেট থেকে মানি ব্যাগ বার করে তার মধ্য থেকে একটা বিবর্ণ কাগজের টুকরো বার করলেন। তামিলে লেখা চিঠিটার গায়ে সিঁদুরের দাগ। চিঠিটা পরম যত্নে খুলে রামলিঙ্গম সায়েব বললেন, "বাবা লিখেছিলেন : মনে রাখবে সায়েব হচ্ছে অগ্নির মতো। অগ্নি থেকে খুব দূরে থাকলে তাপ পাওয়া যায় না আবার খুব কাছে গেলে দগ্ধ হবার প্রবল সম্ভাবনা। সুতরাং ভেঙ্কটেশ্বরের আশীর্বাদে আগুন থেকে ঠিক মাঝামাঝি দূরত্বে থাকবে।"

চিঠিটা মহামূল্যবান দলিলের মতো আবার সযত্নে ব্যাগের মধ্যে পুরে রেখে রামলিঙ্গম বললেন, "সারা জীবন আমি অফিসে বাবার উপদেশ মেনে চলেছি। দেখ কত লোক এলো, কত লোক হু-হু করে উঠলো, আবার চলে গেল—আমি ঠিক আছি।"

ঘড়ির দিকে নজর দিয়ে রামলিঙ্গম এবার প্রসঙ্গ পরিবর্তন করলেন। শ্যামলেন্দুর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "মিস্টার চ্যাটার্জি, সামনে তোমার আরও ভাল সময় আসছে। আমি জানি তুমি ভাবছ তেত্রিশ বছর বয়সে পাঁচ হাজার টাকা পাচ্ছ আর কী ভাল হবে? কিন্তু আমি বলছি আরও অনেক কিছু পড়ে আছে। তবে রবি তোমাকে নিয়ে একটু মজা করতে পারে। একটু চেষ্টা করতে হবে তোমাকে। তুমি একটা 'কোরাল' নাও!"

"সেটা আবার কী?"

"তোমরা যাকে প্রবালের আংটি বলো—লাল প্রবাল, বেশ বড় সাইজের।"

রামলিঙ্গম চলে যেতে চ্যাটার্জি একটু হাসলো। কে বললে, মার্চেন্ট অফিসে কিছু দেখবার নেই!

রামলিঙ্গমের মতো সন্তুষ্টি থাকলে বোধ হয় ভাল হতো। এই তো মাত্র দশ বছরে শ্যামলেন্দু চ্যাটার্জি যে উন্নতি করেছে তা গল্পের মতো। মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সে কমারসিয়াল ম্যানেজার। কিন্তু তাতেও সন্তোষ নেই। শ্যামলেন্দু যে লোভী তা নয়। পয়সার লোভটাই যে বড় তা নয়। কিন্তু উপরে ওঠার নেশাটা রক্তের মধ্যে আগুন ধরিয়ে রেখেছে।

পাবলিসিটি অফিসার মিঠু সেন এবার ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। "মিস্টার চ্যাটার্জি, আমাদের নতুন ফ্যানের বিজ্ঞাপনের মিডিয়া-লিস্টটা দেখবেন নাকি একটু? কোন কোন কাগজে যাচ্ছে তার লিস্ট রেডি, তা ছাড়া রেডিও জিংগল্ এবং সিনেমা শর্ট রয়েছে।"

মিঠু সেন চোঙা প্যান্ট পরেন। দু গালে বিরাট লম্বা জুলপি। আসল নাম ললিত সেন, কিন্তু প্রফেশনে সবাই মিঠু বলে ডাকে। মিডিয়া-লিস্টে সই করে দিলো শ্যামলেন্দু।

"নতুন ফ্যানের নামটা ভালই হয়েছে—কী বলেন? উর্বশী।" শ্যামলেন্দু জিজ্ঞেস করে।

"ভাল মানে? ওয়াণ্ডারফুল! এজেন্সির মিস নারগোলওয়ালা তো একসাইটেড। নিজে থেকে স্বীকার করলেন, অনেক দিন ফ্যানের বাজারে এমন ক্রিয়েটিভ নাম পাওয়া যায়নি," মিঠু সেন উত্তর দেন।

"বিশেষ করে আমরা যখন বিয়ের উপহার হিসেবে উর্বশীকে চালাতে চাই, কী বলেন মিঃ সেন ?" শ্যামলেন্দু উত্তর দেয়।

"নিশ্চয়, মোস্ট সার্টেনলি। আমাদের বিজ্ঞাপন এজেন্সির রিসার্চের যদি কোনো দাম থাকে, তাহলে মিস নারগোলওয়ালা বলছেন, আমরা ফ্যান সাপ্লাই দিয়ে উঠতে পারবো না।"

"কিন্তু এক্সপোর্ট মার্কেট ? বিদেশের বাজারটাও তো ক্রমশ ভাইটাল হয়ে উঠছে," শ্যামলেন্দু মতামত দেয়।

"আপনার কি ম্যারিকান বাজারের দিকে নজর আছে ? তাহলে মিস্টার চ্যাটার্জি সেনসেশন পড়ে যাবে—ইণ্ডিয়ার রাভিশঙ্কর, ইণ্ডিয়ার গাঁজা, আর ইণ্ডিয়ার চির-রহস্যময়ী সোসাইটি গার্ল উর্বশী। মিস নারগোলওয়ালা অবশ্য ওঁর ক্রিয়েটিভ নোটে বলেছেন, আমেরিকার বিজ্ঞাপনে আমাদের এই সেক্সটা আরও হাইলাইট করতে হবে। যেমন একটা সাজেশন দিয়েছেন, মেড-ইন-ইনডিয়া ভারতে প্রস্তুত না বলে, বিজ্ঞাপনে লেখা যেতে পারে কামসূত্রের দেশে তৈরি—মেড ইন দি ল্যাণ্ড অফ কামসূত্র।"

শ্যামলেন্দু কিন্তু মিঠু সেনের মতো উৎসাহিত হলো না। সিগারেট ধরিয়ে বললে, "কিন্তু আমাদের ব্রীফে দেখেছেন, আমেরিকাতে আমাদের পাখার বাজার একেবারেই নেই বললেই হয়। সাড়ে-সাত টাকায় এফ-ও-বি একটা পাখা দিতে পারলে ওরা হাজার খানেক নিতে পারে। আমি এখন থাইল্যাণ্ড, কোরিয়া, মালয় এসবের কথা ভাবছি।"

বিশেষজ্ঞের মতো গম্ভীরভাবে মিঠু উত্তর দিলেন, "ডেফিনিটলি এ-বিষয়ে কিছু বলতে গেলে বোধ হয় মিস নারগোলওয়ালা এবং আমাকে একবার দেশগুলো দেখে আসতে হবে। তবে এজেন্সির ডেস্ক রিসার্চ বলছে, থ্যাংকস টু আওয়ার পিতৃপুরুষ, থাইল্যাণ্ডে উর্বশী নামটা এবং এই মহিলার কীর্তিকলাপ প্রায় সবাই জানে। সুতরাং উর্বশীকে এসট্যাবলিশ করার জন্যে আমাদের খুব হেভি বিজ্ঞাপন করতে হবে না।"

মিঠু সেন এবার শ্যামলেন্দুকে খুশী করার জন্যে বললে, "দেশে এবং বিদেশে আপনি যেভাবে জাল ছড়াচ্ছেন তা দেখে মিস নারগোলওয়ালা তো অবাক। কালকেই লা-ভেগা বার-এ বসে আমরা একটু ক্রিয়েটিভ ডিসকাশন করছিলাম। মিস নারগোলওয়ালা বললেন, এজেন্সির দৃঢ় বিশ্বাস বিজ্ঞাপনের খরচটা আরও কিছু বাড়ালেই সামনের বছরে আমাদের কারখানা বাড়াতে হবে—সাবটেনশিয়াল এক্সপ্যানশনের জন্যে শিগগির গভর্নমেন্টের কাছে আবেদন করতে হবে।"

শ্যামলেন্দু আর কথা বাড়াতে দিলো না। গম্ভীরভাবে বললে, "রপ্তানি-বিজ্ঞাপনের ব্যাপারটা আরও ডিটেলে চিন্তা করা যাবে। আপনি নোট তৈরি করুন! ইতিমধ্যে দেখা যাক কী হয়।"

"বড় বড় কাগজগুলোতেও তাহলে সোলাস পোজিশন নিচ্ছি—ডবল চার্জ—কিন্তু সেখানে আর কোনো বিজ্ঞাপন থাকবে না।"

"ভাল আইডিয়া—সোলাস নিন," শ্যামলেন্দু এবার মিঠু সেনকে বিদায় করলে।

সোলাস—এই সোলাস পোজিশনের জন্যেই পৃথিবীর লোকেরা মারামারি করছে। শ্যামলেন্দু চ্যাটার্জিও সোলাস পোজিশন চায়। ডিরেকটরের পদটাই সোলাস। কিন্তু সেখানেও রুণু সান্যালের ছায়াটা তাকে তাড়া করছে। একই বছরে রুণু ঢুকেছিল—হিন্দুস্থান পিটারস্-এ। তারপর দুজনেই একই সঙ্গে উন্নতি করে যাচ্ছে। যেন ৪৪০ গজ রেস চলেছে। পাকের পর পাক খেতে খেতে অনেকে পিছিয়ে পড়েছে। এখন আর একটা মাত্র পাক বাকি—সেখানে মাত্র দুজন প্রতিদ্বন্দ্বী—শ্যামলেন্দু চ্যাটার্জি আর রুণু সান্যাল।

একটু পরেই দরজায় টোকা পড়লো। রুণু ঘরের মধ্যে উঁকি মেরে জিজ্ঞেস করলে, "আসতে পারি?"

রুণুর এই টোকা-মারা অভ্যাসটা শ্যামলেন্দুর ভাল লাগে না। একটা লোক দরজা খুলে অর্ধেক নাক বাড়িয়ে দিলে, কী করে বলা যায় এখন আসবেন না!

শ্যামলেন্দু নিজে তা কখনও করে না। রুণুর সঙ্গে কোনো দরকার থাকলে ইনটারন্যাল টেলিফোনে আগে জিজ্ঞেস করে নেয়।

মনের ভাব চেপে রেখেই শ্যামলেন্দু বললে, "এসো এসো।"

একখানা ফাইল নিয়ে রুণু সামনের চেয়ারে বসে পড়লো। "তোমার সঙ্গে কয়েকটা পয়েন্ট আলোচনা ছিল।"

"তুমি তো সব সময়ই ওয়েলকাম," শ্যামলেন্দু বলে। তারপর জিজ্ঞেস করে, "তোমার মার্কেট কেমন? আমি তো ভাই পাখা বিক্রি করতে গিয়ে নাস্তানাবুদ হচ্ছি। সেলসের লোকরা বলছে, একখানা পিটারস্ ফ্যান কিনলেই সারাজীবন কেটে যায়। সুতরাং রিপ্লেসমেন্ট সেল বলে কোনো জিনিসই নেই।"

"আমাদের মার্কেট ফোরকাস্ট অনুযায়ী ল্যাম্পের বাজার খুব খারাপ হওয়ার কথা ছিল। লিস্ট প্রাইস থেকে হানড্রেড ওয়াট দশ পয়সা কমে বিক্রী

হবে আমরা ভেবেছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি প্রত্যেক পিস পিটারস্ ল্যাম্প পঞ্চাশ পয়সা প্রিমিয়ামে বিক্রী হচ্ছে। ব্ল্যাক কথাটা এই ব্যবসায় কেউ ব্যবহার করে না—তার বদলে বলে প্রিমিয়াম! দাম চড়লে প্রিমিয়াম, নামলে ডিসকাউন্ট।"

"কনগ্রাচুলেশন ব্রাদার, মার্কেটিং জিনিয়াস না হলে এমন সম্ভব হয় না," শ্যামলেন্দু অভিনন্দন জানায় রুণু সান্যালকে।

রুণু সান্যাল বিনা প্রতিবাদে এমনভাবে গ্রহণ করলে যেন অভিনন্দনটা সত্যিই তার পাওনা ছিল। সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বললে, "মিস্টার ফেরিসও আজ কনগ্রাচুলেট করলেন। স্টকে মাছি ঘুরছে। টেবিলে বসতে পারছি না, ডীলাররা হানড্রেড ওয়াট ল্যাম্প আরও নেবার জন্যে মিনিটে মিনিটে টেলিফোনে জ্বালিয়ে খাচ্ছে। তবে ব্রাদার, আমাকে কিছু করতে হয়নি। যদিও মিঠু সেন লাফাচ্ছে—গত মাসে ঐ মুটকি মিস নারকোলওয়ালা না গোলমালওয়ালা কি বিজ্ঞাপন ছেড়েছিল, তার জন্যেই নাকি আমাদের বিক্রী বেড়ে গিয়েছে। আসলে দুটো ল্যাম্প কোম্পানিতে স্ট্রাইক চলছে, তারা বাজারে একদম মাল দিতে পারছে না।

"আমিও এই তালে দুষ্টু ডীলারগুলোকে টাইট দেবার ব্যবস্থা করছি। বেটাচ্ছেলে মণ্ডল কোম্পানি দু মাস আগেও বড় বড় বাত্ ছেড়েছে বাজারে একটু যোগান বেশী ছিল বলে। এখন স্যর স্যর করছে। আমি খোসলাকে বলে দিয়েছি একটা ল্যাম্পও যেন মণ্ডলকে না দেওয়া হয়! তার থেকে সাপোর্ট করো চোখানিয়া ব্রাদার্সকে যারা সব সময় গাঁটের পয়সা আগে ফেলে মাল তুলে নিতে রাজী থাকে।"

চোখানিয়া ব্রাদার্স পিটারস্ ফ্যানও বিক্রী করে। পূর্বাঞ্চলের সেলস ম্যানেজার হীরানন্দানির মুখে গতকালই শ্যামলেন্দু শুনেছে, চোখানিয়া কোনোরকম বাড়তি সাহায্য করে না। কারণ চোখানিয়া জানে অদূর ভবিষ্যতে ইণ্ডিয়াতে ফ্যানের কোনো অভাব হবে না। ও-বিষয়ে কোনো কথা না তুলে, শ্যামলেন্দু বললে, "তাহলে এখন বেশ ঝাড়া হাত-পা?"

"হ্যাঁ, কাজ যখন নেই, তখন ভাবলাম এই দশকের চ্যালেঞ্জের জন্যে প্রস্তুত হওয়া যাক। বড়সায়েব প্রায়ই বলেন না, চ্যালেঞ্জ অফ দি ডেকেড! ভাবলাম, সামনের দশ বছরের একটু অ্যাডভান্স প্ল্যানিং করা যাক। ডেভিডসন ফিরলেই আলোচনা করা যাবে।"

"ডেভিডসনের তো ফেরার সময় হয়ে গিয়েছে, তবু ফিরছেন না কেন?"

শ্যামলেন্দু জিজ্ঞেস করলে।

"তোমার বেলটা টিপে বেয়ারাকে একটু কফি আনাতে বলো না। বিবি আর আমি ফিরেছি ভোর তিনটেয়। আমার ফ্রেণ্ড, হিগিনস্ কোম্পানির ডিরেকটর সুরিন্দর লাল-এর বাড়িতে ডিনার ছিল। ইনফরমাল পার্টি। কিন্তু ভাই, মালের ঝোঁকে সবাই ডান্স করতে চাইলে। নাচ সেরে মাথা ধরে গেল। রাত্রে একটুও ঘুম হয়নি। সুরিন্দর লাল আমার সঙ্গেই ডুন ইস্কুলে পড়তো। মাথায় পবিত্র গোবর ছাড়া আর কিছুই ছিল না। কিন্তু কেমন টপাটপ এগিয়ে গিয়ে হিগিনসের ডিরেকটর হয়ে গেল।"

বেয়ারাকে ডেকে কফি আনতে বললে শ্যামলেন্দু। সান্যাল সায়েব বেয়ারাকে অনুরোধ করলেন, "নটবর, আসবার সময় আমার টেবিল থেকে স্যাকারিনের শিশিটা এনো।"

"আবার স্যাকারিন কেন?" শ্যামলেন্দু জিজ্ঞেস করে।

"বিবি বিরক্ত হয়েছে, বলছে ভুঁড়ি কমাতে হবে। যত হুইস্কি খাচ্ছি তার সবটাই নাকি মধ্যপ্রদেশে জমা হচ্ছে।" রুণু নিজের কোমরটা দেখিয়ে দিলে।

কফির কাপে চুমুক দিয়ে শ্যামলেন্দু জিজ্ঞেস করলে, "হ্যাঁ, গুজবের ব্যাপারটা কী বললে?"

"জানি না কতটা সত্যি। মাই ওল্ড ফাদারকে দেখতে গিয়েছিলাম গতকাল সকালে। সবাই জিজ্ঞেস করলেন, সুতানুটি ক্লাব না কোথায় শুনেছেন ডেভিডসনের নাকি পেটে ক্যানসার সন্দেহ করছে। ভগবান জানে, ব্রাদার। তা ছাড়া মাই পিতৃদেব ভদ্রলোকটির কথাও একটু ডিসকাউণ্টে নিতে হবে। সাত-সকালেই আড়াইখানা হুইস্কি শেষ করে বসে ছিলেন। রিটায়ার্ড লোক। কোনো কাজকম্ম নেই। মা পূজো করছেন, আর পিতৃদেব মেজর জামাইকে ধরে সস্তায় মিলিটারি ক্যানটিন থেকে হুইস্কি আনিয়ে টানছেন।"

"অসুখ? ডেভিডসনের?" শ্যামলেন্দুর মনটা খারাপ হয়ে গেল। এক মুহূর্তের জন্যে মনে পড়ে গেল পাটনা হোটেলের সেই দৃশ্যটা। ডেভিডসন মফস্বল কলেজের এক অখ্যাত ছোকরা মাস্টারকে সাইকেলে পর্যন্ত এগিয়ে দিতে আসছেন।

কফির কাপে স্যাকারিন ফেলে চামচটা নাড়ছে রুণু। হঠাৎ শ্যামলেন্দুর নজরটা সেই দিকেই পড়লো। রুণুর হাতে আগে তো ওটা ছিল না—বিরাট একটা লাল রঙের প্রবালের আংটি!

রুণু ব্যাপারটা লক্ষ্য করলে। বললে, "গিন্নি এটা পরতে বাধ্য করলেন।

ভগবান জানেন কেন। এদিকে এত মেমসায়েব—কিন্তু সম্প্রতি এইসব গ্রহ-নক্ষত্র সম্পর্কে দুর্বলতা দেখা যাচ্ছে। বাগবাজারের ওখানে এক রাজজ্যোতিষীর কাছে প্রায়ই যাতায়াত করছে।"

এরপর দুজনের ব্যবসায়িক কাজ শুরু হয়ে গেল। রুণু চায়, কিছু সেল্‌সম্যান লাইট এবং পাখা দুই বেচুক। তাহলে তার ডিপার্টমেণ্টের খরচ একটু কমে। শ্যামলেন্দু বললে, "তুমি তো জানো, পাখা আর ল্যাম্প বিক্রি এক জিনিস নয়। তা ছাড়া সামনের বছর থেকে আমার ইনডাসট্রিতে প্রোডাকশন শতকরা কুড়ি ভাগ বেড়ে যাবে। তখন পিটারস্‌ পাখা বিক্রির জন্যে অনেক মেহনত করতে হবে।"

"কাম অন! শ্যামলেন্দু, তুমি কিন্তু কোরো না। মাল বিক্রির অসুবিধে হবে অন্য কোম্পানির—তোমার উর্বশী মডেলের নয়।"

"ভাই, ইণ্ডিয়াতেও সাধারণ মানুষ বোকা থাকছে না। উর্বশী, মেনকা, রম্ভা কেউ খরিদ্দারের মন পটাতে পারবে না, যদি দাম বেশী হয় এবং জিনিস ভাল না হয়," শ্যামলেন্দু উত্তর দিলো।

আলোচনার পরে শেষ পর্যন্ত ঠিক হলো একটা অঞ্চলে সিস্টেমটা চালু করে দেখা যাক—দুটো জিনিসের জন্যে একটা সেল্‌সম্যান। "তবে আমার কাজে অসুবিধে হলেই উইথড্র করবার স্বাধীনতা রইলো।" শ্যামলেন্দু সোজাসুজি জানিয়ে দিলো।

রুণু বললে, "ঠিক হ্যায়। আমি তাহলে ম্যানেজিং ডিরেকটরকে নোট দিয়ে দিই।"

রুণু এবার বেরিয়ে গেল। তার হাতে নতুন পলার আংটিটা আবার শ্যামলেন্দুর নজরে পড়ে গেল। দোলনকে রাজজ্যোতিষীর কথা বললে এখনই বাগবাজারে ছুটবে—পলার আংটি কিনে স্বামীকে পরিয়ে তবে ছাড়বে। কিন্তু এর মধ্যে নেই শ্যামলেন্দু। উপরে উঠতে যদি হয় কাজ করেই উঠবে শ্যামলেন্দু। —মামার জোরে নয়, বংশকৌলীন্য দেখিয়ে নয়, এমন কি গ্রহ-নক্ষত্রকে সন্তুষ্ট করেও নয়।

ইতিমধ্যে ম্যানেজিং ডিরেকটরের ঘর থেকে ডাক পড়লো।

ফেরিস সায়েব ফিনানস্‌ ডিরেকটর গর্ডনকে নিয়ে কোম্পানির অর্থনৈতিক স্বাস্থ্যের পর্যালোচনা করছেন। গর্ডন বললেন, "চ্যাটার্জি, তোমার ফ্যান ডিভিশনের নোট পড়লাম। আমার মনে হয় পরিকল্পনা খুবই ভাল হয়েছে। কারণ ফ্যান কারখানার নয় মাসের প্রোডাকশন তুমি ইণ্ডিয়াতে বেচছো—আর

তিন মাস পুরো কাজ হতো না। শীতের এই প্রোডাকশনটা তুমি বিদেশে রপ্তানি করছো।"

ফেরিস বললেন, "তোমার রপ্তানির অবস্থা কেমন ?"

"মোটামুটি ভাল। আর দশ দিনের মধ্যে আমরা থাইল্যাণ্ড এবং কোরিয়ায় শিপিং করবো। এই রপ্তানি থেকে আমরা যে খুব লাভ করবো তা নয়। কিন্তু কোম্পানির সুনাম বৃদ্ধি পাবে। সরকার খুশী হবেন। ল্যাম্প ডিভিশনের যে সমস্ত সাবকমপোনেণ্ট এখনও বিদেশ থেকে আসে সেগুলোর জন্যে বাড়তি ইমপোর্ট লাইসেন্স পাওয়া যাবে। অথচ আমাদের হোম-মার্কেটের কোনো ক্ষতি হবে না," শ্যামলেন্দু উত্তর দেয়।

"ফ্যাকটরি থেকে সমস্ত সহযোগিতা পাচ্ছ তো ? কোনো অসুবিধা হলে বলো, টেকনিক্যাল ম্যানেজার হার্টলের সঙ্গে আমরা কথা কইবো।" ফেরিস সায়েব উত্তর দিলেন।

একটা কাগজের দিকে তাকিয়ে ফিনানস ডিরেকটর এবার বললেন, "সবই ভাল। শুধু যদি তোমার ডিভিশন থেকে আরও দশ লক্ষ টাকা প্রফিট করতে পারতাম, তাহলে চলতি আর্থিক বছরে রেকর্ড লাভ হতো।"

ফেরিস সায়েব বললেন, "হোম অফিস থেকে টেলেক্স পাঠিয়েছে—বলছে লাভের নতুন রেকর্ড করার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা প্রয়োজন।"

মিস্টার গর্ডন জানতে চাইলেন, "চ্যাটার্জি, এক্সপোর্ট থেকে কিছু করা যায় না ?"

"এক্সপোর্ট তো সবই কনট্রাকটের ব্যাপার—অনেক দিন আগেই সই হয়ে গিয়েছে," শ্যামলেন্দু উত্তর দেয়।

ফেরিস সায়েব বললেন, "চ্যাটার্জি, তুমি সব জিনিসটা রিভিউ করে দেখো। তুমি চেষ্টা করলে কিছু প্রফিট আসবেই।"

শ্যামলেন্দু যখন বেরিয়ে এলো, ম্যানেজিং ডিরেকটরের ঘরে তখনও লাল আলো জলছে। শ্যামলেন্দুর মনে হলো, কেউই তাহলে সর্বশক্তিমান নন। ফেরিস এবং গর্ডনও তাঁদের হোম বোর্ডের কাছে নাম কেনার চেষ্টা করছেন। ফেরিস তো সেদিন বলছিলেন, "ক্যাপিটালের ওপর আমরা কত টাকা লাভ করতে পারলাম, সেই হিসেব করে হোম অফিস আমাদের মেরিট বিচার করে।"

ঘরে বসতে না বসতেই বেয়ারা হাতে একটা স্লিপ দিলো। টুটুল না! দেখছো মেয়ের কাণ্ড—স্লিপ পাঠিয়েছে। টেলিফোনে মিস্ চক্রবর্তীকে শ্যামলেন্দু

বললে, "মিস ভট্টাচার্যকে পাঠিয়ে দিন।"

মিস ভট্টাচার্যের সঙ্গে এক গাল হেসে দোলনও ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো। করমর্দনের জন্যে হাত বাড়িয়ে দিয়ে শ্যামলেন্দু বললে, "টুটুল, এই রসিকতা কেন? সোজা চলে এলে পারতে।"

দোলন বললে, "টুটুলের ইচ্ছে হলো একটু মজা করে, তাই স্লিপ পাঠালে।"

"তা ধন্যি আপনি," টুটুল বললে। "কতক্ষণ স্লিপ দিয়ে বসে আছি, কোনো খবর নেই। রাগ করে চলেই যাচ্ছিলাম।"

"আমি খুবই দুঃখিত, টুটুল। ম্যানেজিং ডিরেকটর ডেকে পাঠিয়েছিলেন।"

"বউ আগে, না ম্যানেজিং ডিরেকটর আগে?" টুটুল মুখ টিপে প্রশ্ন করে।

উত্তরটা দোলনই দিলে। "মার্চেন্ট অফিসের কেষ্ট-বিষ্টুরা জানে চাকরি থাকলে বউ-এর অভাব হবে না!"

শ্যামলেন্দু বললে, "ম্যানেজিং ডিরেকটর হুকুম করলে কিছু কাঁচাখেগো অ্যামবিশাস একজিকিউটিভ সীতাকে বনবাস পাঠাতে পারে। কিন্তু তুমি তো জানো প্রিয়া, তোমার রামচন্দ্র গেরস্ত বাঙালী!" এবার শ্যালিকার দিকে তাকিয়ে শ্যামলেন্দু বললে, "দিদিকে একটু ঠাণ্ডা করো, আমি তো অপরাধের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।"

হাসতে হাসতে সুদর্শনা বললে, "আচ্ছা, এবারের মতো ক্ষমা করলাম।"

দিদির দিকে মুখ ফিরিয়ে টুটুল বললে, "দিদি, এবার মুখে হাসি ফোটা। তুই তো আজকে বললি, খিটখিটে মেয়েদের বরদের সহজে পদস্খলন হয়।"

"তোমরা কফি খাবে?" শ্যামলেন্দু জিজ্ঞেস করলো।

দোলন বললে, "ঘড়ির দিকে তাকাও। একটা বাজতে পাঁচ মিনিট।"

"শ্যামলদা, আপনার ঘরটা কী সুন্দর সাজানো," সুদর্শনা প্রশংসা করে। "আপনাকে এই পরিবেশে ঠিক সিনেমার হিরোর মতো দেখাচ্ছে।"

"সিনেমার হিরোদের ফ্যান বেচতে হয় না," শ্যামলেন্দু উত্তর দেয়।

"আচ্ছা শ্যামলদা, আপনার ঘরের ঐ ছবিটা কিসের?"

"ছবিটা নতুন আনিয়েছি বিলেত থেকে। আমাদের কোনো একটা বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করবার ইচ্ছে আছে। মিলিয়ন পাউণ্ড খরচ করে তৈরি হয়েছে ওই হাওয়া-গবেষণা কেন্দ্র।"

"গায়ে হাওয়া লাগাবার জন্যে আপনারা মিলিয়ন পাউণ্ড খরচ করে বসলেন!" চটপট উত্তর দিলো সুদর্শনা।

"সেই কথাটাই তো পাবলিককে জানাতে চাই। ওখানে আমরা বিভিন্ন

চেম্বারে বিভিন্ন পরিবেশ সৃষ্টি করি—ইণ্ডিয়ার জুন মাস, ইথিয়োপিয়ার সেপ্টেম্বর মাস, স্পেনের মার্চ মাস, যা খুশী। তারপর সেখানে নানারকম হাওয়া বইতে থাকে—সমুদ্রের হাওয়া, নদীর হাওয়া, শীতের হাওয়া, বসন্তের হাওয়া! কমপিউটার এই সব হাওয়া সম্বন্ধে রিপোর্ট তৈরি করে। সেইসব রিপোর্ট পড়ে নামকরা সায়েনটিস্টরা আমাদের পিটারস্ ফ্যানের নতুন মডেল তৈরি করেন। বুঝলে?"

"ওয়াণ্ডারফুল। আপনি সত্যি সুপার-সেল্‌সম্যান, শ্যামলদা," জামাইবাবুকে সার্টিফিকেট দিয়ে দিলো সুদর্শনা। "এখন বুঝতে পারছি মাত্র ন'বছরে আপনি কেন এত উন্নতি করতে পেরেছেন।"

দরজার কাঁচের মধ্য দিয়ে কে যেন উঁকি মারলো। শ্যামলেন্দু বললে, "কাম ইন।"

ঘরে ঢুকলো সুদর্শন শ্যামলকান্তি ছিপছিপে এক যুবক। ম্যানেজমেণ্ট ট্রেনি অতনু রে নিশ্চয় সারাজীবন ইংলিস মিডিয়ামে পড়াশোনা করেছে। এদের বাংলার মধ্যে একটু আদুরে-আদুরে ভাব থাকে। বেশ বিনয়ের সঙ্গেই বাংলায় অতনু রে জিজ্ঞেস করলে, "আপনি আমাকে খুঁজেছিলেন? আমি একটু রাধাবাজারে গিয়েছিলাম মার্কেট রিসার্চে। মফস্বল থেকে যারা ইলেকট্রিক পাখা কিনতে আসে তাদের পাঁচজনকে ইনটারভিউ করেছি আজ। আপনার কথাটাই সত্যি, মিস্টার চ্যাটার্জি। এরা বিভিন্ন পাখা কোম্পানির বিজ্ঞাপন দেখেছে, কিন্তু কেনবার বেলায় বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন এবং অফিসের সহকর্মীদের পরামর্শ নিয়েছে।"

শ্যামলেন্দু বললে, "এ-বিষয়ে আপনার সঙ্গে পরে বিস্তারিত আলোচনা হবে। আপনি অন্ততঃ দেড়শ' সামপ্‌ল ইনটারভিউ করুন। দরকার হলে ঠিকানা নিয়ে ওদের বাড়িতে যান, ওদের বাইং হ্যাবিটস এবং সাইকলজী স্টাডি করুন। আপনাকে এখন কোনো দরকার নেই, এমনি খোঁজ করছিলাম।"

অতনু বেরিয়ে গেল। দোলন বেশ খুঁটিয়েই অতনুকে দেখে নিলো। "ওকে আগে দেখেছি না?" দোলন জিজ্ঞেস করে।

শ্যামলেন্দু বললে, "হ্যাঁ, এম-ডির বাৎসরিক টি-পার্টিতে দেখেছো। বছরে ওই একদিনই তো জুনিয়র অফিসার এবং ম্যানেজমেণ্ট ট্রেনিদের সঙ্গে আমাদের সামাজিক মেলামেশা হয়।"

"ম্যানেজমেণ্ট ট্রেনিদের ভবিষ্যৎ কী রকম?" দোলন জানতে চাইলো।

শ্যামলেন্দু মিটমিট করে হাসতে হাসতে বললে, "এক কথায় উজ্জল।

ইংরেজের তল্পিবাহক বড়লোকের গবেট ছেলেরা আগে বংশপরিচয়ের সুবাদে মার্চেণ্ট অফিসে চান্স পেত। স্বাধীনতার ঠিক পরেই গভরমেণ্টের বড় বড় অফিসাররা তাদের ছেলে এবং জামাইদের এই লাইনে ঢুকিয়েছে। কোম্পানির কর্তারা দিল্লীর আমলাদের খুশী করবার সুযোগ পেয়ে ধন্য হয়েছেন। ইনডাসট্রির ভবিষ্যৎকে নিরাপদ করার এইটাই সহজতম উপায় মনে হয়েছে। কারণ কে চাইবে, ছেলে এবং জামাইয়ের অফিস উঠে যাক! এখন কোম্পানিগুলো ঠেকে শিখছে। বুঝছে, এদেশে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে বুদ্ধিমান এবং কর্মঠ লোকদের চাই—যারা দেশের মানুষদের জানে, তাদের মনের কথা বোঝে। এখন তাই কলেজের সেরা ছেলেদের ইনডাসট্রি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছে। ম্যানেজমেণ্ট শিক্ষানবিশদের আমাদের এখানে দু বছরের ট্রেনিং নিতে হয়। তারপর ওরা ঝপাঝপ উন্নতি করে। বোম্বাইতে দু-একটা কোম্পানিতে ম্যানেজমেণ্ট ট্রেনিরা এর মধ্যেই ম্যানেজিং ডিরেকটর হয়েছে।”

ওরা এবার বেরিয়ে পড়লো। আড়চোখে বাবুরা দেখলো, মিসেস চ্যাটার্জি এবং একটি সুদেহী সুন্দরী যুবতীকে নিয়ে মিস্টার চ্যাটার্জি আজ একটা বাজবার ত্রিশ সেকেণ্ড আগেই অফিস থেকে বেরিয়ে গেলেন।

“এবার কোথায় যাচ্ছি আমরা।” গাড়িতে বসে দোলন জিজ্ঞেস করলে।

“ক্লাবে,” উত্তর দেয় শ্যামলেন্দু।

“এখন ক্লাবে?” টুটুলের মুখে জিজ্ঞাসা।

“দুপুরের খাওয়াটা আমরা ক্লাবেই সেরে নেবো, টুটুল,” দোলন বলে।

“ক্লাবে খাবার পাওয়া যায় নাকি?” টুটুল বেশ অবাক হয়ে যায়।

“একি আর আমাদের কদমকুয়ার ক্লাব! এখানকার ক্লাবে রেস্তোর। আছে, বার আছে, সুইমিং পুল আছে।” দোলন বোনকে বুঝিয়ে দিলো।

গোবিন্দপুর ক্লাবের বিরাট বাড়িটা দেখেও টুটুল অবাক। দোলন বললে, “ও মেম্বার, তবে সব খরচ কোম্পানি দেয়। ক্লাবের মেম্বার হলে কত নামকরা লোকের সঙ্গে আলাপ হয়, তাতে অফিসের কাজের সুবিধে। ব্যবসাদাররা ঠেকে ঠেকে শিখেছে, অচেনা লোকের কাছে হঠাৎ হাজির হলে কাজ আদায় করা যায় না। এই চেনা-জানা ব্যাপারটা কোম্পানির পক্ষে খুব ইমপর্টাণ্ট।”

কার্ডরুমে বসে কয়েকজন মহিলা তখন সিগারেট ও বীয়ার সহযোগে তাস খেলছেন। দোলন বললে, “মেম্বারের বউরা দুপুরে এখানে তাস খেলতে আসে। তারপর ইচ্ছে করলে লাঞ্চটাও এখানে সেরে যায়। সঙ্গে পয়সা আনতে হয় না —চালানে সই করে দিলেই হলো। মাসের শেষে ক্লাবের নগেনবাবু স্বামীর

কাছে বিল পাঠিয়ে দেবেন।"

দোলন ফিস ফিস করে বোনকে বললে, "দেশের স্বাধীনতায় এই ক্লাবের বিরাট দান আছে, বুঝলি? তখন কলকাতায় ছিল কেবল সুতানুটি ক্লাব—ওনলি ফর সাদা চামড়া। ইণ্ডিয়ানদের সেখানে নেওয়া হতো না। তারই প্রতিবাদে ন্যাশনালিস্ট ইণ্ডিয়ানরা স্যর হরেন পালের নেতৃত্বে বহু ত্যাগ স্বীকার করে এই ক্লাব প্রতিষ্ঠা করে।"

"তারপর?" টুটুল জিজ্ঞেস করে।

"তারপর আর কী, সায়েবদের চোখ ট্যারা। কিন্তু স্যর হরেন পাল ওদের মোক্ষম জুতো মারলেন, বললেন, গোবিন্দপুর ক্লাব সুতানুটি ক্লাবের পথ অনুসরণ করবে না। আমাদের ক্লাবে সায়েবরাও মেম্বার হতে পারবে।"

টুটুলের দৃষ্টি এবার অন্যদিকে নিবদ্ধ হলো। হলের এক কোণে বিরাট একটা বীয়ারের মগ নিয়ে নির্বাক নিস্তব্ধ হয়ে বসে আছেন এক শীর্ণ বৃদ্ধ। ঠিক যেন মিশরের মমি। "দেখ দেখ দিদি।"

"চুপ চুপ," সাবধান করে দেয় শ্যামলেন্দু। "আমাদের ডিরেকটর স্যর বরেন রায়, আই-সি-এস রিটায়ার্ড। বউ বড্ড খিটখিটে, ছেলেটা হাবা-বোবা। বেচারা বাধ্য হয়ে এই ক্লাবে এসে চুপচাপ বসে থাকেন আর বীয়ার খান।"

ওরা তিনজন এবার লাঞ্চরুমে প্রবেশ করলো। একটা টেবিল দখল করে শ্যামলেন্দু জানতে চাইলো, "কী খাবে টুটুল—চীনে না ইংরিজী? না তন্দুরি? তাছাড়া আছে কোল্ড বুফে।"

"অত আমি বুঝি না, শ্যামলদা," টুটুল বলে ফেললে।

"আজকে চাইনীজ বলো, টুটুলের খারাপ লাগবে না। চাইনীজ স্টুয়ার্ড মিস্টার হুয়াকে ডাকো, আমি নিজে অর্ডার দিচ্ছি।' গোবিন্দপুর ক্লাবের চীনে কুকের খুব নাম, বুঝলি টুটুল।"

টুটুল একটু বিস্ময়ের সঙ্গে চারদিক খুঁটিয়ে দেখছে। দোলন বললে, "কলকাতায় এক একটা দোকানে এক একটা খাবার ভাল। তোকে এক এক করে সব রেস্তোরাঁ ঘোরাবো। ব্লু-ফক্সে সিজলিং স্টেক, স্কাইরুমে বেকটি মেয়নেজ, ফারপোতে ফ্রায়েড ফিশ উইথ টার্টার সস, অ্যামবারে রোটি কাবাব, মোকাম্বোতে চিকেন তন্দুরি, মদিরার্তে বেঙ্গলী ডিশ। লিডো রুমে স্মোকড হিলশা খুব ভাল করে। কিন্তু এখন সিজন নয়, পাওয়া যাবে না।"

"আমরা মাঝে-মাঝে রান্না বন্ধ দিয়ে বাইরে ডিনার খেতে বেরোই," দোলন বোনকে জানায়।

খাবার টেবিলে শ্যামলেন্দু জিজ্ঞেস করলে, "সকাল থেকে কী করলে তোমরা ?"

দোলন লিস্টি দিতে আরম্ভ করলে! "প্রথমে গেলাম ক্যালিকোর দোকানে। ওখান থেকে হাসেমের টেলরিং শপে। টুটুলের দু-একটা বডি ফিটিং ব্লাউজ করিয়ে দেবার জন্যে। তা মেয়ের কি লজ্জা—কিছুতেই বোনের টাকায় জিনিস নেবেন না। আমি বললাম, হাসেম হচ্ছে ওয়ার্লড ফেমাস। এ-ব্লাউজ তুই পাটনায় পাবি না।

"তারপর লিণ্ডসে স্ট্রীটে ও নিউ মার্কেট ঘুরে ঘুরে ওকে দেখালাম। চারটে পেটিকোট কেনা গেল। সেদিন কাগজে বেরিয়েছিল না, নিউ মার্কেটের পেটিকোটের সমস্ত ইণ্ডিয়া-জোড়া নাম। টুটুল বিশ্বাস করতে চায় না। জানো, এরকম বউ তুমি পাবে না। দরদস্তুর করে তোমার ছ' টাকা বাঁচিয়ে দিয়েছি।"

"এই তো চাই," শ্যামলেন্দু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

তারপর বলে, "জানো টুটুল, আমাদের অফিসের পারচেজ ডিপার্টমেন্টের লোকগুলো যদি তোমার দিদির মতো হতো, তাহলে কোম্পানির আরও উন্নতি হতো। কোম্পানির টাকায় ওদের মায়া দয়া নেই।"

শ্যামলেন্দুর মন্তব্যে কান না দিয়ে দোলন বললে, "নিউমার্কেট থেকে বেরিয়ে আমরা দুজনে গেলাম জেনি টিউডর হেয়ার ড্রেসারের ওখানে। টুটুলের চুল বাঁধালাম। নিজের হেয়ার ডু করালাম। কী ভীড় ওখানে। এক সপ্তাহ আগে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট করাতে হয়। তবু তোমরা বলবে কলকাতায় ব্যবসা-বাণিজ্য কমে যাচ্ছে। জেনি টিউডর থেকে ছাড়া পেয়েই ছুটেছি মোকাম্বোতে—মিসেস ফেরিসের কফি পার্টি।"

"আচ্ছা।" শ্যামলেন্দু বলে।

টুটুল বললে, "জানেন শ্যামলদা, আমি গাড়িতে বসেছিলাম। কিন্তু মিসেস ফেরিস এমন সুন্দর মহিলা যে দিদির মুখে আমার খবর পেয়ে নিজে বেরিয়ে এসে আমাকে ভিতরে নিয়ে গেলেন।"

"লেডিজ কফি মীট-এ কাদের ডেকেছিলেন ?" শ্যামলেন্দু জিজ্ঞেস করে।

"ওনলি কভেনেণ্টেড অফিসারদের বউদের। বললেন, দেখছো তো ইণ্ডিয়ার পুওরদের অবস্থা কী হচ্ছে। আমাদের সকলের উচিত সাধ্যমতো গরীবদের সেবা করা। শিলিগুড়ি হোমসের ফ্ল্যাগ ডে হবে সামনের সপ্তাহে। আমাদের সবাইকে বাক্স নিয়ে রাস্তায় ভিক্ষে করতে হবে।"

টুটুল বললে, "চমৎকার মহিলা! ম্যানেজিং ডিরেকটরের বউ, কিন্তু কোনো

চাল নেই। শিলিগুড়ির অনাথ ছেলেদের কথা বলতে গিয়ে চোখে ওঁর জল এসে গেল।"

দোলন বললে, "আর সেই না দেখে, আমাদের মিসেস সান্যালও শিলিগুড়ির ছেলেদের জন্য চোখ মুছতে লাগলেন। মিসেস সান্যাল আবার কুকুর প্রেমিক-সমিতিতেও ঢুকেছেন শুনলাম। মিসেস ফেরিস নাকি এ-বছরে ওখানকার অনারেরি সেক্রেটারী হচ্ছেন।"

খাওয়া শেষ করে ওরা ক্লাবের গাড়ি-বারান্দায় এসে দাঁড়ালো। ড্রাইভার সৃষ্টিধর হুস করে গাড়িটাকে সামনে এনে দাঁড় করালো। টুটুল ভিতরে ঢুকে পড়লো।

সেই সুযোগে দোলন স্বামীকে বললে, "এই শোনো।" তারপর ফিস ফিস করে কী একটা বললে।

"কী বলছিস রে দিদি?" টুটুল জানতে চাইলে।

দোলন স্বামীর দিকে চোখের ইশারা করে বললে, "কিছুই নয়।"
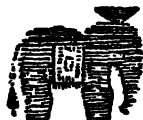
দোলনের ফিস ফিস কথাটা শ্যামলের কানে লেগে রয়েছে। অফিসে নিজের ঘরে ঢুকেই বললে, "মিসেস অ্যাণ্ডারসন!"

নোটবুক নিয়ে মিসেস অ্যাণ্ডারসন ছুটে এলেন। "না, ডিকটেশন নয়। একবার অতনু রায়ের পার্সোনাল ফাইলটা দেখতে চাই!"

এক মিনিটেই ফাইলটা এনে হাজির করলে মিসেস অ্যাণ্ডারসন। একটা কাগজে শ্যামলেন্দু লিখে নিলো—অতনু রে। বাবার নাম সুধাময় রায়, রিটায়ার্ড জেলা জজ। বয়স পঁচিশ। খড়্গপুর আই আই টি থেকে বি এস-সি (টেক) ইলেকট্রনিকসে। তার আগে স্কুল ফাইনালে ফার্স্ট ডিভিশন। সেণ্ট জেভিয়ার্স থেকে আই এস-সি ফার্স্ট ডিভিশন। হিন্দুস্থান পিটারস্-এ দেড় বছর হলো ঢুকেছে। ম্যানেজমেণ্ট ট্রেনি হিসেবে। রেকর্ড ভালই। এখনই আটশ' টাকা পাচ্ছে। ভবিষ্যত খারাপ নয়। হাইট পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি; টুটুলের পাঁচ ফুট চার। ভালই মানাবে।

বাড়িতে একটা ফোন বুক করলে শ্যামলেন্দু। দোলনকে অতনু রায়ের সব বিবরণ জানালে। বললে, "বেশ কালচার্ড এবং স্মার্ট ছেলে। আমার

আণ্ডারেই এখন রয়েছে। কিছুদিন আগে আমাদের দিল্লীর রিসিডেন্ট ডিরেকটর মিস্টার মূর্তি শান্তিনিকেতনে যেতে চাইলেন, বললেন একটা গাইড দিতে পারো। আমি অতনুকে দিয়েছিলাম। মিস্টার মূর্তিও বেশ ইমপ্রেসড, খুব প্রশংসা করেছেন।"

দোলন সঙ্গে সঙ্গে বললে, "তাহলে দেখ না। আজই মায়ের চিঠি এসেছে, লিখেছেন পাত্র আমাদেরই খুঁজতে হবে। আমি বলি কি, ছোকরাকে আমাদের এখানে বিকেলে চা খেতে নেমন্তন্ন করো। দু পক্ষের দেখাও হবে, তারপর যা হয় করা যাবে।"

"দেখি," বলে ফোন নামিয়ে দিলো শ্যামলেন্দু।

অতনুকে ডেকে পাঠিয়ে বিকেলের চায়ের ব্যবস্থা পাকাপাকি করলে শ্যামলেন্দু। বললে, "বিকেলে বাড়িতে বসে বসে আপনার সঙ্গে মার্কেট রিসার্চ সম্বন্ধে আলোচনা করতে চাই। ইংলণ্ড আমেরিকা সর্বত্র এখন মার্কেট রিসার্চের জয়জয়কার। বাজারটা স্টাডি করে যে কোম্পানি আগে থেকে বুঝতে পারবে পোটেনসিয়াল কাস্টমার কী চায়, তার রুচি কীরকম, তার দুর্বলতা কোথায়, সেই কোম্পানিই কমপিটিশনে জিতে যাবে।"

অতনুর সঙ্গে আরও কথাবার্তা হতো, কিন্তু ফ্যাকটরি থেকে সেলসের টেকনিক্যাল অফিসার রাও এসে হাজির।

"আপনি কি খুব ব্যস্ত মিস্টার চ্যাটার্জি? আপনার সঙ্গে আমার খুব আর্জেণ্ট দরকার। এইমাত্র ফ্যাকটরি থেকে ফিরছি।"

রাওকে বসতে বললে শ্যামলেন্দু।

"ব্যাপারটা কিন্তু খুবই কনফিডেনসিয়াল, স্যর।"

শ্যামলেন্দুর ঘরের বাইরে লাল আলোটা জ্বলে উঠলো।

ঠিক একই সময় আর একটা ঘরে লাল আলো জ্বলে উঠলো। দিল্লীর রেসিডেন্ট ডিরেকটর মিস্টার মূর্তি কলকাতায় এলে এই ঘরটা ব্যবহার করেন। সেই ঘরেই মূর্তি সায়েব কোম্পানির সেক্রেটারী নীলাম্বর সেনগুপ্তকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

দিল্লীর দোর্দণ্ডপ্রতাপ বাণিজ্যদূত আজ যেন একটু মিইয়ে রয়েছেন, সেনগুপ্তর মনে হলো। মূর্তি সাধারণতঃ বেশ ডাঁটের ওপর থাকেন, কথাবার্তা প্রয়োজন না হলে বলেন না। কথায় কথায় ম্যানেজিং ডিরেকটর দেখান। আর দেখাবেন নাই বা কেন? বিজনেসের টিকি বাঁধা রয়েছে

দিল্লীতে। আর সেই টিকি যাতে কাটা না পড়ে তা দেখাশোনার দায়িত্ব মূর্তি সায়েবের। ইমপোর্ট লাইসেন্স, কারখানার উৎপাদন বাড়াবার লাইসেন্স, বিদেশে টাকা পাঠাবার অনুমতি সব কিছুই নির্ভর করছে দিল্লীশ্বরের অমাত্যদের হুকুমের ওপর। সুতরাং মূর্তি সায়েবের দায়িত্ব এবং ক্ষমতা দুই অসীম। কিন্তু আজ মূর্তি বেশ নরম হয়েই বললেন, "সেনগুপ্ত, একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে।"

"আপনার প্রবলেম?"

"আমারও বটে, কোম্পানিরও বটে।"

"আপনাদের প্রবলেম মানেই তো কোম্পানির প্রবলেম, কারণ কোম্পানিকে তো আপনারাই পাইলটের মতো চালাচ্ছেন।" সেনগুপ্ত উত্তর দেয়।

"তোমাকে ব্যাপারটা বলি। আমার মেয়ে রাগিণীকে তো দেখেছ তুমি।"

"নিশ্চয় দেখেছি। কতবার দেখেছি। দিল্লীতে সেবার যখন আমরা এক সপ্তাহ রইলাম তখন রাগিণীর সঙ্গে খুব আলাপ হয়েছিল। ভারি মিষ্টি মেয়ে, আমার স্ত্রীর তো খুব পছন্দ ওকে। রাগিণী এখন কী পড়ছে?"

"কী পড়ছে জানি না, তবে মিরাণ্ডা হাউসে বি-এ অনার্সে নাম লেখানো আছে। লেখাপড়া কিছু করে বলে মনে হয় না।" দোর্দণ্ডপ্রতাপ মূর্তি সায়েবের কণ্ঠস্বর বেশ অসহায় মনে হলো।

"না, ভারি ইনটেলিজেণ্ট মেয়ে। আপনি চিন্তা করবেন না।" সেনগুপ্ত সান্ত্বনা দেয়।

মূর্তি সায়েব বললেন, "ডিরেকটরের ওয়াইফ হয়েও আমার স্ত্রী এখনও নিজে ধোসা তৈরি করেন। এখনও ভোর চারটেয় উঠে সংসারের কাজ গুছিয়ে রাখেন। আর রাগিণী ওসব খেয়ালও করে না। কখনও মিনিস্কার্ট কখনও বেল-বটম, কখনও লুঙী পরছে, নিজেকে নিয়েই সর্বদা ব্যস্ত।"

"যুগ তো পাল্টাচ্ছে মিস্টার মূর্তি।"

"এসব নিয়ে চিন্তা করতাম না আমি, কিন্তু রাগিণী আমাদের বিপদে ফেলেছে," মিঃ মূর্তি বেশ উত্তেজিত হয়েই বললেন। "বলতে লজ্জিত হচ্ছি, রাগিণী একটি ছেলের সঙ্গে প্রেম করছে। এখনও উনিশ পুরো হয়নি, এর মধ্যেই বিয়ে করবে বলছে।"

"এ-বিষয়ে আমরা আর কী বলবো মিস্টার মূর্তি? ছেলেপুলের বাবা হিসেবে আপনাকে কেবল সহানুভূতি জানাতে পারি। ব্যাপারটা নিতান্তই আপনাদের।"

"এগজ্যাক্টলি। আমিও তাই ভেবেছিলাম। ব্যাপারটা আমার, আমার স্ত্রীর এবং আমার মেয়ের ব্যক্তিগত অ্যাফেয়ার। মেয়ে যেরকম বেঁকে বসেছে তাতে আমাকে বিয়েতে মত দিতেই হবে। কিন্তু এইখানে একটা মস্ত বড় কিন্তু এসে হাজির হয়েছে।"

মিঃ মূর্তি বলে চললেন, "কালকে মিঃ ফেরিসকে ড্রিংকসে ডেকেছিলাম। ওইখানে আমার ওয়াইফ ক্যাজুয়ালি ব্যাপারটা জানিয়ে দিয়েছেন। এম-ডি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, ব্যাপারটা বেশ সিরিয়াস্। তুমি বিয়েতে মত দেবার আগে সেনগুপ্তের সঙ্গে পরামর্শ করো।"

"আপনার মেয়ে আপনি যেখানে খুশী বিয়ে দেবেন, তাতে আমাদের কী করবার আছে?" সেনগুপ্ত উত্তর দিলেন।

"এগজ্যাক্টলি। তাই না?" মিস্টার মূর্তি যেন একটু ভরসা পেলেন। "ছেলে বাইরের হলে আমি জিজ্ঞেসও করতাম না। কিন্তু ছোকরাটি আমাদের অফিসের স্টাফ হয়েই গোলমাল বাধিয়েছে।"

"আমাদের স্টাফ? তাহলে সত্যি গোলমেলে ব্যাপার, মিস্টার মূর্তি। কোম্পানিজ অ্যাকটে বিয়ে আটকাবে!"

মিস্টার মূর্তি অভিমানে ফুলে উঠলেন। জিজ্ঞেস করলেন, "আমরা ডিরেকটররা কি মানুষ নই? আমরা কি সেকেণ্ড ক্লাস নাগরিক? নিজের মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে গভরমেণ্টের অনুমতি ভিক্ষা করতে হবে?"

কোম্পানি আইনে ধুরন্ধর সেনগুপ্ত বললেন, "গভরমেণ্টের অনুমতি নয়, কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের অনুমতি প্রয়োজন। যতদূর মনে হচ্ছে—সেকশন ৩১৪ কোম্পানিজ অ্যাকট, ১৯৫৬, অ্যাজ অ্যামেণ্ডেড। ডিরেকটরের আত্মীয়কে অফিস অফ প্রফিট দিতে হলে শেয়ারহোল্ডারদের জেনারেল মিটিংয়ে স্পেশাল রেজলিউশন পাস করাতে হবে।"

"মাই গড্। মিসেস মূর্তি যে দিনক্ষণ ঠিক করে ফেলেছেন," মিস্টার মূর্তি প্রায় ভেঙে পড়লেন। "দেখুন তো কি ডেনজারাস মেয়ে এই রাগিণী—বেছে বেছে আমার অফিসের ছেলের সঙ্গে প্রেম করা। মিঃ ফেরিসও এই সেকশন ৩১৪-র কথা শুনলে আমার ওপর বিরক্ত হবেন।"

একটু ভেবে মূর্তি সায়েব বললেন, "সাপোজ আমি যদি এই বিয়েতে মত না দিই?"

"তাতে কিছু এসে যায় না। আপনার মত না নিয়ে বিয়ে করলেই আইনের চোখে আপনার মেয়ের স্বামী আমার জামাই; এবং কোম্পানী আইন অনুযায়ী

ডিরেকটরের জামাই হলো রিলেটিভ। শুধু জামাই কেন, আপনার মেয়ের মেয়ে হলে সে যাকে বিয়ে করবে সেও আপনার রিলেটিভ হবে।"

"মাই গড্।" মূর্তি আবার ঈশ্বরকে স্মরণ করলেন।

"আমি স্যরি মিস্টার মূর্তি, কোম্পানিজ অ্যাকটে ডিরেকটরদের ৩৮ রকম আত্মীয়র লিস্টি দেওয়া আছে—জামাই তার মধ্যে একটি।"

শেয়ারহোল্ডারদের বিনা অনুমতিতে বিয়ে হলে তার ফলাফল কী হতে পারে মিস্টার মূর্তি জানতে চাইলেন।

সেনগুপ্ত বললেন, "ব্যারিস্টারের অ্যাডভাইস নিতে হবে। তবে যতদূর মনে হচ্ছে, জামাই হওয়ার পরে শেয়ারহোল্ডারদের প্রথম যে জেনারেল মিটিং হবে সেখানে রেজলিউশন পাস না হলে জামাইয়ের চাকরি যাবে। তাছাড়া যত টাকা আগে মাইনে হিসেবে পেয়েছে তাও ফেরত দিতে হবে। এখন তো তবু ভাল। ১৯৬৫ সালের অ্যামেণ্ডমেন্টের আগে হলে কোম্পানি আইন অনুযায়ী ডিরেকটরের চাকরি যেত।"

"এঁ্যা।" মিঃ মূর্তির আর্তনাদ।

"আপনি এত চিন্তা করছেন কেন? জুলাই মাসেই তো শেয়ারহোল্ডারদের জেনারেল মিটিং। সেখানে একটা স্পেশাল রেজলিউশন পাস করিয়ে নেওয়া যাবে।"

"আর কোনো পথ নেই?" মিস্টার মূর্তি কাতরভাবে অনুরোধ করলেন।

"সেটা আমার বলা ভাল দেখায় না—ভাবী জামাইকে বিয়ের আগে বরখাস্ত করা।"

"না, তাও হয় না। আমার ডটার যে কী রকম সেন্টিমেণ্টাল তুমি জানো না।"

"তাহলে মাসিক মাইনে পাঁচশ' টাকার কম করে দিতে পারেন।"

"পাঁচশ' টাকায় আমার মেয়ের শাড়ির খরচ উঠবে না সেনগুপ্ত," কাতরভাবে বললেন মিস্টার মূর্তি।

সেনগুপ্ত বললেন, "আরও পথ থাকতে পারে। আমি সেকশন ৩১৪ এবং সাবসেকশন (২) ভাল করে স্ট্যাডি করি। রাগিণীর ফিঁয়াসের ফাইলটাও দেখতে পারলে মন্দ হতো না।"

"নাম চাও?" মিঃ মূর্তি একটু ইতস্তত করে স্লিপে নামটা লিখে দিলেন।

পাঁচটা বাজবার আর বেশী দেরি নেই। শ্যামলেন্দুর ঘরের সামনে আলোটা

বহুক্ষণ লাল হয়ে থেকে এবার সাদা হলো।

শ্যামলেন্দুকে ভীষণ উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে। মুখ কুঁচকে সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে আছে।

ঘরের মধ্যে সেনগুপ্ত সায়েব ঢুকলেন। সেনগুপ্ত সায়েব সবসময় হাসিখুশি থাকে। জিজ্ঞেস করলেন, "কী হলো? বড্ড চিন্তিত দেখাচ্ছে।"

"ভীষণ প্রবলেম, মিঃ সেনগুপ্ত।"

"তার জন্য আপসেট হয়ে কী হবে? সমস্যা এসেছে, একটা সমাধান হবে। রবি ঠাকুরের ওই গানটা আমি প্রায়ই শুনি—'তোমার পরে নাই ভুবনের ভার ওরে ভীরু, হালের কাছে মাঝি আছে করবে তরী পার'।"

হেসে ফেললো শ্যামলেন্দু। বললে, "বড্ড ফ্যাসাদে পড়ে গেলাম সেনগুপ্ত সায়েব। কাউকে বলবেন না, এক্সপোর্টের জন্যে নতুন পিটারস্ উর্বশী ফ্যানের বিরাট একটা কনসাইনমেণ্ট ফ্যাকটরিতে রেডি। এখন আমাদের সেলসের টেকনিক্যাল এক্সপার্টরা চেক করতে গিয়ে দেখে পাখা ডিফেকটিভ। বেশ গোলমাল হয়েছে। ভিতরের ছোট্ট একটা পার্টস বিলিতী দেবার কথা ছিল। তা ফ্যাকটরির কর্তারা গাফিলতি করে দিশী এক কোম্পানিকে দিয়ে তৈরি করিয়েছে। কোয়ালিটি মোটেই ভাল নয়। এখন বিপদ। সমস্ত পাখা গুদামে রেডি, এই সময় দোষ ধরা পড়লো।"

সেনগুপ্ত সায়েব বললেন, "আমারও বিপদ। এখনই ব্যারিস্টার এ কে চৌধুরীর সঙ্গে কনসালটেশন করতে যাচ্ছি। আপনার আণ্ডারে কাজ করে, অতনু রে, ম্যানেজমেণ্ট ট্রেনি, ওর পার্সোনাল ফাইলটা একটু দিন তো।"

"অতনু রে? ওর ফাইল?" শ্যামলেন্দু একটু অবাক হয়ে যায়।

"হ্যাঁ মশাই। আপনিই তো এর জন্যে দায়ী!"

"আমি?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ। এই রয়াল রোমান্সের ফাঁদ তো আপনিই পেতেছিলেন। ডিরেকটর মিস্টার মূর্তির মেয়ে রাগিণী আর অতনু রায়। আপনিই তো শুনলাম অতনুকে গাইড হিসেবে নির্বাচন করেছিলেন যখন মিস্টার মূর্তি, তাঁর বউ এবং মেয়েকে নিয়ে শান্তিনিকেতনে বেড়াতে গেলেন।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ। কিন্তু সে তো দু দিনের জন্যে—একটা উইক এণ্ডে।"

হেসে ফেললেন সেনগুপ্ত সায়েব। "এক পলকের দেখাই যেখানে অঘটন ঘটিয়ে দেয় সেখানে পুরো দুটো দিন কি কম কথা হলো?"

অতনু রায়ের পার্সোনাল ফাইলটা হাতে নিয়ে সেনগুপ্ত বললেন, "ঘটক

বিদায় পাবেন আপনি। নেমন্তন্ন চিঠিও—চি অতনু এবং সৌ রাগিণী। মাদ্রাজীরা বিয়ের চিঠিতে ওই দুটো কথা—চি এবং সৌ ব্যবহার করে। তবে দাঁড়ান আগে কোম্পানি আইনটা সামলে নিই। ডিরেকটর নিজের অফিসের কাউকে জামাই করলে মুশকিল আছে। কন্যার স্বামী হচ্ছে রিলেটিভ—কোম্পানি আইনের সেকশন ৬, অ্যাজ অ্যামেণ্ডেড বাই অ্যাকট থার্টিওয়ান অফ ১৯৬৫।

গম্ভীর হয়ে যায় শ্যামলেন্দু! তারপর জিজ্ঞেস করে, "আচ্ছা স্ত্রীর বোনের স্বামী?"

"দাঁড়ান মশায়, আপনি বিপদে ফেললেন। দেখে নিই একটু গন্ধমাদন পর্বত তো সঙ্গেই রয়েছে।" কোম্পানি আইনের বিরাট বইটা খুলে সেনগুপ্ত বললেন, "জোর বেঁচে গেলেন। পুরানো আইনে স্ত্রীর বোনের স্বামী আত্মীয়। এবারের সংশোধনীতে স্ত্রীর বোন আত্মীয়া, কিন্তু বোনের স্বামী আত্মীয় নয়। তবে বলা যায় না। কিন্তু লোক আত্মীয়র এই তালিকা আরও বাড়াবার জন্য গভরমেণ্টের ওপর চাপ দিচ্ছে।"

সেনগুপ্ত সায়েব বেরিয়ে যেতেই ইনটারন্যাল ফোন তুলে একটা নম্বর ডায়াল করলে শ্যামলেন্দু।

"রায় নাকি? আমি চ্যাটার্জি বলছি। আই অ্যাম অ্যাফরেড, আমার শরীরটা আজ ভাল লাগছে না, বাড়িতে যে মিটিংয়ের কথা ছিল সেটা যদি না হয়?"

অতনু উত্তর দিয়েছিল, "ঠিক আছে; তাতে কী হয়েছে।"

"আপনার কিছু অসুবিধে হলো না তো?"

"মোটেই না। পারফেক্টলি অল রাইট।"

রাত্রে ডিনারের পর নাইট শোয়ের টিকিট কেটে রেখেছিল দোলন। যাবার তেমন ইচ্ছে ছিল না শ্যামলেন্দুর। কিন্তু সুদর্শনা এসেছে দু দিনের জন্যে। বেচারা দোলন নিজের লোকদের নিয়ে হৈ হৈ করার সুযোগ পায় না। সুতরাং ওদের আনন্দে ছন্দপতন ঘটাতে দেয়নি শ্যামলেন্দু।

নির্ধারিত সময়ের একটু আগেই ওরা মেট্রোতে হাজির হয়েছিল। ইভনিং

শো তখন সবে ভাঙছে। সেইখানেই মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল। অতনু সিনেমা থেকে বেরিয়ে আসছে। সঙ্গে রাগিণী। মূর্তি সায়েব তাহলে এবার সকন্যা কলকাতায় এসেছেন।

একটু লজ্জা পেয়ে গেল শ্যামলেন্দু। অতনু বরং বেরিয়ে এসে বললে, "গুড ইভনিং মিস্টার চ্যাটার্জি। ছবিটা আপনাদের ভাল লাগবে।"

শ্যামলেন্দু বললে, "শরীরে এখনও যুত পাচ্ছি না। কিন্তু বাড়িতে বসে বসেও ভাল লাগলো না।"

অতনুর গাড়ি নেই। হিন্দুস্থান পিটারস্-এর অলিখিত নিয়ম অনুসারে অফিসার স্থানীয় লোকেরা বাসে-ট্রামে যাতায়াত করে না। অতনুও ট্যাক্সি করে অফিসে আসে। এখন কিন্তু দূর থেকে শ্যামলেন্দু দেখলে হিন্দুস্থান পিটারস্-এর ইউনিফর্ম-পরা ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে হলের সামনে দাঁড়ালো। ভিতরে বসে আছেন স্বয়ং মূর্তি সায়েব।

দোলনও গম্ভীর হয়ে আছে। শো আরম্ভ হওয়ার পর বেশ চুপচাপই রইলো। শ্যামলেন্দু শুধু একবার ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলে, "তুমি টুটুলকে কিছু বলোনি তো?"

"পাগল!"

ইনটারভ্যালে টুটুল একটু বেরিয়ে গেল। শ্যামল বললে, "অমন গম্ভীর হয়ে গেলে কেন?"

"আমি ভেবেছিলুম টুটুলটা লাকি আছে। এক চান্সেই পার হয়ে যাবে", দোলন বললে।

"প্রথম সুযোগটাই কিছু জীবনের শেষ সুযোগ নয়। প্রথমবার টেস্ট ম্যাচে নেমেই সব ক্রিকেটার কিছু সেঞ্চুরি করে না। শ্যামলেন্দু সান্ত্বনা দেয়।

আরও কাছে সরে এসে দোলন বললে, "না, আমি ভাবছি টুটুলটা তোমার-আমার মতো লাকি নয়। আমাদের প্রথম দর্শনেই বিয়ে, প্রথম ইণ্টারভিউয়ে তোমার চাকরি, আর যদি প্রথম চান্সেই ডিরেকটর হয়ে যাও তাহলে তো হ্যাটট্রিক হয়ে গেল।"

ডিরেকটর! কথাটা শুনেই শ্যামলেন্দুর মনের মধ্যে একটা কাঁটা বিঁধে গেল। বেশ ভুলে গিয়ে সিনেমা দেখতে এসেছিল।

"আচ্ছা, ডিরেকটরদের কত মাইনে গো"? দোলন জিজ্ঞেস করে।

"সাত হাজার। তাছাড়া লাভের ওপর কমিশন আছে। আরও নানা রকম সুযোগ-সুবিধে আছে। তবে সবসুদ্ধ বছরে এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা।"

"তাহলে মাসে কত দাঁড়াচ্ছে?" দোলন হিসেব করতে লাগলো। "বারো দশকে একশ' কুড়ি, মানে মাসে দশ হাজার টাকা।" বেশ আনন্দ পাচ্ছে দোলন —ঠিক যেন স্বপ্ন দেখছে। রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা। "হ্যাঁগো ডিরেকটরদের ক'টা পোস্ট খালি আছে?"

"মাত্র একটা। তার বেশী ডিরেকটর নিতে হলে, কোম্পানির আর্টিকলস্ অফ অ্যাসোসিয়েশন পাল্টাতে হবে," শ্যামলেন্দু উত্তর দিলে।

"তোমাকে সত্যি কথা বলছি, টুটুলের জন্যে আমার আর দুঃখ হচ্ছে না।"

"হঠাৎ এ-রকম মত পাল্টে ফেললে?" শ্যামলেন্দু হেসে জিজ্ঞেস করে।

"অতনুর সঙ্গে ব্যাপারটা যে বেশীদূর গড়ায়নি, খুব ভাগ্য। শালীর বর-এর জন্যে তুমি হয়তো অসুবিধেয় পড়তে। ডিরেকটর হওয়া মাত্রই ওই মূর্তি সায়েবের মতো কোম্পানি অ্যাকট নিয়ে ছটফট করতে।"

অন্ধকারে দোলনের হাতটা মৃদু চাপ দিলো শ্যামলেন্দু।

দোলন কিন্তু থামলো না। ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলে, "গভরমেণ্ট এমন আইন করেছে কেন বলো তো!"

"যাতে আত্মীয়-তোষণ না হয়। তবে জানোই তো, এদেশে সরকারের বজ্র-আঁটুনি ফস্কা গেরো।"

দোলন এবার ছেলেমানুষের মতো প্রশ্ন শুরু করে। "আচ্ছা, ওই যে সেকশন ৩১৪ না কি বললে, তাতে শেয়ারহোল্ডারদের মিটিংয়ে আত্মীয় সম্পর্কে রেজিলিউশন পাস করতে অসুবিধে হতে পারে?"

"আজকাল কিছুই অসম্ভব নয়। আমাদের পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি। যে-কেউ বাজার থেকে একখানা শেয়ার কিনে মিটিংয়ে এসে গোলমাল বাধাতে পারে। বম্বেতে ইউনিয়নের লোকরা তো প্রায়ই করছে। তা ছাড়া আছে বড় শেয়ারহোল্ডার, সরকারী লাইফ ইনসিওর কর্পোরেশন, ইউনিট ট্রাস্ট। ফেরিস সায়েব এদের বড্ড ভয় করেন, যদিও জানেন ভোটের জোরে তিনি যা-ইচ্ছে পাস করিয়ে নিতে পারেন, কারণ শতকরা পঁচাত্তর ভাগ শেয়ার এখনও বিলেতের কোম্পানির হাতে।"

টুটুলকে ফিরে আসতে দেখেই কথা বন্ধ হয়ে গেল। জামাইবাবুকে মধ্যিখানে বসিয়ে দুই বোন দুধারে দুখানা চেয়ার অধিকার করেছে। বিজ্ঞাপনের ছবি আরম্ভ হলো। হঠাৎ টুটুল জামাইবাবুকে খোঁচা দিলো। বললে, "আরম্ভ হলো আপনার পিটারস্ ফ্যানের গুণকীর্তন!"

শ্যামলেন্দু মাথা নাড়লো। এক মিনিটের ছবি শেষ হওয়া মাত্রই টুটুল

বললে, "উঃ জামাইবাবু, বিজ্ঞাপনে আপনারা দিনকে রাত, রাতকে দিন করতে পারেন! আমার তো এখনই একখানা উর্বশী ফ্যান কিনতে ইচ্ছা করছে—যার হাওয়ায় সব কষ্ট, সব দুঃখ মুছে যাবে!"

এই বিজ্ঞাপনের ছবিটাই সব মাটি করে দিলো। একবার আলো জ্বলে আসল ছবিটা আরম্ভ হলো। কিন্তু শ্যামলেন্দুর চোখের সামনে শুধু কারখানার গুদামঘরের দৃশ্য ভেসে উঠতে লাগলো। গুদামের ছাদ পর্যন্ত বাক্স বাক্স পাখা সাজানো রয়েছে। গায়ে ইংরিজীতে লেখা—রপ্তানির জন্যে। কিন্তু প্রতিটি পাখায় গলদ।

আর মনে পড়ছে গর্ডন সায়েবের কথা। রূপালী পর্দার রঙীন নায়িকার মুখের ওপর সুপার-ইমপোজ হয়েছেন গর্ডন সায়েব, ফিনানস ডিরেকটর। চলতি আর্থিক বছরে আরও দশ লাখ টাকা প্রফিট চাইছেন তিনি।

শোনা যাচ্ছে রুণুর কাছেও ফিনানস ডিরেকটর কিছু টাকা চেয়েছেন। রুণু নাকি এ-বছরে পাঁচ লাখ টাকা খরচ কম দেখাবে। ঠিক হ্যায়, রুণু সান্যাল যদি পাঁচ লাখ বাঁচাতে পারে—শ্যামলেন্দু নিশ্চয় দশ লাখ পারবে। বিজ্ঞাপনের জন্যে অনেক টাকা আছে—তার থেকে পাঁচ লাখ টাকা বাঁচিয়ে ফেলবে শ্যামলেন্দু। তিন লাখ টাকার একটা অদৃশ্য প্রভিশন রেখেছিল এমার্জেন্সির জন্যে। সেটাও ফিরিয়ে দেবে কোম্পানিকে। তাহলে হলো আট লাখ। আর দু লাখ এদিক-ওদিক যা হয় করা যাবে। গ্রামে গ্রামে মাল না পাঠিয়ে বেশীর ভাগ পাখা বড় বড় শহরে বিক্রি করে দেবে। তাতে খরচ কম পড়বে। সেলসম্যানদের ঘুরে বেড়াবার খরচ কমে যাবে।

মেট্রোর রূপালী পর্দায় এখন সমুদ্রে-সফেন হাওয়াই-এর রোমান্টিক দৃশ্য। প্রায়-বিবসনা বিদেশিনী নায়িকা এবার নায়কের বক্ষলগ্না হতে চলেছেন। সামনের সস্তা সীটগুলোতে প্রবল উত্তেজনা। দু-একটা সিটি পড়লো। দোলন রসিকতা করে শ্যামলেন্দুর পায়ে একটু চাপ দিলো। আলিঙ্গনে আবদ্ধ নায়ক-নায়িকা এবার চুম্বনে মগ্ন হলো—বিশাল স্ক্রিন জুড়ে শুধু ওদের মুখ দুটো দেখা যাচ্ছে। দোলন বললে, "সায়েবগুলো ভারি অসভ্য!"

কিন্তু শ্যামলেন্দু শুধু ডিফেকটিভ পাখার ডাঁই দেখতে পাচ্ছে। কোনো কথাই তার কানে আসছে না। শুধু মনে হচ্ছে, দশ লাখ টাকা না হয় যোগাড় হলো, কিন্তু এই এক্সপোর্টের কী হবে?

এক্সপোর্টের চিন্তা মাথায় নিয়েই শ্যামলেন্দু আবার অফিসে এসেছে। হিন্দুস্থান পিটারস্-এর কেউ এখনও ব্যাপারটা জানে না। বড় সায়েবকে রিপোর্ট করা দরকার।

নোটটা নিজের হাতেই লিখে ফেললো শ্যামলেন্দু। মিসেস অ্যাণ্ডারসনকে টাইপ করতে দিতেও সাহস হলো না।

নোটটা পাবার পর কয়েক মিনিট পরেই মিস্টার ফেরিস ইণ্টারকমে ফিনানস ডিরেকটরকে ডাকলেন, "জন, একবার আমার ঘরে চলে আসবে?"

মিস্টার ফেরিসের ঘরে লাল আলোটা জলে উঠলো। কয়েক মিনিট পরে শ্যামলেন্দুরও ডাক পড়লো। ডাক আসবে শ্যামলেন্দু জানতো। তাই কোটটা পরেই সে অন্য কাজ করছিল।

মিসেস ডিকের টেলিফোন পাওয়া মাত্রই শ্যামলেন্দু এম-ডির ঘরে চলে গেল।

রুণু সান্যাল অন্য ব্যাপারে এম-ডির দর্শনপ্রত্যাশী হয়ে এসে কয়েকবার বিফলমনোরথ হয়ে ফিরে গেল। মিসেস ডিককে রুণু জিজ্ঞেস করলে, "কী ব্যাপার? আজ সমস্ত সকালই মিটিং চলবে নাকি?"

মিসে ডিক ঠোঁটে লিপস্টিকের ডবল কোটিং লাগাতে লাগাতে বললে, "ভগবান জানেন, আর মিস্টার ফেরিস জানেন। তবে মিটিং চলবে মনে হয়। কারণ এবার টেকনিক্যাল ম্যানেজারের ডাক পড়েছে।"

ফ্যাকটরির সর্বেসর্বা, টেকনিক্যাল ম্যানেজার হার্টলে হাসি মুখে এম-ডির ঘরে ঢুকলেন। কিন্তু মিনিট পনেরো পরে যখন বেরিয়ে এলেন তখন তাঁর মুখ কালো হয়ে গিয়েছে।

কী একটা কাগজ নিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যে হার্টলে আবার ফিরে এলেন।

ঘরের ভিতর তিনজন তখনও গম্ভীর হয়ে বসে আছেন। মিস্টার ফেরিস বললেন, "তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে কী?"

টেকনিক্যাল ম্যানেজার বললেন, "এটা বোঝা যাচ্ছে যে, এই ফ্যান আমরা কিছুতেই বিদেশে পাঠাতে পারি না। সমস্ত মাল রিজেক্ট হয়ে ফিরে আসবে।"

ঠোঁটের পাইপে একটা টান দিয়ে হার্টলে বললেন, "দোষটা অবশ্য খুবই সামান্য। থার্ড পার্টির কাছ থেকে কিনে আমরা যে পার্টস ব্যবহার করে-

ছিলাম সেটা পাল্টে দিলেই উর্বশী পৃথিবীর বেস্ট ফ্যান হয়ে যাবে। আমি আজই টেলেক্স পাঠাচ্ছি শেফিল্ডে। পার্টসগুলো এরোপ্লেনে পাঠাতে।"

"ইমপোর্ট লাইসেন্স?" মিস্টার গর্ডন জিজ্ঞেস করলেন।

"আমাদের ব্লানকেট কোটা থেকে এখনকার মতো নিয়ে নিচ্ছি—যাতে আপনাদের রপ্তানি না বাধা পায়।"

হার্টলে নিজের কাগজের দিকে তাকিয়ে বললেন, "শেফিল্ড যদি মাল এয়ার ফ্রেট করে, আমি তিন সপ্তাহের মধ্যে সমস্ত পাখা রেডি করে দেবো।"

হার্টলে আরও বললেন, "উই আর স্যরি, পিটার। আমি এনকোয়ারি করে দেখছি কাদের দোষে এমন বিশ্রী ভুল হলো। আর স্বীকার করছি দোষটা আমাদেরই অনেক আগে খুঁজে বার করা উচিত ছিল। সেলসের ইনস্পেকটররা যে সময় থাকতে দোষটা বার করেছে তার জন্য কোম্পানির সম্মান রক্ষা পেলো।"

হার্টলে সায়েব উঠে পড়লেন। ফিনানস ডিরেকটর এবার ফেরিস সায়েবকে বললেন, "পিটার, কোম্পানির সম্মান হয়তো রক্ষা পেলো, কিন্তু তোমার আমার সমূহ বিপদ।

"কেন?" পিটার ফেরিস জানতে চাইলেন।

গর্ডন বললেন, "থাইল্যাণ্ড এবং কোরিয়ায় যে মাল যাচ্ছিলো তার দাম এক কোটি টাকা। প্লাস রপ্তানির জন্য গভরমেণ্টের কাছ থেকে আমরা সাহায্য পাচ্ছিলাম দশ লাখ টাকা।"

"কিন্তু জন, আমরা তো মার্চ মাসে এই আর্থিক বছর শেষ হবার আগেই মালটা পাঠিয়ে দিচ্ছি," ম্যানেজিং ডিরেকটর উত্তর দিলেন।

"দশ নম্বর ক্লজটা পড়ে দেখ পিটার।" গর্ডন গম্ভীরভাবে বললেন, "তোমার সমস্ত মাল জাহাজে তোলার শেষ তারিখ এই মাসের পনেরোই। তার মধ্যে এরোপ্লেনে নতুন পার্টস বিলেত থেকে এসে পড়বে, কিন্তু মাল তখনও রেডি হবে না।"

"তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে, জন?"

"পরের প্যারাগ্রাফটা পড়লেই বুঝতে পারবে। যে-ক্লজের জন্যে চ্যাটার্জি আজ তোমার কাছে ছুটে এসেছেন। পনেরো তারিখে রাত এগারোটার মধ্যে মাল জাহাজে না চড়লে আমাদের পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।"

"অ্যাঁ! অমন শর্তে আমরা রাজী হয়েছিলাম কেন?" প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন ফেরিস সায়েব।

কনট্রাকটের শর্তগুলো আগে যে ডিরেকটররা দেখেননি এমন নয়। তাঁরা অনুমোদন করার পরই কনট্রাকট সই হয়েছে। কিন্তু সেকথা মনে করিয়ে দিয়ে লাভ নেই। কলমের পিছন দিকটা হাতের তালুতে ঠুকতে ঠুকতে শ্যামলেন্দু উত্তর দিলো, "ওই শর্ত না রাখলে থাইল্যাণ্ড এবং কোরিয়া কেউ আমাদের কাছে মাল নিত না।"

ফিনান্স ডিরেকটর বললেন, "পিটার, তুমি আর আমি কনট্রাকট সই হবার আগে ওটা পাস করেছি। আর ওদের কথাও ভেবে দেখো। গ্রীষ্মকাল কেটে যাওয়ার পর ফ্যান এসে পৌঁছলে, সেই পাখা দিয়ে ওরা কী করবে?"

"ঠিক সময়ে ডেলিভারির ব্যাপারে ইণ্ডিয়াকে এখনও কোনো দেশ বিশ্বাস করে না," শ্যামলেন্দু দুঃখের সঙ্গে বললে।

ঘস ঘস করে নিজের নোট বুকে কী একটা অঙ্ক কষে ফেললেন চার্টার্ড অ্যাকাউনটেণ্ট গর্ডন সায়েব। তারপর বললেন, "পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ, দশ লক্ষ টাকা এক্সপোর্ট সাবসিডিতে লোকসান—মোট ষাট লক্ষ টাকা। প্লাস ওই ডিফেকটিভ মাল তৈরির খরচ নব্বুই লাখ টাকা। ঐ মাল ইণ্ডিয়াতেও বিক্রি হবে না, কারণ পাখাগুলোর ভোলটেজ মাত্র ১১০। ইণ্ডিয়াতে ২২০। আমরা এবারে আশি লক্ষ টাকা লাভ করতে যাচ্ছিলাম। সুতরাং বেশ কয়েক লক্ষ টাকা লোকসান। চমৎকার!"

ফেরিস সায়েবের লাল মুখটা আরও লাল হয়ে উঠলো! বললেন, "দেখি আমাদের কনট্রাকটটা।"

শ্যামলেন্দু দলিলটা ফাইল থেকে খুলে এগিয়ে দিলো।

অনেকক্ষণ ধরে মন দিয়ে প্রতিটা লাইন পড়লেন ফেরিস সায়েব। তারপর গম্ভীরভাবে বললেন, "আমি তো কোনো পথ দেখছি না। অল আই ক্যান সে, ফ্যাকটরির ম্যানেজারকে নেক্সট জাহাজে বাড়ি পাঠিয়ে দাও।"

ফ্যাকটরি থেকে বোধ হয় আরও অনেককে বাড়ি পাঠানো দরকার হবে। কিন্তু এই ষাট লক্ষ টাকা বাঁচাবার তো কোনো পথ দেখছি না। হিসট্রিতে এই প্রথম হিন্দুস্থান পিটারস্-এর লোকসান হবে, হিসেবের খাতায় লাল কালির আঁচড় পড়বে," বললেন গর্ডন সায়েব।

"দেখি একবার কনট্রাকটটা," গর্ডন সায়েব এবার দলিলটা পড়ে ফেললেন তারপর ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, "না, কোনো উপায় তো দেখছি না।"

ভীষণ বিব্রত বোধ করছে শ্যামলেন্দু। সে আবার বললে, "আমি অত্যন্ত দুঃখিত।"

"না, তোমার দুঃখিত হবার কিছু নেই। ফ্যাকটরিই এর জন্যে দায়ী," ফেরিস সায়েব বললেন।

শ্যামলেন্দু বললে, "আমি বরং কাগজগুলো সব নিয়ে যাই, আরও খুঁটিয়ে রিভিউ করে দেখি, যদি কোনো পথ থাকে।"

গর্ডন বললেন, "তোমাকে মনে করিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই, কাকপক্ষী যেন ব্যাপারটা এখন না জানতে পারে। শেয়ার মার্কেট এবার বাড়তি ডিভিডেণ্ড আশা করছে, সেই সঙ্গে বোনাস শেয়ার। কোনো রকমে খবরটা রটে গেলে শেয়ার বাজারে সর্বনাশ হবে।"

ফেরিস এবার হাতটা বাড়িয়ে দিলেন। "উইশ ইউ অল দি লাক, ইয়ং-ম্যান," এই বলে শ্যামলেন্দুর সঙ্গে করমর্দন করলেন।

ম্যানেজিং ডিরেকটরের ঘর থেকে যেন অন্য এক শ্যামলেন্দু বেরিয়ে এলো। যে-শ্যামলেন্দু চ্যাটার্জি কমারসিয়াল ম্যানেজার, সকালে মিস্টার ফেরিসের ঘরে ঢুকেছিল—তার সঙ্গে এ-শ্যামলেন্দুর অনেক তফাত। শ্যামলেন্দু এখন অনেক দায়িত্বশীল। হিন্দুস্থান পিটারস্-এর ভবিষ্যৎ যেন সে নিজেই সৃষ্টি করছে, বোর্ডের অন্য মেম্বারদের সঙ্গে।

শ্যামলেন্দু নিজেকে বোঝাচ্ছে—তোমার নামের পাশে ম্যানেজার বলে একটা কথা আছে। শিল্পে ও বাণিজ্যের সমরাঙ্গনে তুমি একজন লীডার—তোমার নেতৃত্বের ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। সংসারে হয়তো অনেক জরুরী সমস্যা আছে, কিন্তু এই মুহূর্তে হিন্দুস্থান পিটারস্-এর শ্যামলেন্দু চ্যাটার্জির কাছে ওই ষাট লক্ষ টাকা ক্ষতির সম্ভাবনা বিরাট চ্যালেঞ্জের মতো হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

লাঞ্চের আগে পর্যন্ত শ্যামলেন্দু মন দিয়ে থাইল্যাণ্ডের সঙ্গে চুক্তির কাগজগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েছে। তারপর কাছাকাছি রেস্তোরাঁতে গিয়ে কয়েকটা স্যাণ্ডউইচ খেয়ে ফিরে এসেছে। মিস্টার ফেরিস ও গর্ডন লাঞ্চে বেরিয়ে গিয়েছেন। মিসেস ডিকের কাছে শুনেছে বিকেলে বড় সায়েব গল্‌ফ খেলতে যাবেন। ডিকিনসন কোম্পানির চেয়ারম্যান হ্যাডো সায়েবের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেণ্ট আছে গল্‌ফ কোর্সে। যত দায়িত্ব এখন শ্যামলেন্দু চ্যাটার্জির।

ওঁরা দুজন বোধ হয় শ্যামলেন্দুকে পরীক্ষা করছেন। দেখছেন বিরাট একটা অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে শ্যামলেন্দু কেমনভাবে বেরিয়ে আসতে পারে। এ-কথা বলা যায় না তাঁরা শ্যামলেন্দুর ঘাড়ে দায়িত্বটা জোর করে চাপিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু উঁচু পর্যায়ে তো কিছুই চাপিয়ে দেওয়া হয় না। দায়িত্ব নিজে

কুড়িয়ে নিতে হয়। প্রাইভেট সেকটরে এই নিয়ম। পশ্চিমের শিল্প-বিপ্লবের ভোর থেকে এই লাইন চলে আসছে।

এক্সপোর্ট ফাইলের মধ্যে ডুবে থেকেও শ্যামলেন্দুর মনে পড়তে লাগলো—জেমস ওয়াটকে কেউ বলেনি বাষ্প ইঞ্জিন আবিষ্কার করো, ষ্টিভেনসনকে কেউ হুকুম করেনি রেল ইঞ্জিন তৈরি করো, জন বয়েড ডানলপকে কেউ চোখ রাঙায়নি হাওয়াভরা টায়ার আবিষ্কার না করলে তোমার ইনক্রিমেণ্ট হবে না, হেনরি ফোর্ড কারুর ইনস্ট্রাকশন মতো মোটরগাড়ি তৈরিতে মন দেননি, সুইডেনের আলফ্রেড নোবেলকে কেউ বিস্ফোরক আবিষ্কারের জন্যে রিমাইণ্ডার দেয়নি, হলাণ্ডের এনটন ফিলিপস্‌কে কেউ বলেনি যে রাশিয়ার জারের কাছ থেকে ইলেকট্রিক বাতির বিরাট অর্ডার না আনলে তোমার চাকরি যাবে। এসব এমনিই হয়েছে—প্রয়োজনের সময়, বিপদের সময় কাজের লোকরা এগিয়ে এসেছে, চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করেছে—ফলে তারা উপরে উঠে গিয়েছে। ইনডাসট্রির ইতিহাসে তাদের নাম লেখা হয়ে গিয়েছে সোনার অক্ষরে। এঁদের তুলনায় একান্ত পুঁটকে কোম্পানি হিন্দুস্থান পিটারস্‌-এর ততোধিক পুঁটকে অফিসার শ্যামলেন্দুর কাছ থেকে আর কতটুকু আশা করা হচ্ছে!

শ্যামলেন্দুকে কেমন যেন নেশায় পেয়ে বসেছে। দলিলটা সে আবার মন দিয়ে পড়তে শুরু করলো—যেভাবে বড় বড় ব্যারিস্টাররা ব্রীফ পড়েন, যেভাবে শার্লক হোমস কোনো এভিডেন্স বিচার করেন, যেভাবে দোলনের বাবা শেক্সপীয়র পড়েন। লাল পেন্সিল নিয়ে, দাগ দিয়ে—কোথাও যদি নতুন কোনো অর্থ উদ্ধার করা যায় যা এতদিন খুঁজে পাওয়া যায়নি।

শ্যামলেন্দু একটু যেন আলো দেখতে পাচ্ছে। আবার আলোটা আলেয়ার মতোই মিলিয়ে যাচ্ছে।

এরই মধ্যে আবার পাবলিসিটি অফিসার মিঠু সেন ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো।

"মিস্টার চ্যাটার্জি, আপনার নোট পেলাম। পাঁচ লাখ টাকার বাজেট কেটে দিচ্ছেন। অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সীর মিস নারগোলওয়ালা খবরটা শুনে ভীষণ মুষড়ে পড়েছেন। উনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।"

"আমি এখন বড্ড ব্যস্ত, মিস্টার সেন," শ্যামলেন্দু গম্ভীরভাবেই জানায়। ওর মুখ দেখে কে বলবে ভিতরে কি চিন্তা চলছে।

"কিছু যদি মনে না করেন, একটু যদি টাইম দেন। আপনাকে সত্যি কথা বলছি, মিস নারগোলওয়ালা খুবই স্পর্শকাতর।"

মনের রাগ চেপে রেখে, মুখে হাসি ফুটিয়ে শ্যামলেন্দু বললে, "কুমারী মহিলা স্পর্শ করলে কাতর তো হবেনই!"

লজ্জায় জিভ কেটে মিঠু সেন বললেন, "আমি বোধ হয় ঠিক বোঝাতে পারিনি, স্পর্শকাতর মানে—একটু সেনসিটিভ, একটু অভিমানিনী।"

"আই অ্যাম স্যরি। আমার হয়ে ওঁকে একটু বুঝিয়ে বলবেন; আমি ছু-তিনদিন পরে মিস নারগোলওয়ালাকে মিট করবো।"

মিঠু সেন এবার একটা বিরাট বোর্ড টেবিলের ওপর রেখে শ্যামলেন্দুকে বললেন, "আমাদের এক্সপোর্টের বিজ্ঞাপন। উর্বশী ফ্যান নিয়ে যেদিন জাহাজ কলকাতার খিদিরপুর ডক থেকে ছাড়বে—সেদিন কাগজে বেরুবে। মিস নারগোলওয়ালা এবং আমি ছুজনে একসঙ্গে বসে কপি লিখেছি। উনি খুব একসাইটেড। প্রথম লাইন: উর্বশী চললেন বিদেশে অভিসারে।"

"মিঃ সেন এই বিজ্ঞাপন সম্বন্ধেও মতামত দিতে একটু দেরি হবে।" শ্যামলেন্দু বেশ গম্ভীভাবে তার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলো।

দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে হতাশ মিঠু সেন আবার ফিরে এলেন। কমারসিয়াল ম্যানেজারের হাবভাবে ভদ্রলোক বিচলিত হয়ে পড়েছেন। বেশ করুণ কণ্ঠে বললেন, "মিস্টার চ্যাটার্জি. আপনি বলেছিলেন এক্সপোর্ট বিজ্ঞাপনটা খুব আর্জেন্ট—পনেরো তারিখেই সমস্ত ইণ্ডিয়াতে রিলিজ করতে হবে। তাহলে, আমি অন্ততঃ এজেন্সীকে উর্বশীর জন্যে কয়েকটা সুন্দরী মডেলের ছবি তুলতে বলি।"

"তা তুলুন আমার আপত্তি নেই," শ্যামলেন্দু মিঠু সেনকে বিদায় করতে পারলে বাঁচে।

তারপর আবার চিন্তায় ডুবে গিয়েছে শ্যামলেন্দু।

মিসেস অ্যাণ্ডারসন বাইরে চুপচাপ বসে আছেন। কোনো কাজ নেই। শুধু লোক তাড়াচ্ছেন, কেউ যেন বিনা নোটিশে মিস্টার চ্যাটার্জির ঘরে ঢুকে না পড়েন।

ঘস ঘস করে বাংলায় দু পাতা চিঠি একখানা লিখে ফেলেছে সুদর্শনা। "পড়বি নাকি দিদি?" সুদর্শনা এবার বোনকে জিজ্ঞেস করে।

"তুই এখন বড়সড় হয়েছিস—তোর চিঠি পড়াটা ঠিক নয়," দোলন সোজাসুজি বলে দেয়।

"এমন কিছু গোপনীয় নয়—বাবা এবং মাকে একই সঙ্গে তোদের এখানকার রিপোর্ট দিয়ে দিলাম।"

"হুইস্কি-টুইস্কির কথা লিখিসনি তো? মা আবার যা সেকেলে," দোলন তার উদ্বেগ প্রকাশ করে।

"পাগল হয়েছিস! তবে লিখে দিলুম, তোমাদের বড় কন্যা এবং জামাতা যেখানে থাকে সে-এক রূপকথার দেশ। এবং সবচেয়ে যেটা গর্বের কথা, শ্যামলদা নিজের অধিকারে এবং চেষ্টায় এখানে স্থান করে নিয়েছে।"

"চেষ্টা বলে চেষ্টা! সায়েবরা দোকানদারের জাত, মুখ দেখে কাউকে কমারসিয়াল ম্যানেজার করে না। ওকে ওরা বড্ড খাটিয়ে নেয়।"

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দোলন বললে, "এই আজকের ব্যাপারটাই দেখ না। হিন্দুস্থান পিটারস্-এর সব সায়েবরা বাড়ি ফিরে এসেছে, তোর জামাইবাবু ছাড়া।"

কথার মধ্যেই জুতোর আওয়াজ পাওয়া গেল। রসিকতা করে শ্যামলেন্দু বললে, "হুম! পরচর্চা চলেছে মনে হচ্ছে!"

"পর নয়, আপনচর্চা চলছে, শ্যামলদা। বিষয়: হিন্দুস্থান পিটারস্-এর কমারসিয়াল ম্যানেজার মিস্টার চ্যাটার্জি যিনি কখনও সময়মতো অফিস থেকে বাড়ি ফেরেন না।" সুদর্শনা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলো।

"দিদি নিশ্চয় কমপ্লেন করেছে তোমার কাছে। কিন্তু কী করি বলো? দায়িত্ব জিনিসটা ঈশ্বর কেন যে সৃষ্টি করেছিলেন!" শ্যামলেন্দু সোফার ওপর বসে পড়লো।

"যে-পুরুষমানুষের দায়িত্বজ্ঞান নেই মেয়েরা তাকে পছন্দ করে না, শ্যামলদা।" সুদর্শনা জামাইবাবুকে মনোবল দেবার চেষ্টা করে।

কিন্তু দোলন সঙ্গে সঙ্গে বাধা দেয়। "দায়িত্বের মতো দায়িত্ব হলে তো কথা থাকে না। সায়েবরা গল্ফ খেলার মাঠে সময় কাটাচ্ছে, রুণু সান্যাল পার্টি

দিচ্ছে, চোপরা সায়েব তাসের জুয়ায় মেতে আছেন, আর তোর জামাইবাবু শুধু খেটেই চলেছেন। সেনগুপ্ত সায়েবের বউ অথচ আমাকে প্রায়ই বলেন, শুধু খেটে মার্চেন্ট অফিসে কেউ উপরে উঠতে পারে না।"

"বোকার মতো খাটলে হয় না; তার সঙ্গে বিদ্যাবুদ্ধি চাই," শ্যামলেন্দু সিগারেট ধরিয়ে বলে। "তাছাড়া, আমার কখনো হেরে যেতে ইচ্ছে করে না। কাজে-কর্মে আমরা যে সাদা চামড়াদের থেকে নিরেস নই সেটা প্রমাণ করবার দায়িত্ব নতুন যুগের ইণ্ডিয়ান ম্যানেজারদের ওপর। আমরা যারা সাধারণ অবস্থা থেকে এই ব্লু হ্যাভেনের দশতলায় উঠে এসেছি তাদের প্রমাণ দিতে হবে, আমরা কারুর থেকে কম যাই না।"

"সত্যিই তো," জামাইবাবুর কথায় সায় দিয়ে সুদর্শনা বলে। "বাবা আপনার কথাগুলো শুনলে খুব খুশী হতেন।"

চায়ের পর্বটা খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল। শ্যামলেন্দু আজ তেমন আড্ডা জমাতে পারলে না। শুধু দোলন বললে, "দুপুরে একটু পাড়া বেড়াতে বেরিয়েছিলাম টুটুলকে নিয়ে। মিসেস সান্যালের কাছেও গিয়েছিলাম।"

"কেমন বুঝলে, টুটুল?" শ্যামলেন্দু জিজ্ঞেস করলে।

টুটুল উত্তর দিলো, "খুব সাজানো-গোছানো, শ্যামলদা। কিন্তু বাঙালী মহিলা নস্যি নিচ্ছে, সিগারেট খাচ্ছে, স্বামীকে নাম ধরে ডাকছে, মা দেখলে মাথায় হাত দিয়ে বসবে।"

শ্যামলেন্দু একটু বিব্রত বোধ করলে। তারপর বললে, "প্রথম প্রথম আমার এবং তোমার দিদিরও এসব খারাপ লাগতো। এখন সহ্য হয়ে গিয়েছে। আসলে, এদের সংস্কৃতিটাই অন্যরকম। বিলেত আমেরিকা থেকে আমদানি হয়ে, প্যাকিং না খুলেই এখানে চলে এসেছে।"

"তোর জামাইবাবু আগে এইসব নিয়ে খুব ভাবতো। শেষে আমি একদিন বকাবকি করলাম। কালচার কালচার করেই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালীরা ব্যস্ত হয়ে রইলো, মাঝখান থেকে অন্যরা এসে বড় বড় চাকরিগুলো বাগিয়ে নিলো। আমি বলি যস্মিন্ দেশে যদাচার। সায়েবরা মাইনে দিচ্ছে, যা চাইবে তাই করতে হবে। আর দেখ না, সায়েবদের গালাগালি করা একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু কে আমাদের এত সুখে রাখতো? দেশী মালিকদের তো দেখছি। তাদের নজর সবচেয়ে নিচু—প্রত্যেকটি অফিসারকে নিজের চাকর মনে করে।"

শ্যামলেন্দু আজ আর কথা বাড়ালো না। নিজের পড়ার টেবিলে গিয়ে বসলো।...

সুদর্শনা ভেবেছিল শ্যামলদা এই সময় বইটই পড়ে। কিন্তু সে দেখলো শ্যামলেন্দু সঙ্গে করে অফিসের ফাইল এনেছে।

একসময় যেভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শেক্সপীয়রের প্রতিটি লাইন পড়তো, এখন তেমনি নিষ্ঠার সঙ্গে এক্সপোর্ট কনট্রাকটের প্রতিটি শর্ত পরীক্ষা করে দেখছে শ্যামলেন্দু। বিরাট দলিল। প্রায় পঁচিশ-তিরিশ পাতা সিঙ্গল স্পেসে টাইপ করা। দোলনের বাবাকে মনে পড়ছে শ্যামলেন্দুর। শেক্সপীয়র পড়তে পড়তে ভাল লাগলেই নানা রঙের পেন্সিলে দাগ দিতেন। এক এক রঙের নাকি এক একটা অর্থ আছে। শ্যামলেন্দুও এখন কনট্রাকটের কপিতে দাগ দিচ্ছে।

দূর থেকে তুই বোন শ্যামলেন্দুকে কাজে ডুবে থাকতে দেখে আর জ্বালাতন করলে না। ওরা তুজনে অন্য ঘরে গিয়ে নিজেদের প্রাণের কথা বলতে আরম্ভ করলে।
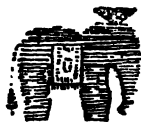
পরের দিন সকালে অফিসেও মিস্টার শ্যামলেন্দু চ্যাটার্জির ঘরের সামনে লাল আলো জ্বলতে দেখা গেল। অথচ ঘরের মধ্যে দ্বিতীয় কোনো প্রাণী নেই। নিবিষ্টমনে মিস্টার চ্যাটার্জি একটা ফাইল পড়ে যাচ্ছেন।

লাঞ্চের একটু পরেই মিসেস অ্যাণ্ডারসন দেখলেন, মিস্টার চ্যাটার্জি বেশ একসাইটেড হয়ে কোট না পরেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

লাল আলোটা বড় সায়েবের ঘরের মাথায় আবার জ্বলে উঠলো। তারপর তুজনে কী যে আলোচনা হলো ভগবান জানেন।

আধঘণ্টা পরে শ্যামলেন্দু যখন বেরিয়ে গেল, তখন মিসেস ডিক এম-ডির ঘরে ঢুকেছিল। মিসেস ডিকের মনে হলো, লাঞ্চের আগে মিস্টার ফেরিসকে যতটা চিন্তিত দেখাচ্ছিল, এখন আর তেমন মনে হচ্ছে না।

শ্যামলেন্দু নিজের ঘরে না ঢুকে পার্সোনেল অফিসার তালুকদারের ঘরে উঁকি মারলে। হরিহর তালুকদার এই অফিসে তেমন উন্নতি করতে পারেননি। তবে রুণু সান্যাল এবং শ্যামলেন্দু তুজনকেই তিনি খাতির করেন। কারণ তালুকদার জানেন, এই তুটো খুঁটির একটাই শেষ পর্যন্ত বোর্ডরুমে গিয়ে পৌঁছবে। তখন কাজে লাগতে পারে এরা।

"আসুন, মিস্টার চ্যাটার্জি, কি সৌভাগ্য আমার," হরিহর অভ্যর্থনা জানালেন।

"এলুম আপনাদের একটু খোঁজখবর করতে।"

অনেকক্ষণ কাজের কথার পর শ্যামলেন্দু ফ্যাকটরির খবর জানতে চাইলে। এখন ফ্যান কারখানায় কত লোক কাজ করে।

তিতি-বিরক্ত হরিহর বললেন, "আটশ' লোক মাত্র—কিন্তু আমার এক এক সময় মনে হয় আট কোটি। পৃথিবীতে যত রকম সমস্যা আছে—তার নমুনা আমাদের ফ্যাকটরিতে পাবেন। কী করে যে সামলে রেখেছি ভগবান জানেন।"

"আপনার মতো অভিজ্ঞ লোক রয়েছে এটা আমাদের সৌভাগ্য," হরিহরকে চাঙ্গা করার জন্যে শ্যামলেন্দু উত্তর দেয়।

"কোম্পানি সেটা অ্যাপ্রিসিয়েট করে না, স্যার। তাহলে আমাকে এতদিনে কভেনেণ্টেড ম্যানেজার করে দিত।" হরিহর মনের দুঃখ চেপে রাখতে পারেন না।

শ্যামলেন্দু চুপ করে থাকে। তালুকদার বললেন, "আপনি বাঙালী বলেই দুঃখ করছি। আমার ল্যাম্প ফ্যাকটরি আর ফ্যান ফ্যাকটরি মানিকজোড়ের নাম দিয়েছি হিরোশিমা নাগাসাকি।"

"তার মানে?"

"সত্যি কথা বলবো স্যার? এটম বোমার কেস।" তালুকদার হা হা করে হেসে ফেললেন।

শ্যামলেন্দু হাসতে পারলে না। তালুকদার লজ্জিত হয়ে বললেন, "কিছু মনে করলেন না তো স্যার—আপনি বেঙ্গলি বলেই বললাম। আমার অবস্থা দেখুন, ফ্যান ফ্যাকটরিতে তিনটে ইউনিয়ন। 'ক' ইউনিয়ন যদি উত্তর দিকে যাবে বলে, 'খ' ইউনিয়ন বলবে দক্ষিণ দিকে যাবো। 'গ' ইউনিয়ন তখন সুযোগ বুঝে আকাশের চাঁদ ধরতে চাইবে। তারপর আছে কোম্পানি পরিচালিত লেবার ক্যানটিন। বাড়িতে বউ শাক-চচ্চড়ি যা দেবে ঘাড়গুঁজে মেনিবেড়ালের মতো সুড়সুড় করে খেয়ে নেবে, অথচ কারখানায় নবাব খাজা খাঁ। পান থেকে চুন খসলেই ডিমনেস্ট্রেশন।"

শ্যামলেন্দু তারপর ঘরে ফিরে চুপচাপ বসে আছে। পাঁচটা বাজলো বলে। মিসেস অ্যাণ্ডারসন হন্তদন্ত হয়ে এসে বললেন, "ফ্যাকটরি ক্যানটিনে যারা মাল সাপ্লাই করে তাদের নাম-ঠিকানাগুলো চেয়েছিলেন, এই নিন।" শ্যামলেন্দু দেখলো

—মাছ, তরকারি, তেল, ডিম সমস্ত সাপ্লায়ারেরই নাম ও ঠিকানা রয়েছে।

ঘড়ির ছোট কাঁটা ইতিমধ্যেই পাঁচটার ঘরে ঢুকে পড়েছে। কিন্তু শ্যামলেন্দু উঠলো না। আজ পাঁচ তারিখ। পনেরো তারিখ হতে আর বেশী সময় নেই। পনেরো তারিখটা যেন ক্রমশ বড় হচ্ছে। অক্ষর দুটো বড় বড় হতে হতে যেন সমস্ত ক্যালেণ্ডারটাকে গ্রাস করে ফেলেছে। অক্ষরেরও তাহলে ক্যানসার হয়! ক্যানসার না হলে কী করে এত বেড়ে যাচ্ছে টিউমারের মতো!
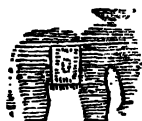
দোলন ও সুদর্শনা সেজেগুজে বসে আছে। ঘন ঘন ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে দোলন। মিস্টার ফেরিসের বাড়িতে আজ ককটেল আছে।

"তোর শ্যামলদার কাণ্ডটা দেখ," দোলন বোনের কাছে অভিযোগ করে।

"তোর বর, তুই দেখ!" সুদর্শনা হেসে উত্তর দিলো।

দশতলা থেকে উঁকি মারলে নিচে গাড়িগুলো দেখা যায়। মিস্টার-মিসেস সান্যাল, মিস্টার-মিসেস চোপরা, রাও, ভার্ঘিজ সবাই একে একে বেরিয়ে গেল। ভার্ঘিজ অবশ্য একা গেল, ওর ওয়াইফ প্রেগনেণ্ট।

দোলন যখন প্রায় আশা ছেড়ে দিতে বসেছে তখন শ্যামলেন্দু হন্তদন্ত হয়ে ফিরলো। বললে, "একস্ট্রিমলি স্যরি।"

"ওই একটা ইংরিজী কথা শিখে রেখেছো—সব রোগে পেনিসিলিনের মতো চালিয়ে যাচ্ছ," দোলন বেশ বিরক্ত হয়ে উত্তর দিলো।

"দায়িত্ব জিনিসটা বড় খারাপ দোলন।"

দোলন ঠোঁট বেঁকালো। "দায়িত্ব তোমার একার—ম্যানেজিং ডিরেকটরের নয়, ফিনানস ডিরেকটরের নয়, মিস্টার মূর্তির নয়, চোপরার নয়, রুণু সান্যালের নয়।'

"দেবী, মার্জনা ভিক্ষা করছি,' শ্যামলেন্দু হাত জোড় করে হাসতে হাসতে বললে

"অফিসে দুবার টেলিফোন করেছি, তোমার ঘরে ডাইরেক্ট নম্বরে। কোনো সাড়া নেই," দোলন বললে।

সুদর্শনা বললে, "দিদির শুধু চিন্তা মিসেস অ্যাণ্ডারসনকে নিয়ে! আমরা তো ভাবছি আজকে এম-ডিকে বলবো ওর বদলে দিদিকেই বসাতে।"

শ্যামলেন্দু বললে, "খুব ভাল আইডিয়া।" তারপর কথা না বাড়িয়ে, সট করে ভিতরে ঢুকে গেল। "জাস্ট তিন মিনিট।"

খুব তাড়াতাড়িই তৈরি হয়ে বেরিয়ে এলো শ্যামলেন্দু। কিন্তু দোলন স্বামীর ড্রেস দেখে আঁতকে উঠলো। "উঃ! আর পারা যায় না। লাউঞ্জ স্যুট পরলে কি বলে? কার্ডটা দেখ, ড্রেস ফর্মাল।"

"ভেরি স্যরি, ভুলে গিয়েছিলাম," বলে শ্যামলেন্দু আবার ডিনার জ্যাকেট পরতে ভিতরে চলে গেল।

"ড্রেস কী দিদি? কী পরে আসতে হবে তাও কর্তারা হুকুম দেয় নাকি?"

"নিশ্চয়। ম্যানেজিং ডিরেক্টরের পার্টিতে যাচ্ছে—এটা ইয়ারকি নয়। সেবারে পাণ্ডে বলে একটা লোক ডিনার স্যুট পরে আসেনি বলে চাকরি গেল। তখন এম-ডি ছিলেন বোয়লান সায়েব। লর্ড ফ্যামিলির ছেলে, ম্যানারের অভাব বরদাস্ত করতে পারতেন না।"

শ্যামলেন্দু এবার বেরিয়ে এলো ডিনার জ্যাকেট পরে। সাদা কোট, কালো বো টাই, কালো প্যান্ট। প্যান্টের দুধার দিয়ে দুটো দাগ নেমে গিয়েছে। প্যান্টের তলায় ফোল্ড নেই। সঙ্গে ছুঁচলো কালো পেটেণ্ট লেদারের জুতো। দেখে তো সুদর্শনার হাসি চেপে রাখা দায়।

"হাসিতেছ কেন, শ্যালিকা সুন্দরী?" শ্যামলেন্দু প্রশ্ন করে।

"আমাদের পাটনাতে জয়সোয়ালরা একবার বিয়েতে ব্যাণ্ড পার্টি নিয়ে গিয়েছিল। যে-লোকটা বিরাট একটা ড্রাম পিঠে বইছিল, সে এই রকম ড্রেস পরেছিল", টুটুল বলে ফেলে।

"রসিকতা!" শ্যামলেন্দু চোখ বড় বড় করলে।

গাড়িতে বসে টুটুল বললে, "আপনাদের মিসেস ফেরিস কিন্তু খুব ভাল মানুষ। আমি এখনও কলকাতায় আছি শুনে নিজে টেলিফোন করে আমাকে আসতে বললেন, অথচ আমি তো অফিসের কেউ নই।"

"নয় মানে? অফিসের শ্যালিকা বলে কথা," শ্যামলেন্দু পরিবেশটা হাল্কা করার চেষ্টা করে।

"অফিসের শ্যালিকা হতে যাবো কোন দুঃখে? আমি আপনার শ্যালিকা," টুটুল উত্তর দেয়।

দোলনের রাগ পড়েছে এবার বোঝা গেল। সে জিজ্ঞেস করলে, "সোনালি বুটি দেওয়া বেনারসী শাড়ি পরে শ্যালিকাকে কেমন দেখাচ্ছে বললে না তো?"

চোখ বড় বড় করে শ্যামলেন্দু উত্তর দিলো, "তোমার সামনে বলতে সাহস

হচ্ছে না, মনের ভাব আড়ালে নিবেদন করবো!"

"ইয়ারকি ছাড়ুন। দিদিকে কী মিষ্টি দেখাচ্ছে বলুন তো—এখনই বিয়ের পিঁড়িতে বসিয়ে দেওয়া যায়। দিদির সম্বন্ধে কিছু মতামত দিন," সুদর্শনা সমস্ত পরিবেশটা আনন্দোচ্ছল করে তুললো।

ড্রাইভ করতে করতে শ্যামলেন্দু বললে, "বলতে পারি—যদি তোমার দিদি অনুমতি দেন।"

"দিদির হয়ে আমিই অনুমতি দিচ্ছি, মশাই," সুদর্শনা সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিলো।

শ্যামলেন্দু বললে, "নিজের ভাষায় কুল পাচ্ছি না। তাই কবির ভাষায় বলছি :

তুমি মোর অবন্তীর প্রিয়া!
হেমচম্পক বরণী—
তুঙ্গপীন পয়োধর কাঁচলি
আঁটিতে নাহি পারে,
অলস মন্থর গতি বিপুল
জঘন-গুরুভারে
ইন্দীবর আঁখিকোণে মদালস
ভঙ্গুর চাহনি।"

লজ্জায় গাল রাঙা হয়ে উঠলেও সুদর্শনা মিটমিট করে হাসতে লাগলো। আর বোনের সামনে অপ্রস্তুত হয়ে দোলন রেগে গিয়ে বললে, "একেবারে ঠেলে ফেলে দেবো। মার্চেন্ট অফিসের লোকগুলো বড্ড অসভ্য হয়, জানিস টুটুল!"

"কার লেখা শ্যামলদা?" টুটুল জিজ্ঞেস করে।

"আন্দাজ করো।"

"রবীন্দ্রনাথের?"

"শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। এক সময় খুব পড়তাম রে। মার্চেন্ট অফিসের ফেরিওয়ালা হয়ে এখন সব জলে গিয়েছে। এখন শুধু স্মৃতিশক্তির ওপর বেঁচে আছি। পুরানো দিনে যা পড়েছিলাম তার থেকে কোটেশন দিয়ে চালাই।"

ম্যানেজিং ডিরেকটরদের বাড়ির সামনে উঁচু পাঁচিলঘেরা লন। নরম কচি সবুজ ঘাসের কার্পেট পাতা রয়েছে যেন লনটায়। লনের চারিদিকে ছোট ছোট জোনাকির মতো রঙীন আলো। আলোগুলোও কেমন নরম-নরম।

রুণু সান্যালের লাইট ডিভিশনের বিশেষজ্ঞরা বহু মাথা ঘামিয়ে এই আলোক-সজ্জার ব্যবস্থা করেছেন। রুণু বলে, "ককটেল পার্টির লাইট আলো দেবার জন্যে নয়, শুধু অন্ধকারকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্যে। নরম মিষ্টি আলো মানুষকে অন্তরঙ্গ হবার সুযোগ দেয়।"

এম-ডির বাড়িতে এই আলোকসজ্জা সম্পর্কেই বোধ হয় রুণুর সঙ্গে মিসেস ফেরিসের আলাপ-আলোচনা চলছিল। অনেক অতিথিই এসে গিয়েছেন। শ্যামলেন্দুকে দেখে সস্ত্রীক মিঃ ফেরিস একটু এগিয়ে এলেন এবং করমর্দন করলেন। টুটুলকে বেশ খাতির করলেন মিসেস ফেরিস। বললেন, "তুমি যে আসতে পেরেছ এর জন্যে আমি খুব আনন্দিত।"

ভিড়ের মধ্যে শ্যামলেন্দু কোথায় হারিয়ে গেল। একটা টমাটো জুসের গেলাস নিয়ে টুটুল জিজ্ঞেস করলে, "শ্যামলদা বেশ লোক তো। কোথায় কেটে পড়লো?"

দোলন বললে, "পার্টিতে এই নিয়ম। বউ-এর আঁচল ধরে ঘুর-ঘুর করলে সকলে হাসাহাসি করে। বলে, গৃহিণী কিছু হারিয়ে যাচ্ছে না। এখন মন দিয়ে ড্রিংক করো।"

রুণু এবার সামনে এসে দাঁড়ালো। মিসেস চোপরাও একটা হুইস্কির-গেলাস নিয়ে হাজির হলেন। মিসেস চোপরাকে রুণু বললে, "আমাদের দিকে একটু নজর দিন মিসেন চোপরা। আপনাকে ওয়াণ্ডারফুল দেখাচ্ছে।"

"কাঁচা মিথ্যে কথাগুলো কেন বলছেন, মিস্টার সান্যাল!"

"হাইকোর্টের জজের সামনে এফিডেভিট করে বলতে পারি, হানড্রেড ওয়াট পিটারস্ ল্যাম্পের মতো ব্রাইট ঝকঝকে দেখাচ্ছে আপনাকে। দাঁড়ান চোপরা সায়েবকে ডেকে আনছি। আমি যা বলছি, মিস্টার চোপরার নজরে তা পড়েনি, হতেই পারে না।"

চোপরা সায়েবকে সত্যিই পাকড়াও করে আনলো রুণু। বললে, "চোপরা সায়েব, আপনার স্ত্রীর সৌন্দর্য যে সম্প্রতি বৃদ্ধি পেয়েছে, এটা আপনি নোটিশ করেননি, তা কেমন করে হতে পারে?"

আনন্দে বিগলিত মিসেস চোপরা বললেন, "তাহলে সত্যি কথা বলছি, লাস্ট ছ'সপ্তাহ মিডলটন রোডে যে নতুন ফিগার সেলুন হয়েছে ওখানে যাচ্ছি। ওখানকার মিসেস কাউর আমার অনেকদিনের জানাশোনা—লণ্ডন থেকে বিউটি ডিপ্লোমা নিয়ে এসেছে। খুব রিজনেবল রেট—আধঘণ্টা সেশনের জন্যে মাত্র কুড়ি টাকা।"

"চোপরা সাহেব খরচে নিশ্চয় কোনো আপত্তি করছেন না। অথচ অফিসের খরচের ব্যাপারে আমাদের সকলকে চেন দিয়ে বেঁধে রেখেছেন। মিসেস চোপরা, আপনার স্বামীর কাছে আমাদের সম্বন্ধে একটু রেকমেণ্ড করে দিন। অফিসে উনি যেন হাতে মাথা না কাটেন!"

রুণু সান্যালের কথা শুনে মিস্টার চোপরা সমেত সবাই হেসে ফেললে।

চোপরা দম্পতি এবার ফিনানস ডিরেকটর গর্ডনের দিকে সরে গেলেন। মিসেস সান্যাল দূর থেকে মিসেস চোপরাকে দেখে মন্তব্য করলেন, "ভদ্রমহিলার হলো কী? গতবারের পার্টিতে যে ভায়োলেট রঙের শাড়িটা পরে এসেছিলেন এবারেও সেটা পরেছেন! না-হয় এম-ডির ফেভারিট রং ভায়োলেট।"

উপস্থিত মহিলাবৃন্দের অনেকেই এটা লক্ষ্য করেছেন। টুটুল তো অবাক। মিসেস সান্যালের স্মৃতিশক্তির প্রশংসা না করে পারা যায় না। দোলন ফিস ফিস করে বোনকে বললে, "এই পার্টিগুলো অফিসারদের পরীক্ষা। কে কতখানি সামাজিক তা কর্তারা বাজিয়ে দেখেন। বউরা, সেই পরীক্ষায় যতখানি পারে স্বামীদের সাহায্য করে।"

"কিন্তু দিদি, কে কোথায় কবে কোন শাড়ি পরে এসেছে তা মনে রাখবে কী করে?" টুটুল জিজ্ঞেস করে।

"যাদের একটু উচ্চাশা আছে, যারা তাড়াতাড়ি উন্নতি করতে চায়, তাদের বউদের স্পেশাল নোট বই রাখতে হয়। তাতে কোন বড় কর্তার সঙ্গে কবে কোথায় সামাজিক ভাবে দেখা হলো লিখে রাখতে হয়, এবং সেই 'অকেশনে' শাড়ির এবং ব্লাউজের কী রঙ ছিল তা নোট করতে হয়, যাতে রিপিট না হয়।"

"বলিস কী দিদি।" টুটুল নিজের বিস্ময় চেপে রাখতে পারে না। দোলন বলে, "সেই নোট বইতে, নিজের বাড়িতে কোনো পার্টি দিলে, তার মেনু এবং অতিথিদের নামও লিখে রাখতে হয়। মনে কর, ডেভিডসন সায়েব রুণুদের বাড়িতে একবার ডিনারে গিয়ে মুলিগটানে স্যুপ, তন্দুরি চিকেন এবং নান খেয়েছেন, শেষে ফ্রুট স্যালাড। পরের বারে যদি ডেভিডসন খেতে আসেন তখন যাতে একই খাবার না হয় তার জন্যে সাবধান হতে হবে। তারপর ধর, মিসেস গর্ডনের চিংড়ি মাছে এলার্জি; অথচ মিস্টার গর্ডন চিংড়ি মাছ খেতে ভালবাসেন। ফলে তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে, মিস্টার গর্ডনকে যখন নেমন্তন্ন করেছ তখন মিসেস গর্ডন বিলেতে রয়েছেন কিনা।"

"দিদি, তুই আর বলিস না, আমার মাথা ঘুরছে। পাটনার সমস্ত বান্ধবীদের

বলে দেবো, তাদের পক্ষে কভেনেণ্টেড অফিসারের বউ হবার কোনো চান্স নেই। এর জন্যে চাই স্পেশাল ট্রেনিং।"

"দূর বোকা, মেয়েরা চাপে পড়লে পারে না এমন কোনো কাজ নেই! সব ঠিক হয়ে যায়। শুধু শেখবার আগ্রহ থাকা চাই।" দোলন বোনকে আশ্বাস দেয়।

মিসেস সেনগুপ্ত এবার ওদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। বেচারার মুশকিল অনেক। ইংরিজী তেমন জানেন না। বর্ষীয়সী ভালমানুষ মহিলা, পার্টিতে এসে বেশ অস্বস্তি বোধ করেন। দোলনদের দলে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। বললেন, "ইংরিজীটা না-শিখে যে কী ভুলই করেছি। এদের কাছে মান-সম্মান থাকে না।"

টুটুল বললে, "মাসিমা, আপনি এ-কথা বলছেন কেন? আপনি যে-দেশের লোক সেখানকার ভাষা জানেন তো? জাপানী বউরা তো ইংরিজী জানে না বলে লজ্জা পায় না!"

দোলন বললে, "মিসেস সেনগুপ্তর অসুবিধাটা আমি বুঝি। জানিস্ টুটুল, ইণ্ডিয়া কোনোদিন জাপান হবে না!'

"হলে সুবিধেই হতো, দিদি। আচ্ছা আচ্ছা আমেরিকান, ইংরেজ, জার্মান আমাদের ভাষা জানে না বলে ক্ষমা চাইতো," টুটুল সোজাসুজি উত্তর দিলো।

মিসেস সেনগুপ্ত বললেন, "আমরা দুজনে একটু আলাদা ধরনের মানুষ। ছেলেদের পড়াশোনায় ক্ষতি হবে বলে বেশী পার্টিতে আসি না।"

দোলন বললে, "মিস্টার সেনগুপ্ত এসব এড়িয়ে চলবার সাহস রাখেন, কারণ উনি নিজের সাবজেক্টটা খুব ভাল জানেন। আর কোম্পানি আইনকে কোন সায়েব না ভয় করে? কিন্তু বাকি সকলের কথা আলাদা। তাদের কাজও করতে হবে এবং মন যুগিয়েও চলতে হবে। এইটাই মার্চেণ্ট অফিসের অলিখিত নিয়ম।"

টুটুল বলে, "কাজ করবো। কিন্তু মন যোগাবো কোন দুঃখে?"

"এই জন্যেই তো বাঙালীরা মরে," মিসেস সেনগুপ্ত জানালেন, "বেশীর ভাগ বাঙালী এত সেন্টিমেণ্টাল যে চাকরিও করবে অথচ চাকরির এই দিকটা দেখবে না।"

দোলন বললে, "নতুন কোনো সায়েব এলে সবাই চিন্তায় পড়ে যায়। কী খেতে ভালবাসেন, কী রঙ পছন্দ করেন, কোন কোন বিষয়ে আগ্রহ।"

"তাতে তোমাদের কী দরকার?"

"বা রে! পার্টিতে আমাদের কর্তারা কোন কোন বিষয়ে আলোচনা করবে?"

দোলন বললে, "আগেকার এম-ডি মিস্টার বোয়লান, ওঁর ছিল আর্কিটেকচারে আগ্রহ। মার্চেন্ট অফিসের লোকরা আর্কিটেকচারের কী বুঝবে? কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অনেক দামী দামী বই কিনে, ইণ্ডিয়ার মন্দির স্থাপত্য সম্বন্ধে পড়াশোনা আরম্ভ করলো। মুশকিল হলো আবার মিস্টার ফেরিস এলেন। ওঁর যে কী বিষয়ে আগ্রহ তা কিছুতেই জানা যাচ্ছিলো না। সকলে বেশ দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছিল। এমন সময় একদিন দেখি মিস্টার এবং মিসেস জৈন আমাদের এম-ডির সঙ্গে কুকুর সম্বন্ধে আলোচনা করছেন। জৈনদের আটতলার ফ্ল্যাটে গিয়ে দেখি কুকুরদের সম্বন্ধে তিন-চারখানা বই টেবিলের ওপরে রয়েছে। অথচ ওঁরা কোনো বইপত্র কেনেন বলে জানতাম না। মিসেস জৈন আমার বিশেষ বান্ধবী। ওঁকে চেপে ধরলাম। বেচারা তখন আমাকে খুব গোপনে বললেন, মিস্টার এবং মিসেস ফেরিস দুজনেই কুকুরে আগ্রহী। বললুম, জানলেন কী করে? মিসেস জৈন জানালেন, অনুসন্ধানের মতলবটা ওঁর বোনের স্বামী দিয়েছে, 'একটু সুযোগ পেলেই এম-ডির বাড়িতে একবার টয়লেটে যেতে চাইবে। মেয়েরা টয়লেটে যেতে চাইলে সাধারণতঃ গৃহস্বামীর শোবার ঘরের লাগোয়া বাথরুমেই নিয়ে যাওয়া হয়। শোবার ঘরের ভিতর দিয়ে যাবার সময় টুক করে দেখে নেবে বিছানার মাথার গোড়ায় কী কী বই আছে। সায়েবরা তাঁদের ফেভারিট বইগুলো এখানে রাখে।' এরপর সোজা ব্যাপার। মিসেস জৈন ফেরিসদের বেডরুমে তিন-চারখানা কুকুর সংক্রান্ত বই দেখলেন।"

মিসেস সেনগুপ্ত বললেন, "ওমা? তাই বলি, হিন্দুস্থান পিটারস্-এর অফিসার মহলে হঠাৎ এত কুকুর সম্পর্কে আগ্রহ বাড়লো কেন?"

এবার কথায় বাধা পড়লো, খোদ মিসেস জৈন এসে দলে যোগ দিলেন। তার একটু পরেই এলেন মিস্টার গর্ডন। মিসেস জৈনের মুখের সিগারেটে আগুন ধরিয়ে দিলেন মিস্টার গর্ডন। বললেন, আজকের ওয়েদার খুবই সুন্দর। তিনি প্রতি মুহূর্তে এনজয় করছেন; আশা প্রকাশ করলেন সুন্দরী মহিলারাও এখানে আনন্দ পাচ্ছেন।

গর্ডন সায়েবকে দেখেই অ্যাকাউন্টসের জনার্দনম হাজির হলেন। "কেমন আছ জনার্দনম?" গর্ডন জিজ্ঞেস করেন।

"ভালই আছি, মিস্টার গর্ডন। কিন্তু আমাদের নতুন ইনভয়েসিং সিস্টেম

নিয়ে একটু গোলমালে পড়ে গিয়েছি।" এই বলে জনার্দনম ইনভয়েস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আরম্ভ করতে যাচ্ছিলেন। দেখাতে চান অফিস সম্বন্ধে তিনি কত ভাবেন।

কিন্তু গর্ডন সায়েব পিছলে বেরিয়ে গেলেন। রসিকতা করে বললেন, "অফিসের বাইরে অফিস সংক্রান্ত আলোচনায় আমার কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু তার জন্যে আমি মিনিটে দশ টাকা চার্জ করে থাকি।"

জনার্দনম তখন বললেন, "তাহলে কালকেই আপনার সঙ্গে দেখা করবো।"

"যখন খুশী। আমার সেক্রেটারীকে একটু টেলিফোন করে জেনে নিও ফ্রি আছি কিনা।" গর্ডন উত্তর দিলেন।

সায়েবরা না-চাইলেও ইণ্ডিয়ানরা পার্টিতে প্রাণ খুলে অফিসের কথা আলোচনা করে যাচ্ছেন। অফিসের বাইরে ঘোড়ার মাঠ ছাড়া আর কোনো কিছুর সঙ্গে তেমন পরিচয় নেই এঁদের অনেকের। গৃহিণীরা অবশ্য আলোচনা করছেন বাজার দর সম্পর্কে। দিশী প্রসাধন সামগ্রীর খারাপ কোয়ালিটি সম্পর্কে। কয়েকজন এর মধ্যে ইংরিজী ফিল্ম সম্পর্কেও কথা তুলেছেন। আর বিষয় হলো সার্ভেণ্ট। কলকাতা শহরের সার্ভেণ্টগুলো যা নবাব হয়ে উঠছে শেষ পর্যন্ত হবে কী! গৃহভৃত্যরা যে গোল্লায় যাচ্ছে এ সম্বন্ধে গৃহিণীদের মধ্যে কোনোরকম মতদ্বৈধ নেই।

মিস্টার মিঠু সেন বোধ হয় একটু বেশী হুইস্কি টেনে ফেলেছেন। মহিলাদের কাছে এসে বললেন, "মিসেস চ্যাটার্জি, আজকে যে কার মুখ দেখে উঠেছি, সকাল থেকেই গালাগালি খাচ্ছি। এজেন্সির মিস নারগোলওয়ালার সঙ্গে একটু ক্রিয়েটিভ আলোচনার জন্য দুপুরবেলায় লা-ভেগা বার-এ গিয়েছিলাম। সেখানে খোকন বাসু আর্টিস্ট মাল টানছিল। নেশার ঘোরে খোকন বাসু বলে কী জানেন? বস্তির ছোটলোকদের আগে যেসব গুণ ছিল, এখন ফ্ল্যাটবাড়ির হাই-অফিসাররা সেইগুলো পেয়েছেন। যেমন ছোটলোকেরা লেখাপড়া করতো না, গালাগালি দিত, সারাক্ষণ ডাংগুলি খেলে বেড়াতো, মদ খেয়ে বেসামাল হতো এবং বউকে মারতো। খোকন বাসুর এত বড় আস্পর্ধা যে চীৎকার করে বললে, এখন এই নিউ ইনডাসট্রিয়াল সোসাইটিতে কোট-প্যাণ্ট পরা লোকগুলোও ঠিক তাই করে। মিস নারগোলওয়ালা আমাকে থামিয়ে দিলেন তাই, না হলে আজ হাতাহাতি হয়ে যেত। অফিসেও মিস্টার চ্যাটার্জি এক্সপোর্ট বিজ্ঞাপনটা পাস করলেন না। এখানেও আমার দিকে আপনারা কেউ তাকাচ্ছেন না। তার ওপর পাঞ্জাবী ওয়াইফও এই ভিড়ের মধ্যে কোথায়

হারিয়ে গিয়েছে খুঁজে পাচ্ছি না !"

মিঠু সেনের মত্ত অবস্থা দেখে দোলনের বোধ হয় মায়া হলো। বললে, "আপনার বউকে খুঁজে দিচ্ছি। একটু আগেই মিস্টার সান্যালের সঙ্গে কথা বলছিলেন উনি। এক্সপোর্ট বিজ্ঞাপনের ব্যাপারটা আমি ঠিক জানি না, তবে আমার স্বামীকে জিজ্ঞেস করবোখন। আর আপনার লা-ভেগা বার-এর খোকন বাসু লোকটা সত্যিই অসভ্য, দুনিয়ার এত লোক থাকতে শুধু হাই অফিসারদের দোষ খুঁজে বেড়াচ্ছে। তাকে বলবেন, হিংসেটা একটু কমাও। হিংসে করে হলেই, আমাদের জাতের কিছু হচ্ছে না।"

সাড়ে-দশটা নাগাদ ওরা ককটেল থেকে বেরিয়েছিল। গাড়িতে বসে দোলন জিজ্ঞেস করলে, "টুটুল তোর কেমন লাগলো ?"

"মনে হচ্ছিলো আমি ভারতবর্ষে নেই। অনেক দূরে, বিলেত কিংবা আমেরিকায় চলে গিয়েছি।" টুটুল গম্ভীর হয়েই উত্তর দিলো।

"তোমার সহকর্মীদের বউদের অনেক গুণ—দেখতে সুন্দরী, মদ খেতে পারে, বাজনার তালে তালে নাচতে পারে," দোলন স্বামীকে বললে।

শ্যামলেন্দু হাসলে। টুটুল জিজ্ঞেস করলে, "আচ্ছা দিদি, তোমাদের মিস্টার ফেরিস, মিস্টার গর্ডন, মিস্টার মূর্তি এদের ঘিরে সবাই এত গদগদ হচ্ছিলো কেন ?"

"বাঃ, ডিরেকটর যে। তুমি তুষ্টে জগৎ তুষ্ট !"

"আপনাদের সেই শর্মাকে তো দেখালেন না শ্যামলদা ! যে বাড়িতে পার্টির দিনে প্রেস্টিজ নষ্ট হবার ভয়ে, বুড়ো কেরানি বাবাকে ঘরে তালা দিয়ে রেখেছিল," টুটুল জিজ্ঞেস করলে।

"ছিল তো। ছিনে জোঁকের মতো এম-ডির গায়ে শর্মা লেগে ছিল সারাক্ষণ", শ্যামলেন্দু বললে।

"বাবাকে তালাবন্ধ করে রাখা, মাকে আয়া বলে ইংরিজীতে পরিচয় দেওয়া অনেকেই করে—ধরা পড়ে গেছে বেচারা শর্মা একা," দোলন যোগ করলো।

প্রসঙ্গ পাল্টে গেল। দোলন বললে, "তোমার কী হলো আজ ? পার্টিতে ঢুকলে হাসিমুখে, তারপর একবার ফেরিসের সঙ্গে এককোণে গিয়ে গুজগুজ করলে এবং মুহূর্তের মধ্যে ভীষণ গম্ভীর হয়ে গেলে। মনে হলো কিছুই তোমার ভাল লাগছে না।"

"কই ? না তো।" শ্যামলেন্দু প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গিয়ে হুইস্কি করতে লাগলো।

অফিসে সকাল থেকেই কাজের মধ্যে ডুবে ছিল শ্যামলেন্দু। কিন্তু মাঝে-মাঝে ওই পনেরো তারিখটার দিকে নজর পড়ে যাচ্ছিলো, যেদিন রাত বারোটার পরেই কোম্পানিকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

কিন্তু অফিস দেখে সে কথা কে বুঝতে পারবে? বড় সায়েবের পার্টিতে গতকালের আনন্দোৎসব ও ডান্স দেখে কে বলবে হিন্দুস্থান পিটারস্-এর সামনে বিরাট একটা সমস্যা আছে—পনেরো তারিখে টাইম বোমার মতো সেটা ফেটে পড়ে এই কোম্পানির ভিৎ নড়িয়ে দেবে।

বিকেল তিনটের সময় হরিহর তালুকদার বেশ চিন্তিত মুখে এম-ডির ঘর থেকে বেড়িয়ে এলেন। করিডর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হরিহরের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। দুয়ে আর দুয়ে যোগ দিয়ে চার হচ্ছে।

শ্যামলেন্দুর ঘরে ঢুকে হরিহর বসে পড়লেন। এই এয়ার কণ্ডিশনেও হরিহরের টাকে ঘাম জমতে দেখে শ্যামলেন্দু বুঝলে ভদ্রলোক উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। শান্তভাবে শ্যামলেন্দু বললে, "বসুন, মিঃ তালুকদার। এত ভাবিত দেখাচ্ছে কেন?"

"বেশ বিপদ স্যার। ফ্যাকটরিতে সিরিয়াস টেনশন। দুপুরে খাওয়ার সময় ক্যানটিনে গোলমাল শুরু হয়েছে—মাছের টুকরোর সাইজ নাকি ছোট দিয়েছিল। আমাদের তো দমকল বাহিনীর কাজ, খবর পেয়েই ছুটেছিলুম—আমার আজ লাঞ্চ হলো না।"

শ্যামলেন্দু দুঃখ প্রকাশ করলে, জানতে চাইলে ফিরে এসে হরিহর কিছু খেয়েছেন কিনা।

"আর খাওয়া! ওয়ার্কারদের অ্যাটিচুড আমার ভাল মনে হলো না। তাই ফ্যান কারখানা থেকে ফিরেই এম-ডির কাছে রিপোর্ট দিতে গিয়েছিলাম। কিন্তু বড় সায়েব সাফ বললেন, এখন উনি ব্যস্ত থাকবেন—ফ্যান ফ্যাকটরির সব ব্যাপার যেন আপনার কাছে রিপোর্ট করি। আপনাকে এইরকম কিছু বলেছেন নাকি?"

"হ্যাঁ, হুকুমটা পেয়ে গিয়েছি," শ্যামলেন্দু গম্ভীরভাবে উত্তর দিলে।

প্রচণ্ড হতাশায় মুষড়ে পড়লেন হরিহর তালুকদার। দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে

বললেন, "সারা জীবন এম-ডি'র ডাইরেক্ট আণ্ডারে কাজ করেছি। রিটায়ার হবার দেড় বছর আগে আমার কপালে এই শাস্তি ছিল—কিছু মনে করবেন না স্যার, আপনি বাঙালী বলেই নিজের দুঃখের কথা বলছি। আফটার অল, বাঙালী কখনও বাঙালীর মাংস খেতে পারে না।

সত্যি ভেঙে পড়েছেন তালুকদার। ওঁকে চাঙ্গা হয়ে ওঠবার সময় দিলে শ্যামলেন্দু। তালুকদার বললেন, "এ-সম্বন্ধে কোনো অফিস অর্ডার বেরুচ্ছে নাকি, স্যার ?"

"এখনই কিছু হচ্ছে না। আপনি চিন্তা করবেন না," শ্যামলেন্দু উত্তর দেয়।

"আমরা স্যার ব্রিটিশ আমলের লোক। ডিসিপ্লিনড্ সোলজার। আপনি আমাকে আর যাই বলুন, কখনও ওবিডিয়েণ্ট নই এ-কথা বলবার সুযোগ পাবেন না।"

"বলুন এবার ফ্যাকটরির কথা।" শ্যামলেন্দু কয়েকটা চিঠি সই করতে করতে প্রশ্ন করলে।

"ওই বলছিলুম—মাছের সাইজের ব্যাপার। আমাকে দেখে ওয়ার্কাররা অকথ্য ভাষায় গালাগালি করলে। বাবা নাম দিয়েছিলেন হরিহর, আর ওরা কী বললে জানেন ? হাড়হারামজাদা তালুকদার।"

"অবস্থাটা লক্ষ্য করে যান। হয়তো একদিনের ব্যাপার, কালকেই সব ঠিক হয়ে যাবে" শ্যামলেন্দু গম্ভীরভাবে বললে।

"তাই হোক। আপনাকে সব সময় পিকচারে রেখে যাবো। তবে রামলিঙ্গম আগেই বলেছিল—সূর্য মকরে প্রবেশ করছে, রবি আমার পক্ষে মোটেই মঙ্গলকারক নয়। শুধু বুধের জন্য সর্বনাশ করতে পারবে না, বুধ আমাকে ঘিরে রেখেছে মিঃ চ্যাটার্জি।"

তারপরেই খবরটা ছড়িয়ে পড়েছিল। ছোট্ট ছোট্ট কাঁচের ঘরের খুপরিতে ফিস-ফিস আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছিল। "শ্যামলেন্দু চ্যাটার্জির এই নতুন দায়িত্ব মানে উন্নতি না অবনতি ?"

দেশী সায়েবরা ইনটারন্যাল টেলিফোনে, বাবুরা প্রস্রাবখানায় এবং বেয়ারারা সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে আলোচনার মাধ্যমে খবরটা সম্পর্কে নিজেদের ভাষ্য প্রচার করেছিল।

রুণু সান্যাল একটুও দেরি না করে ফোন তুলে নিয়েছিলেন। "বিবি, আমি বলছি। গরম খবর।" তারপর স্ত্রীর কাছে খবরটা রিপোর্ট করেছিলেন সবিস্তারে।

স্ত্রীর মতামত চেয়েছিলেন রুণু সান্যাল। "তোমার কী মনে হয়, বিবি?"

"আমার তো মনে হয়, শেষের শুরু।"

"আমারও তাই মনে হচ্ছে—বিগিনিং অফ দি এণ্ড! হয়তো লেবারের কোনো হাবিজাবি কাজ চাপিয়ে আস্তে আস্তে মার্কেটিং থেকে সরিয়ে দেবে।"

"বিবি, তোমাকে আগেই বলেছিলাম, পাটনায় ইংরিজীতে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হওয়া এক জিনিস, আর বিলিতী কোম্পানির মার্কেটিং একজিকিউটিভ হওয়া আর এক জিনিস। আর সায়েবদেরও বলিহারি, ওঁদের গায়েও সমাজতন্ত্রের হাওয়া লেগেছে! ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউণ্ড না দেখেই যদুমধুর ছেলেদের ম্যানেজমেণ্ট ক্যাডারে চাকরি দিচ্ছে। সোশ্যালিজম এক জিনিস আর এই মার্চেণ্ট অফিস চালানো আর এক জিনিস।"

নীলরক্ত সম্পর্কে মিসেস সান্যাল স্বামীর সঙ্গে একমত হলেন। কারণ তাঁর বাবাও উইলিয়ামসন মেগরের চা-বাগানে মেজসায়েব হয়েছিলেন। বিবি বললেন, "আমার বাবা বলতেন, একজন ইণ্ডিয়ানের পিছনে আর একজন ইণ্ডিয়ানকে লাগিয়ে রাখা ম্যানেজমেণ্টের একটা পলিসি। তোমাকে ওরা অত ভালবাসে তবু পিছনে হনুমান লেলিয়ে দিয়েছে।"

"বিবি, তোমার এটর্নি অফিসে চাকরি করা উচিত ছিল! তোমার আইনের ব্রেন অদ্ভুত।"

স্বামীকে নাম ধরে ডাকে বিবি। "তোমায় কাল রাত্রে বলা হয়নি, রুণু। মিস্টার ফেরিসের সঙ্গে যেন কী একটা কথা-কাটাকাটি হলো চ্যাটার্জির। তারপরেই তোমার বন্ধুর মুখ একেবারে নীল হয়ে গেল!"

"ফ্যান ডিভিশন থেকে যদি ওকে সরায় তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে, বিবি?" রুণু সান্যাল স্ত্রীর ভাষ্য শুনতে চায়।

"তোমাকেই আরও দায়িত্ব নিতে হবে। ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো তুমি তো আছই।"

"খবরটা এখন কিন্তু একেবারে টপ সিক্রেট।" রুণু সাবধান করে দেয়।

"তুমি যদি চাও আমি রাঙা মাসিমার সঙ্গে কথা বলতে পারি," বিবি বলে।

"এখন নয় বিবি—হাজার হোক রিটায়ার্ড আই-সি-এস অফিসারের বউ।"

"আচ্ছা গো আচ্ছা! আর শোনো. তোমার ঐ গলার আংটিতে যেন এ টোকাটা লাগিয়ো না বুঝলে!"

পরের দিন আরও উত্তেজনা। হরিহর হাঁফাতে হাঁফাতে চ্যাটার্জির ঘরে

ছুটে এলেন। বললেন, "বাইরের লাল আলোটা জ্বেলে দিন স্যার। সিচুয়েশন ইজ কেরোসিন।"

"মানে?"

"মানে যে-কোনো মুহূর্তে ফ্যান কারখানায় আগুন জ্বলে উঠতে পারে। মাছ নাকি আজকে আরও ছোট হয়েছে। কিছু মাছে গন্ধ ছিল।"

"গন্ধ?"

"মানে অভিযোগে প্রকাশ—ইট ইজ অ্যালেজ্‌ড, মাছ পচা ছিল। কিন্তু আমরা তীব্রভাবে অস্বীকার করেছি," হরিহর বললেন।

"তারপর?"

"ওরা স্যার, বিশ্রী কাণ্ড বাধিয়েছে। মাছটা খাওয়া ছাড়েনি—মাছ খেয়ে, মাছের কাঁটা হাতে করে নিয়ে আমার লেবার অফিসারের টেবিলে ফেলে দিয়ে এসেছে। বিশ্রী ব্যাপার স্যার, দেখলে বমি হয়ে যাবার উপক্রম। তার সঙ্গে শ্লোগান দিচ্ছে—কোম্পানি নিপাত যাক, হাড়হারামজাদার মুড়ো নাও।"

"প্রোডাকশন?" শ্যামলেন্দু জিজ্ঞেস করে।

"কমতে আরম্ভ করেছে স্যার।"

"গো-শ্লো?"

অভিজ্ঞ পার্সোনেল অফিসার হরিহর বললেন, "ঠিক গো-শ্লো নয়—এখনও গো-মিডিয়াম। আপনি যদি বলেন, আমাদের এটর্নি লায়ন অ্যাণ্ড বড়ালের মিস্টার বড়ালের সঙ্গে পরামর্শ করতে পারি।"

শ্যামলেন্দু এবার বেশ গম্ভীর হয়ে উঠলো। "যা প্রয়োজন মনে করেন করুন, কিন্তু একটা কথা আমি সোজাসুজি জানাতে চাই, কোনো রকম নিয়ম-ভঙ্গ সহ্য করা কোম্পানির পলিসি নয়।"

"আপনার সঙ্গে আমি ১১০ পারসেণ্ট একমত স্যার। যারা বলেছে, হাড়হারামজাদার মুড়ো নাও, তাদের নামের লিস্টি চেয়েছি—যদি প্রয়োজন হয়, কাল পুলিসে ডাইরি করে দেবো। চার্জসিটও রেডি রাখছি। দলের পাণ্ডা-গুলো এত অসভ্য স্যার যে চার্জসিটকে সব সময় সিটচার্জ বলবে!"

কয়েক দিনের মধ্যে ব্যাপারটা আরও সঙ্গীন হয়ে উঠেছে। হরিহর হন্তদন্ত হয়ে শ্যামলেন্দুর ঘরে ঢুকে বললেন, "স্যার, বাইরের লাল আলোটা জ্বেলে দিন। মাছের কনট্রাকটরের জন্যে কোম্পানি যেতে বসেছে। মাছের দাগার সাইজ এমন কমিয়েছে যে ওয়ার্কাররা, অ্যাজ এ প্রোটেস্ট, আজ দুপুরে ভাত খেয়ে

এঁটো হাতে ম্যানেজারের ঘরের দেওয়ালে দাগ কেটে দিয়েছে।'

"লায়ন এণ্ড বড়ালের মিস্টার বড়ালকে কনসাল্ট করছি। বলেছেন, ক্লিয়ার ব্রিচ অফ ডিসিপ্লিন। তাছাড়া ইউনিয়ন যা-তা দাবি করছে। এক নম্বর ইউনিয়ন ডিমাণ্ড করছে—প্রতিদিন দুশো গ্রাম ওজনের রুই মাছ দিতে হবে। এই না শুনে, দু নম্বর ইউনিয়ন বলেছে, ওই সাইজের দুখানা মাছ চাই। আর তিন নম্বর ইউনিয়নের কথা যদি শোনেন, তাহলে আপনি মাথায় হাত দিয়ে বসবেন। ওরা দাবি করছে, রোজ মাছের সঙ্গে মাংস এবং ডিমও দিতে হবে।"

"প্রোডাকশন?" শ্যামলেন্দু গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করে।

"খুবই খারাপ। একজ্যাক্ট ফিগারটা আপনাকে একটু পরেই দিচ্ছি। আর শ্লোগান স্যার, আপনাকে কী বলবো! কোম্পানি নিপাত যাক। তা বলছে বলুক, ওয়ার্কাররা রেগে গেলে ওরকম বলে থাকে। কিন্তু আমারই হয়েছে বিপদ। আমার ওয়াইফের একে হাই ব্লাড-প্রেসার। শুনলে কোলাপ্‌স করবে। বলছে হাড়হারামজাদার ল্যাজা-মুড়ো দুই নাও।"

হরিহরের স্ত্রীর শরীর খারাপ শুনে শ্যামলেন্দু উদ্বেগ প্রকাশ করলে, জানতে চাইলে কোম্পানির ডাক্তার নিয়মিত যাচ্ছেন কিনা। "প্রয়োজন হলে নার্সিং হোমে পাঠিয়ে দিন কোম্পানির খরচে।"

"নার্সিং হোম কেন, নন্দন-কাননে রাখলেও ওর প্রেসার কমবে না, যতক্ষণ না আমার সম্বন্ধে চিন্তা যাচ্ছে।" গভীর দুঃখের সঙ্গে হরিহর বললেন, "ছোকরা লেবার অফিসারদের আজকাল বিয়ে হচ্ছে না, স্যার। পাত্র কী চাকরি করে শুনলেই মেয়ের বাপরা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে।"

শ্যামলেন্দু বললে, "পুলিসে খবর দেবেন নাকি?"

"দিতে গিয়েছিলাম স্যার। আফটার অল কোনো হিউম্যান বিং-এর ল্যাজা-মুড়ো নেওয়া, এ তো মার্ডারের ভয় দেখানো। কিন্তু থানার কোনো সহযোগিতা পেলুম না। ওরা বলছে, আমরা আপনাকে হরিহর বলে জানি, আপনি যে 'হাড়হারামজাদা' তা প্রমাণ করুন। আমি বললুম, এর মধ্যে কেন আইনের মারপ্যাঁচ ঢোকাচ্ছেন? দুনিয়াসুদ্ধ সবাই জানে আমি হাড়হারামজাদা। কিন্তু ব্যাটারা বলে কি জানেন স্যার? কোর্টে গিয়ে এফিডেভিট করুন যে আপনি হাড়হারামজাদা!"

একটু থেমে হরিহর বললেন, "আমি বলি কি, চাঁইগুলোকে চার্জসিট দিই। টাইপ-ফাইপ করে সব রেডি রেখেছি।"

"দিন, তাছাড়া উপায় কী?" শ্যামলেন্দু তার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলো।
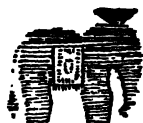
"টুটুল বেচারা ক'দিনের জন্যে বেড়াতে এলো, আর তুমি ওর জন্যে কিছু করছো না," অভিযোগ করলে দোলন। "ঠিক সময়ে আজকাল বাড়িও ফেরো না।"

"এক্ষুনি যেন বলে বসবেন না, আই অ্যাম স্যরি," হেসে টুটুল টিপ্পনী কাটলো।

"তোমরা দুই বোন একসঙ্গে ষড়যন্ত্র করে আমার মুখ বন্ধ করে দিলে," উত্তর দিলো শ্যামলেন্দু।

দোলন বললে, "আমার অবস্থা দেখছিস তো, টুটুল। কমারসিয়াল অফিসের একজিকিউটিভকে কিছুতেই বিয়ে করিস্ না।"

"একজনের অপরাধে সমস্ত একজিকিউটিভ জাতকে শাস্তি দেওয়া ঠিক হবে!" শ্যামলেন্দু হাসতে হাসতে প্রশ্ন করে।

টুটুল এবার কপট গাম্ভীর্যের সঙ্গে জামাইবাবুর পক্ষ নিলো। "তুই বেশ দিদি! আমার মাথাটা গোলমাল করে দিচ্ছিস। ডাক্তার বিয়ে করিস না, দিনরাত পুঁজরক্ত ঘাঁটে, হাসপাতাল, নার্সিংহোম রোগী নিয়ে ব্যস্ত থাকে, বউকে আদর করে না। আই-এ-এস শুনতে ভাল; কিন্তু মাইনে কম। তাছাড়া জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়টা মফস্বলে পচতে হবে! কভেনেণ্টেড অফিসার—সেও বলছিস, না। তাহলে বিয়েটা করবো কাকে? ল্যাম্পপোস্টকে?"

হা-হা করে হেসে উঠলো শ্যামলেন্দু। "খুব ভাল উত্তর দিয়েছে সুদর্শনা। মুখে যাই বলুক, প্রত্যেক শ্যালিকার মনের গহনে জামাইবাবুদের জন্যে একটা চাপা অনুরাগের আগুন সব সময় জ্বলছে।"

"তুমি না করলেও আমি যতটা পারছি টুটুলকে কলকাতা দেখাচ্ছি। হাজার হোক মার-পেটের বোন, আমি তো আর অফিসের নাম করে ওকে ফেলে দিতে পারি না," দোলন বেশ গম্ভীর হয়েই উত্তর দিলে।

শ্যামলেন্দু বললে, "টুটুল, কেমন বুঝছ আমাদের এই জীবন?"

"আপনার র‍্যাক থেকেই তো বই নিয়ে আজ পড়ে ফেললাম!"

"আমি আজকাল বইটই পড়তে পারি না, টুটুল। পাঁচ পাতার বেশী কিছু পড়বার ধৈর্য থাকে না। কী করে যে এম-এ পাস করেছি নিজেই বুঝতে পারি না। কী পড়লে টুটুল?"

টুটুল বললে, "বেকার বসেছিলাম। তাই আপনার বুককেস থেকে বার

করে কবিতা পড়ছিলাম—অ্যালান ডুগানের লেখা।"

দোলন বললে, "শুধু পড়েনি, সঙ্গে সঙ্গে অনুবাদ করে ফেলেছে।"

"মানুষের একঘেয়ে জীবন সম্বন্ধে ভদ্রলোক বেশ লিখেছেন," টুটুল বললে। আপনাকে পড়ে শোনাচ্ছি অনুবাদটা।

ঘুম থেকে উঠলাম, অফিসে গেলাম
কাজকর্ম করে বাড়ি ফিরে এলাম।
এবার ভোজনপর্ব, একটু কথাবার্তা,
তারপর শুয়ে পড়েছিলাম।
আবার ঘুম থেকে উঠলাম, অফিসে গেলাম
কাজকর্ম করে বাড়ি ফিরে এলাম,
এবং খাওয়া-দাওয়ার পরেই শুয়ে পড়েছিলাম।
তারপর ঘুম থেকে উঠে অফিসে গিয়েছিলাম
কাজকর্ম করে বাড়ি ফিরে এলাম।
খাওয়া-দাওয়া হলো, রেডিওতে কিছুক্ষণ
গান শুনে বিছানায় শুয়ে পড়লাম।
তারপর ঘুম থেকে উঠে অফিসে গেলাম
কাজকর্ম শেষ করে বাড়ি ফিরলাম,
মাংস খাওয়া হলো, এবার নিদ্রা।
তারপর ঘুম থেকে উঠে পড়ে অফিসে গেলাম
কাজকর্ম করে বাড়ি ফিরে এলাম,
খাওয়ার পর বিছানায় শুয়ে ঘুমোবার আগে
স্ত্রীর সঙ্গে প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ হয়েছিলাম।
তারপর এলো শনিবার, শনিবার, শনিবার!
আমরা দুজনে দোকানে গিয়েছিলাম
আমি নীল মেঘ দেখেছিলাম,
স্ত্রীর সঙ্গে অনেক বিষয়ে কথা হয়েছিল।
শনিবার সান্ধ্য-ককটেলে
কী সব ছাই-পাঁশ গলায় ঢেলেছিলাম,
ফলে রবিবারের অর্ধেক মাঠেমারা গেল।
বিকেলে মনের অবস্থা অবর্ণনীয়।
তারপর শুয়ে পড়েছিলাম।

কাল সকালে আবার ঘুম থেকে উঠে অফিসে যাবো
আবার সেই কাজকর্ম, বাড়ি ফিরে আসা,
খাওয়া এবং ঘুমনো।"

শ্যামলেন্দু বললে, "বাঃ, চমৎকার! পাঠিয়ে দাও কোনো পত্রিকায়! নাম দিও: 'আমার জামাইবাবুকে দেখে'।"

হাই তুললো দোলন। "এবার ঘুমনো যাক।" কবিতাটি ওর ভাল লাগেনি। লেখাটা অত্যন্ত অসভ্য।

বিছানায় শুয়ে শ্যামলেন্দুর ঘুম আসছে না। দোলন কিন্তু কেমন সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লো।

শ্যামলেন্দু এসে জানালার কাছে দাঁড়ালো। দূরে অনেক দূরে চৌরঙ্গীর ব্যবসায়ী নিয়ন আলোগুলো রাস্তার নির্লজ্জ পতিতার মতো তখনও পথচারীদের দিকে চোখের ইশারা করেছে। একটা বিরাট ফ্রেমের মধ্যে হিন্দুস্থান পিটারস্-এর নিয়ন বিজ্ঞাপনটাও এতদূর থেকে চোখে পড়ছে। ঘন নীল রঙের পিটারস্ কথাটা স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। তার তলায় একবার জ্বলছে 'ফ্যান'—পরের মুহূর্তে 'ল্যাম্প'। ফ্যান ল্যাম্প, ল্যাম্প ফ্যান, ফ্যান ল্যাম্প—জ্বলছে আর নিভেছে, নিভছে আর জ্বলেছে।

"তুমি ঘুমোওনি?" চমকে উঠলো শ্যামলেন্দু।

দোলন কখন উঠে এসেছে।

"মাথা ধরেছে?" দোলন জিজ্ঞেস করে।

"মাথার ভিতরটা কেমন করছে।"

হাতটা ধরে পরম স্নেহে দোলন আবার শ্যামলেন্দুকে বিছানায় নিয়ে গেল "চলো মাথা টিপে দিচ্ছি।"

ভারি সুন্দর কপালে হাত বুলিয়ে দেয় দোলন। অনেকদিন আগে ছোটবেলায় জ্বর হলে মা এমনি করে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন।

নরম হাতটা বুলোতে বুলোতে দোলন বললে, "অফিসের জন্যে অত খেটো না, লক্ষ্মীটি।"

ছোট্ট ছেলের মতো শ্যামলেন্দু স্বীকার করলে, "না-খাটলেও চলে, দোলন। কিন্তু ওই যে রুণু সান্যাল পিছনে রাহুর মতো লেগে রয়েছে।"

"থাকগে। ওসব নিয়ে মাথা ঘামিও না," দোলন ধীরভাবে স্বামীকে বলে।

"আমার যে হারতে ইচ্ছে করে না দোলন।"

শ্যামলেন্দু বুঝতে পারে তার চোখেও এবার ঘুম নেমে আসছে।
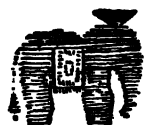
দেওয়ালে টাঙানো ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকিয়ে আছে শ্যামলেন্দু। পনেরো তারিখের আর চারটে দিন বাকি। তারিখটা আজ চোখ রাঙাচ্ছে শ্যামলেন্দু চ্যাটার্জিকে।

হরিহর তালুকদার হুড়মুড় করে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। "কারখানার খবর খুবই খারাপ, স্যার। সামান্য একটুকরো মাছ থেকে কি জিনিস আরম্ভ হলো। দু দলে মাথা ফাটাফাটি। লেবার কমিশনার ডেকেছিলেন। কেউ যাচ্ছে না। ইতিমধ্যে এইমাত্র খবর পেলাম—সিরিয়াস অবস্থা। যাদের আমরা রেকগনাইজ করিনি, থার্ড ইউনিয়ন, যারা মাছ ডিম মাংস তিনটে চাইছে, তারা কারখানার মধ্যে বসে পড়েছে।"

"প্রোডাকশন ?" শ্যামলেন্দু গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করলে।

"বন্ধ স্যার। আপনি ফ্যাকটরি ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলবেন ?" হরিহর জানতে চাইলেন।

"নিন লাইনটা। টেকনিকাল ম্যানেজার মিস্টার হার্টলে যখন হরিয়ানাতে রয়েছেন, তখন এফ-এম এর সঙ্গেই কথা বলি।"

শ্যামলেন্দু ফ্যাকটরি ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বললে। তারপর বললে, "ম্যানেজিং ডিরেকটরের সঙ্গে আলোচনা করছি।"

"আপনার নোটটা তাড়াতাড়ি লিখে ফেলুন, মিস্টার তালুকদার। ক'জন আহত হয়েছে, মেশিনের কোনো ক্ষতি হয়েছে কিনা, প্রতিদিন কত টাকা লোকসান হচ্ছে।"

"আমি এখনই নোট পাঠিয়ে দিচ্ছি।" তারপর হরিহর দুঃখের সঙ্গে বললেন, "অথচ, এরা খুবই ভাল মাইনে পায়। এ-রকম সার্ভিস কণ্ডিশন খুব কম ফ্যাকটরিতে আছে।"

একটু থেমে হরিহর বললেন, "এই হিন্দুস্থান পিটারস্-এ বেয়ারা এবং ঝাড়ুদার থেকে আরম্ভ করে বুকে হাত দিয়ে কেউ বলতে পারবে না সে বাইরের অন্য লোকদের তুলনায় সুখে নেই। তবু সামান্য কারণে এরা কী করে বসলো ! কী যুগ পড়লো স্যার ? কাউকে দোষ দিই না। শুধু এক এক সময় মনে হয় সমস্ত জাতটার ম্যালেরিয়া ধরেছে—জুন মাসের গরমে হাড়-কাঁপানো শীত দিয়ে জ্বর আসে, রোগী মাঝে-মাঝে ভিরমী খায়।"

শ্যামলেন্দু এবার হরিহরের মুখের দিকে তাকালো কিন্তু কোনো কথা বললো না।

হরিহরের নোটটা পাওয়া মাত্রই শ্যামলেন্দু ম্যানেজিং ডিরেকটরের ঘরে চলে গেল। ম্যানেজিং ডিরেকটরের ঘরে রেড সিগন্যাল সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠলো।

মিনিট পনেরো পরে ওখান থেকে বেরিয়ে এসেই মিস্টার তালুকদারের ঘরে বসে শ্যামলেন্দু শলাপরামর্শ করলে এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলো। বেচারা তালুকদার বললেন, "রবি যখন মকরে প্রবেশ করেছিল তখনই জানতাম এমন কিছু হবে। আমার রবি যে নীচস্থ।"

হরিহরের টেলিফোনটা এই সময় আবার বেজে উঠলো। টেলিফোনে কান দিয়েই হরিহর আঁতকে উঠলেন। ফোনের মাউথপীসটা হাতে চেপে ধরে বললেন, "যা ভয় করছিলাম, ফ্যাকটরি-গেটে বোমা পড়েছে। আমাদের ওয়াচম্যান হীরা সিং বোমায় আহত হয়েছে।"

হীরা সিং-এর মুখটা মনে পড়ছে শ্যামলেন্দুর। গেটের কাছে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে থাকতো। ফৌজী লোক, বাষট্টি সালের যুদ্ধে বমডিলায় একটা পা জখম হওয়ায়, আর্মি থেকে ছাঁটাই করে দেয়। লোকটা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতো, কোনো কথা বলতো না।

হীরা সিং নিরীহ লোক। তাকে কেন বোম মারা? হরিহর বললেন, "আমার লেবার অফিসারের ওপর অ্যাটেম্পট হয়েছিল। কিন্তু ইনজিওরড্ হলো হীরা সিং।"

শ্যামলেন্দু বললে, "ওর চিকিৎসার ব্যবস্থা? টাকার জন্যে কিছু যেন আটকে না যায়।"

হরিহর আশ্বাস দিলেন, "আপনি ব্যস্ত হবেন না। ওকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তবে অবস্থা এখনও খুব আশাপ্রদ নয়।"

শ্যামলেন্দুর শরীরটা ভাল লাগছে না। হঠাৎ যেন মাথাটা একটু ঘুরে গেল। হরিহর ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনারা লেখাপড়া-জানা ভদ্রলোক। অ্যাক্সিডেণ্টাল এই ইনডাসট্রির জগতে ঢুকে পড়েছেন, আপনাদের খারাপ লাগবেই। আমি সারাজীবন লেবার চরাচ্ছি, আমার মনে এসব দাগ কাটে না। এও এক জঙ্গল স্যার, গাছপালার বদলে লোহালক্কড় দিয়ে তৈরি। এখানে বাঘ সিংহ নেই, আছে সাপ, বেবুন এবং ছুঁচো।"

শ্যামলেন্দু তবু কোনো উত্তর দিলো না। হরিহর কিন্তু থামলেন না।

বললেন, "দাবী আদায়ের জন্য মিটিং করো, আওয়াজ তোলো, পোস্টার মারো, ট্রাইবুন্যালে কেস করো, কিন্তু রক্তপাত কেন? গরীবের রক্ত গরীবেই খাচ্ছে, বুঝলেন মিস্টার চ্যাটার্জি। আমাদের থর্নি সায়েব কিন্তু ব্যাপারটা অনেক আগেই বুঝেছিলেন। তখন আজাদহিন্দ ফৌজ আন্দোলন নিয়ে সমস্ত দেশ আগুন হয়ে আছে। মেজর থর্নি আমাকে বলেছিলেন, তালুকদার, তোমরা ইংরেজকে দেশ ছেড়ে যেতে বলছো, আমরা হয়তো যাবোও। কিন্তু এই দেশ তোমরা চালাতে পারবে না। তোমাদের পথে বসে কাঁদতে হবে। তখন কিন্তু সাধাসাধি করলেও আমরা আর ফিরে আসবো না।"

"আপনি হীরা সিং-এর চিকিৎসা সম্বন্ধে একটা খোঁজ খবর নিন।" শ্যামলেন্দু এই বলে হরিহরকে বিদায় দিলো।

শ্যামলেন্দুর ইচ্ছে করছে ড্রয়ার থেকে একটু উত্তেজক কিছু বের করে খেয়ে নেয়। অযথা শরীরকে কষ্ট দেওয়া থেকে একটু হুইস্কি গলায় ঢালা ভাল। শ্যামলেন্দু তাই করলে।

ঠিক সেই সময় মিঠু সেন ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো। "আমাদের এক্সপোর্ট বিজ্ঞাপনের জন্য খুব সুন্দরী উর্বশীর মডেল পাওয়া গিয়েছে। ফটোগ্রাফার ভিকটর বিশ্বাস এবং এজেন্সির মিস নারগোলওয়ালা দুজনেই খুব একসাইটেড। মেয়েটি ওয়াণ্ডারফুল সুন্দরী এবং রীতিমতো সেক্সাইটিং। শুধু একটা প্রশ্ন, মহাভারতের ডেসক্রিপশন মতোই মডেলকে শুধু কাঁচুলি পরানো হবে, না মডার্ন ড্রেস দিয়ে সিনেমায় উর্বশীকে যেরকম দেখানো হয় সেই রকম ফটো নেওয়া হবে! মেয়েটির ফটো দেখবেন নাকি?"

শ্যামলেন্দু গম্ভীরভাবে বললে, "ফটো দেখবার দরকার নেই, মিস্টার সেন। বিজ্ঞাপনও হবে না, কারণ থাইল্যাণ্ডে এখন ফ্যান যাচ্ছে না। তার বদলে একটা বিজ্ঞাপন করে দিন—আজ রাত থেকে ফ্যান কারখানা বন্ধ, দুই দলে মারামারি ইত্যাদির ফলে এবং নাশকতামূলক কাজকর্মে কারখানার যন্ত্রপাতির বিপুল ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কায় ফ্যাকটরিতে ক্লোজার ঘোষণা করতে কোম্পানির কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়েছেন। দাঁড়ান মিস্টার তালুকদারকে ডেকে পাঠাই।"

"বিজ্ঞাপন এখনই করে দিচ্ছি, কাল সমস্ত কাগজে বেরিয়ে যাবে। তবে আমরা খুবই দুঃখিত। মিস নারগোলওয়ালা ঠিকই বলেন যে ইণ্ডিয়ার কিছু হবে না, বিশেষ করে ওয়েস্ট বেঙ্গলের।"

টেলিফোন পেয়েই হরিহর ফাইল হাতে ঘরে ঢুকলেন। আজ তাঁর দোর্দণ্ড প্রতাপ। যুদ্ধ না হলে মিলিটারিদের কদর বোঝা যায় না।

মিঠু সেন জানতে চাইলেন, "লক-আউটের বিজ্ঞাপনটার কী কী পয়েন্ট হবে।"

হরিহর বললেন, "লক-আউট নয়, ক্লোজার। দুটোর মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত। একটা হলো সাময়িক অসুস্থতা, আর শেষেরটি হলো ডেথ সার্টিফিকেট। একেবারে মকরধ্বজের মতো কাজ করে। লায়ন অ্যাণ্ড বড়াল বলছিল লক-আউট। আমি কিছুতেই রাজী নই। বললুম, চিকিৎসা যখন করাতেই হবে, তখন মোক্ষম চিকিৎসা।"

মিঠু সেন বললেন, "তাহলে মিস নারগোলওয়ালাকে ডেকে পাঠাই, বিজ্ঞাপনটা এখনই লিখে ফেলতে হবে।"

একগাল হেসে হরিহর বললেন, "কিছু মনে করবেন না স্যার, এই বিজ্ঞাপন লেখা অত সোজা নয়। বাঘা-বাঘা এটর্নি ব্যারিস্টার এই ড্রাফট করতে ঘেমে ওঠে। লায়ন অ্যাণ্ড বড়ালের মিঃ বড়াল এই লাইনে স্পেশালিস্ট। ইতিমধ্যেই দেড়শ' কোম্পানিতে ক্লোজার করিয়েছেন। আপনাকে চিন্তা করতে হবে না। আমরা বিজ্ঞপ্তির ল্যাংগুয়েজ ফাইনাল করে এনেছি। ইংরিজী, বাংলা এবং হিন্দীতে ছাপা হবে।"

"শুনুন।" বাংলা বিজ্ঞপ্তিটা হরিহর পড়তে লাগলেন :

"৫১০ নম্বর তারাতলা রোডস্থিত ফ্যান কারখানার বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে শ্রমিক কর্মিগণ অবগত আছেন। কিছুদিন যাবৎ শ্রমিক কর্মিসাধারণ ইচ্ছাকৃত মন্থর উৎপাদন কৌশল গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহারা তুচ্ছ ও বাজে কারণে অন্যান্যপ্রকার নাশকতামূলক কার্যকলাপ করিতেছেন! শ্রমিক কর্মিগণ যে চুক্তিনামাগুলি প্রবল রহিয়াছে সেগুলি মানিয়া চলিতে ইচ্ছুক নহে। তাঁহারা আইন নিজের হাতে তুলিয়া লইয়াছেন। কারখানার নিরাপত্তা নিয়মশৃঙ্খলা একেবারে লোপ পাইয়াছে।

"পরিস্থিতি কর্তৃত্বের বাহিরে চলিয়া যাওয়ায়, পরিচালকগণ এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন যে কারখানা এখনই বন্ধ করিয়া দিতে হইবে।"

এরপরেও অনেকখানি আছে। যেমন "১৯৪৭ সালের শিল্পবিরোধ আইনের ২৫ এফ এফ এফ ধারার প্রভাইসোয় লিখিত বিধান অনুসারে শ্রমিক কর্মিগণ ছাঁটাইয়ের ক্ষতিপূরণ পাইবার অধিকারী হইবেন; ইহা ব্যতীত যদি অন্যান্য কিছু পাওনা থাকে তাঁহারা তাহাও পাইবেন, ইত্যাদি।"

কাগজ নিয়ে সেন চলে যাচ্ছিলেন। শ্যামলেন্দু বললে, "হ্যাঁ শুনুন মিস্টার সেন, আর এই বিজ্ঞাপনের পাঁচটা কাটিং কাল সকালেই খবরের কাগজ থেকে

:কেটে আমাকে পাঠিয়ে দেবেন। ওগুলো আমাকে ফাইলে রাখতে হবে।"

একটু পরেই রুণু সান্যাল বাড়িতে ফোন বুক করলেন। "বিবি, খবর আছে। ফ্যান ফ্যাকটরিতেও ম্যাসাকার করলে শ্যামলেন্দু। দায়িত্ব নিতে না নিতে ফ্যাকটরি বন্ধ। এক্সপোর্টেও মনে হচ্ছে কী একটা গোলমাল বাধিয়ে বসেছে। মাল রেডি অথচ জিনিস জাহাজে উঠছে না। রপ্তানির খবর দিয়ে যে বিজ্ঞাপন বেরোবে ঠিক ছিল তা ক্যানসেল করে দিয়েছে।"

"সেলসে রাখছে ওকে?" বিবি জিজ্ঞেস করলেন।

"উইকেটই থাকে কিনা আগে দেখ," রুণু সান্যাল বেশ আনন্দের সঙ্গেই জানালেন।

"শ্যামলদা?" সুদর্শনা ডাকছে। "আলো না জ্বালিয়ে একলা এই অন্ধকারে ব্যালকনিতে বসে কী ভাবছেন?"

"বসো," গম্ভীরভাবে বললে শ্যামলেন্দু। "নাথিং পার্টিকুলার—আসলে কিছুই ভাবছি না টুটুল।"

"ফ্ল্যাটের দরজা খুলে অন্ধকার দেখে আমরা ভাবলাম আপনি এখনও আসেননি," সুদর্শনা বললে।

"আমি ফিরে এসে তোমাদের না দেখে কেমন মুষড়ে গেলাম। কোনো-রকমে স্নানটা সেরে, এখানে এসে বসেছি। সিগারেট খেয়ে যাচ্ছি পরের পর," শ্যামলেন্দু বলে।

ফেরার পথে শ্যামলেন্দু যে হাসপাতাল ঘুরে এসেছে তা আর প্রকাশ করলে না। হরিহর বাধা দিয়েছিল, কিন্তু শ্যামলেন্দু শোনেনি। আষ্টেপৃষ্ঠে ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা হীরা সিং তাকে দেখেই চিনতে পেরেছে। বোধ হয় সেলাম করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু হাত-পা বাঁধা। বোতলে ফোঁটা ফোঁটা করে রক্তও দিচ্ছে। হাসপাতালের দরজার গোড়ায় হীরা সিং-এর বউ ছোট ছেলেটাকে কোলে করে বসে আছে।

"আর সামনের ওই গেলাসে কী নিয়েছ? আগে তো তুমি এমন ছিলে না! কই কখনও তোমাকে একলা হুইস্কির বোতল নিয়ে বসতে দেখিনি,"

অভিমানভরা কণ্ঠে দোলন বললে। বোনের কাছে বোধহয় একটু প্রেষ্টিজ নষ্ট হলো দোলনের।

প্রশ্নটা এড়িয়েই গেল শ্যামলেন্দু। জিজ্ঞেস করলে, "তোমরা কোথায় গিয়েছিলে?"

"সকালে আজ জানোই তো, শিলিগুড়ি হোমের ফ্ল্যাগ-ডে ছিল। টুটুলকেও লাগিয়ে দিয়েছিলাম বক্স কালেকশনে। জানো, টুটুল আমার থেকে বেশী কালেকশন করেছে।"

"নো ওয়াণ্ডার," শ্যামলেন্দু এবার হাল্কা হবার চেষ্টা করলো। "এই রকম মহিলা সামনে বাক্স নিয়ে দাঁড়ালে কে না বলবে?"

"তারপর ওই সব বাক্স জমা দিয়ে বিকেলে আমরা গিয়েছিলাম ব্লিংক রেস্তোরাঁয় স্পেশাল জ্যাম সেশনে! সুদর্শনার ওসব দেখা উচিত। আজকের তারুণ্যকে।"

"উঃ শ্যামলদা, মাথায় থাকুন আপনাদের পার্ক স্ট্রীটের তরুণ সমাজ! ছেলেগুলো মেয়ে হয়ে যাচ্ছে, আর মেয়েগুলো ছেলে। কতকগুলো ইয়ুথকে দেখে আমার যা হাসি লাগলো; তারা ছেলেও নয় মেয়েও নয়।"

"কলকাতা সম্বন্ধে তোমার বেশ ধারণা হয়ে যাচ্ছে," শ্যামলেন্দু গম্ভীরভাবে বলে।

"হ্যাঁ। কলেজ স্ট্রীট এবং কফি হাউস ঘুরে এসেছি। বৌবাজারের মোড়ে বোম পড়াও দেখা হয়ে গেল। ত্রিশটা পয়সা রোজগারের জন্যে দলে দলে মানুষ কেমন করে সারাদিন রোদে-জলে রাস্তার ওপর কুমড়োর ফালি কিংবা শাকের আঁটি নিয়ে বসে আছে তাও শেয়ালদা স্টেশনের সামনে দেখা হলো। কাউনসিল হাউস স্ট্রীটে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের সামনে বেকার যুবকদের লাইনও দেখলাম। ট্রামে-বাসে বাদুড়-ঝোলা হয়ে মানুষ কেমন করে ঘরে ফিরছে তাও দেখলুম, আবার এই জ্যাম সেশন, সুইঙ্গিং ক্যালকাটা অফ সেভেনটিজ।"

"কিছু বুঝলে?" শ্যামলেন্দু জিজ্ঞেস করলে।

"বোঝা তো দূরের কথা, শ্যামলদা, আমার সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। একই সঙ্গে সমস্ত শহরটা যেন হাই ব্লাড-প্রেসার এবং লো ব্লাড-প্রেসার, যক্ষ্মা এবং ক্যানসার মেদ এবং ম্যালনিউট্রিশনে ভুগছে। আমাদের অর্থনীতির টেক্সট বইতে এ-রকম কোনো কেসের কথা লেখা নেই। আপনি কিছু বুঝছেন?" টুটুল বললে।

"বুঝতে গেলেই সব গোলমাল হয়ে যায় টুটুল। তাই আমরা অর্থাৎ মার্চেণ্ট অফিসের লোকেরা ভাল আছি। আমরা বোঝবারই চেষ্টা করি না। আমাদের দৃষ্টি এবং দায়িত্ব সীমাবদ্ধ। আমরা কেবল অর্ডার সাপ্লাই করি। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ বলে, সমাজে যারা বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবার কথা তুলছে তারা হিংসুটে। সুযোগ-সুবিধে পেলে ওরা আমাদের দলেই ঢুকে পড়তো। পায়নি, তাই বুক জ্বলছে। বলছে, আমরা অপদার্থ। ক্যাপিটালিস্টরা আমাদের হাতে লজেন্স দিয়ে ভুলিয়ে রেখেছে।"

"তোমার গেলাসটা আমি সরিয়ে নিচ্ছি," দোলন শাসনের সুরে বললে। "একলা একলা মদ না খেয়ে তুমি আবার একটু পড়াশোনা আরম্ভ করলে পারো। একটু লেখালেখি। তুমি কত ভাল ছাত্র ছিলে, কী সুন্দর তুমি লিখতে পারতে, নতুন নতুন ভাবনা তোমার মাথায় আসতো, বাবার কত আশা ছিল তোমার ওপর।"

শ্যামলেন্দু চুপচাপ বসে রইলো। তারপর বললে, "আমায় মা বলতেন, মাংস খাবার পর দুধ খাওয়া নিরাপদ নয়! মার্চেণ্ট অফিসের চাকরি করার পরে অরিজিন্যাল কোনো চিন্তা না করাই ভাল।"

টুটুল ও দোলন দুটো মোড়া টেনে নিয়ে বসে পড়লো। টুটুল বললে, "শ্যামলদা উই আর স্যরি। আপনার ফ্যাকটরির খবর শুনলাম!"

"কোথা থেকে শুনলে?"

দোলন বললে, "কেন? তোমার ড্রাইভারের কাছ থেকে। আর একটা গুজব, তোমাকে নাকি সেল্‌স থেকে সরিয়ে দেবে।"

"যত সব অমঙ্গলের কথা। আমি বকে দিয়েছি আপনার ড্রাইভারকে," টুটুল বললে।

"টুটুল, তোমার খুব খারাপ লাগছে, তাই না?" শ্যামলেন্দু জিজ্ঞেস করে।

"লাগবে না?" দোলন বললে। "যখন ও-বেচারা এলো তখন তুমি কেমন হাসিখুশী—একেবারে অন টপ অফ দি ওয়ার্লড। আর এখন দেরি করে বাড়ি ফেরো, দিনরাত কী সব ভাবো।"

"কই আমি ভাবছি?" শ্যামল উত্তর দেয়। "আমার গুরু মেনন সায়েব বলতেন, আদর্শ ম্যানেজার কখনও অভিভূত হবে না—না দুঃখে, না সুখে। আমি প্রথম জেনারেশনের একজিকিউটিভ, তাই খাপ খাইয়ে নিতে একটু মানসিক কষ্ট পাচ্ছি—রাজার কোনো অসুবিধে হবে না।"

"দিদি, শ্যামলদাকে খবরটা দিই তাহলে?" টুটুল জিজ্ঞেস করলে।

"দাও," দোলন উত্তর দিলো।

"শ্যামলদা, বাবার চিঠি এসেছে। আমি আই-এ-এস লেখার পরীক্ষায় পাস করেছি। দিল্লীর ইণ্টারভিউতে ডাক পড়েছে। এখান থেকেই সোজা চলে যাবো ভাবছি।"

লাফিয়ে উঠলো শ্যামলেন্দু। "নিষ্ঠুর চতুরা নারী! এতক্ষণ খবরটা চেপে ছিলে?"

"আমি খবরটা পেয়েই তোমাকে ফোন করেছিলাম। তা শুনলাম তুমি বড় সায়েবের ঘরে," দোলন বললে।

"ওয়াণ্ডারফুল! টুটুল বোনটি আমার, তোমাকে মাথায় করে ঘুরপাক খেতে ইচ্ছে করছে!" বেজায় খুশী হয়েছে শ্যামলেন্দু।

"কবে তোমার ইনটারভিউ?"

"এখনও কয়েকদিন বাকি আছে," দোলন বললে।

"ঠিক হ্যায়, এখান থেকেই যাবে তুমি। তবে লক্ষ্মী সোনা বোনটি, আমার একটা রিকোয়েস্ট রাখতে হবে। আমার খরচে এখান থেকে তুমি প্লেনে যাবে, সঙ্গে তোমার গার্ড থাকবে দিদি। আমিও যেতাম, কিন্তু অফিসে এখন ছুটি দেবে না।"

"শুধু শুধু পয়সা নষ্ট করে কী হবে, শ্যামলদা? পাবলিক সার্ভিস কমিশন আমাকে ট্রেনের ভাড়া দেবে।" টুটুল বলে।

"ওসব আমি কিছুই শুনতে চাই না, টুটুল। আমি খুশী হয়েছি, আমাকে একটু আনন্দ করতে দাও।"

"বেশ বাবা, তাই হবে," টুটুল বলে। "জামাই-স্নেহে অন্ধ বাবা তো লিখেই দিয়েছেন, 'শ্যামলেন্দু যাহা বলিবে তাহাই করিবে'!"

"এবার একটু ঝগড়া করা যাক," শ্যামলেন্দু তার মুড ফিরে পেয়েছে।

"গোপনে গোপনে কবে এই পরীক্ষাটা দেওয়া হয়েছে বলোনি তো! এত কথা হলো, একবারও লিক হলো না। কে বলে মেয়েরা সিক্রেট রাখতে পারে না?"

টুটুল বললে, "খেয়ালের মাথায় পরীক্ষা দিয়েছিলুম। পাস করবো ভাবিনি। তাই লজ্জায় কাউকে বলিনি। বাবা এবং মা ছাড়া কেউ জানতো না।"

"আই-এ-এস হয়ে তুই তাহলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হবি?" দোলন বলে।

"তারপর ডেপুটি সেক্রেটারী, জয়েণ্ট সেক্রেটারী, সেক্রেটারী এমন কি রাজ্যপালিকাও হতে পারে। দিল্লীতে যখন পোস্টিং হবে, আমাদের মূর্তি সায়েব

তখন হয়তো গিয়ে সুদর্শনা ভট্টাচার্যের পা জড়িয়ে ধরবে। কত ক্ষমতা। রাজা বদলায় কিন্তু রাজকর্মচারী বদলায় না। রবীন্দ্রনাথ তো সিভিল সার্ভেন্টদের দেখেই লিখেছিলেন, ওরা কাজ করে শত শত সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপ পরে। ওটা মোটেই শ্রমিকদের উদ্দেশ্য করে লেখা নয়।"

একটু থেমে শ্যামলেন্দু বললে, "আমার কিন্তু খুব আনন্দ হচ্ছে টুটুল।"

"দাঁড়ান, এখন গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল," সুদর্শনা জবাব দিলো।

দোলন বললে, "আমার তো ওর সঙ্গে দিল্লী যাবার খুব ইচ্ছে। কিন্তু তোমাকে এই অবস্থায় ছেড়ে।..."

"অবস্থা আবার কি? এখন তো স্ট্যাণ্ডার্ড হয়ে গিয়েছে। যা হয়ে থাকে তাই হবে। ফ্যাকটরি বন্ধ হয়েছে—কিছু লোক খেতে পাবে না, কিছু লোক বউ-এর গয়না বেচবে, কিছু লোক কাবুলিওয়ালার কাছে যাবে, ছেলেমেয়ের মুখে ভাত দিতে না পেরে দু-একটা সেনসিটিভ লোক গলায় দড়ি দেবে, কিছু হিন্দুস্থানী ওয়ার্কার দেশে ফিরে গিয়ে চাষ করবে, কিছু লোক গেটের সামনে দাঁড়িয়ে গরম গরম বক্তৃতা দেবে, কিছু লোক বাসে-ট্রামে উঠে লোকের নাকের ডগার সামনে কালেকশন বাক্স নাড়বে, কিছু লোক মাথা-ফাটাফাটি করে মরবে, তারপর একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে। আবার কারখানার দরজা খুলবে।" শ্যামলেন্দু বুঝতে পারছে কয়েকটা পেগের কল্যাণে নিজেকে সামলাতে পারছে না। প্রাণপণে ব্রেক কষে এবার সে বললে, "দোলন, বেশী চিন্তা কোরো না। এখনও তো সময় রয়েছে।"

বাইরে এবার কলিং বেল টেপার আওয়াজ হলো। দোলন বেরিয়ে গিয়ে দেখলো রুণু সান্যাল এবং তাঁর বউ।

"আসুন, আসুন।" ওদের বসালো দোলন।

শ্যামলেন্দুও এসে বসলো। বন্ধুকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বললে, "কী সৌভাগ্য!"

দোলন জিজ্ঞেস করলে, "কী খাবেন বলুন?"

মিসেস সান্যাল উত্তর দিলেন, "কফি।"

"আর আপনি?" দোলন জিজ্ঞেস করলে, "জিন, হুইস্কি, রাম সব আছে।"

"তাহলে একটা জিন অ্যাণ্ড লাইম হোক।"

জিনের গেলাসে চুমুক দিয়ে রুণু বললে, "কী শুনছি? তোমার ফ্যান ফ্যাকটরি বন্ধ হয়ে গেল?"

"উপায় ছিল না," শ্যামলেন্দু উত্তর দিলে।

রুণু বললে, "শুনেই আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। হাজার হোক এই বিরাট অফিসে দুটো বাঙালী আমরা টিম টিম করে জ্বলছি, তাও হাঙ্গামা। অফিসে আর জ্বালাতন করলাম না, লোকে নোটিশ করবে। ভাববে বাঙালী আবার বাঙালীর সঙ্গে নাক ঘষাঘষি করছে। তাই চলে এলাম। বিবিও বললে, মিসেস চ্যাটার্জিও নিশ্চয় উদ্বিগ্ন। যাই ওঁর মনটাকে একটু হাল্কা করে দিয়ে আসি।"

দোলন বললে, "আমার আর কী করবার আছে বলুন?"

বিবি সান্যাল বললেন, "এটা কী বলছেন, মিসেস চ্যাটার্জি? কমারসিয়াল ফার্মে একজিকিউটিভদের বউদের অনেক দায়িত্ব। মিস্টার ফোরসই তো সেদিন পার্টিতে বললেন, প্রত্যেকটি সফল অফিসারের পিছনে নিশ্চয় একটি মহীয়সী মহিলা আছেন।"

দোলন বললে, "বিয়ের সময় অগ্নিসাক্ষী রেখে স্বামী প্রতিজ্ঞা করেছে স্ত্রীকে অন্ন-বস্ত্র যোগাবে। সুতরাং সমস্তটা ওর দায়িত্ব, আমি ওতে নাক গলাতে যাবো কেন?"

"ওরে বাবা!" বলে উঠলো শ্যামলেন্দু।

বিবি বললেন, "মিসেস চ্যাটার্জি, আমি রসিকতা করছি না, অনেক অফিসে হাই পোস্টে চাকরি দেবার আগে বউকেও ইনটারভিউ করে। এটা খুব প্রয়োজনীয়।"

"তাহলে, তোমার তো কোথাও চাকরি হবে না?" দোলন স্বামীকে বললে।

মিসেস সান্যাল বললেন, "আমাদেরও মাইনে পাওয়া উচিত। সারাদিন খাটিয়ে খাটিয়ে সব রস নিংড়ে ক্লান্ত খিটখিটে স্বামীটিকে কোম্পানি বিকেলে আমাদের হাতে তুলে দিচ্ছেন। আমরা তাকে নার্স করে, চাঙ্গা করে আবার কাজের উপযুক্ত করে পরের দিন অফিসে পাঠিয়ে দিচ্ছি। এটা তো আমরা কোম্পানির জন্যেই করছি।"

রুণু জিজ্ঞেস করলে, "তা কেমন বুঝছো?"

শ্যামলেন্দু কিছুই ভাঙলো না। বললে, "যা হবার তাই হবে, বুঝে কি আর করবো!"

যাবার আগে দোলন বললে, "আপনাদের অশেষ ধন্যবাদ। দুঃখের দিনেই বোঝা যায় কে বন্ধু আর কে শত্রু।"

"এইটুকু না করলে নিজেদের বেঙ্গলী বলে পরিচয় দিয়ে লাভ কী!" এই বলে মিস্টার ও মিসেস সান্যাল বিদায় নিলেন।

খবরটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। মিঠু সেন কয়েকটা ফোনও পেয়েছে কাগজের অফিস থেকে। গ্রামোফোন রেকর্ডের মতো মিঠু বলে যাচ্ছেন, "কি দুঃখের কথা বলুন দেখি। শুধু প্রোডাকশন নষ্ট নয়—এই সময় আমাদের পাখা বিদেশে যেতে পারতো। মূল্যবান বিদেশী মুদ্রা নষ্ট। প্রতিরক্ষার কাজেও আমাদের ফ্যান লাগে। অবশ্য যুদ্ধক্ষেত্রে নয়, মিলিটারি অফিসে এবং ব্যারাকে।"

অফিসেও ছোটাছুটি। শ্যামলেন্দুকে কয়েকবার বড় সায়েবের ঘরে ঢুকতে এবং বেরোতে দেখা গেল।

গুজবও রটছে নানা রকম। রুণু সান্যালের ডিপার্টমেণ্টের টাইপিস্ট চন্দ্রনাথ বাথরুমে বলে গেল, "খবর মোটেই ভাল নয়। মস্ত একটা উইকেট এবার পড়লো বলে। বুঝতেই পারছো কার উইকেট! যারা কুইক রান তুলতে চায়, হিন্দুস্থান পিটারস্-এ তাদের রান আউট হবার চান্স বেশী। বুঝলে ব্রাদার।"

হরিহর তালুকদারও ভয়ানক ব্যস্ত। প্রায় অর্ধেক সময়ই তাকে সীটে দেখা যাচ্ছে না। চ্যাটার্জি সায়েবের ঘরে বসে আছেন।

হুঙ্কার ছেড়ে হরিহর বললেন, "বাছাধনরা নরম হয়েছেন। যে-রোগের যে-ওষুধ। আমরা যে এইরকম এটম বোমা ফাটাবো তা নেতারা বুঝতে পারেননি। মিনিস্টারের কাছে গিয়ে কেঁদে পড়েছে নিশ্চয়। না হলে লেবার কমিশনার ত্রিপাক্ষিক আলোচনার জন্যে আমাকে ঘন ঘন অনুরোধ করছেন কেন?"

"আলোচনার জন্যে কোম্পানি তো সব সময় প্রস্তুত, আপনাকে বলছি।" শ্যামলেন্দু উত্তর দিলো।

তালুকদার বললেন, "চেম্বারলেন সায়েব যদি হিটলারকে অতটা তেল না দিতেন, তাহলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হতো না। পলিসি অফ অ্যাপিজমেণ্টই তো ইণ্ডিয়াকে পিছিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অমন যে অমন নেপোলিয়ন, তিনিও জনতা সামলাবার জন্যে প্যারিসের রাস্তায় কামান বসিয়েছিলেন। গরীবের কথাটা একটু শুনুন স্যার। এখনও মাসখানেক ক্লোজার চলুক। সহজে আমরা আলোচনায় যাবো না।"

"সেটা ভাল দেখায় না। আপনি ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে যান। বলবেন মাছ ঐ

এক পিস-ই থাকবে। তবে আমরা দেখবো যাতে ছোট না হয়, বা পচা না হয়। কিন্তু সবাইকে শৃঙ্খলার সঙ্গে কাজ করতে হবে। উৎপাদন কমানো চলবে না।"

এরপর ক'দিন ধরে তালুকদার চরকির মতো ঘুরে বেড়ালেন—একবার লেবার কমিশনার, একবার লায়ন অ্যাণ্ড বড়াল সলিসিটরস, একবার কাউনসেলের বাড়ি, একবার চ্যাটার্জি সায়েবের ঘর।

দোলন এদিকে ফোন করলে, "কী খবর?"

"মনে হচ্ছে মিটমাট একটা হয়ে যাবে। ইউনিয়ন ডিমাণ্ড করেছে যে হরিহরের সঙ্গে ওরা আলোচনা করবে না। তাই এখন আমাকেও ত্রিপাক্ষিক আলোচনায় যেতে হচ্ছে।"

"দেখো যদি পারো একটা মিটমাট করে নিও, পরশু আমরা চলে যাবো। তার আগে একটা ফয়সালা হলে মনে শান্তি পাবো।"

"এখনই তো যাচ্ছি মিটিংয়ে। দেখা যাক কী হয়।"

বিকেলেই চুক্তি সই হয়ে গিয়েছিল। কোম্পানি বিনা সর্তে ক্লোজার তুলে নিচ্ছে—তবে শ্রমিকরাও কথা দিচ্ছে তারা প্রোডাকশন বজায় রাখবে। কোনো কর্মীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না। মাছ এখন এক পিস-ই থাকবে, তবে দু পিস মাছের দাবিটা প্রয়োজন হলে ট্রাইবুন্যালে পাঠানো হবে।

ইউনিয়নের কর্তারা শ্যামলেন্দুর সঙ্গে করমর্দন করেছিলেন, কিন্তু তালুকদারের সঙ্গে নয়। "যত নষ্টের গোড়া তো ওই ভদ্রলোক, আপনি না হলে এত তাড়াতাড়ি মিটমাট হতো না," শ্যামলেন্দুকে ওঁরা বললেন।

গাড়িতে উঠে অফিসে ফিরবার পথে হরিহর বললেন, "আমার সঙ্গে হ্যাণ্ডসেক না করুক, আমার ওয়াইফের ব্লাড-প্রেসারটা আজ কমবে। কালকে পর্যন্ত স্যার, বাড়িতে টেলিফোন করে শ্লোগান শুনিয়েছে হাড়হারামজাদার ল্যাজা-মুড়ো দুই চাই।

ইতিমধ্যে কারখানার শ্রমিকদের বিজয় শোভাযাত্রা বেরিয়েছে। হরিহর সেই দেখে খিল খিল করে হাসতে লাগলেন। "এর থেকে বিরাট রসিকতা আর কিছু দেখেছেন? গোহারান হেরে যাবার পরও দলের লোকেদের বোঝাচ্ছে তারা জিতেছে!"

"মিস্টার তালুকদার, আত্মবিশ্বাস হারিয়ে গেলে কোনো মানুষ, কোনো

দল, কোনো জাতি টিকে থাকতে পারে না," শ্যামলেন্দু গম্ভীর ভাবে উত্তর দেয়।

"কিছু যদি মনে না করেন, মিস্টার চ্যাটার্জি, সায়েবদের লেখা বই পড়ে এই সব কথা বলছেন আপনারা। লোহালক্কড়ের জঙ্গলে হোল লাইফ কাটিয়ে আমি নিজে যা বুঝেছি, তা হলো মানুষ হচ্ছে হারামজাদা। মানুষের মধ্যে যে শূয়োরটা আছে তাকে মাঝে-মাঝে খাওয়াতে হয়, মাঝে-মাঝে ঠেঙাতে হয়। তবেই মানুষ শায়েস্তা থাকে।"

শ্যামলেন্দু বিরক্ত হলেও বললে, "মানুষকে এতখানি ঘৃণা করলে কী নিয়ে বেঁচে থাকবো, মিস্টার তালুকদার! এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে একদিন বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে।"

হঠাৎ হীরা সিং-এর কথা মনে পড়ে গেল। "হীরা সিং এখন কেমন আছে, মিস্টার তালুকদার?"

"এই সব শান্তি বৈঠক চালাতে গিয়ে ক'দিন খোঁজ নেওয়া হয়নি। যখন বলছেন, আজ একবার হাসপাতালে যাবো'খন। শুনছি ডায়াবিটিস পেয়েছে ডাক্তাররা, না হলে এতদিন তো ভাল হয়ে বাড়ি ফিরে আসতো।"

মিটমাটের খবর বাড়িতে দিতেই দোলনের কী আনন্দ! "আমি এখনই কালীঘাটে পূজো দিতে যাচ্ছি। উঃ, ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো।"

লাঞ্চ আওয়ারের পরই স্যর ব্রায়ান রেরগাড়িখানা হিন্দুস্থান পিটার্স্-এর বাড়ির সামনে দাঁড়ালো।

ভিজিটরস রুমে সেক্রেটারী সেনগুপ্ত তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন। "কেমন আছেন?"

"ভালই। খুব ঘন ঘন বোর্ড মিটিং করছো দেখছি!"

সেনগুপ্ত বললেন, "কোম্পানি বড় হচ্ছে—আপনাদের উপদেশ সব সময়ই দরকার। এত শর্ট নোটিসে যে আসতে পেরেছেন এই সৌভাগ্য।"

কুমার জগদীশও উলুবেড়িয়া থেকে এলেন। তারপর মিস্টার গর্ডন ও মিস্টার মূর্তিকে দুই পাশে রেখে ফেরিস সায়েবও হাজির হলেন। সকলে এবার বোর্ডরুমে ঢুকে পড়লেন।

মিটিং শুরু হয়ে গেল। আইটেম নাম্বার ওয়ান থেকে টেন পর্যন্ত সহজেই পাস হয়ে গেল। তারপর ফ্যাকটরিতে শ্রমিক অসন্তোষের কথা উঠলো। ফেরিস সায়েব বললেন, "সৌভাগ্যক্রমে আমরা তেমন ক্ষতিগ্রস্ত হইনি। কারখানার কাজ আগামীকাল থেকে স্বাভাবিক হয়ে যাবে।"

এরপর শেষ প্রস্তাবটা মিস্টার ফেরিস নিজেই আনলেন।

"আমি প্রপোজ করছি, মিস্টার শ্যামলেন্দু চ্যাটার্জিকে কোম্পানির সর্বক্ষণের অ্যাডিশনাল ডিরেকটর নিযুক্ত করা হোক, সাবজেক্ট টু সরকারের অনুমতি, এটসেটরা, এটসেটরা।"

স্যর বরেন রায় ঢুলছিলেন। কথাটা কানে যেতে তিনিও খাড়া হয়ে উঠে বসলেন। তারপর অন্য সকলের দেখাদেখি নিজের হাতটা তুলে প্রস্তাবে অনুমতি দিলেন।

নতুন ডিরেকটর শ্যামলেন্দু চ্যাটার্জিকে এবার সেনগুপ্ত সায়েব ঘরে নিয়ে এলেন। প্রথমে ফেরিস সায়েব ঘরে নিয়ে এলেন। প্রথমে ফেরিস সায়েব নিজে করমর্দন করলেন, তারপর অন্য সকলের সঙ্গে শ্যামলেন্দুর পরিচয় করিয়ে দিলেন।

সেনগুপ্ত সায়েব করমর্দন করবার সময় আস্তে আস্তে বললেন, "দেখালেন বটে। ম্যাজিক জানেন আপনি। আজ সকালেই ফেরিস সায়েব আমাকে খবরটা দিয়ে অবাক করে দিলেন। এত কম বয়সে কাউকে ডিরেকটর হতে দেখিনি এই কোম্পানিতে।"

ফেরিস সায়েব তারপর শ্যামলেন্দুকে পাকড়াও করে নিজের ঘরে ঢুকে পড়লেন।

কোথায় আনন্দে টগবগ করবে, না শ্যামলেন্দু যখন ফেরিস সায়েবের ঘর থেকে বেরিয়ে এলো তার মুখে কে যেন কালি ঢেলে দিয়েছে। শ্যামলেন্দুর মনে হচ্ছে তাকে যেন বিষাক্ত কোনো পোকা কামড় দিয়েছে।

শ্যামলেন্দু সম্পর্কে সার্কুলারটা ফেরিস সায়েব ডিকটেশন দিয়ে দিয়েছেন। একটু পরেই সারা অফিসে খবরটা রাষ্ট্র হয়ে যাবে। কোথায় নিজের চেম্বারে বসে পরের পর ফোন রিসিভ করবে, লোকের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করবে, তা না চেয়ারে বসে থাকতে পারছে না শ্যামলেন্দু।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো শ্যামলেন্দু, তারপর বাথরুমের চাবিটা তুলে নিলো টেবিল থেকে।

বাথরুমটা ভিতর থেকে লক করে দিয়েছে শ্যামলেন্দু। এখন এই ঘরে শ্যামলেন্দু চ্যাটার্জি একা। আয়নার ওপরকার টিউব লাইট জ্বালা ছিল। সেটা নিভিয়ে দিলো শ্যামলেন্দু।

বেশ ছিল শ্যামলেন্দু। ডিরেকটর হয়েছে, বেশ হয়েছে। কিন্তু ফেরিস সায়েব নিজের ঘরে ঢুকিয়ে ওই বিশ্রী প্রসঙ্গটা মনে করিয়ে দিলেন। যে-কাজটা শ্যামলেন্দু গোপনে গোপনে করেছে, যা সে নিজেকেও ঠিক তেমনভাবে বুঝতে দিতে চায়নি, সেইটেই তুললেন মিস্টার ফেরিস।

ফেরিস সায়েবকে আবার দেখতে পাচ্ছে শ্যামলেন্দু। তিনি বলছেন, "চ্যাটার্জি, মস্ত বিপদ থেকে কোম্পানিকে তুমি উদ্ধার করেছো। থাইল্যাণ্ড এবং কোরিয়ার সঙ্গে চুক্তির ওই সর্তটা ভাগ্যে তুমি খুঁজে বার করলে, স্ট্রাইক, লক আউট, ক্লোজার ইত্যাদিতে কারখানা বন্ধ থাকলে কোম্পানি ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে না। তারপর তুমি যখন আইডিয়া দিলে, তখন ভাবতেই পারিনি, ওই ক'দিনের মধ্যে সামান্য মাছের অজুহাতে এবং কয়েকটা লোককে হাত করে শ্রমিক অশান্তি বাধিয়ে সম্মানের সঙ্গে ফ্যান কারখানায় তালা লাগানো যাবে। ষাট লক্ষ টাকা বাঁচলো, বিলেত থেকে পার্টস এসে গিয়েছে—এই মাসেই আমরা প্রতিশ্রুতি মতো রপ্তানি করতে পারবো।"

ফেরিস সায়েব এরপর তার সঙ্গে করমর্দন করতে হাত বাড়িয়ে দিলেন। সায়েব বললেন, "এ-কথা কিন্তু কেউ বলতে পারবে না যে আমরা লিগ্যালি কোনো অন্যায় করেছি। আমরা শুধু একটা পরিস্থিতির সুযোগ নিয়েছি, যেখানে যে-কেউ শ্রমিক অশান্তি বাধিয়ে দিতে পারে।"

শ্যামলেন্দু হাতটায় সাবান লাগাতে লাগাতে ভাবলো, "লিগ্যালিটিই সব নয় —কোর্টের উকিলদের ওপরেই তো পৃথিবীর সব ন্যায়-অন্যায়ের দায়িত্ব নেই। আইন ছাড়াও একটা যেন কি আছে। যাকে মেনন সায়েব বলতেন—মর‍্যাল।"

একি হলো শ্যামলেন্দুর! মুখ-চোখে ঠাণ্ডা জল দিয়েও স্বস্তি আসছে না। ইচ্ছে হচ্ছে বরফের মধ্যে মুখটা ডুবিয়ে রাখে, যাতে কেউ না দেখতে পায়।

দোলনকে খবরটা দেওয়া দরকার। টেলিফোনে খবরটা পেয়েই লাফিয়ে উঠলো দোলন। "কী বলছো! ডিরেকটর! আজই রেজলিউশন হয়েছে, কাল গভরমেণ্টের কাছে অ্যাপ্লিকেশন যাবে!"

শ্যামলেন্দু আর কথা বলতে পারেনি। ফোনটা নামিয়ে দিয়েছিল।

হিন্দুস্থান পিটার্স-এর অফিস থেকে ব্লু হ্যাভেনে আর একটা টেলিফোন কল বুক হয়েছিল। রুণু সান্যাল কাতরভাবে বলছে, "বিবি বিবি, সর্বনাশ হয়েছে।"

টেলিফোনেই দুঃসংবাদটা শুনে বিবি চমকে উঠলো। "অ্যাঁ! কী বলছো তুমি? আমি কি একবার এখনই নতুন মেসোমশায়ের কাছে ঘুরে আসবো?"

"আর মেসোমশাই! এসব মেসোমশায়ের কম্ম নয়। একটা শালী-ফালি বাড়িতে এনে কর্তাদের সঙ্গে ভিড়িয়ে দিতে পারলে ফল হতো। নাউ ইট ইজ টু লেট!" দীর্ঘশ্বাস ফেললো রুণু।

বিবি স্বামীর মনের অবস্থা বুঝতে পারছে। বললে, "শোনো ডার্লিং, মনের ভাবটা যেন প্রকাশ করে ফেলো না। চ্যাটার্জিকে অভিনন্দন জানিয়ে এসো।"

"ওই কাজটা আমি মরে গেলেও পারবো না, বিবি।"

"ছেলেমানুষী ছাড়ো। তাছাড়া তুমি অফিস থেকে ফিরে এলে দুজনে সন্ধ্যেবেলায় একসঙ্গে গিয়ে দেখা করবো। আমি নিউ মার্কেটে ফুলের অর্ডার দিয়ে দিচ্ছি।"

পাথরের মতো নিস্তব্ধ হয়ে বসে আছে শ্যামলেন্দু। মেনন সায়েবের মুখটা শুধু চোখের সামনে ভেসে উঠছে। মেনন সায়েব এখন কলকাতায় রয়েছেন। ওঁকেই প্রথম ফোন করলে শ্যামলেন্দু। "কর্মজীবনে প্রথম অনুপ্রেরণা আপনার কাছেই পেয়েছিলাম, তাই আপনাকেই প্রথম খবরটা দিচ্ছি। আমি হিন্দুস্থান পিটারস্‌-এর ডিরেকটর হয়েছি। আপনার আশীর্বাদ চাই।"

মেনন সায়েবের গলাটা কেমন ভারি শোনালো। "আশীর্বাদের কোনো প্রয়োজন নেই। কনগ্রাচুলেশনস্‌।"

"মিস্টার মেনন, আমার বাবা বেঁচে নেই। আপনি আমার বাবার মতো। আপনাকে একটা প্রশ্ন করবো। অ্যামবিশন—এই উচ্চাশা কি পাপ?"

হেসে উঠলেন মেনন সায়েব। "মার্চেন্ট অফিসে এতদিন কাজ করেও সেন্টিমেন্টাল রয়ে গিয়েছ! উচ্চাশা কেন পাপ হতে যাবে? মনে নেই জোসেফ কনরাড কি বলেছিলেন—*All ambition are lawful except those which climb upward on the miseries or credulities of mankind.* দুর্বল অসহায় অজ্ঞ মানুষদের ঘাড়ের ওপর দিয়ে তোমার উচ্চাশার রথ যেন না যায়।"

টেলিফোনটা নামিয়ে দিয়েছে শ্যামলেন্দু। ওর শরীরটা ঠিক ভাল লাগছে না, শুধু মনে হচ্ছে, কত লোকই তো সৎপথে থেকে নিজের প্রতিভা এবং প্রচেষ্টায় ডিরেকটর হচ্ছে, তাদের মতো হতে পারল না কেন শ্যামলেন্দু?

নেশার মাথায়, অন্ধ গোঁ-এর মাথায় উপরে ওঠবার জন্যে শ্যামলেন্দু এ কি করে বসেছে!

শ্যামলেন্দু চেয়ার ছেড়ে উঠতে যাচ্ছে, ঠিক সেই সময় হরিহর তালুকদার ঝড়ের মতো ঘরে ঢুকলেন। "এইমাত্র সুখবরটা পেলাম। আমার আন্তরিক কনগ্রাচুলেশন গ্রহণ করুন।"

করমর্দনের পর হরিহর বললেন, "আজকে কোনো কথা শুনতাম না, আপনার সঙ্গেই ব্লু হ্যাভেনে যেতাম মিসেস চ্যাটার্জির কাছে সন্দেশ খেতে। কিন্তু দেখুন না, এই লাস্ট মিনিটে হাঙ্গামা। আপনাকে বলি না, ইনডাসট্রিতে শান্তি হলেও লেবার অফিসারদের জীবনে কোনো দিন শান্তি আসবে না! ওই যে হাসপাতালে ছিল লোকটা, হীরা সিং, ঘণ্টাখানেক আগে মারা গিয়েছে। আমার লেবার অফিসার দাসকে পাঠিয়েছি। মরবার আর সময় পেলো না। মেট্রোতে সিনেমার টিকিট কাটিয়ে রেখেছি।"

শ্যামলেন্দুর সর্বশরীরে কে যেন বরফের গুঁড়ো ছড়িয়ে দিলো। হীরা সিং মারা গিয়েছে! বমডিলায় যে লোকটা খোঁড়া হয়ে এসেছিল, এই কলকাতায় আমরা তার বাকিটা শেষ করলাম!

হরিহর বললেন, "আমাদের দিক থেকে দুঃখ করবার কিছু নেই। চিকিৎসার সব ব্যবস্থাই হয়েছিল, কিন্তু ডায়াবিটিস থাকলে কী করা যাবে? সেটা আমাদের দোষ নয়।"

খবরটা মিস্টার চ্যাটার্জিকে যে এমনভাবে আঘাত করবে তা হরিহর ভাবতেও পারেননি। মনে মনে ভাবলেন, এই লোক কী করে ফ্যাকটরির অ্যাডমিনিসট্রেশন চালাবে। মুখে হরিহর বললেন, "হীরা সিং নিজেও স্বীকার করে গিয়েছে, এরকম রাজকীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা কেউ করে না।"

"বাট হি ইজ ডেড," শ্যামলেন্দু কাতরভাবে বললে।

হরিহর এরপর ব্যাপারটা সহজ করবার জন্যে বললেন, "দুঃখ নিশ্চয় হয় স্যার। আপনার যে এতটা কষ্ট হচ্ছে, এটা জানলে ওর বউ এবং ছেলেপুলে ভরসা পাবে। তবে কি জানেন, যারা ওয়াচম্যানের চাকরি করে, তার আগে মিলিটারিতে ছিল, প্রাণের ঝুঁকি আছে জেনেই তো কাজে ঢুকেছে। প্রাণটা বন্ধক রেখেই ওরা রুজিরোজগার করে, তা ওদের বউ-ছেলেমেয়ে সবাই জানে। হয়তো দেখবেন, ওর বাপ এবং ঠাকুর্দা ওইভাবেই ফার্স্ট এবং সেকেণ্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারে মরেছে! মরাটা ওদের অভ্যাস হয়ে গিয়েছে!"

শ্যামলেন্দু তখনই হাসপাতালে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু হরিহর [illegible]

আপত্তি জানিয়ে তাকে নিবৃত্ত করেছিলেন। ডেড বডি এখন ময়না তদন্তে যাবে। তারপর ওয়াচ এণ্ড ওয়ার্ডের স্টাফরা দল বেঁধে হাজির হবে। বলা যায় না, তাদের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দিতে পারে। কোম্পানির ডিরেকটর দেখলে তারা উত্তেজিত হয়ে উঠতে পারে। শ্যামলেন্দু তখনও যেতে চাইলে, হরিহর বললেন, "ঠিক আছে, তেমন বুঝলে আগামীকাল সকালে আপনাকে একবার শ্মশানে নিয়ে যাবো। ইতিমধ্যে, আপনার নামে একটা ফুলের মালা নিউ মার্কেটে অর্ডার দিয়েছি। লিখে দিয়েছি : *In deep sympathy from Mr. S. Chatterjee, Director.* আপনি যখন এতটাই কষ্ট পেয়েছেন, তখন মালাটা একশ' টাকা দামের করে দিচ্ছি। তাছাড়া ওর বউকেও আগামীকাল একটা চিঠি লিখে দেবেন। লায়ন অ্যাণ্ড বড়ালের অ্যাপ্রুভড্ চিঠির খসড়া আমার ফাইলে আছে। দারোয়ান স্টাফের মধ্যে তেমন উত্তেজনা দেখলে, আমি ওখানেই ঘোষণা করে দেবো, হীরা সিং-এর ছেলেকে আমরা বেয়ারার চাকরি দেবো। সমস্ত দাহখরচও আমাদের।"

শ্যামলেন্দু আর কোনো উত্তর দিতে পারেনি। কিছুক্ষণের জন্ম তার বিচারবুদ্ধি যেন রহিত হয়ে গিয়েছিল।

দোলন ও সুদর্শনা এয়ারপোরটে যাবার জন্যে তৈরি হয়েই ছিল। শ্যামলেন্দু আসতেই সুদর্শনা হৈ-হৈ করে উঠলো।

"দিন, হাতটা বাড়িয়ে দিন," সুদর্শনা বললে। "একটা হ্যাণ্ডশেক করি। শ্যামলদা আপনি ম্যাজিক জানেন বোধ হয়। এই বয়সেই ডিরেকটর! তারপর কী করবেন?"

সুদর্শনার মতো সরল মেয়েও সেই হাতটা চাইছে। যে-হাতটা শ্রমিকদের নেতারা তুলে নিয়েছিলেন। যে-হাতটা একটু আগেই ফেরিস সায়েবের হাতের সঙ্গে মিলে গিয়েছিল। শ্যামলেন্দু হাতটা বাড়িয়ে দিতে পারলো না। এই নোংরা হাতে জেনেশুনে সকলের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করা যায় না।

সুদর্শনাকে কাটিয়ে দু মিনিটের জন্যে নিজের বেডরুমে এসে ঢুকলো শ্যামলেন্দু। পিছন পিছন দোলনও চলে এসে বললে, "দাঁড়াও, তোমাকে একটা জিনিস দিচ্ছি।" তারপর আনন্দের আতিশয্যে দোলন স্বামীর ঠোঁটে উষ্ণ চুম্বন এঁকে দিলো।

"কিন্তু এ কি! তোমাকে এমন ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে কেন? তোমার শরীর খারাপ নয় তো?" দোলন জিজ্ঞেস করলে।

"না শরীর খারাপ হবে কেন ? তোমরা চলো, শেষে প্লেন ফেল হয়ে যাবে।"

ভি-আই-পি রোড ধরে দমদম এয়ারপোরটে যেতে যেতে দোলন বললে, "আমার খুব ভাল লাগছে আজ। তোমার এই খবর, তারপর টুটুলের যদি একটা লেগে যায়!"

"টুটুলের লাগা কেউ আটকাতে পারবে না।" শ্যামলেন্দু বলে।

টুটুল বললে, "আমার প্রথম চয়েস ফরেন সার্ভিস, তারপর অ্যাডমিনিস-ট্রেটিভ সার্ভিস, তারপর আই-আর-এস।"

"কোন দুঃখে তুই দেশত্যাগ করবি ? ফরেন সার্ভিস মানেই তো বিদেশে থাকতে হবে ?" তারপর দোলন জিজ্ঞেস করলে, "হ্যাঁ রে তুই বিয়ে করবি না ?"

পিছনে ফেলে আসা কলকাতার দিকে তাকিয়ে টুটুল বললে, "মার্চেন্ট অফিসের একজিকিউটিভের বউ হবার প্রবলেম তো দেখলাম। মাস্টারের বউ হলে খেতে পাবো না, তার চেয়ে নিজের পায়ে ভর দিয়ে বিদেশে পালানো ভাল। মেয়ে হিসেবে আমার শ্লোগান লিবার্টি, ইকোয়ালিটি ফ্রেটারনিটি!"

শ্যামলেন্দুর মনে হলো টুটুলের রসিকতার মধ্যে কোথায় একটু বেদনাও মিশিয়ে আছে। এই মুহূর্তে টুটুল বোধ হয় রসিকতা করছে না। জামাই-বাবুকে শুনিয়ে শুনিয়ে কথাগুলো বলছে। গভীর দুঃখের সঙ্গে, শ্যামলেন্দু বললে, "মার্চেন্ট অফিসের দিশী সায়েবদের কথা ছেড়ে দাও—আমাদের কাছে লিবার্টি কথাটার মানে হলো লিবার্টি শার্ট। পিটারস্ ফ্যানের মতো আমরা সকলেই সিলিং থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় সীমাবদ্ধ পরিধিতে ঘুরে মরছি।"

জামাইবাবুকে হঠাৎ ইমোশনাল হয়ে উঠতে দেখে সুদর্শনা চুপ করে রইলো।

দোলনের কিন্তু দুশ্চিন্তার শেষ নেই। বোনকে দোলন বললে, "তোদের ছেলেমানুষী রাখ। আই-এ-এস হও আর সায়েবই হও, বিয়ে না করলে মেয়েরা পরিপূর্ণ হয় না।"

"ছেলেরা বিয়ে ছাড়াই পরিপূর্ণ বুঝি ?" সুদর্শনা উল্টে প্রশ্ন করে।

"আবার তর্ক করছিস, টুটুল!"

"আই-এ-এস হলে বিয়ে করতে তো বাধা নেই দিদি।" টুটুল দিদিকে সান্ত্বনা দেয়।

শ্যামলেন্দু বললে, "আমরা যে জগতে বিচরণ করি, সেখানকার কাউকে মালা না দিয়ে ভালই করলে টুটুল। নতুন জগতে নতুন পরিবেশে কাউকে নির্বাচন করার স্বাধীনতা তোমার রয়ে গেল। আমাদের শুধু পাতপেড়ে খাবার নেমন্তন্নটা কোরো।"

লজ্জায় সুদর্শনার মুখ রাঙা হয়ে উঠলো। শ্যামলদা আজকে মোটেই রসিকতা করছেন না, সে বুঝতে পারে। জামাইবাবুর দিকে মুখ ফিরিয়ে সে বললে, "ডিরেকটরের গৃহিণীকে একটু সামলান শ্যামলদা। শ্যালিকা কথা দিচ্ছে আপনাদের মুখ ডোবে এমন কিছু সে করে বসবে না।"

দোলন বললে, "ডিরেকটর হওয়া মাত্রই তুমি কেমন গম্ভীর হয়ে গিয়েছ!"

আনন্দের উত্তেজনায় দোলন ছটফট করছে। কী করবে ভেবে উঠতে পারছে না। এয়ারপোরটের লাউঞ্জে দাঁড়িয়ে দোলন বললে, "আমাদের বাড়ি কোথায় নেবে? আলিপুর রোড না বার্ডওয়ান রোডে? আমার বার্ডওয়ান রোডটা ভাল লাগে।"

এরোপ্লেনে ওঠবার ঘোষণা হয়েছে। "টুটুল বললে, "আচ্ছা চলি শ্যামলদা।"

টুটুল একটু এগিয়ে গিয়েছে। করিডর ধরে যেতে যেতে দোলন ছোট্ট মেয়ের মতো বললে, "আজকেই বাবাকে চিঠি লিখবো। নিজের প্রতিভায় এবং পরিশ্রমে তুমি যে বড় হবে বাবা জানতেন। হ্যাঁগো, এত তাড়াতাড়ি তোমায় কেন ডিরেকটর করলে? নিশ্চয় খু-উব ভাল কাজ করেছ।"

শ্যামলেন্দুর মাথাটা এবার হঠাৎ ঘুরে উঠলো। কী একটা বলতে গিয়েও আটকে গেল।

"কিছু বলবে?" দোলন জিজ্ঞেস করলে।

শ্যামলেন্দু কিছুই বলতে পারলো না। শ্যামলেন্দু পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে। তার সর্বশরীর অবশ হয়ে আসছে। একবার ইচ্ছে হলো চীৎকার করে দোলনকে ডেকে বলে, "দোলন শোনো।"

কিন্তু কোথায় দোলন? দোলন ততক্ষণে এয়ারপোরটের টারম্যাকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে।

কে যেন একটা লোহার শিক পুড়িয়ে শ্যামলেন্দুর ডান হাতটাকে পুড়িয়ে দিতে চাইছে। নিজেকে হঠাৎ অনাথ এবং নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছে। কিন্তু কি এমন অপরাধ করেছে সে? আর কেউ তা বুঝতে পারেনি শুই ফেরিস সায়েব ছাড়া। ইউনিয়ন থেকে আরম্ভ করে স্ত্রী পর্যন্ত আর সকলেই তো তার ডান হাতটা ধরতে চেয়েছে। কিন্তু মনটা বুঝতে চাইছে না।

ওই মনের মধ্যে সেই দাড়িওয়ালা ইংরেজ কবি উইলিয়ম শেক্সপীয়র হাজির হয়ে চোখ রাঙাচ্ছে তাকে। লোকটাকে দূর করে তাড়িয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু লোকটা বলছে আমাকে ভাঙিয়েই তো একদিন হিন্দুস্থান পিটারস্-এর চাকরিতে ঢুকেছিলে!

এয়ারপোরট রেস্তোরাঁয় হুইস্কির গেলাসে চুমুক দিয়ে শ্যামলেন্দু ফিস ফিস করে অদৃশ্য লোকটাকে বললে, "প্লিজ আমার কানের কাছে আর কোটেশন দেবেন না। আমাকে ডিসটারব করবেন না। আমি লাস-কাটা ঘরের এক কোণে বসে হীরা সিংকে দেখছি। ওর দেহকে ফালা ফালা করে কেটে ডাক্তারবাবু মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করছেন। বাড়িতে তার সদ্য-বিধবা স্ত্রী মাটিতে আছড়ে পড়ছে।"

দাড়িওয়ালা লোকটা তবু কথা শুনছে না। আরও কাছে এগিয়ে এসে বিড় বিড় করে কী সব বলছে। শ্যামলেন্দু বিরক্ত হয়েই বললো, "আপনার স্পর্ধা কম নয়, আপনি হিন্দুস্থান পিটারস্ লিমিটেডের ডিরেকটরের প্রাইভেসী ভঙ্গ করছেন! কোটেশন দেবার ইচ্ছে থাকলে আপনি পাটনাতে আমার ভূতপূর্ব মাস্টারমশায় বটুকেশ্বর ভট্টাচার্যের কাছে যান।"

লোকটা তবু কানের কাছে মুখ লাগিয়ে নাটকীয় কায়দায় বলছে, "*As ambitious as Lady Macbeth, Cromwell, I Charge thee, fling away ambition, By that sin fell the angels.*"

"দাঁড়াও, আমি লোকজন ডাকছি। বেয়ারা, বেয়ারা" শ্যামলেন্দু চীৎকার করে উঠলো।

এয়ারপোরট রেস্তোরাঁর বেয়ারা ছুটে এসে বললে, "স্যার অনেকক্ষণ হয়েছে। এবার বাড়ি যাবেন?"

অফিসের গাড়ি নিয়ে ড্রাইভার সৃষ্টিধর এরোড্রামের সামনে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছিল। সৃষ্টিধর দেখলে সায়েব টলতে টলতে ফিরছেন। এয়ার-পোরট রেস্তোরাঁয় দারুপান ভালই হয়েছে, সৃষ্টিধর ভাবলো।

রাতের অন্ধকারে দমদম ভি-আই-পি রোড ধরে বেশ জোরে গাড়ি চালাতে চালাতে সৃষ্টিধর দেখলে তার সায়েব ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন।

গিয়ার-চেঞ্জিং নব-এ হাত রেখে সৃষ্টিধর ভাবছে সায়েবকে একবার জিজ্ঞেস করে, কী হলো। কিন্তু পরের মুহূর্তে মনে পড়ে গেল, সায়েব আজ ডিরেকটর হয়েছেন। লেখাপড়া তেমন শেখেনি সৃষ্টিধর, কিন্তু এইটুকু জানে, খুব আনন্দ হলে মানুষ অনেক সময় কেঁদে ফেলে। সৃষ্টিধর তার সায়েবকে আর জ্বালাতন করলো না।

হেডলাইটটা জ্বালিয়ে সৃষ্টিধর গাড়ির স্পীড বাড়িয়ে দিলো।

সীমাবদ্ধ সম্পর্কে

জনসমক্ষে আত্মপ্রকাশের আগে 'সীমাবদ্ধ'র নায়ক-নায়িকারা প্রায় দশ বছর আমার মনের মধ্যে অজ্ঞাতবাস করেছেন।

ঐ সময় বিখ্যাত এক আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন কাজকর্ম সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত জানা-শোনার সুযোগ হয়। স্বাধীনতা পরবর্তী এই ভারতবর্ষে শিল্প বিপ্লবের নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছে: যে সব কাঁচের ঘরে একদা শ্বেতাঙ্গদের আসন সংরক্ষিত ছিল সেখানে ভারতীয়রা বিদ্যাবুদ্ধি ও পরিশ্রমের দ্বারা নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে আরম্ভ করেছেন। কিন্তু নতুন যুগের এই শিল্পনায়কদের কাছে যা প্রত্যাশা করা গিয়েছিল তা কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না এমন একটা অভিযোগ শ্রমিক ও কর্মীদের মধ্যে ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছয় যে প্রকাশ্যে কর্মীরা বলাবলি করতেন—'কালা সায়েবদের থেকে গোরা সায়েবরাই ভাল। ওঁদের সঙ্গে কাজকর্ম আলাপ-আলোচনা অনেক সহজ।'

শিল্প-বিপ্লবের এই নতুন অভিজাত সম্প্রদায়কে অনেকে 'ভিলেনের চেয়েও খারাপ' বলে ভাবতে অভ্যস্ত হলেন। এই সব নব-নায়করাও সায়েবদের জীবনযাত্রা নির্লজ্জভাবে নকল করতে গিয়ে ব্যক্তিজীবনে নানা সমস্যা ডেকে আনলেন এবং এদেশের জনজীবনের মূল প্রবাহ থেকে নিজেদের স্বেচ্ছানির্বাসিত করলেন। স্বদেশে জন্ম নিয়েও এঁরা হঠাৎ একদিন প্রবাসী হয়ে উঠলেন। নিচুতলায় সহকর্মীদের বিদ্বেষকে এঁরা সপরিবারে হিংসে বলে উড়িয়ে দিলেন। মানুষের মধ্যে দূরত্ব বাড়লো, বিচ্ছিন্নতার প্রাচীর জেলখানার পাঁচিলকেও লজ্জা দিতে লাগলো।

মানবিক সম্পর্কের এই অবস্থা যে-কোনো উপন্যাস লেখকের পক্ষেই পরম লোভনীয় বস্তু। এই উচ্চবিত্ত ও বিলাসিতার জীবনকে ভুল না বুঝে, এঁদের ওপর কোনো রকম অবিচার না-করে কিছু কাজ করবার ইচ্ছে হঠাৎ আমার মধ্যেও প্রবল হয়ে উঠলো। কয়েক বছরের মধ্যে কয়েকজন শুভানুধ্যায়ীর সহযোগিতায় বেশ কিছু উপাদানও সংগ্রহ করলাম। 'সীমাবদ্ধ'র শ্যামলেন্দু চ্যাটার্জি শীতের এক পড়ন্ত দুপুরে আমার মনের পর্দায় নিঃশব্দে আত্মপ্রকাশ

করলেন। যেহেতু শ্যামলেন্দু চ্যাটার্জি আমার উপন্যাসের নায়ক এবং তাঁকে আমি ভিলেন করে তুলতে চাই না, সেহেতু একদিন তাঁর সুন্দরী শিক্ষিতা শ্যালিকা টুটুলও পাটনা থেকে ঘটনাস্থলে হাজির হলেন!

এত জায়গা থাকতে পাটনা কেন? কারণ, একসময় মাঝে-মাঝে আমাকে পাটনা যেতে হতো এবং রেলের কামরায় একবার এক সপ্রতিভ বালিকার সাময়িক অভিভাবকত্ব নিতে হয়েছিল, যে দিদি ও জামাইবাবুর সঙ্গে অবকাশ বিনোদনের জন্যে কলকাতায় আসছিল। বলাবাহুল্য, এই জামাইবাবুটি বিলিতী কোম্পানির তরুণ অফিসার।

এত সব প্রস্তুতি সত্ত্বেও উপন্যাসের পরিকল্পনা বেশীদূর গেলো না। উপন্যাসের কাঠামো আঁকবার সময় আমি এমন একটা ঘটনা সন্ধান করছিলাম যেখানে উচ্চাভিলাষী নায়ক পরিস্থিতির দুর্বিপাকে এমন কাজ করবে যা ঠিক বে-আইনী নয়, কিন্তু 'ইম্‌মরাল'। বিবেক বহির্ভূত এই অপরাধের দংশন আমার উপন্যাসের ক্লাইমেক্সের পক্ষে অপরিহার্য মনে হয়েছিল। এই ঘটনার সন্ধানে বহু জায়গায় গেলাম, বহু খোঁজখবর করলাম—কিন্তু আশানুরূপ ফল না-হওয়ায় উপন্যাস রচনার কাজ বন্ধ রইলো। পরের বছর আবার অনুসন্ধান শুরু হলো, কিন্তু পছন্দমতো ঘটনা এ-বারেও জোগাড় হলো না। মনে আছে, এই সময় বিভিন্ন গোপন সূত্র থেকে সম্ভাব্য অপরাধের একটা দীর্ঘ তালিকাও তৈরি করেছিলাম—কিন্তু যা চাইছি তা কিছুতেই মিললো না।

অতি প্রয়োজনীয় এই ঘটনার অভাবে উপন্যাস রচনার পরিকল্পনা যখন বাতিল করবো ভাবছি ঠিক সেই সময় একদা-পরিচিতা এক মহিলা টেলিফোন অপারেটর আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। জিজ্ঞেস করলেন, জানা-শোনা অফিসে কোনো কাজকর্ম খালি আছে কিনা। তাঁকে আমি জানা-শোনা অফিসে এক বন্ধুর কাছে পাঠালাম। কিন্তু তার আগে জানতে চাইলাম, কেন তিনি বিখ্যাত অফিসের ভাল-মাইনের কাজ ছাড়তে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন? মহিলা বন্ধুটি সেই সময় চুপিচুপি বললেন, তাঁর বর্তমান অফিসে গোলমাল আসন্ন। ওখানে বিরাট এক্সপোর্টের চুক্তি রয়েছে, যা মান্য করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং ক্ষতিপূরণের ভয়ে, ওঁরা হয়তো কারখানায় গোলমাল বাধিয়ে দেবেন।

মহিলা বিদায় নিলেন, কিন্তু নিজের অজান্তে আমাকে মহাবিপদ থেকে উদ্ধার করে গেলেন। যা আমি তিনবছর থেকে খুঁজছি তা এক মুহূর্তেই পেয়ে গেলাম। আশ্চর্য ব্যাপার, সপ্তাহখানেকের মধ্যেই বিখ্যাত সেই প্রতিষ্ঠানে

'শ্রমিক অশান্তি'র জন্য সত্যই লক-আউট হলো। আমার মহিলা-বন্ধুটির কাছে আর একবার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি—তাঁর সঙ্গে দেখা না-হলে 'সীমাবদ্ধ' হয়তো লেখা হতো না।

সংবাদপত্রের বিশেষ সংখ্যায় 'সীমাবদ্ধ' প্রকাশিত হবার পর নানা ধরনের রি-অ্যাকশন হয়। সাধারণ পাঠক-পাঠিকারা খুশী হলেন। কোনো কোনো ট্রেড ইউনিয়ন নেতা এবং কিছু পদগর্বিত বঙ্গসন্তান কিন্তু মোটেও সন্তুষ্ট হতে পারেননি। নেতাদের দুঃখ, শ্যামলেন্দু চ্যাটার্জির প্রতি আমি যথোপযুক্ত কঠোরতা দেখাতে পারিনি—এরা যে সমাজের শত্রু তা ঠিকমতো আঁকা হয়নি। সায়েবপাড়ায় সস্ত্রীক দিশী সায়েবদের কেউ কেউ সন্দেহ করলেন, নতুন জেনারেশনের উচ্চাভিলাষী সুশিক্ষিত ও পরিশ্রমী যুবকদের সমাজের চোখে অকারণে হেয় করবার ষড়যন্ত্রে আমি অংশ নিয়েছি। একজন নবনিযুক্ত তরুণ ডিরেকটরের স্ত্রী তো অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে অভিযোগ করলেন—জামাইবাবুর পদোন্নতির শুভ সংবাদ পেয়ে তাঁর ভগ্নী যে অভিনন্দনপত্র পাঠিয়েছে তাতে লেখা আছে, "সীমাবদ্ধর শ্যামলেন্দু চ্যাটার্জির মতো আপনি কী কী গোপন কুকর্ম করলেন তা জানবার আগ্রহ রইলো।"

আর একজন প্রতিভাবান উচ্চপদাধিকারী প্রকাশ্য এক অনুষ্ঠানে অভিযোগ করলেন, তিনি ও তাঁর সহকর্মীর তীব্র প্রতিযোগিতার বিষয়ে খোলাখুলি লিখে আমি তাঁকে লোকচক্ষে হেয় করেছি। সৌভাগ্যক্রমে, সেই অনুষ্ঠানে আরও কয়েকজন ভদ্রলোক তাঁদের অফিসে অনুরূপ রেষারেষির ঘটনা বর্ণনা করলেন। এই ধরনের এতগুলি ঘটনা আমার কানে আসে যে এক-একসময় ভয় হয় যে প্রায় প্রত্যেক অফিসেই কয়েকজন শ্যামলেন্দু চ্যাটার্জি সমসংখ্যক রুণু সান্যালের সঙ্গে জীবন-মরণ লড়াইয়ে ব্যস্ত রয়েছেন।

আর একজন মধ্যবয়সী ম্যানেজারের কথা মনে পড়ছে। নিজের অফিসে শ্রমিকদের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার সময় সীমাবদ্ধ প্রসঙ্গ বেশ শ্লেষের সঙ্গে উত্থাপিত হওয়ায় তিনি বিশেষ দুঃখিত হন। এবং এক পত্রযোগে আমার কাছে তাঁর ব্যক্তিগত অভিযোগ নিবেদন করেন: 'দেশের সমস্ত প্রতিভাবান উচ্চাভিলাষী পুরুষই কী নীতিহীনতা ও নির্লজ্জ বিলাসীতার কৃত্রিম পৃথিবীতে বসবাস করছে? যারা সীমাবদ্ধ তাদের কথা তো বিশ্ববাসীকে নিবেদন করলেন, কিন্তু সকলের অলক্ষ্যে কলে-কারখানায় যারা নীরবে নতুন ভারতবর্ষ সৃষ্টির সাধনায় মগ্ন রয়েছে, ইতিহাস ও পরিবেশের নানা বিপত্তি সত্ত্বেও যারা সীমানা মুক্ত হবার স্বপ্ন দেখছে তাদের কথা কে লিখবে?'

অপরিচিত ভদ্রলোকের এই চিঠিখানি আমাকে বেশ নাড়া দেয়। এবং আশা আকাঙ্ক্ষা উপন্যাসের কথা তখনই ভাবতে আরম্ভ করি।

এই উপন্যাসের পুনঃপ্রকাশ উপলক্ষে সেই ঠিকানাহীন অপরিচিত ভদ্রলোককে আমার প্রীতিনমস্কার জানাই।

আশা আকাঙ্ক্ষা

লেখকের নিবেদন

বছর কয়েক আগে কোনো এক ছুটির দিনে। বাংলার বাইরে গিয়েছিলাম। সেখানকার এক আধুনিক গবেষণাগারে কয়েকজন তরুণ বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে আকস্মিকভাবে পরিচিত হবার সুযোগ এসেছিল। সেই পরিচয় থেকেই এই উপন্যাসের সূত্রপাত। আমাদের এই ভারতবর্ষে তাঁরা নীরবে যে আশা-আকাঙ্ক্ষার স্বর্ণলোক সৃষ্টির চেষ্টা করছেন তা সার্থক হোক, দেশজননীকে তাঁরা স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করুন এই প্রার্থনা।

শংকর

কমলেশ রায়চৌধুরীর জীবনে একটু আগে যে-অধ্যায় শুরু হয়েছে, সহজেই তার নামকরণ করা যায়: 'ফুলশয্যার পরেই'। নবদম্পতির জীবনে সেই পরম আকাঙ্ক্ষিত, চরম রোমাঞ্চকর এবং বৈপ্লবিক অভিজ্ঞতার পর মাত্র কয়েক ঘণ্টা অতিবাহিত হয়েছে। এমন সময়ে সুখশয়নের নায়ককে একাকী হাওড়া স্টেশনে ট্রেনের কামরায় বসে থাকতে দেখার কোনো যুক্তি থাকতে পারে না।

কিন্তু বত্রিশ বছরের সুদর্শন কমলেশ রায়চৌধুরী সত্যিই হাওড়া-চন্দনপুর এক্সপ্রেসের প্রথম শ্রেণীর কামরায় বসে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। গত রাত্রে নতুন অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হওয়ার পরও তার মুখে তীব্র বিরক্তির রেখা ফুটে উঠেছে কেন?

সাধারণ বাঙালীদের তুলনায় কমলেশ একটু লম্বা। সুতপাদি সেবার ফোন করে জানতে চেয়েছিলেন, "ভাই, তোমার হাইট কত?"

কমলেশ ফোন ধরে বলেছিল, "বেশ মানুষ তো আপনি? একটা লোক কতখানি লম্বা জানবার জন্যে কলকাতা থেকে চন্দনপুরে ট্রাঙ্ক টেলিফোন করছেন!"

"আঃ কমলেশ, তুমি বড্ড কথা বাড়াতে পারো! জানোই তো মাত্র তিন মিনিট সময়। চটপট তোমার হাইট বলে ফেলো," কলকাতা থেকে সুতপাদি অনুরোধ করেছিলেন।

"আমার হাইট নিয়ে আপনার কী হবে?" কৌতূহলী কমলেশ একটু অবাক হয়েই প্রশ্ন করেছিল।

সুতপাদি এবার ট্রাঙ্ক কলেব রহস্য ফাঁস করলেন, "একটি সুন্দরী মহিলার মাকে তোমার সম্পর্কে খবরাখবর দিতে হবে, বুঝলে শ্রীমান? মেয়েটির গোঁ, পুরুষমানুষ খুব লম্বা না হলে গলায় মালা দেবে না।"

"লিখে নিন—১.৮০ মিটার," কমলেশ সুতপাদিকে বলেছিল।

"আঃ কমলেশ! আইসক্রিমের মতো ফর্সা এবং মিষ্টি একটা কমবয়সী নরম মেয়ে সেন্টিমিটার থেকে কী করে ভাবী বর সম্বন্ধে আন্দাজ পাবে?"

কমলেশ রসিকতা করেছিল, "তাহলে কিলোগ্রামে লিখে নিন—গতকালই ওজন নিয়েছি: ৬৬ কিলো। গজ-ফুট-ইঞ্চি, মণ-সের-ছটাক এসব যে বাতিল হয়ে এখন মেট্রিক হিসেব চালু হয়েছে জানেনই তো।"

ওপার থেকে সুতপাদি বলেছিলেন, "কিলোতে গিয়ে কী জিনিস হাতছাড়া করছো জানো না! পাত্রী ইতিহাসে এম-এ পড়ে, অতশত অঙ্ক জানে না। তোমার হাইট কত বলো। পাঁচ ফুট এগারো ইঞ্চি?"

সুতপাদি ঠিক ধরেছেন। কমলেশ জানতে চাইলো, "আন্দাজ করলেন কেমন করে?"

সুরসিকা সুতপাদি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, "কেন! আমার কর্তার পাশে ফেলে। উনি হচ্ছেন পাঁচফুট আট—তার থেকে ইঞ্চি তিনেক লম্বা তুমি।"

সুতপাদি চন্দনপুরে ফিরে আসবার পরে কমলেশ বলেছিল, "ধন্য আপনারা আজকালকার মেয়েরা! সে-যুগে মেয়েরা বিয়ের আগে তাদের স্বামীর নাম পর্যন্ত জানতো না, জিজ্ঞেস করবার সাহসও পেতো না। আর আজকাল মেয়েরা ভাবী বরের নাড়ী-নক্ষত্রের খবর নিচ্ছে। তাছাড়া বিয়ের পর আপনারা স্বামীদের বাড়তেও দিচ্ছেন না!"

"মানে?" সুতপাদি কপট রাগ দেখিয়ে কমলেশের অভিযোগের বিস্তারিত ব্যাখ্যা চেয়েছিলেন।

শুভাশিসদাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে কমলেশ বলেছিল, "বিয়ের আগেও দাদার যা উচ্চতা ছিল এখনও তাই রয়েছে—পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি।"

"তাতে মহাভারতের কী অশুদ্ধি হয়েছে শুনি?" তর্কে পারদর্শিনী সুতপাদি টিপয়ে চা রাখতে-রাখতে দেবরসদৃশ কমলেশকে কোণঠাসা করবার চেষ্টা করলেন।

কমলেশ চায়ের কাপে মুখ দিয়ে বলেছিল, "মাই ডিয়ার সুতপাদি,

পুরাকালে ঋষিরা বলেছিলেন—শুয়ে থাকাটাই কলি, বসে থাকাটাই দ্বাপর, উঠে দাঁড়ানোই ত্রেতা এবং চলাটাই হলো সত্যযুগ। আর আমাদের এই যুগে, ম্যানেজমেণ্ট শাস্ত্রে বলছে……

"রাখো তোমাদের ম্যানেজমেণ্ট শাস্ত্র," সুতপাদি এবার কমলেশকে মিষ্টি মুখঝামটা দিলেন।

"বেশ! পতিদেবতার মুখেই শুনুন, উনিও তো আজ দিগম্বর বনার্জির সেমিনার লেকচার সেবন করেছেন।"

শুভাশিসদা বললেন "আমাদের বলা হচ্ছে, গ্রোথ অর্থাৎ এই বাড়ন্ত ভাবটাই হলো জীবন। বাড় না-থাকাটাই এক ধরনের মৃত্যু। প্রত্যেক কোম্পানিকে, এমন কি আমাদের এই ভারত সরকারী সংস্থা হিন্দুস্থান অ্যাগ্রো-কেমিক্যালস্ লিমিটেডকে, স্রেফ বেঁচে থাকবার জন্যে প্রতিবছর অন্ততঃ শতকরা দশভাগ বেড়ে যেতে হবে।"

কমলেশ হাসতে হাসতে মন্তব্য করেছিল, "সুতপাদি, তার মানে শুভাশিসদাকেও বছরে শতকরা দশভাগ বাড়বার অনুপ্রেরণা দিতে হবে আপনাকে!"

"দিচ্ছি!" সুতপাদি নিজের নরম সুন্দর মুখ বেঁকিয়েছিলেন। স্বামীকে সাবধান করে দিয়েছিলেন, "অফিসে যত খুশী বাড়াবাড়ি করো; কিন্তু নিজের ওজন বাড়ালেই ডাইভোর্স!"

ঘরোয়া আক্রমণে বিপর্যস্ত শুভাশিসদার পক্ষ নিয়ে কমলেশ টেবিলে আলতো টোকা মেরে প্রশ্ন তুলেছিল, "বিয়ের সঙ্গে ওজনের সম্পর্ক কী?"

প্রশ্নটার ওপর কোনোরকম গুরুত্ব না দিয়ে সুতপাদি মিটমিট করে হাসতে লাগলেন। এবং যার জন্যে লড়াই করা সেই শুভাশিসদা নির্লজ্জভাবে বউকে সাপোর্ট করলেন। কমলেশের অনভিজ্ঞতা যে ধরা পড়ে গিয়েছে তার ইঙ্গিত দিয়ে তিনি বলেছিলেন, "আছে আছে; দাম্পত্যজীবনের সঙ্গে নরনারীর ওজনের একটা নিবিড় সম্পর্কই আছে! এখনও আইবুড়ো রয়েছো, বিয়ে-শাদি হোক তখন বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে।"

শুভাশিসদার উত্তর শুনে অমন যে সপ্রতিভ সুতপাদি, তিনিও একটু লজ্জা পেয়েছিলেন। মুখের হাসি চেপে রেখে গম্ভীর ভাব করে তিনি অন্যদিকে তাকিয়েছিলেন, যেন কথাটা শুনতেই পাননি।

শুভাশিসদার শেষ কথাটাও এখন ট্রেনের কামরায় বসে কমলেশের মনে পড়ে যাচ্ছে। শুভাশিসদা বলেছিলেন, "আসলে, মেয়েরা সব সময় একটা

মাঝামাঝি জিনিস চায়—কমও নয় বেশীও নয়। খুব রোগাও নয়, মোটাও নয়।"

শুভাশিস্‌দা জিওলজির ছাত্র। কমলেশের সঙ্গে একই কলেজে পড়েছেন—কয়েক বছরের সিনিয়র। কিন্তু কলেজ হোস্টেল থেকেই কমলেশের সঙ্গে আলাপ ছিল। তারপর পাকে-চক্রে কর্মসূত্রে এই চন্দনপুরে দুজনের আবার দেখা হয়ে গেল। ইতিমধ্যে কমলেশ এম-টেক পাস করেছে, নামের সামনে একটা 'ডক্টর' যোগ হয়েছে। আর শুভাশিস্‌দাও বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিন পড়াশোনা করে দু-একটা বাড়তি ডিগ্রির রবার স্ট্যাম্প যোগাড় করেছেন। শুভাশিসদা হিন্দুস্থান অ্যাগ্রো-কেমিক্যালস্‌-এ বেশ জাঁকিয়ে বসেছিলেন। শুভাশিস্‌-গৃহিণী সুতপা মজুমদার ব্যাচেলর কমলেশ রায়চৌধুরীকে প্রায়ই বাড়িতে নেমন্তন্ন করেন।

দেবরসদৃশ কমলেশকে সুতপাদিই বলেছিলেন, "আর এইভাবে আইবুড়ো হয়ে কতদিন যেখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াবে ভাই?"

সুতপাদির স্নেহপ্রশ্রয়ে কমলেশ খুব সহজ হয়ে যেতে পারে। সে হেসে বললো, "স্বীকার করছি আমি আইবুড়ো। কিন্তু 'যেখানে-সেখানে' ঘুরে বেড়াচ্ছি এমন বদনাম দিচ্ছেন কেন?"

কমলেশের প্রশ্নে মোটেই বিব্রত হলেন না আধুনিকা সুতপাদি। কমলেশের দিকে ডান হাতের আঙুল তুলে বললেন, "ব্যাচেলরদের আমি মোটেই বিশ্বাস করি না!"

কমলেশ নিজেকে নিরপরাধ প্রমাণ করবার জন্যে বললো, "চরে খাবার সময় কোথায়, সুতপাদি? নিজের কাজকর্ম, নিজের ল্যাবরেটরি এবং নিজের ডিরেক্টর দিগম্বর বনার্জিকে নিয়েই তো মশগুল হয়ে আছি।"

সুরসিকা সুতপাদি সঙ্গে সঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন, "ব্যস্ত হয়তো আছো, কিন্তু মশগুল কিনা জানি না। সত্যেন দত্ত লিখেছিলেন: আমি চাই মধু মশগুল হাওয়া।"

"শুভাশিস্‌দা, সত্যি আপনি গুছিয়ে নিতে জানেন। দেখেশুনে খুঁজেপেতে বিয়ে করলেন বাংলায় এম-এ সুতপাদিকে। কথায় কথায় মিষ্টি মিষ্টি কোটেশন পাচ্ছেন!"

কমলেশের কথা শুনে মজুমদার দম্পতি অনেকক্ষণ ধরে হেসেছিলেন। তারপর সুতপাদি কোলের ওপর পড়ে-যাওয়া আঁচলটা কাঁধে তুলে নিয়ে বলেছিলেন, "বাংলায় এম-এ পাস করা সুন্দরীরা এখনও এদেশে বিরল হচ্ছে

ওঠেনি। প্রতিবছর শতখানেক করে বেরুচ্ছে কলকাতা ইউনিভার্সিটি থেকে। তাছাড়াও আধডজন বিশ্ববিদ্যালয় আছে। একটু ইচ্ছে দেখালেই ঘটকীর ব্যবসায় নেমে যেতে পারি। এম-এ পাস মেয়েদের বাবারা এমন ছেলের খোঁজ পেলে আমার বাড়ির সামনে লাইন দেবে।"

কমলেশ ব্যাপারটাকে এবারে হাল্কা করে দিয়েছিল। গম্ভীরভাবে বলেছিল, "সুতপাদি, এটা মনে রাখবেন, আপনি সরকারী সংস্থায় একজন পদস্থ অফিসারের ওয়াইফ। এইচ-এ-সির বিনা অনুমতিতে সরকারী বাংলো থেকে প্রাইভেট ব্যবসা চালাতে পারবেন না। ভিজিলেন্স ডিপার্টমেন্টের দাসাপ্পা আমার জানাশোনা।"

"বেশ করবো, একশ' বার করবো।" সুতপাদি আবার আঁচল সামলে নিলেন। বক্ষদেশের আব্রু সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে তিনি বললেন, "আমি তো আর পয়সা রোজগারের জন্যে এ-লাইনে নামছি না। নামছি পুণ্যের লোভে। আইবুড়ো ছেলেমেয়েদের ঘটকালি করলে স্বর্গলাভ হয়।"

মুখটিপে হেসে কমলেশ বললে, "যতই গলা ফাটিয়ে চীৎকার করুন, দাসাপ্পা জানে যে ঘটকালিটা আজকাল এদেশে একটি ভাল ব্যবসা—অনেকেই টু-পাইস করছে। আপনার অপরাধে দাদা বিপদে পড়ে যাবেন।"

নির্ভীক সুতপাদি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন, "তোমাদের তিনটে দাসাপ্পাকে বগলে পুরে রেখে আমি প্রজাপতির কাজ করবো।"

"শাস্তি না হয়ে দাসাপ্পার পক্ষে সেটা দুর্লভ সৌভাগ্যই হতো, কিন্তু বেচারাকে সে-সুযোগ কোনোদিনই দিতে পারবেন না সুতপাদি। ভদ্রলোককে আপনি দেখেননি। অর্ডিনারি ওজন-মেশিনে উঠলে কাঁটা পুরো ঘুরে গিয়ে কল খারাপ হয়ে যায়। খুবই গুরুত্বপূর্ণ পদ তো, তাই তিন মণ ওজনের লোক দেওয়া হয়েছে।"

সুতপাদি এসব কথাতে মোটেই দমে যাননি। কমলেশকে বলেছিলেন, "বাজে কথা ছাড়ো। মেঘে-মেঘে বয়স তো কম হলো না। এখন বিয়ে না করলে, কবে করবে? সোজা পথে না গেলে, শেষ পর্যন্ত কোনো খাণ্ডারনী প্রেমিকার ফাঁদে পড়বে, জীবনটা মিজারেব্‌ল করে ছেড়ে দেবে।"

সুতপাদির সেদিনের কথাগুলো এই মুহূর্তে ট্রেনের কামরাতেও কমলেশের মনে পড়ে যাচ্ছে। আর সেই সঙ্গে গত রাত্রের কথা। গত রাতটা সত্যিই কমলেশের বত্রিশ বছর ধরে গড়া জীবনটাকে মধুরভাবে লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছে।

কমলেশের কাছে এখন বিধাতার কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণ নেই। ভানহাতের

মণিবন্ধে হলদে রঙের সুতোটা সে আগেই ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে। পকেটে শুধু আছে একটা ছবি। এই ছবিটাও সুতপাদি একদিন কমলেশের কাছে চালান করেছিলেন। বম্বে ফটো স্টুডিওর মিঃ বোসের নিজের হাতে তোলা চন্দ্রমল্লিকার ছবি। মল্লিকার মুখের ওপর স্টুডিওর অনেকগুলো লাইট নানা কোণ থেকে পড়ে এক বিচিত্র আলো-আঁধারির সৃষ্টি করেছে। চন্দ্রমল্লিকাকে একটু বেশী ফর্সাই দেখাচ্ছে। ঠিক যেন চলচ্চিত্রের নায়িকা—যে-কোনো গল্পে নামিয়ে দেওয়া যায়।

ছবি দেখিয়ে সুতপাদি যখন কমলেশের মতামত জানতে চেয়েছিলেন তখন সে বলেছিল, "সিনেমার কাগজে ছাপিয়ে দিন। ডিরেকটররা দেখলেই চান্স দেবে।"

সেই শুনে সুতপাদি বলেছিলেন, "সিনেমা-থিয়েটার বুঝি না, তোমার জীবনের নায়িকা করে নাও—ঠকবে না।"

কমলেশ মুচকি হেসেছিল। সুতপাদি বলেছিলেন, "ভারি মিষ্টি মেয়ে। যেমন নরম লক্ষ্মীমন্ত গড়ন, তেমন হরিণ চোখের দুষ্টুমি। যদি একবার ধরা পড়ে যাও সারা জীবন নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাবে!"

"ওরে বাবা! ছেলেরা কি গোরু নাকি?" কমলেশ কপট উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল।

"অন্যের কথা জানি না, তবে তুমি একটি গোরু! এই রকম এক উদ্ভিন্ন-যৌবনা সুন্দরীর ছবি হাতে তুলে দিলাম, বিয়ে করো না করো, কিছুক্ষণ খুঁটিয়ে দেখবে তো? তা নয়, একবার দায়সারাভাবে তাকিয়ে খামের মধ্যে পুরে টেবিলে রেখে দিলে," সুতপাদি সোজাসুজি কমলেশকে শুনিয়ে দিয়েছিলেন।

"আহা! করো কি, করো কি! আমার কলেজতুতো ভাই এবং সহকর্মীকে থলহুড়িতে ফেলে এমনভাবে মাড়ছো কেন?" শুভাশিসদা সেই সময় অফিস থেকে ফিরে এসেছিলেন। গিন্নির বক্তব্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়েও শুভাশিসদা কিন্তু কমলেশের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। বলেছিলেন, "হাজার হোক আমরা সরকারী কোম্পানিতে দায়িত্বপূর্ণ পদে রয়েছি—আমাদের প্রেস্টিজবোধ আছে। স্বয়ং নূরজাহানের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব এলেও আমরা হ্যাংলার মতো হুমড়ি খেয়ে পড়তে পারি না।"

"বটে!" স্বামীর দিকে তির্যক দৃষ্টিপাত করে সুতপাদি কপট রাগ দেখালেন।

শুভাশিসদা বললেন, "বেচারাকে একটু সময় দাও। ছবিটা কাছে নিয়ে

যেতে অনুরোধ করো। নিজের ঘরে গিয়ে, একান্তে আলো জালিয়ে প্রয়োজন হলে একশ' বার দেখবে, যেমন তোমার ছবিটা আমি দেখেছিলাম…"

সুতপাদির উপরের ঠোঁটে ডানদিকে একটা কালো বিউটি স্পট আছে। রাগ দেখিয়ে মুখ কুঞ্চিত করলে তিলটা স্থানচ্যুত হয়ে ভারি সুন্দর দেখায়। সুতপাদি সেইভাবেই বললেন, "কলকাতার ছেলেদের মানসিক স্বাস্থ্য দেখছি মোটেই ভাল নয়।"

"তুমি ইউ পির বাঙালী—সুযোগ পেলেই পশ্চিমবঙ্গবাসীদের গালাগালি দাও। কিন্তু কেন মিথ্যে বলবো, তোমার ছবিখানা আমি প্রথম দিনে সাড়ে-একাশিবার দেখেছিলাম।"

"সাড়ে কেন?" সহাস্য কমলেশ জানতে চেয়েছিল।

শুভাশিস্‌দা বলেছিলেন, "একমাত্র কারণ, আলেখ্যদর্শনের সময় মা বিনা নোটিশে আচমকা ঘরে ঢুকে পড়েছিলেন। আমিও ক্রিকেট খেলোয়াড়—ঝটিতি মালমসলা বালিশের তলায় থ্রো করেছিলাম!"

"তারপর?" সুতপাদিকে বিব্রত করবার উপাদান পেয়ে কমলেশ বেশ উৎসাহিত হয়ে উঠলো।

শুভাশিস্‌দা গম্ভীরভাবে বলেছিলেন, "মা ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারলেন না। ভাবলেন আমি অফিস থেকে ফিরে ক্লান্ত হয়ে শুয়ে আছি। নিশ্চয়ই মেয়ে পছন্দ হয়নি। তখন মা বললেন, 'খোকা, তুই আর বাধা দিস না। মেয়েটি হিন্দুস্থানী হলেও, বেশ ভাল। লক্ষ্মী সোনা আমার, তুই রাজী হয়ে যা।' আমি বললাম, এখন জ্বালাতন কোরো না, একটু ভেবে দেখি। মা তখন ফটোখানা ফেরত চেয়ে বিপদে ফেলে দিলেন। বললাম, কোথায় রেখেছি খুঁজে দেখতে হবে। মা তবুও নাছোড়বান্দা। তখন মোক্ষম দাওয়াই দিলাম: মা, একটু পরে এসো। ভীষণ মাথা ধরেছে।"

সুতপাদি সঙ্গে সঙ্গে স্বামীকে মধুর মুখ ঝামটা দিলেন, "রাখো রাখো। পুরুষ-মানুষের ভালবাসা মোল্লার মুরগী পোষা! এখন তো মুখ ফিরে তাকিয়েও দেখ না।"

দাম্পত্য কলহ যাতে আর না বাড়ে সেই উদ্দেশ্যে শুভাশিস্‌দা এবার টেবিল থেকে কমলেশের খামটা তুলে নিলেন। তারপর খুঁটিয়ে মেয়েটির ছবি দেখলেন।

মন্ত্রবৎ কাজ হলো। স্বামীর ওপর মুহূর্তের মধ্যে প্রসন্না হয়ে উঠলেন সুন্দরী সুতপাদি। একগাল হেসে বললেন, "তুমি তো চন্দ্রমল্লিকাকে দেখনি। কেমন মনে হচ্ছে? শিশুকে একটু সৎপরামর্শ দাও।"

শুভাশিস্‌দার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। "যদি ফ্র্যাংক ওপিনিয়ন চাও, তাহলে সোজাসুজি বলবো: কোকাকোলা।"

শুভাশিস্‌দার মন্তব্য শুনে দুজনেই মাথায় হাত দিয়ে বসলো। সন্দিগ্ধ সুতপাদি এবার স্বামীকে সাবধান করে দিলেন, "আমার আত্মীয়স্বজন নিয়ে তোমাদের কারখানার সস্তা রসিকতা চলবে না, একথা আগে থেকেই বলে রাখছি কিন্তু।"

আত্মরক্ষায় তৎপর শুভাশিস্‌দা বললেন, "সস্তা সমালোচনা হলো? এতবড় প্রশংসা করলাম! পড়োনি বিজ্ঞাপন: *Things go well with Coke*—সোজা বাংলা করলে যার মানে: জমে ভাল কোকাকোলা থাকলে!" এবার কমলেশের দিকে চোখ ফিরিয়ে শুভাশিস্‌দা বললেন, "বুঝলে ব্রাদার! ওয়াইফের দূরসম্পর্কের আত্মীয়া বলে নয়—নামটা একটু জবড়জং হলেও, এ-মেয়ের সঙ্গে জমবে ভাল।"

সুতপাদি কয়েকদিন পরে আবার টেলিফোনে খবরাখবর নিয়ে ছিলেন। "কী হলো কমলেশ? ছবি দেখে এমন ঘাবড়ে গেলে যে দাদার বাড়িমুখো হচ্ছো না?"

কমলেশ বলেছিল, "উঃ সুতপাদি, আর বলবেন না। কর্তা একেবারে ভাবের ঘোরে রয়েছেন! কাজ, কাজ ছাড়া ক'দিন কিছুই বুঝছেন না। এতই তো বশীকরণ মন্ত্র জানেন; বুড়ো এন ডি বনার্জির একটা বিহিত করতে পারেন না?"

এইচ-এ-সির ডিরেকটর নোয়েল দিগম্বর বনার্জিকে সুতপাদি যে একেবারেই পছন্দ করেন না, তা কমলেশের অজানা নয়। সুতপাদি গম্ভীর হয়ে বললেন, "হিন্দুস্থান সার কোম্পানি সমস্ত ভারতবর্ষ খুঁজে খুঁজে আর লোক পেলো না—কোথা থেকে যে খেংরা-গুঁফোকে এনে চন্দনপুরে বসালো। রসকষ একটুও নেই।"

কমলেশ বলেছিল, "রস না থাকুক কষের যে অভাব নেই এ-কথা আপিসের লোকেরা হাড়ে হাড়ে জানে, সুতপাদি।"

সুতপাদি বললেন, "তোমাদের অফিসের কথা থাক। চন্দনপুরে দিনরাত অফিস-কীর্তন শুনতে শুনতে কান পচে গেল। তুমি 'কোকাকোলা'র কী করলে বলো?"

কমলেশ সলজ্জভাবে মন্তব্য করেছিল, "মহিলাটি কোকাকোলার মতোই বরফ-ঠাণ্ডা নয়তো?"

বউদিরা অন্যদিকে যতই স্নেহশীলা হোক, প্রেমের দৌত্যে অনেক সময়

তারা নিষ্ঠুর হতে দ্বিধা করে না। না হলে, এই বরফ-ঠাণ্ডার ব্যাপারটা কেউ সোজাসুজি অপর পক্ষের কানে তুলে দেয়?

কলকাতায় কয়েকদিন ছুটিতে এসেছিল কমলেশ। সেই সময় সুতপাদি সুযোগ বুঝে হাজির হয়েছিলেন। সুতপাদির আগ্রহেই চন্দ্রমল্লিকার সঙ্গে কমলেশের সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা হয়েছিল। প্রথমে মেট্রো সিনেমা, তারপর পার্ক স্ট্রীটে কোয়ালিটি রেস্তোরাঁয়। সঙ্গে সুতপাদি ছাড়া আর কেউ ছিল না। সুতপাদির ভাষায়, এর নাম কনট্রোলড্ প্রণয়!

চন্দ্রমল্লিকা সেদিন কী সুন্দর সেজেছিল। সাজ-সাজ ভাব নেই, অথচ সাজ। আমাদের শিক্ষিত আধুনিকারা এই আর্ট আজকাল বেশ আয়ত্তে এনেছে। দেখানোর ব্যস্ততা নেই; অথচ আমার যে সবই আছে এই আত্ম-বিশ্বাস ছড়িয়ে আছে চন্দ্রমল্লিকার দেহে মুখে ভঙ্গিতে চলনে বলনে।

সুতপাদি বলেছিলেন, "তোমাদের আলাপ করিয়ে দিই। এই হলো আমার পিসতুতো দিদির ছোট মেয়ে চন্দ্রমল্লিকা চ্যাটার্জি—ওরফে মল্লিকা—ওরফে ঝুমঝুমি। জন্ম এলাহাবাদে, প্রথম জীবন কেটেছে বোম্বাইতে; তারপর বাবার চাকরির সঙ্গে বদলি হয়ে এসেছে কলকাতায়। কনভেন্ট শিক্ষিতা বলতে পারো—কারণ ডায়োসেশানের ছাত্রী। তারপর আশুতোষ থেকে বি এ 'হনস্' হয়ে এখন কলেজ স্ট্রীট থেকে এম এ পরীক্ষা দিয়েছেন। রেজাল্ট বেরোয়নি, পরীক্ষাকেন্দ্রে টোকাটুকি করে কোনো বিপত্তি বাধিয়ে এসেছে কিনা জানা নেই!"

"আঃ মাসি," চন্দ্রমল্লিকা চাপা রাগ প্রকাশ করে সুতপাদিকে আয়ত্তে আনবার চেষ্টা করেছিল।

সুতপাদি বলেছিলেন, "ইনি কমলেশ রায়চৌধুরী। আমাদের প্রোজেক্টের নামকরা বৈজ্ঞানিক। সায়েন্সকেই জীবনের সারসত্য বলে মেনেছেন। আই-আই-টির এম-এসসি টেক। তারপর পাগলা দিগম্বরের নেকনজরে পড়ে মহামান্য ভারতসরকার পরিচালিত হিন্দুস্থান অ্যাগ্রো-কেমিক্যালস্-এ দ্রুত উন্নতি করছেন। সায়েনটিস্ট সম্বন্ধে অনেক ইংরেজী নভেল পড়েছ নিশ্চয়, কিন্তু বৈজ্ঞানিক চোখে দেখেছ কিনা জানি না: তাই আলাপ করিয়ে দিলুম।"

"দেশে হাজার হাজার বৈজ্ঞানিক রয়েছেন, দেখবার কী আছে?" এই বলে কমলেশ হাত তুলে নমস্কার করেছিল চন্দ্রমল্লিকাকে। একটু ঘাবড়ে গিয়েছিল চন্দ্রমল্লিকা। কিন্তু দ্রুত সাহস সঞ্চয় করে কমলেশকে একটা পরিচ্ছন্ন প্রতিনমস্কার জানিয়েছিল।

স্বল্পালোকিত কোয়ালিটি রেস্তোরাঁয় সুতপাদি দুজনকে মুখোমুখি বসিয়েছিলেন। তারপর গম্ভীরভাবে বলেছিলেন, "এ-কোথায় আনলে বাবা কমলেশ? একেবারে অমাবস্যার অন্ধকার, কিছুই দেখা যায় না।"

সুতপাদি যে জীবনে এই প্রথম কোয়ালিটি রেস্তোরাঁয় আসছেন এমন নয়। কমলেশ বুঝলো সুতপাদি সুযোগ পেয়ে চাপা রসিকতা করছেন।

কফির কাপে চামচ নাড়তে নাড়তে কমলেশ ও চন্দ্রমল্লিকা দুজনেই চুপচাপ হয়ে গিয়েছিল। সুতপাদি বললেন, "অন্য সময়ে দুজনেই এক কথা বলো, এখন কী হলো?"

কমলেশ বাধ্য হয়ে নিস্তব্ধতা ভাঙবার চেষ্টা করলো। বললে, "ইতিহাস, সে তো অতীতের ব্যাপার; আর বিজ্ঞান, এ-বিষয়ে আমাদের ডিরেকটর ডক্টর বনার্জি বলেন, ভবিষ্যৎ নিয়েই আমাদের কাজ কারবার।"

চন্দ্রমল্লিকা চুপ করেই শুনছিল। সুতপাদি খোঁচা দিয়ে বললেন, "বৈজ্ঞানিকদের আজকাল বড় দেমাক, এমন ভাব দেখান যেন পৃথিবীটা ওঁদেরই হাতের মোয়া। ছাড়িস না ঝুমঝুমি, একটা কড়া উত্তর দিয়ে দে।"

চন্দ্রমল্লিকা ওর বড় বড় চোখ দুটো আরও বড় করে নিঃশব্দ হাসি ফুটিয়েছিল। তারপর বলেছিল, "জানো মাসি, আমাদের হেড-অফ-দি-ডিপার্টমেন্ট প্রায়ই বলেন: অতীতকে প্রভাবিত করবার সাধ্য মানুষের নেই। বর্তমান সে তো তার নিজস্ব রূপ নিয়ে আমাদের সামনে এসেই পড়েছে। সুতরাং হাতে আছে কেবল ভবিষ্যৎ। একমাত্র ইতিহাসের আলোতে বর্তমানে দাঁড়িয়ে ভবিষ্যৎ তৈরি করা যায়।"

সুতপাদি বললেন, "বেশ উত্তর হয়েছে।"

এরপর ছল করে সুতপাদি কিছুক্ষণের জন্যে টয়লেটের দিকে চলে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "তোমরা কফি খাও, কথাবার্তা চালাও, আমি এক মিনিটে আসছি।"

কমলেশ ও চন্দ্রমল্লিকা মুখোমুখি তাকিয়েছিল। কমলেশ জিজ্ঞেস করেছিল, "আপনাকে আর একটু গরম কফি দেবো?"

চন্দ্রমল্লিকা এবার বেশ গম্ভীরভাবেই উত্তর দিয়েছিল, "আপনি তো বলেছেন: আইস কোল্ড, বরফ-ঠাণ্ডা!"

কমলেশের বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ করে, সুতপাদি বলেছিলেন, "কমলেশ, আমার কথা শোনো, এখানেই বিয়ে করো। চন্দনপুরে একলা পড়ে থাকি—হৈচৈ করবার মতো লোকজন নেই। তোমরা ও আমরা মিলে বেশ জমানো

যাবে। এতদিন বউদি ছিলাম এবার শাশুড়ী হয়ে যাবো। তোমার জামাই-আদরের কোনো অসুবিধে হবে না।"

কিন্তু সে বোধ হয় ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয়। বিয়ে ঠিক হবার পরেই ডিরেকটরের সঙ্গে ঝগড়া করে শুভাশিসদা চন্দনপুর ছেড়ে অন্য চাকরিতে চলে গেলেন। চন্দনপুর মাইনাস সুতপাদি ভাবতেই পারা যায় না। কিন্তু সুতপাদি সেকথা বিশ্বাস করেননি। বলেছিলেন, "ওসব লেকচার রাখো। বরং তোমাদের সুবিধে হলো। বিয়ের প্রথম বছরটা কাছাকাছি চেনাশোনা লোকজন না থাকলেই ভাল লাগে!"

সুতপাদি আরও বললেন, "একটু-আধটু মনে রেখো—একদিন তোমাদের দুজনের মধ্যে হাইফেনের কাজ করেছিলাম। সমাস হয়ে গেলে লোকে হাইফেনকে তাড়িয়ে দেয়!"

"কোথায় সমাস? এখনও তো বিয়ের কার্ড ছাপা হয়নি," কমলেশ প্রতিবাদ করেছিল।

সুতপাদি হেসে বলেছিলেন, "একটু প্রাকবৈবাহিক প্রেমটেম করবে নাকি? তাহলে তো সুতপা ঘটকীকে দরকার হবেই।"

কমলেশের যে ইচ্ছে হয়নি এমন নয়। চন্দনপুর থেকে উইক-এণ্ডে পালিয়ে এসে চন্দ্রমল্লিকার সঙ্গে একটু দেখাসাক্ষাৎ করতে পারলে মন্দ হতো না।

সুতপাদিরও আপত্তি ছিল না। কলকাতায় নিজের বাড়িতে দুজনকে জড়ো করবার বিস্তারিত পরিকল্পনাও করেছিলেন। কিন্তু বাদ সাধলেন চন্দ্রমল্লিকার মা। সুতপাদি জানিয়েছিলেন, "ভেরি স্যরি, কমলেশ। নীহারদি এখনও খুব মডার্ন হয়ে উঠতে পারেননি। রাজী হলেন না।"

কমলেশ যে একটু হতাশ হয়েছিল তা মিথ্যে নয়।

কিন্তু সুতপাদি বললেন, "এই যে বিয়ে ঠিক-ঠাকের পর মেলামেশা নেই এটা একদিকে ভাল। অদেখা জিনিসে টান বাড়ে, বুঝলে শ্রীমান?"

"তাই বুঝি?" কমলেশ জিজ্ঞেস করেছিল।

"পুরুষ-মানুষ তুমি, তোমাদের কথা জানি না। কিন্তু আমাদের মেয়ে তো এখন থেকেই মনোমন্দিরে দিবসযামিনী ভাবী পতিদেবতার পুজো করছে।"

এরপর হনিমুনের প্রসঙ্গ উঠেছে। সুতপাদি জানতে চেয়েছেন, "মধুচন্দ্রের ব্যবস্থা করছো তো? বিয়ের মন্তর পড়েই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বউকে নিয়ে ইলোপ করবে—যাকে বলে লোপাট হয়ে যাবে।"

"কিন্তু কোথায় লোপাট হওয়া যায় বলুন তো?" কমলেশ পরা[illegible]

চেয়েছিল। চারসপ্তাহ ছুটির জন্য দিগম্বর বনার্জির কাছে সে আবেদনপত্র পাঠিয়ে দিয়েছে।

"মধুচন্দ্রের ব্যাপারটা চন্দ্রমল্লিকার সঙ্গে আলাপ করে ঠিক করতে হয়, বুঝলে মূর্খ!" প্রেমক্রীড়ায় অনভিজ্ঞ দেবরটিকে সুতপাদি মনে করিয়ে দিয়েছিলেন।

সহাস্য কমলেশ অভিযোগ করেছিল, "কী করে আলাপ করবো? তাকে তো আপনারা গায়েব করে দিয়েছেন।"

"ওরে বাবা! ছেলের কথার ধরন দেখো! নীহারদিকে এখনই খবর পাঠাচ্ছি, মল্লিকা উদ্ধারের জন্যে জামাই আপনার নামে পুলিস কেস করবে।"

কমলেশ বলেছিল, "দোহাই সুতপাদি, হনিমুনের ব্যাপারে চন্দ্রমল্লিকার মতামতটা আনিয়ে দিন। একেবারে গোপনে কিন্তু।"

সুতপাদি বললেন, "এখনও পর্যন্ত ঘটকীর পারিশ্রমিকটা ঠিক করলে না। অথচ দিনরাত খাটিয়ে নিচ্ছ। বিয়ের পর কী করবে সে-সম্পর্কেও পরামর্শ চাইছ!"

"গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নেবেন না, সুতপাদি।" কমলেশ কাতর অনুনয় করেছিল।

সুতপাদি হেসে বলেছিলেন, "আমাকে যে-সে ঘটকী পাওনি। কমলেশবাবু কখন হনিমুনের কথা তুলবেন তার জন্যে অপেক্ষা না করে নিজেই নায়িকার সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করে রেখেছি।"

"কোথায় যেতে চায়?" সলজ্জ কমলেশ সাগ্রহে জিজ্ঞেস করলো।

"হনলুলু-হাওয়াই-ওয়াকিকি বীচ-এ আমাদের মেয়ে হনিমুন করুক আমরা চাইবো। কিন্তু তোমার ইচ্ছেটা কোথায়?"

"আমার কোনো ইচ্ছে নেই, ও যা বলবে।"

সুতপাদি বললেন, "উনিও তো সেই এক কথা জানালেন; কর্তার ইচ্ছেয় কর্ম। উঃ পারোও বটে—তোমরা এখন থেকেই আদর্শ দম্পতি হয়ে উঠলে।"

মাথা চুলকে কমলেশ বললে, "হোয়াট অ্যাবাউট খজুরাহ? ইতিহাসের ছাত্রী ওর নিশ্চয় ভাল লাগবে।"

সুতপাদি মুখ টিপে হেসে বললেন, "তোমার বউ, তুমি যেখানে খুশী নিয়ে যাবে, আমরা বাধা দেবার কে? আমাদের মেয়েটা একেবারে ইনোসেন্ট এবং সরল, তাকে যদি খজুরাহ মন্দিরে পাথুরে মানবমানবীদের নির্লজ্জ কীর্তিকাহিনী দেখিয়ে তুমি পাকাতে চাও, পাকাবে!"

শুভাশিসদা এখন কলকাতায় নেই। থাকলে কমলেশের হয়ে তর্ক করতেন। শুভাশিসদার একটা থিওরি আছে: "কলকাতার কলেজে-পড়া মেয়েরা আজকাল অনেক পাল্টেছে। হেদোর ধারে শুভাশিসদার এক চেনা স্টল থেকে তারা অশ্লীল বই এবং পত্র-পত্রিকা কিনে প্রকাশ্যে ভ্যানিটি ব্যাগে পুরতে দ্বিধা করে না।"

ফুলশয্যার দিনেও শুভাশিসদা আসতে পারেনি। নতুন চাকরি, ছুটি মেলেনি। কিন্তু কমলেশের বন্ধুবান্ধব অনেক এসেছিলেন।

ফ্ল্যাশলাইটে বরবধূর ছবিও উঠেছিল। কমলেশের মা জিজ্ঞেস করেছিলেন, "কেমন দেখলেন?"

চন্দ্রমল্লিকার মামা বলেছিলেন, "কী আর বলবো—ঠিক যেন ফিলটার সিগারেটের বিজ্ঞাপন—মেড্-ফর-ইচ-আদার। এনার জন্যে ওনাকে তৈরি করা হয়েছে!"

নবদম্পতিকে আশীর্বাদ অথবা শুভেচ্ছা জানিয়ে কমলেশের অনেক সহকর্মী চন্দনপুর থেকে রঙীন টেলিগ্রাম পাঠিয়েছে। সেই সব টেলিগ্রাম দেখতে দেখতে কমলেশের বাবা একটা টেলিগ্রামের কাছে এসে একটু গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন। কী ভেবে সেই কাগজটা নিজের পকেটে পুরে রেখেছিলেন। অন্যগুলো ছেলের দিকে এগিয়ে দিয়েছিলেন।

সুতপাদি নিজে এসেও খোঁজ করেছিলেন, "তোমার ডিরেকটর দিগম্বর বনার্জি কোনো টেলিগ্রাম পাঠাননি?"

"এখনও পাইনি। হয়তো পাঠিয়েছেন—পরে হাজির হবে," কমলেশ বলেছিল।

কমলেশের বাবা সুধন্যবাবু কিন্তু টেলিগ্রামটা পকেটে পুরেই ঘড়ির দিকে তাকিয়েছিলেন। প্রায় সাড়ে-দশটা বাজে। বাড়ির লোককে তাগাদা দিয়েছিলেন। "অনেক দেরি হয়ে যাচ্ছে, তোমরা ফুলশয্যার ব্যবস্থা করো।"

ফুলশয্যার ঘরে নবদম্পতিকে ঢুকিয়ে দেবার সময় পর্যন্ত সুতপাদি সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। চুপিচুপি কমলেশকে বলেছিলেন, "কী হে শ্রীমান, নাড়িটা একবার মেপে দেখবো নাকি? মিনিটে কতবার বুকটা ধুকপুক করছে? মেয়ে আমাদের যে বরফ-ঠাণ্ডা নয় তার প্রমাণ একটু পরেই পাবে।"

তারপর ওর হাতটা ধরে আশীর্বাদ জানিয়ে সুতপাদি বলেছিলেন, "আজকের রাতটা জীবনে একবারই আসে—সুতরাং বুঝেসুঝে খরচ কোরো। কোনোরকম আক্ষেপ থেকে যেন না যায়।"

বিদ্যুৎবাহিত চন্দনপুর এক্সপ্রেস ইতিমধ্যেই তীব্র বেগ নিয়েছে। একটা ছোট স্টেশন চোখের নিমেষে বেরিয়ে গেল। একটা বুড়ো মালগাড়ি পাশেব লাইনে ধুঁকছিল। উদ্ধত চন্দনপুব এক্সপ্রেসেব কাণ্ডকারখানা দেখে নিজেকে আর বেইজ্জতী করবার ইচ্ছে যেন তার নেই। তাই একধারে সরে গিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে।

কমলেশ রায়চৌধুরী এবার ঘড়িব দিকে তাকালো। হিসেব করে দেখলো, গত রাত্রে ফুল-দিয়ে-সাজানো শয়নমন্দিবে প্রবেশ কববার পর এখনও চব্বিশ ঘণ্টা হয়নি।

চশমার মোটা ফ্রেমে কমলেশ একবার হাত দিলো। এখানেও চন্দ্রার স্পর্শ লেগে আছে। চশমাটা কমলেশ যখন একবার খুলে ছিল তখন নিজের শাড়ির আঁচলে সে কাঁচ মুছে দিয়েছিল।

সে এক আশ্চর্য অনুভূতি। বিজ্ঞানের সংযত সেবক কমলেশ রায়চৌধুবী গত রাত্রের বাঁধনহারা বন্যায় অকস্মাৎ কোথায় যেন ভেসে গিয়েছিল।

বাড়ির মেয়েরা সালঙ্করা সুসজ্জিতা চন্দ্রমল্লিকাকে আগেই ঘরে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। কমলেশ ঘরে ঢুকতে একটু ইতস্তত করছিল। কিন্তু বাবা আবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন। "বড় দেরি করছিস তোরা সকলে।"

চন্দ্রমল্লিকা দেখলো পাঁচ ফুট এগারো ইঞ্চি লম্বা একটা পুরুষ-মানুষ ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলো। ঘষা কাঁচের জানালার সাটারগুলো আগে থেকেই কারা বন্ধ করে দিয়েছে। কমলেশ তবু একবার খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে নিলো। ফুলের অলঙ্কার সামলাতে সামলাতে চন্দ্রমল্লিকা লাল বেনারসীর ঘোমটার ফাঁক দিয়ে এই প্রস্তুতিপর্ব দেখলো; কিন্তু একটুও ভয় পেলো না। বরং নিশ্চিন্তে বাঁহাতের বড় নখগুলো নিয়ে খেলা করতে লাগলো।

অথচ এই মেয়েকেই মাত্র ছিয়ানব্বই ঘণ্টা আগে একই কমলেশ রায়চৌধুরীর সঙ্গে প্রকাশ্য রাজপথে একটা চায়ের দোকানে মুখোমুখি বসতে দেওয়া হয়নি। আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে, রাত্রি দশটা বেজে চৌদ্দ মিনিট পর্যন্ত দুজনের মধ্যে কতরকম সঙ্কোচ ও দূরত্ব ছিল। পরের মিনিটে যেমনি পিঁড়িতে বসে সাতপাক খাওয়া হলো অমনি সব পাল্টে গেল। বাইরে থেকে পরিবর্তন নয়—একেবারে রাসায়নিক পরিবর্তন: কমলেশদের কারখানায় যেমন পরিবর্তন হয় কয়লার।

দাদার বিয়ের সময় কমলেশ খুব কাছে দাঁড়িয়ে বউদির এই রাসায়নিক পরিবর্তন লক্ষ্য করেছে। সাতপাক হবার আগে পর্যন্ত মেয়েদের একটা নিজস্ব

সত্তা থাকে—যতই নম্র এবং লজ্জা বিধুরা হোক, সে তখনও আলাদা। পিঁড়িতে উঠবার ঠিক আগে বিপত্তি হয়েছে এবং বিয়ে ভেঙে গিয়েছে কিন্তু পাত্রী আবার বধূ সেজে অপর এক শুভলগ্নে হাসি মুখে অন্য কাউকে মালা দিয়েছে—এমন ঘটনা দুর্লভ নয়। কিন্তু ঐ যে সাতপাকের মুহূর্তে কী একটা হয়, আমাদের দেশের মেয়েরা যুগ-যুগান্তের ট্রাডিশনে অকস্মাৎ পাল্টে যায়। এতগুলো লোকের চোখের সামনে, চড়া বিজলীবাতির প্রকাশ্য আলোকে এই আশ্চর্য অনুঘটন হয়, কিন্তু কেউ তা লক্ষ্য করে না, কেউ বিস্মিত হয় না। যে-মেয়ে পিঁড়িতে ওঠে এবং যে-মেয়ে পিঁড়ি থেকে নেমে আসে তারা যে এক নয় তা আমাদের খেয়াল থাকে না।

চন্দ্রমল্লিকার ডানহাতটা আলতোভাবে ধরেছিল কমলেশ—বাংলা সিনেমায় ফুলশয্যার দৃশ্য এইভাবেই শুরু হয়। চন্দ্রমল্লিকা বাধা দেয়নি। কমলেশ বলেছিল, "মোটেই বরফ ঠাণ্ডা নয়—বরং "

"বরং কী?" চন্দ্রমল্লিকা ওর বড় বড় চোখ দুটো বিকশিত করে জানতে চেয়েছিল।

কমলেশ মৃদু হেসে বলেছিল, "কফির মতো উষ্ণ।"

"কফি তো বড্ড গরম থাকে। বেশীক্ষণ হাতে ধরে রাখা যায় না।" চন্দ্রমল্লিকার উত্তরটা বেশ লেগেছিল কমলেশের।

"হাতে ধরা যায় না, কিন্তু ঠোঁটে নেওয়া যায়," এমন একটা কথা বলবার লোভ হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্রেক করেছিল কমলেশ। সে শুনেছে, প্রথম রাতে সাবধানে না এগিয়ে তড়িঘড়ি করায় অনেকের সারা জীবনের দাম্পত্য সুখ নষ্ট হয়েছে।

"তোমার নামটা মস্ত বড, চন্দ্রমল্লিকা," নববধূর নরম হাতটা নিয়ে খেলা করতে করতে কমলেশ বলেছিল।

"পছন্দ হয়নি?" চন্দ্রমল্লিকা নির্ভয়ে জিজ্ঞেস করেছিল।

"খুব পছন্দ হয়েছে। কিন্তু বেনারসী শাড়ির মতো দামী এবং ভারী।"

চন্দ্রমল্লিকার কপালে চন্দনের ফোঁটাগুলো চকচক করে উঠেছিল। ওর সিঁথিতে মোটা-করে-টানা লাল সিঁদুররেখাও হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। কমলেশ বলেছিল, "তুমি যেমন ফুরফুরে হাল্কা, তেমনি একটা আটপৌরে আদুরে নাম পেলে বেশ মজা হতো।"

চন্দ্রমল্লিকা লজ্জায় সিঁটিয়ে যায়নি, বরং স্বামীর দাবি মেনে নিয়ে উৎসাহ দিয়ে বলেছিল, "আমিই যখন তোমার হয়ে গিয়েছি, তখন তোমার যা-খুশী নাম

দিও। তা বলে, বাবা-মার সামনে সেই নামে ডেকে বসো না, তাহলে খুব লজ্জায় পড়ে যাবো।"

স্ত্রীর মধুর প্রশ্রয়ে কমলেশ আরও লোভী হয়ে ওর হাতের চুড়িগুলো ওপরের দিকে তুলে এঁটে দিয়েছিল। হাতের কাজ একটু থামিয়ে এবার সে বললো, "তোমার একটা আদুরে নাম আছে ঝুমঝুমি। কিন্তু ঝুমু বললে একটু কম রোমান্টিক মনে হয়। তার চেয়ে আমার যখন যা-খুশী তাই ডাকবো—কখনও চন্দ্রমল্লিকা, কখনও মল্লিকা, কখনও চন্দ্রা, কখনও বা ঝুমু।"

কমলেশ এবার স্ত্রীর ডান হাত নিজের দুই হাতের মধ্যে তুলে নিলো। নিজের হাতের সঙ্গে তুলনা করে বললো, "এই হচ্ছে কুলির হাত—আঙুলগুলো ছড়ালে কুলোর সাইজ হয়ে যায়। কোথাও কোমলতা নেই, দু-এক জায়গায় কড়াও পড়েছে। আর এই হলো রূপকথার রাজকুমারীর হাত—নরম তুলতুলে—একটু ঠাণ্ডা একটু গরম।"

চন্দ্রমল্লিকা কোনো প্রতিবাদই করলো না। নিজেকেই যখন সমর্পণ করেছে, তখন হাত ছাড়িয়ে আনার কোনো মানে হয় না।

কমলেশ এবার পাঞ্জাবির পাশ পকেট থেকে লাল রঙের বাক্স বার করলো। তার মধ্যেই ছিল আংটিটা। আস্তে আস্তে, গভীর আদরে এবং খুব সাবধানে কমলেশ সেটা বউ-এর নরম আঙুলে পরিয়ে দিলো। আংটিটা যে এত সুন্দর কমলেশ নিজেই তা কেনবার সময় বুঝতে পারেনি। যে-জিনিস যেখানে শোভা পায়!

চন্দ্রমল্লিকা সলজ্জ হাসিতে মুখ ভরিয়ে বললো, "থ্যাংক্স।"

"মাপটা কোথা থেকে পেলাম, জিজ্ঞেস করলে না তো?" কমলেশ বলেছিল।

"জানি। সুতপা মাসির কাছে চেয়েছিলে—বলেছিলে, কেউ যেন না জানতে পারে।"

"তাহলে তুমি জানলে কী করে?" কমলেশ অভিযোগ করেছিল।

"বারে! আমার আঙুল, আমি জানতে পারবো না? সুতপা মাসি তবু বলেছিল, আমার এক বয় ফ্রেণ্ড চেয়ে পাঠিয়েছে।"

আংটি-পরা হাতটা কমলেশ নিজের কপাল ও মুখে ঠেকিয়েছিল। শান্ত-ভাবে চন্দ্রমল্লিকা বললো, "তুমি আমাকে এমন সুন্দর আংটি দিলে, অথচ তোমাকে দেবার মতো কিছু নেই।"

এক মুহূর্ত ইতস্তত করলো কমলেশ। তারপর আর সঙ্কোচ রইলো না।

সে বলে ফেললো, "উঁহু। দেবার মতো অনেক কিছু আছে।" স্ত্রীর পাতলা রঙীন ঠোঁটের দিকে তাকিয়ে স্বামীদেবতা এবার যা ইঙ্গিত করলো তা তৎক্ষণাৎ বুঝতে, সম্মতি জানাতে এবং দান করতে চন্দ্রমল্লিকা দ্বিধা করলো না।

সেই ভেলভেটের মতো নরম, সামান্য ভিজে অথচ তাজা, মিষ্টি ঠোঁটের প্রথম স্পর্শ এবং সুদীর্ঘ প্রশ্রয় কমলেশের ওষ্ঠে যেন এখনও লেগে রয়েছে; শরীরের ওই বিশেষ অংশটা এখনও অনির্বচনীয় অক্ষয় স্বর্গলোকে পড়ে রয়েছে।

তারপর ওরা দুজনে নির্ভয়ে ছোট্ট এক স্বপ্নের ডিঙিতে চড়ে কখনও দুরন্ত অভিজ্ঞতার অতলান্ত সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছে, কখনও প্রশান্ত প্রেমের সরোবরে ভেসে বেড়িয়েছে। উত্তাল মুহূর্তে কখনও হারিয়ে ফেলেছে নিজেদের, কখনও আবার পরস্পরকে খুঁজে পেয়ে সভয়ে খুব কাছাকাছি সরে এসেছে।

কমলেশ বুঝেছে, এই যে মিলেমিশে একাকার হয়ে যাওয়ার আদিম আকাঙ্ক্ষা, তা অনেকটা রাসায়নিক বিপ্লবের মতো—ল্যাবরেটরিতে যে-মিলনের চূড়ান্তে পৌঁছে পদার্থ নিজের সত্তা হারিয়ে ফেলে। যে-বিপ্লবের পরে পুরানোকে আর পাওয়া যায় না, নিজেকে নিঃশেষ করে সে নূতনের জন্ম দেয়।

কিন্তু সাগরে ভেলা ভাসিয়েও ওরা দুজনে হাঁপিয়ে ওঠেনি, ব্যস্তও হয়নি। কারণ এই তো সবে শুরু, সামনে পড়ে রয়েছে অনেক সময়। এক মাস অফিসের কথা পর্যন্ত ভাববার প্রয়োজন নেই কমলেশের।

বধূকে খুব কাছে টেনে নিয়ে কমলেশ বলেছে, "চন্দ্রা, খজুরাহতেই সব পাকা ব্যবস্থা করা আছে। শুভচণ্ডীর পূজোটা শেষ করে ঐদিনই ট্রেনে চড়বো। টিকিট, রিজার্ভেশন, কূপে সব ব্যবস্থা করা আছে। ওখানকার নতুন হোটেলটাও শুনেছি নব-বিবাহিতদের পক্ষে খুব সুন্দর।"

আধুনিকা বধূও উৎসাহিত বোধ করেছে। "বেশ মজা হবে, খুব ঘুরে বেড়ানো যাবে," চন্দ্রা আস্তে আস্তে বলেছে। আত্মসমর্পণের পর তার দেহটা এখনও সুখের বিহ্বলতায় অবশ হয়ে আছে।

নিবিড় আলিঙ্গনশৃঙ্খল থেকে সুদেহিনীকে মুক্তি না দিয়েই কমলেশ বলেছে, "যদি আমি হোটেল ঘর থেকে বেরোতে না চাই?"

"বেরুবো না! তুমি যা-চাইবে তাই হবে," স্বামীর সব দাবি চন্দ্রমল্লিকা বিনা প্রশ্নে নির্দ্বিধায় মেনে নিতে রাজী আছে।

নিঃশব্দ পদসঞ্চারী রাত্রি এরপর নবদম্পতির নতুন খেলাঘরে বিনানুমতিতে প্রবেশ করে ওদের দুজনকেই ঘুমের দেশে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল। নতুন অভিজ্ঞতায় পরিতৃপ্ত কিন্তু পরিশ্রান্ত দেহটা যে এবার অবসন্ন হয়ে পড়েছে তা

বোধহয় চন্দ্রমল্লিকা বুঝতে পেরেছিল। স্বামীকে চুপি চুপি বলেছিল, "আমি যদি ঘুমিয়ে পড়ি, তাহলে কিন্তু ভোর হলেই তুলে দিও।"

স্বামীর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করেই মল্লিকা ঘুমিয়ে পড়তে চায়। কমলেশ বললো, "ভোর হলেই উঠতে হবে কেন ?"

"নতুন বউ অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে থাকলে বিশ্রী দেখায়। লোকজন হাসাহাসি করে," চন্দ্রমল্লিকা বলেছিল।

"এখানে কেউ তোমাকে কিছু বলবে না। ফুলশয্যার পরের দিনই বউমা ভোর পাঁচটায় উঠে পড়ুক আমাদের বাড়ির কেউ তা প্রত্যাশা করে না।"

"যা-বলছি শোনো, লক্ষ্মীটি। আমি ঘুমিয়ে পড়লে তুলে দিও। মা বার বার করে বলে দিয়েছে—দরকার হলে দুপুরে ঘুমিও, কিন্তু সকালে কিছুতেই আটটা পর্যন্ত ঘরে খিল দিয়ে বিছানায় পড়ে থাকবে না।"

রাতের আলোয় সবার উপস্থিতিতে যে-দরজা বন্ধ করতে আপত্তি নেই, দিনের বেলায় তা খুলতে একটু দেরি হলে জিনিসটা কেন অশ্লীল হয়ে যাবে, কমলেশ বুঝতে পারে না। কিন্তু চন্দ্রার সঙ্গে এই মুহূর্তে তর্ক করবার মন নেই—চন্দ্রা যা-চাইছে তাই পাবে।

আসল সময়ে কমলেশ কিন্তু গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। ভোর-বেলায় ওঠার সযত্ন লালিত অভ্যাসটা আজ সকালে বিশ্বাসভঙ্গ করেছে। কিন্তু চন্দ্রাকে লজ্জায় পড়তে হয়নি, সে নিজেই যথাসময়ে উঠে পড়েছে।

চন্দ্রমল্লিকা প্রথমেই বিধ্বস্ত বিছানার চাদরটা টেনে সোজা করে দিয়েছে, ছেঁড়া ফুলগুলোকে কুড়িয়ে বাস্কেটে ফেলে দিয়েছে এবং অতি সাবধানে চুড়ির আওয়াজ না করে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চিরুনির সাহায্যে নিজের বিশৃঙ্খল চুলগুলোকে শাসনে এনেছে। এবার দরজা খুলে দিয়ে লজ্জাবতী নববধূ ঘরের কোণে চেয়ারে বসেছে এবং মাথায় সামান্য ঘোমটা টেনে দিয়েছে। অপরিচিত পরিবেশে নিজের অস্বস্তি অপনোদনের জন্য চন্দ্রমল্লিকা একখানা বই তুলে নিয়েছে। বইটা সে পড়বার চেষ্টা করছে, কিন্তু একটা লাইনও মাথায় ঢুকছে না।

চন্দ্রার মুখ দেখলেই সহজেই বলে দেওয়া যায় সে এখন নিজেকে ভীষণ বড়লোক মনে করছে—বিয়ের মন্ত্র পড়ে সে অকস্মাৎ এত পেয়ে গিয়েছে, যে এক রাত্রি কেন বহু রাত্রি ফেলে-ছড়িয়ে খরচ করলেও নিঃস্ব হবার আশঙ্কা নেই। বিবাহিতা সহপাঠিনীদের কাছে মল্লিকা শুনেছিল অনেক স্বামীদেবতা প্রথম রাত্রেই বড় হ্যাংলামি করে—তার স্বামী কিন্তু নিজেকে ছোট করেনি।

এক রাত্রেই সব তো ফুরিয়ে যাচ্ছে না, কমলেশ বলেছিল। একান্ত পরিচয়ের প্রথম সুযোগ মল্লিকার জন্যে নির্লজ্জ লোভের মলিনতা বয়ে আনেনি, তার নিজস্ব নিভৃত স্বাধীনতাকেও লণ্ডভণ্ড করেনি।

মল্লিকার বিবাহিতা ননদ ভোরবেলায় উঠে পড়েছিলেন। নববিবাহিতদের দরজা খোলা দেখে তিনি অবাক। বললেন, "ওমা, নতুন বউ এরই মধ্যে উঠে পড়লে? এখনও বাড়ির কেউ তো বিছানা ছাড়েনি।"

চন্দ্রমল্লিকা কোনো কথার উত্তর দেয়নি। মুখে গম্ভীর ভাব দেখালেও একটু লজ্জা লাগছে তার—সিঁথির সিঁদুরটা অনভ্যাসে সমস্ত কপালে ছড়িয়ে গিয়েছে। মুখটা আর একবার মুছে ফেললে হতো।

বিবাহিতা ননদ কোনো কথা না বলে অভিজ্ঞ চোখে মল্লিকার মাথা থেকে পা-পর্যন্ত প্রতি অঙ্গ খুঁটিয়ে দেখছেন। তাঁর দৃষ্টি বুকের কাছে থমকে দাঁড়াতেই ভীষণ অস্বস্তি বোধ করলো চন্দ্রমল্লিকা—আঁচল কাঁধের ওপর পুরোপুরি ছড়ানো থাকলেও আরও একটু টেনে দিলো।

অতি কৌতূহলী মেয়েরা এই সব মুহূর্তে লজ্জাশরম বিসর্জন দিয়ে নির্মম হয়ে ওঠে, নানা অস্বস্তিকর প্রশ্নের উত্তর চায়। ছোট বড় জ্ঞান থাকে না, যা-তা মন্তব্য করে বসে, শুনেছে চন্দ্রমল্লিকা। কিন্তু দিদি কিছুই করলেন না। শুধু জিজ্ঞেস করলেন, "ঘুম হয়েছিল তো? নতুন জায়গায় অনেক সময় ঘুম আসে না।"

ঘুমের যে কোনো ব্যাঘাত ঘটেনি তা চন্দ্রমল্লিকা নীরবেই জানিয়ে দিলো—মুখ ফুটে মিথ্যে কথা বলতে তার কেমন সঙ্কোচ লাগে। দিদি বললেন, "বাথরুম খালি রয়েছে।"

রাতের জামাকাপড় পাল্টে কলঘর থেকে বেরিয়ে চন্দ্রমল্লিকা দেখলো শ্বশুরমশায় অস্থিরভাবে বারান্দায় পায়চারি করছেন। তিনি খোঁজ নিলেন খোকা উঠেছে কিনা।

ফুলশয্যার পরে বেলা দুপুর পর্যন্ত স্বামী নাক ডাকিয়ে ঘুমোক চন্দ্রমল্লিকার তা মোটেই পছন্দ নয়। আটটা বাজতেই কমলেশের পায়ে সে একটা আলতো চিমটি কেটেছিল। পাশ-বালিশটাকে আবার জড়িয়ে ধরবার আগে কমলেশ মুহূর্তের জন্য তাকিয়েছিল।

চন্দ্রমল্লিকা চাপা গলায় বলেছিল, "বাবা তোমার খোঁজ করছেন।"

ঘুম থেকে ধড়মড়িয়ে উঠে কমলেশ সোজা বাইরে চলে যাচ্ছিলো। চন্দ্রমল্লিকা হুমড়ি খেয়ে পথ রোধ করলো। বললে, "মুখটা একটু মুছে নাও।

আয়নাতে একটু দেখে নাও, কোথাও কিছু লেগে রইলো কিনা ?"

বাইরের বারান্দায় একটা চেয়ারে বাবা চুপচাপ বসেছিলেন। গত রাত্রের টেলিগ্রামখানা সামনেই পড়েছিল। রঙীন অভিনন্দনবার্তা নয়, জরুরী টেলিগ্রাম।

"বনার্জি তোদের অফিসের কে হয় রে ?" বাবা জিজ্ঞেস করলেন।

"আমাদের টেকনিক্যাল ডিরেকটর এন ডি বনার্জি," কমলেশ বললো।

"তুই যে বিয়ে করবার জন্যে কলকাতায় এসেছিস তা তিনি জানেন ?" বাবা আবার গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

"খুব জানেন। ওঁকে নিজের হাতে বিয়ের কার্ড দিয়ে এসেছি। এখানে আসবার দিনে আশীর্বাদ করলেন। বললেন, তেমন অসুবিধা না হলে বউভাতে নিশ্চয় আসবেন।"

বাবা আর কথা না-বাড়িয়ে কমলেশের দিকে জরুরী টেলিগ্রামটা এগিয়ে দিলেন। তাতে লেখা—'রিগ্রেট, তোমার ছুটি নাকচ করতে হলো। অবিলম্বে চন্দনপুরে ফিরে এসো। বনার্জি।'

টেলিগ্রাম গতকাল রাত্রেই এসেছে তাও দেখতে পেলো কমলেশ। বাবা ইচ্ছে করেই কমলেশের ফুলশয্যার রাত্রি নষ্ট হতে দেননি।

বাবা শান্তভাবেই ব্যাপারটা নিয়েছেন। কোনো মন্তব্য করলেন না। গম্ভীরভাবেই জানিয়ে দিলেন, "যদুকে আমি ফেয়ারলি প্লেস বুকিং অফিসে পাঠিয়ে দিয়েছি, চন্দনপুর এক্সপ্রেসে একখানা ফার্স্ট ক্লাস টিকিট কিনে আনবে।"

খবরটা এবার দ্রুতবেগে আত্মীয়মহলে ছড়িয়ে পড়েছিল। চন্দ্রমল্লিকার বাড়িতে টেলিফোন যেতেও দেরি হয়নি। এমন আকস্মিক ঘটনার জন্যে কোনোপক্ষই তৈরি ছিল না। দু পক্ষের মধ্যে কয়েক রাউণ্ড আলোচনার পরে ধুলো-পায়ে-সপ্তটা সঙ্গে সঙ্গে সেরে ফেলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।

বাপের বাড়িতে ফিরবার সময় চন্দ্রমল্লিকার সঙ্গে কমলেশ ছাড়া আর কেউই ছিল না। আকস্মিক বিচ্ছেদের আশঙ্কায় মল্লিকা বেচারা বেশ মুষড়ে পড়েছে। কমলেশ নিজেও এ-ধরনের বিনা-মেঘে-বজ্রপাতের জন্যে প্রস্তুত ছিল না। চন্দনপুরে ফিরে না-যাওয়া পর্যন্ত রহস্যটা মোটেই বোঝা যাচ্ছে না।

আচমকা ব্রেক কষার ফলে ট্রেনটা একটু ধাক্কা দিয়ে থামলো। কমলেশের মনে হলো একটা অপ্রত্যাশিত অন্যায় ধাক্কা খেয়েছে সে। চাকরি কমলেশ

একা করে না। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোক ছুটি নিয়েই বিয়ে করতে আসে—কিন্তু ফুলশয্যার রাতে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে কোনো অফিসের কর্তা তাদের বিয়ের আনন্দ ভণ্ডুল করে দেন না।

বাড়ির সবার মন খারাপ। শ্বশুরবাড়িব তো কথাই নেই। তারা ভাবছিল, হৈচৈ হবে কয়েকদিন, তারপর মেয়ে-জামাইকে হনিমুনে রওনা করে দেওয়া হবে। তা নয় হরিষে বিষাদ। চন্দ্রমল্লিকা বেশ ঘাবড়ে গেছে—ওর দুঃখটাই বেশী, কিন্তু বেচারা ভয় পাচ্ছে, লোকে ওর ঘাড়েই দোষ চাপাবে।

একঘণ্টা মল্লিকাদের বাড়িতে কাটিয়ে ওরা দুজনে আবার ফিরে এসেছিল। কমলেশের বাবা দুপুরে আবার হুকুমনামা জারি করেছিলেন। "খোকাকে অনেকক্ষণ ট্রেনের ধকল সইতে হবে। খেয়ে-দেয়ে চটপট ওকে একটু গড়িয়ে নিতে দাও।"

এই 'গড়িয়ে নেওয়ার' অর্থ কমলেশ বুঝতে পারে। বাবা চাইছেন, নববধূর সঙ্গে আকস্মিক বিচ্ছেদের আগে তার সঙ্গে একান্তে আরও একটু সময় কাটিয়ে নিক খোকা। এইটুকু সুযোগ অবশ্যই ওদের দুজনের প্রাপ্য, কারোর আপত্তিও নেই। কিন্তু চন্দ্রার ভীষণ লজ্জা লেগেছিল। সে ঘরে ঢুকতে রাজী হয়নি। প্রায় জোর করেই তাকে স্বামীর ঘরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। দবজাটা দিদি ভেজিয়ে দিলেও, মল্লিকা ভিতর থেকে বন্ধ করেনি।

চন্দ্রাকে মুহূর্তের মধ্যে কাছে টেনে নিয়েছিল কমলেশ। কিন্তু বেচারা ভয় পেয়ে সিঁটিয়ে গেছে। বলেছে, আমি অপয়া, তাই এমন হলো।"

অফিসের ওপর ভীষণ বিরক্তি ধরছিল কমলেশের। সে কোনোরকমে বলেছিল, "ফার্স্ট রাউণ্ডেই এমন বিচ্ছেদের জন্যে তৈরি ছিলাম না আমরা দুজনে। কিন্তু ব্যাপারটা অত সহজে ছাড়ছি না। কয়েক-ঘণ্টা পরেই অফিসের কারণটা বোঝা যাবে।"

ট্রেনের কামরায় কয়েক ঘণ্টা কেটে যাওয়ার পর চন্দনপুর ক্রমশই এগিয়ে আসছে। কর্মজীবনের কথা কমলেশেব এবার বেশী করে মনে পড়ছে। কয়েকদিন প্রজাপতির ষড়যন্ত্রে চন্দনপুরের কথা প্রায় ভুলেই যেতে বসেছিল কমলেশ।

ছোট ছোট পাহাড়ে সাজানো ছবির মতো শহর এই চন্দনপুর। ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষের এই অঞ্চলকে কেউ চিনতো না। এখানে থাকার মধ্যে তখন ছিল মিলিটারিদের মস্ত ঘাঁটি। মাইলখানেক জায়গা তারের বেড়া দিয়ে ঘিরে তার মধ্যে অজস্র গোপন জিনিসপত্তর রাখা হতো—যা নাকি যুদ্ধের জন্যে দরকার।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরেই সেখানে উঠেছে সুবিশাল ফার্টিলাইজার কারখানা—হিন্দুস্থান অ্যাগ্রো-কেমিক্যালসের প্রথম উদ্যোগ চন্দনপুর প্রোজেক্ট। স্বাধীনতার প্রথম দশকে এই চন্দনপুর ছিল সবার দর্শনীয়, সব থেকে স্মার্ট প্রধানমন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে রাজধানীর শক্তিমানরা, রাষ্ট্রীয় অতিথিদের নিয়ে প্রায়ই আসতেন এই চন্দনপুরে। চীনের চৌ এন লাই থেকে ইংলণ্ডেশ্বরী এলিজাবেথ পর্যন্ত কেউ বাদ যাননি। চন্দনপুর তাঁদের মুগ্ধ করেছিল।

কি সুন্দর নাম এই চন্দনপুর। কিন্তু এ-যুগে সরকারী ফিতের ফাঁসে স্থানীয় নামের সৌন্দর্য ও স্বাধীনতা রক্ষে করা যায় না। সংক্ষেপকরণের উদ্ভট উৎসাহে কোনো একজন ছন্দকানা নিষ্ঠাবান অফিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সরকারী ফাইলে লিখেছিলেন: সি-পি। চন্দনপুর প্রোজেক্ট সেই যে সি-পি হলো, আর মুক্তি পায়নি।

কারখানা যেখানে শেষ হয়েছে তার কিছু দূরেই ছিমছাম আধুনিক ডিজাইনের বিরাট লম্বা দোতলা বাড়ি নবাগতদের নজরে পড়ে। আড়াই দশকের বৃদ্ধ কারখানার সঙ্গে নতুন বাড়িটার কোনো মিলই নেই। সরকারী কোম্পানির অফিস বাড়ি সচরাচর এমন সুরুচিপূর্ণ হয় না। দূর থেকে দেখলে কোনো আধুনিক রঙ্গশালা বলে ভুল হতে পারে। কিন্তু এইটাই হিন্দুস্থান অ্যাগ্রো-কেমিক্যালস্ ওরফে এইচ-এ-সি গবেষণা বিভাগ।

গেটের কাছে একটা নাকচাপা দারোয়ান বন্দুক হাতে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছে। দারোয়ানকে পিছনে ফেলে লাল নুড়ি বিছানো রাস্তা ধরে সামনে এগিয়ে যেতে হবে। ল্যাবরেটরির প্রধান দরজার গোড়ায় গ্রানাইট পাথরের ওপর খোদাই করা কয়েকটি অক্ষর স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, কয়েক বছর আগে কোনো এক জুলাই প্রভাতে প্রধানমন্ত্রী এই গবেষণাগারের দ্বারোদঘাটন করেছিলেন এবং এই পবিত্র জ্ঞানমন্দিরকে জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করেছিলেন।

মূল দরজা পেরিয়ে আরও একটু এগিয়ে গেলেই রিসেপশন হল। সেখানকার দেওয়ালে তামার পাতে তৈরি এক অপরিচিত বিদেশীর অস্পষ্ট বিলিফ মূর্তি আগন্তুকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ফলকের তলায় ফরাসীতে কী একটা উক্তিও খোদাই করা রয়েছে, যার অর্থ: "সন্ধান করো, তাকে নিশ্চয় খুঁজে পাবে।" অনেকদিন আগে, অমর ফরাসী বৈজ্ঞানিক নিকোলাস লে ব্লাঙ্ক নাকি এই বিশ্বাস পোষণ করতেন।

লে ব্লাঙ্কের কালজয়ী ছোট্ট এই উক্তিটি দিগম্বর বনার্জি তাঁর অফিস ঘরের টেবিলে কাঁচের তলাতেও রেখে দিয়েছেন। যখনই কোনো সন্দেহ উপস্থিত হয়, হতাশার মেঘ মনের আকাশকে ছেয়ে ফেলবার উপক্রম করে, তখনই দিগম্বর বনার্জি লে ব্লাঙ্কের ছবির দিকে তাকিয়ে থাকেন। তিনি অকস্মাৎ জীবন্ত হয়ে উঠে ভাবশিষ্যকে স্মরণ করিয়ে দেন—সন্ধান করতে হবে, তবেই তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে।

এখন রাত আটটা। ল্যাবরেটরি বাড়িটা অন্ধকার থাকলেও, বনার্জি সায়েবের অফিস ঘরে চারটে টিউব লাইট জ্বলছে।

টেবিল ল্যাম্পের তলায় ঝুঁকে পড়ে একমনে কতকগুলো এক্স-রে রিপোর্ট দেখছেন দিগম্বর বনার্জি। এক্স-রে পাউডার ডিফ্র্যাকশন প্যাটার্ন সংক্রান্ত রিপোর্ট পড়তে পড়তে ছোট একটা নোট বুকে দিগম্বর বনার্জি লিখলেন, আগামী কাল সকালেই এক্স-রে ডিপার্টমেণ্টের বি এস আয়ারের সঙ্গে কথা বলতে হবে। অ্যামোনিয়াম নাইট্রেটের ছ'রকম অবস্থা সম্পর্কেই তিনি রিপোর্ট চান। তিন নম্বর ফেজ-এর স্ট্রাকচারে করোগেটেড লেয়ার দেখা যাচ্ছে না কেন?

নোট বইতে মন্তব্য লেখা হঠাৎ বন্ধ করে দিলেন দিগম্বর বনার্জি। আরও একটা দিন অযথা নষ্ট হয়ে যাবে। সময় সংক্ষেপের জন্যে দিগম্বর বনার্জি টেলিফোন রিসিভারটা তুলে নিলেন। তারপর আয়ারের বাড়ির নম্বর ডায়াল করলেন। অন্য যে-কোনো অফিসে রাত আটটার সময় ডিরেকটরের টেলিফোন পেলে অফিসাররা চিন্তিত হয়ে পড়তেন! কিন্তু চন্দনপুরের ব্যাপারটা সকলেরই গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে।

দিগম্বর বনার্জি বললেন, "আয়ার, তুমি কি ডিনার করছিলে? আই অ্যাম ভেরি সরি। তোমার ডিপার্টমেন্টের এক্স-রে ডাটাগুলো দেখতে দেখতে হঠাৎ মনে হলো, এক্স-রে ডিপার্টমেণ্টের ছেলেরা আজকাল কুলির মতো কাজ করছে, একেবারে মাথা ঘামাচ্ছে না। ইনফ্লুয়েন্স অফ স্ট্রাকচার অন বিহেভিয়ার

সম্পর্কে বেনহাম এবং বেট্রিকের যে-পেপারটা আমরা আনিয়েছি, তা ওদের একবার দেখতে বোলো। ডকুমেনটেশন ডিভিসনে ঐ পেপারটা দেড়মাস এসেছে। অথচ তোমার ডিপার্টমেন্টের কোনো ছেলে সেটা এখনও পর্যন্ত নেয়নি শুনলাম।" এরপর শুভরাত্রি জানিয়ে দিগম্বর বনার্জি টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন।

বনার্জি এবার তাঁর অ্যাসিসটেন্ট অধর সিন্‌হাকে ডাকলেন। "অধর গতকাল কমলেশের কলকাতার ঠিকানায় টেলিগ্রামটা ঠিক গিয়েছিল তো?"

"নিশ্চয় স্যার।" অধর এসব কাজে কখনও ভুল করে না।

"এক্সপ্রেস তো?" দিগম্বর বনার্জি জানতে চাইলেন।

"হ্যাঁ স্যার।"

"হাওড়া-চন্দনপুর এক্সপ্রেস তো এতক্ষণ এসে পড়া উচিত, তাই না?" দিগম্বর বনার্জি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে অধরকে জিজ্ঞেস করলেন।

"দেড়ঘণ্টা লেট আছে," অধর খবর দিলো।

বেশ বিরক্ত হলেন দিগম্বর। মনে মনে ভাবলেন, আমাদের দেশটাই লেটলতিফের দেশ—আমরা কাউকে সময়ের সঙ্গে তাল রেখে চলতে দেবো না। আমরা জন্মজন্মান্তর ধরে লক্ষ কোটি বছরের ওপর নজর রাখছি, সময়ের সীমাহীনতা সম্পর্কে ভারতবর্ষের বেদ উপনিষদ মহাভারত সর্বদা সোচ্চার, তাই তুচ্ছ মিনিট ঘণ্টা দিন অপব্যয় করতে এখানে কেউ লজ্জিত হয় না।

দিগম্বর বনার্জি আবার মণিবন্ধের ঘড়ির দিকে তাকালেন। তারপর নিজের সহকারীকে বাড়ি ফেরার অনুমতি দিয়ে বললেন, "অধর, তোমার তো যাবার সময় হলো। তুমি বরং কমলেশের কোয়ার্টারে একটু ঘুরে যাও—আমার ড্রাইভার তোমাকে নামিয়ে দেবে। ওখানে খবর দিয়ে এসো, ডকটর রায়চৌধুরী ইচ্ছে করলে আমার সঙ্গে আজকেই দেখা করতে পারেন।"

"আপনি বাড়ি ফিরবেন না?" অধর জিজ্ঞেস করে।

"তোমাকে নামিয়ে দিয়ে গাড়িটা ফিরে আসুক। তারপর দেখা যাবে।"

এই যে বিরাট বাড়িটা এবং এখানে যে কয়েক কোটি টাকার যন্ত্রপাতি এবং শ'চারেক লোক আছেন তাঁদের হর্তাকর্তাবিধাতা বাহান্ন বছরের নোয়েল দিগম্বর বনার্জি। তিন বছর আগে বনার্জি যখন এইচ-এ-সির ডিরেকটর হলেন, তখন অনেকে আশা করেছিল অন্য ডিরেকটরদের মতো তিনিও কোম্পানির দিল্লী অফিসে গিয়ে বসবেন।

কিন্তু দিগম্বর বনার্জি অসাধ্য সাধন করেছিলেন। ম্যানেজিং ডিরেকটরকে

সোজাসুজি জানিয়েছিলেন, "ডিরেকটর করছেন করুন। মিটিংয়ে ডাকলে আসবো। কিন্তু রিসার্চ ডিরেকটর মাইনাস হিজ ল্যাবরেটরি মানে হয় না। আমাকে চন্দনপুরেই থেকে যেতে হবে।" ম্যানেজিং ডিরেকটর প্রয়োজনীয় অনুমতি না-দিয়ে পারেননি।

চন্দনপুরের সবাই জানতো, হিন্দুস্থান অ্যাগ্রো-কেমিক্যালস্ ল্যাবরেটরি ছেড়ে এন ডি বনার্জি দিল্লী তো দূরের কথা, স্বর্গে গিয়েও শান্তি পাবেন না।

এন ডি বনার্জি কাঁচের তলায় লেখা সেই ছোট্ট কোটেশনটা আবার দেখলেন: সন্ধান করো তাকে নিশ্চয় খুঁজে পাবে।

'কোথায় সন্ধান করবো? কাকেই বা খুঁজে পাবো?' দিগম্বর নিজেকেই জিজ্ঞেস করলেন।

নিজের চেয়ারে বসে দক্ষিণের বিশাল জানালা দিয়ে দিগম্বর বনার্জি এবাব বাইরে তাকালেন। গত কুড়ি বছরে রাসায়নিক সারবিজ্ঞানে অবিশ্বাস্য অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে চন্দনপুর কারখানা তার গুরুত্ব হারিয়েছে—সে এখন বিগতযৌবনা। বুড়ী ফ্যাকটরিকে এই রাতে কিন্তু বেশ সুন্দরী দেখাচ্ছে। কে বলবে, হেড অফিসে বিশেষজ্ঞ কমিটির সভ্যরা ইতিমধ্যেই ঠিক করে ফেলেছেন, নানা রোগে জীর্ণ এই কারখানার পিছনে আব টাকা ঢেলে লাভ নেই। চন্দনপুর প্রোজেক্টেব দিন শেষ হয়েছে।

অথচ এই চন্দনপুব কারখানা থেকেই একদিন এইচ-এ-সির সূত্রপাত হয়েছিল। তখন ভারতবর্ষে চাষবাস নিয়ে কর্তাব্যক্তিরা মাথা ঘামাতেন না। চাষ করবে গেঁয়ো ভূতরা; গোরুর গাড়ি কিংবা লরিতে বোঝাই হয়ে চাষেব ফসল কর্তাদের ভোগের জন্যে শহরে চলে আসবে। মূর্খ চাষা গ্রামে পচবে এবং বাবুরা শহরে ফুর্তি করবেন, এই তো ছিল সামাজিক প্রত্যাশা।

দিগম্বর বনার্জির মনে পড়লো, তিনি নিজেও এই শহুরে বাবুদের দলে ছিলেন। কোনোদিন গ্রামে যাননি, যাবার উৎসাহ বোধ করেননি। চন্দনপুর সার কারখানা বসাবার পিছনে যত না ছিল কৃষিচিন্তা, তার থেকে বেশী ছিল যুদ্ধ থেকে সদ্য ছাঁটাই সৈন্যদের কাজে লাগানোর গরজ। বেকার সৈন্যদের সাকার করতে গিয়ে যদি দেশে কিছু সার তৈরি হয়, মন্দ কী?

দিগম্বর বনার্জি ভাবলেন, ভাগ্যে চন্দনপুর তৈরি হয়েছিল। পাকেচক্রে একদিন শহুরে লোকদের ভাতেও টান পড়লো। বোঝা গেল, এবার যদি দুর্ভিক্ষ আসে তাহলে শুধু গাঁয়ের লোক নয়, শহরের বাবুদেরও প্রাণ নিরাপদ থাকবে না। তার ওপর বিদেশীদের অপমান। যারা নিজেদের খাবার

উৎপাদন করতে পারে না, যাদের বন্দরে ভিক্ষের গম পৌঁছে দেবার জন্যে দুনিয়ার অর্ধেক জাহাজকে গলদঘর্ম হতে হয় তাদের মুখে বড় বড় কথা কোন দেশ সহ্য করবে? স্বাধীন ভারতবর্ষ বক্তৃতায় চাম্পিয়ন হয়েও বিশ্বজনের অবজ্ঞা ও কৌতুকের পাত্র হয়ে উঠলো। দেশের কর্তারা অবশেষে অপমানিত বোধ করলেন!

দিগম্বর বনার্জি জানেন, অপমানে ফল হয়েছে। দিবানিদ্রা থেকে উঠে, চোখ মুছতে মুছতে শহুরে বাবুরা জানতে চাইলেন, চাষীরা কেন চাষ করছে না? এত জমি, এত মানুষ, এত সাধ্যসাধনা, তবে বসুমতী কেন কৃপণা? কেন ফসল নেই?

দুনিয়ার লোকরা অনেকদিন আগেই যা জানতো, ভারতবর্ষের বাবুরা অবশেষে তার খবর পেলেন। এ-দেশের জমি থেকে শত শত বছর ধরে নির্মমভাবে আমরা নিয়েই চলেছি—কিন্তু কিছুই ফিরিয়ে দিই না। জননী ধরিত্রীরও ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা আছে। আকাশের বৃষ্টি অনেক সময় তেষ্টা মেটায়, কিন্তু খিদে মেটাবার সার কোথায়? বাঁচার মতো ফসল পেতে হলে, অনেক সার চাই।

দিগম্বর বনার্জি তখন সামান্য একজন বিজ্ঞানী। অন্তত দশবার দিল্লীকে লিখেছেন, জমি যা ফসল হিসেবে দিচ্ছে, তা আবার ফিরিয়ে দিতে হবে। এত খাবার প্রাকৃতিক পথে পাবার উপায় নেই—তাই চাই রাসায়নিক সার। সমগ্র পৃথিবীতে এই সার নিয়ে যে কর্মকাণ্ড চলেছে, ভারতবর্ষ তার থেকে পিছিয়ে থাকলে ভুল করবে।

দিগম্বর বনার্জির মনে আছে, দিল্লী দরবারে তন্দ্রা ছোটার সঙ্গে সঙ্গেই বাড়তে লাগলো এই হিন্দুস্থান অ্যাগ্রো-কেমিক্যালস্। কৃষি রসায়নের সর্বস্তরে প্রবেশ করবে এই কোম্পানি। চন্দনপুর থেকে যার শুরু তা ক্রমশ ছড়িয়ে পড়বে ভারতবর্ষের সর্বপ্রান্তে। দিগম্বর বনার্জির ঘরে-টাঙানো ভারতবর্ষের মানচিত্রে লাল এবং সবুজ রঙের অনেকগুলো পিন পোঁতা রয়েছে, উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিমের নানা অঞ্চলে। লাল মানে যেসব জায়গায় নতুন কারখানার প্রস্তাব রয়েছে; আর সবুজ মানে যেখানে কারখানা চালু হয়ে গিয়েছে।

কাজকর্মের সুবিধার জন্যে এইচ-এ-সির হেড অফিস দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়েছে। কিন্তু গবেষণার কাজ এই চন্দনপুরেই চলছে। দিগম্বর বনার্জির ধারণা, বড় বড় শহরে, বিশেষ করে দিল্লীতে জ্ঞানের সাধনা চলে না। সভ্যতার নানা প্রলোভন ওখানে নিরীহ মানুষকে বিপথে নিয়ে যাবার জন্যে অহরহ

হাতছানি দিচ্ছে। সর্বক্ষণ চোখের সামনে অনেকগুলো জোচ্চোর ব্যবসাদার এবং ততোধিক অপদার্থ জননেতাদের মোগলাই সুখে থাকতে দেখলে বিজ্ঞান সাধকের তপোভঙ্গ হতে পারে।

আপন জীবনের গতিপথে তাকিয়ে দিগম্বর বনার্জি এই মুহূর্তে অবাক হয়ে যাচ্ছেন। কোথায় ছিলেন, কেমন করে পাকেচক্রে এই এইচ-এ-সির সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেন।

দিগম্বর বনার্জি তেমন সামাজিক নন। রাগও আছে তাঁর প্রচণ্ড। কিন্তু রাগতে ইচ্ছে করে না আজকাল। কারণ এইচ-এ-সির কর্মকর্তারা তাঁকে বেঁধে রাখেননি। দিগম্বর বলেছেন, রিসার্চই চাকাই পৃথিবীর কেমিক্যাল শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আজ যা আধুনিক, আগামী কালই তা পচা পুরানো হয়ে যাবে। সুতরাং এগিয়ে যাবার এই তীব্র প্রতিযোগিতায় এইচ-এ-সিকে অংশ নিতে হবে। কোম্পানির কর্তারা তাঁর সঙ্গে একমত। বনার্জিকে তাঁরা এমন স্বাধীনতা দিয়েছেন যা আজকের এই সরকারীযুগে অবিশ্বাস্য। গবেষণার জন্য তিনি যা চাইবেন তা দিতে প্রস্তুত আছেন বোর্ডের মেম্বাররা। এর ফলেই বিপদে পড়েছেন দিগম্বর বনার্জি। এঁদের বিশ্বাসের যোগ্য হয়ে দেশের প্রত্যাশা মেটাতে পারবেন কিনা ভয় হয় তাঁর।

কত স্বপ্ন দেখেন দিগম্বর বনার্জি। এমন একদিন আসবে যেদিন রাসায়নিক সারের আন্তর্জাতিক মানচিত্রে ভারতবর্ষের নাম জ্বলজ্বল করবে। ভারতবর্ষের কোটি কোটি ক্ষুধার্ত মানুষকে খাবার যোগাবার জন্য যদি লক্ষ লক্ষ টন ফসফেট, অ্যামোনিয়া এবং পটাশ দরকার হয় তাহলে রসায়ন শিল্পে আমরা কেন পরনির্ভর হয়ে থাকবো ?

দিগম্বর বনার্জির মনে হতাশা ঢোকাবার চেষ্টা করেছেন কেউ কেউ। তাঁরা বলেন, ইণ্ডিয়াতে নাকি কিছু সম্ভব নয়। এখানে কেউ নাকি চেষ্টা করেও সফল হতে পারে না। সুতরাং বনার্জির কপালেও ব্যর্থতা লেখা আছে।

কিন্তু দিগম্বর বনার্জি ইতিহাসের খোঁজখবর রাখেন। একজন মানুষের জীবন ও সাধনা তাঁকে আশা ভরসা দেয়। তাঁর নাম নিকোলাস লে ব্লাঙ্ক। ১৮০৬ সালে কপর্দকশূন্য হতাশ লে ব্লাঙ্ক অন্য কোনো পথ খুঁজে না-পেয়ে যখন আত্মহত্যা করলেন, তখন কি তিনি জানতেন পৃথিবী একদিন তাঁকে আধুনিক রসায়ন শিল্পের পিতা বলে মেনে নেবে ? ফ্রান্সের এই ভদ্রলোক চেয়েছিলেন, কম খরচে এমন সব কেমিক্যাল তৈরি করবেন যা মানুষের প্রয়োজনে লাগে। পৌনে দু'শ বছর আগে লে ব্লাঙ্ক যা চেয়েছিলেন, চন্দনপুরের দিগম্বর বনার্জিও

তাই চাইছেন : আরও কম খরচে সার তৈরির পদ্ধতি খুঁজে বেড়াচ্ছেন তিনি।

দিগম্বর বনার্জির মনে পড়লো, লে ব্লাঙ্ক প্রথম আবিষ্কারের অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন একটা প্রতিযোগিতা থেকে। সস্তায় অ্যালকেলি তৈরির উপায় আবিষ্কারের জন্যে ফরাসী বিজ্ঞান পরিষদ বারো হাজার ফ্রাংক পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন। মাত্র ১৭৯০ সালের কথা, অথচ পৃথিবীর কেউ তখনও অ্যালকেলি তৈরির সহজ উপায় জানতো না। লে ব্লাঙ্ক সোডিয়াম ক্লোরাইডের সঙ্গে সালফিউরিক অ্যাসিড মিশিয়ে তৈরি করলেন সোডিয়াম সালফেট। তারপর সোডিয়াম সালফেট-এর চাঙড়কে চুনের মধ্যে রেখে কয়লার আগুনে রোস্ট করলেন। পাওয়া গেল কালো রঙের ছাই, যাতে আছে সোডিয়াম কার্বনেট এবং ক্যালসিয়াম সালফাইড। এবার সোডিয়াম কার্বনেটকে জলে গুলে ফেললেন লে ব্লাঙ্ক এবং তারপর দানা বেঁধে পৃথিবীকে উপহার দিলেন উনিশ শতাব্দীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং যুগান্তকারী কেমিক্যাল প্রসেস।

কিন্তু এই রাসায়নিক পদ্ধতি আবিষ্কাবের পবিবর্তে একটুও সুখের মুখ দেখেননি লে ব্লাঙ্ক। প্রাইজের টাকা তাঁর হাতে আসেনি। ফরাসী বিপ্লবের সময় তাঁর কারখানা তছনছ এবং বাজেয়াপ্ত হলো। নেপোলিয়ন শেষ পর্যন্ত দয়া করে কারখানা ফিবিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু কারখানার দরজা খোলার মতো কাঁচা টাকা লে ব্লাঙ্ক যোগাড় করতে পারেনি।

যাদের জন্যে লে ব্লাঙ্ক এত বড় আবিষ্কার করলেন সেই ফরাসীরা তাকিয়েও দেখলো না : কিন্তু ধূর্ত ইংবেজ ব্যবসাদাররা লে ব্লাঙ্কেব রাসায়নিক পদ্ধতি নিজের দেশে নিয়ে গিয়ে সাবান তৈরিতে কাজে লাগালো।

এসব খবর আজকালকার ছেলে-ছোকরারা জানে না। দিগম্বর বনার্জি তাই ল্যাবরেটরির ছেলেদের বলেন, "তোমরা ইতিহাসের খবরাখবর রাখবে—শুধু দৈনন্দিন রিসার্চ এবং রিপোর্টে ডুবে থাকলে বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি প্রসারিত হয় না।"

তরুণ বিজ্ঞানীরা কথাটা শোনে, কিন্তু কাজে লাগায় না। আরও কিছু টাকা পেলে দিগম্বব বনার্জি তাঁব গবেষণাগারে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কেমিষ্ট্রির ঐতিহাসিক খবরাখবর যোগাড় করবার জন্য একজন সহকারী রাখবেন। প্রিয় শিষ্য নগেন বসুকে এসব কথা দিগম্বর বনার্জি একদিন বলেছিলেন। "নগেন, আজকের যুগে গজদন্তমিনারে বাস করলে বৈজ্ঞানিক গবেষণা চলবে না। বৈজ্ঞানিকদের ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী থাকবে; তাদের জানতে হবে দেশের মানুষ কোন পথ থেকে কোথায় যেতে চাইছে; তবেই তো আমরা দেশের

আশা আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তব করে তুলতে পারবো।"

নগেন বলতো, "বৈজ্ঞানিক গবেষণাও এক ধরনের ব্রিসে বেস। তাই না?"

দিগম্বর বনার্জি বলেছিলেন, "নিশ্চয়। না হলে, সাবান কারখানায় অ্যালকেলি তৈরির যে-বিদ্যে লাগানো হলো, তা এই ক'বছরে কেমন করে পৃথিবীর রূপ পাল্টে দিলো? কয়লা, নুন, চুন, সালফার, বাতাস, জল, পেট্রল, এর মধ্যে থেকে প্রকৃতির সযত্নে লুকনো রহস্য ছিনিয়ে এনে এখন তৈরি হচ্ছে লক্ষ লক্ষ জিনিস—রঙ, সাবান, খাবার, ওষুধ, সার, প্লাস্টিক, জামা-কাপড় আরও কত কি।"

নগেন বসু মন দিয়ে শুনতো। ছোকরার মধ্যে সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু দিগম্বর বনার্জি তার কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত আঘাত পেয়েছেন। এমন আঘাত যার জন্যে তিনি মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। নগেনকে তিনি বিশ্বাস করেছিলেন।

গাড়িটা বোধহয় ফিরে এসেছে। ড্রাইভারকে আর আটকে রাখা ঠিক হবে না। দিগম্বর বনার্জি হাতের ব্যাগটা নিয়ে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন।

লম্বা করিডর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দু পাশের বন্ধ কাচের দরজাগুলোর দিকে তাকাচ্ছেন ডকটর নোয়েল দিগম্বর বনার্জি। ফিজিক্যাল রিসার্চ ডিপার্টমেন্টে একটা ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপ দু দিন হলো কাজ করছে না। রাওকে তাড়াতাড়ি সারাবার ব্যবস্থা করতে বলেছিলেন দিগম্বর। রাও পরের দিন তাঁকে একটা লম্বা নোট পাঠিয়েছিল। নোটটা পড়ে দিগম্বর বনার্জি একবার ভেবেছিলেন ওকে ডেকে পাঠাবেন। তারপর কী ভেবে, কাগজটা হাতে নিয়ে নিজেই ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপি রুমে হাজির হয়েছিলেন। রাও তখন স্পেকট্রোফটোমেট্রির জন্যে নতুন নিযুক্ত অফিসার খোসলার সঙ্গে কথা বলছিল।

দিগম্বর বনার্জিকে দেখে রাও উঠে দাঁড়িয়েছিল। "উঠতে হবে না," এই বলে তিনি পাশের একটা টুল টেনে নিলেন। কাগজটা রাও-এর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, "পাশের ঘরেই যখন রয়েছি, তখন চিঠি না লিখে নিজে আমার কাছে চলে এলে না কেন? মেশিন যখন খারাপ হয়েছে, তখন আগে মেশিন চালু করো, তারপর অন্য সব ফর্মালিটি।"

রাও বললে, "আমি ব্যাপারটা অন রেকর্ড রাখতে চেয়েছিলাম। হাজার হোক সরকারী সম্পত্তি।"

বনার্জি বলেছিলেন, "রাও, আমাদের ডিপার্টমেন্টে তুমি নতুন বদলি হয়ে এসেছো, তাই তোমার গোটা কয়েক কথা জেনে রাখা দরকার। গভর্নমেন্টের অনেক গবেষণাগারে চিঠি লেখালেখি ছাড়া আর কিছুই হয় না। এইচ-এ-সির এই যে বাড়ি দেখছো এখানে বৈজ্ঞানিকদের রাখা হয় গবেষণার জন্যে—চিঠি লেখার জন্যে নয়। আমি সবাইকে বলেছি, তোমাকেও মনে করিয়ে দিচ্ছি—তোমার তদারকিতে যেসব মেশিন রয়েছে সেগুলোকে সরকারের সম্পত্তি ভাববার কোনো প্রয়োজন নেই। সমস্ত যন্ত্রপাতি তোমার নিজের মনে করবে এবং সেইভাবে আদরযত্ন করবে। তার জন্যে যদি কোনো হাঙ্গামা হয়, অডিট যদি কোনো কথা তোলে, সঙ্গে সঙ্গে বলে দেবে রিসার্চ ডিরেকটর দিগম্বর বনার্জিকে ধরুন গে যান, তাঁর হুকুম মতো কাজ হয়েছে।"

রাও একটু অবাক হয়ে গিয়েছিল। বনার্জি বলেছিলেন, "আমি চাই তোমরা এখানে নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে বিজ্ঞানের কাজ করে যাও—অকাজ যতটা আছে আমি সামলাবো।"

দিগম্বর বনার্জির এইমাত্র মনে হলো রাওকে বলবেন, "প্রত্যেক যন্ত্র একটু-আধটু মেরামতের কাজ ছেলেদের শিখতে উৎসাহ দিতে। অনেক আধুনিক মেশিন আছে যা মডার্ন মহিলাদের চেয়েও পলকা—কিন্তু ভয় পেয়ে কাজকর্ম বন্ধ করে বসে থাকলে চলবে না। বিদেশী বড় বড় কোম্পানিরা ভারতীয়দের এই দুর্বলতার কথা জানে—তাই তারা মেশিন বিক্রি করে, কিন্তু মেরামতি এবং স্পেয়ার পার্টসের দড়ি নাকে পরিয়ে আমাদের ওঠায় বসায়।"

দিগম্বর বনার্জি সেবার রাশিয়া গিয়েছিলেন। দেখলেন প্রত্যেক ল্যাবে বৈজ্ঞানিকরা নিজেদের যন্ত্রগুলোকে বালিকা-বান্ধবীর মতো আদর করে। রুশরা ঠেকে শিখেছে—ওরা কথায় কথায় ইংলণ্ড, আমেরিকা, জার্মানি থেকে মেশিনের সেল্সম্যানদের ডেকে পাঠাতে পারে না। তাই হাত-পা-গুটিয়ে বসে না থেকে ওরা নিজেরাই যন্ত্রের প্রাথমিক তদারকি এবং মেরামতির কাজগুলো শিখেছে। ব্যাপারটা খুব ভাল লেগেছিল দিগম্বর বনার্জির এবং অভ্যাসটা চন্দনপুরে চালু করবেন ভাবছেন।

করিডর ধরে সামনে এগিয়ে চললেন দিগম্বর বনার্জি। মাঝে-মাঝে তাঁর মাথায় এই জনহীন বিরাট বাড়িটা একা একা ঘুরে দেখবার নেশা চেপে বসে। সাত বছর আগে চন্দনপুর প্রোজেক্টের ছোট কেমিক্যাল অ্যানালিসিস রুমে বসে যখন তিনি এই গবেষণা বিভাগের স্বপ্ন দেখতেন তখন অনেকেই তাঁকে পাগল ভাবতো।

দিগম্বর বনার্জি তখন থেকেই বলছেন, সামনে এমন যুগ আসছে যখন কেমিক্যাল সারের জন্য ভারতবর্ষের চাষীরা কাড়াকাড়ি শুরু করবে। সামান্য এই চন্দনপুরের সাধ্য কী সেই দাবি মেটায়। তখন লক্ষ লক্ষ টন সারের জন্য অন্তত দেড়শ'-দু'শ নাইট্রোজেন তৈরির কারখানা প্রয়োজন হবে। কিন্তু বিদেশীদের কাছে ধার করে, ভিক্ষে মেগে এইসব কারখানা বসানো সম্ভব হবে না। নিজেদের পায়ে দাঁড়াবার মতো কারিগরী বিদ্যা আমাদের আয়ত্ত করতেই হবে।

দিগম্বর বনার্জির কথায় অনেকে তখন হেসেছিলেন। তাঁরা বলতেন, ফার্টিলাইজার টেকনলজি ছেলের হাতের মোয়া নয়। ইচ্ছে করলেই নিজের চেষ্টায় অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, অ্যামোনিয়াম বাইকার্বনেট বা ইউরিয়া তৈরি করা যায় না। গোটা পৃথিবীতে মাত্র আট দশটা কোম্পানি আছে যারা কোটি কোটি ডলার এবং পাউণ্ড গবেষণায় ঢেলে এই বিদ্যা আয়ত্ত করেছে।

দিগম্বর বনার্জি তখন সবে বিদেশ থেকে ফিরে এসেছেন। তিনি বলতেন, "বিলেত আমেরিকা যদি পারে, তবে আমরাও পারবো না কেন? গবেষণার গোড়াপত্তন এখনই হয়ে যাওয়া প্রয়োজন। আর দেরি চলবে না।"

চন্দনপুর প্রোজেক্টের আই-সি-এস কর্মকর্তা মিস্টার আচার্য তখন মন্তব্য করেছিলেন, "বনার্জি, তুমি যেসব কথা বলছো তা এদেশের কোনো কারখানায় সম্ভব নয়। গবেষণা যদি করতেই হয় তাহলে গভরমেণ্টকে লিখি, কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে সার সংক্রান্ত গবেষণাকেন্দ্র খুলতে!"

দিগম্বর বনার্জি বলেছিলেন, "ইউনিভার্সিটির মাস্টারমশায়রা কোনোদিনই সার তৈরি করতে পারবেন না। বাস্তবের সঙ্গে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সম্পর্ক বড় কম। দেশের সমস্যা এবং সুখ-দুঃখের কোনো খবরই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছয় না। তাঁরা অন্য এক জগতে পড়ে রয়েছেন। আমি চাই, এই চন্দনপুর প্রোজেক্টের সঙ্গেই গবেষণা শুরু হোক, যে-কাজ চন্দনপুর কারখানার সঙ্গেই তাল রেখে চলবে।"

দিগম্বর বনার্জির কথা তখনকার কর্তাদের মনঃপূত হয়নি। তাঁরা ভেবেছেন লোকটা পাগল। বামন হয়ে চাঁদ ধরতে চায় বনার্জি। বাঙালে গোঁ নিয়ে ডুপণ্ট, কেমিকো, আই সি আই, মণ্টিকাটিনির মতো বিশ্বজোড়া প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পাল্লা দেবার লোভ। এই চন্দনপুরের জেনারেল ম্যানেজারই বলেছিলেন, "বনার্জি, একটা জিনিস ভুলো না, এই সব কোম্পানি বছরে যত টাকা গবেষণায় খরচ করে আমাদের কোম্পানির মোট আয়ও তার শতকরা এক ভাগ নয়।"

দিগম্বর বনার্জি জানেন, এ-রকম কথা শুনেই তাঁকে হাতগুটিয়ে বসে থাকতে হতো, যদি না ইতিমধ্যে কিছু অঘটন ঘটতো। সেসব ঘটনা ঘটেছে বলেই আজ তিনি এই রিসার্চ ল্যাবরেটরিতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন যেখানে শুধু রসায়ন নয়—ফিজিক্স, এগ্রনমি, বোটানি, জিওলজি, ইঞ্জিনীয়ারিং ইত্যাদি নানা বিষয়ে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে।

ল্যাবরেটরি ভবনের বাইরে এসে দাঁড়ালেন দিগম্বর বনার্জি। মনটা তাঁর মোটেই ভাল নয়। নগেন বসুর খবরটা পাওয়া পর্যন্ত তিনি বেশ বিব্রত হয়ে পড়েছেন।

ট্রেন থেকে নেমে কমলেশ সোজা নিজের কোয়ার্টারে চলে এসেছিল। সেখানে দিগম্বর বনার্জির বার্তা তার জন্যে অপেক্ষা করছিল।

হাত মুখ ধুয়ে রিসার্চ ডিরেকটরের বাংলোর দিকে যেতে যেতে কমলেশের মন অভিমানে ভরে উঠলো। বিয়ের পর আচমকা এইভাবে তাকে ডেকে আনাটা কিছুতেই সে বরদাস্ত করতে পারছে না। বাবা অবশ্য কমলেশকে শান্ত করবার চেষ্টা করেছিলেন। সমস্ত জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বলেছিলেন, "ব্যাটাছেলের কাছে চাকরিটা বড় কথা। চাকরি না থাকলে সংসারের সাধ আহ্লাদ নষ্ট হয়ে যায়। দুনিয়ার আর সবাই তো তোমার কাছ থেকে নেবার তালে রয়েছে—সবার সঙ্গেই তো দেবার সম্পর্ক, এই অফিসটুকু ছাড়া। সুতরাং সেখানে একটু-আধটু অসুবিধে হলেও হাসিমুখে মেনে নিতে হবে।"

কিন্তু বাবা যে-যুগে চাকরি করতেন তারপর দিনকাল অনেক পাল্টেছে। মার্চেন্ট অফিসেও সেই ডিকটেটরি যুগ এখন আর নেই। তাছাড়া কমলেশ সরকারী সংস্থায় কাজ করে। সেখানে প্রত্যেক মানুষের কয়েকটা আইনসঙ্গত অধিকার আছে।

সুতপাদি ভোরবেলাতেই টেলিফোনে বুদ্ধি দিয়েছিলেন, "সিক রিপোর্ট করো। বাৎসরিক ছুটিতে এসেও লোক অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। ডাক্তারের সার্টিফিকেট থাকলে, দিগম্বর বনার্জি টিকি পর্যন্ত ছুঁতে পারবে না।"

টেলিগ্রামে অন্য কারুর নাম থাকলে কমলেশ কিছুতেই ফিরে যেত না। কিন্তু দিগম্বর বনার্জির সঙ্গে তার অন্য সম্পর্ক। চন্দনপুর ল্যাবের ছোকরা

বৈজ্ঞানিকরা কেউ তো দিগম্বর বনার্জিকে ঠিক অফিসের বড়কর্তা হিসেবে দেখে না। তিনি সত্যিই তাদের গুরু। আজকের যুগে অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্যি। রিসার্চ ল্যাবে যে সাড়ে-তিনশ' বৈজ্ঞানিক কাজ করছে তাদের প্রত্যেকের গবেষণার খুঁটিনাটি খবর জানেন দিগম্বর বনার্জি। কে কী কাজ করছে, গবেষণা কতখানি এগিয়েছে, তা ফাইল না দেখেই বলে দিতে পারেন তিনি। অফিসের ভদ্রতা রক্ষে করে 'আপনি' বলার নিয়ম মানেন না দিগম্বর বনার্জি। প্রায় সবাইকে 'তুমি' বলে ডাকেন, দুই একজনকে 'তুই' বলতেও দ্বিধা করেন না।

সব দিকে দিগম্বর বনার্জির তীক্ষ্ণ নজর। কাউকে বলেন, "অজয়, তোমার ভুঁড়ি সামলাও। তোমার ডেট অফ বার্থ তো অমুক সালের অমুক তারিখ। এর মধ্যে এত মোটা হলে কাজ করতে পারবে না।"

কাউকে বলেন, "চিন্তাহরণ, মুখটুখ বেঁকিয়ে অতশত কী ভাবছো? কবোসন সম্বন্ধে গবেষণা করতে গিয়ে নিজেকে ক্ষইয়ে ফেলো না। মনের মধ্যে উত্তেজনা থাকলে বড় আবিষ্কার করা যায় না। পৃথিবীর বিখ্যাত বিখ্যাত আবিষ্কারের ইতিহাস দেখ, হঠাৎ হাল্কা এবং সহজভাবেই প্রথম মতলব এসে গিয়েছে। আর্কিমিডিস তখন বাথ টবে বসেছিলেন, স্যার আইজাক নিউটন আপেল গাছের তলায়।"

চিন্তাহরণ ফিক করে হেসে ফেলেছিল। দিগম্বর বনার্জি বললেন, "হাঙ্গেরিয়ান বায়োকেমিস্ট আলবার্ট সেণ্ট জর্জির সঙ্গে একবার আমার আলাপ হয়েছিল। উনি বললেন, বৈজ্ঞানিকদের আসরে যেতে এক একসময় আমার লজ্জা হয়—সভা এবং সেমিনারে তাঁদের চিন্তাশীল গম্ভীর মুখগুলো দেখলে নিজের সম্বন্ধে ধারণা খারাপ হয়ে যায়। মনে হয় ওঁরা কত জানেন, কত ওঁদের ভাবনা। বিশ্বাসই হতে চায় না যে এঁরা এখনও নোবেল পুরস্কার পাননি। অথচ আমি পেয়ে গিয়েছি।"

কমলেশ রায়চৌধুরীকে দিগম্বর বনার্জিই এই চন্দনপুরে এনেছিলেন। আই আই টিতে ডক্টরেটের জন্যে কমলেশ যে থীসিস জমা দিয়েছিল তার একজন পরীক্ষক ছিলেন বনার্জি। ক্যাটালিস্ট তৈরির কয়েকটা সমস্যা নিয়েই ছিল কমলেশের গবেষণাপত্র। মৌখিক পরীক্ষায় কমলেশকে প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে নানা প্রশ্নে জর্জরিত করেছিলেন দিগম্বর বনার্জি। প্রশ্ন করবার ক্ষমতাও রাখেন ভদ্রলোক। ক্যাটালিস্টের সব রহস্য ভদ্রলোক যেন জেনে বসে আছেন। তর্কযুদ্ধে সন্তুষ্ট হয়ে দিগম্বর বনার্জি অবশেষে কমলেশকে ছুটি দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই রাত্রেই আই আই টি গেস্ট হাউস থেকে কমলেশের

হোস্টেলে দিগম্বর বনার্জি টেলিফোনে কথা বলেছিলেন।

পাস করবার সুখবরটা দিয়ে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন দিগম্বর। তারপর প্রশ্ন করেছিলেন, "নামের পাশে এবার না হয় ডকটর কথাটা লিখবেন। তারপর কী হবে?"

কমলেশ তখন বিদেশ যাবার স্বপ্ন দেখছিল। বললে, "ভাবছি বিদেশের কোনো কেমিক্যাল কারখানায় কিছুদিন অভিজ্ঞতা নিয়ে আসি।"

হা-হা করে হেসে উঠেছিলেন দিগম্বর বনার্জি। তারপর নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলেছিলেন, "বিদেশের কারখানায় আপনাকে কাজ শেখাবে? সায়েবরা বাইরের লোককে গুপ্তবিদ্যা দিয়ে দেবে? আপনি স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করছেন মিস্টার রায়চৌধুরী। তিন বছর গাধার খাটুনি খাটবার পরে আবিষ্কার করবেন, ওরা আপনাকে ওদের জ্ঞানের সদর ঘরেও ঢুকতে দেয়নি। অবশ্য আপনার মুখ বন্ধ করবার মতো মাইনে ওরা দেবে।"

কমলেশ বেশ চিন্তিত হয়ে দিগম্বর বনার্জির সঙ্গে দেখা করার অনুমতি চেয়েছিল। আই আই টি গেস্ট হাউসের দু নম্বর ঘরে দিগম্বর বনার্জিকে বেশ খুঁটিয়ে দেখেছিল কমলেশ। সে কয়েক বছর আগেকার কথা, কিন্তু বেশ মনে আছে কমলেশের।

দিগম্বর বনার্জির চোখে তখনও মোটা পাওয়ারের চশমা ছিল। তাঁর চোখ দুটোতে অদৃশ্য চুম্বকের আকর্ষণ। অথচ দিগম্বর বনার্জি কারও চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলেন না। সব সময় অন্যদিকে তাকিয়ে আছেন। সাজগোজে বেশ ফর্মাল মানুষ। ইভনিং ড্রেস পরে ডিনারের জন্যে তৈরি হয়ে নিয়েছেন। কালো আবলুস কাঠের মতো রঙ। নাকটা টিকালো। কথা বলবার সময় মাঝে-মাঝে নিচের ঠোঁট উল্টে দেন।

দিগম্বর বনার্জি বললেন, "আপনার কেরিয়ার ভাল। সুতরাং ব্রিটিশ কেমিক্যালসের একটা স্কলারশিপ অবশ্যই পেয়ে যেতে পারেন। কিন্তু একটা কথা জোর করেই বলতে পারি, ইংলণ্ড, জার্মানি, ফ্রান্স, ইটালি, জাপান, আমেরিকা, কানাডার কোনো কেমিক্যাল কোম্পানি আপনাকে ভিতরের ব্যাপারটা শিখতে দেবে না। আমাদের দেশে যে ঘোমটা ও বোরখা চালু ছিল তা এখন পশ্চিমের বড় বড় কোম্পানিগুলো পরছে! তাদের সর্বদা ভয়, গুপ্তবিদ্যা বুঝি জানাজানি হয়ে গেল। তাহলে ওদের মোটা রোজগার বন্ধ হয়ে যাবে। এক পা এগোলে, ওরা একশ' পেটেন্টের জন্যে অ্যাপ্লিকেশন করে। তারপর আবার এগোয়।"

কমলেশ ওঁর মুখের দিকে নীরবে তাকিয়েছিল। দিগম্বর বনার্জি বলেছিলেন, "অথচ সবচেয়ে মজার ব্যাপার কি জানেন ? লে ব্লাঙ্ক—যিনি আমাদের এই আধুনিক রসায়ন শিল্পের জন্মদাতা—তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের ফর্মুলা ফরাসী বিপ্লবীরা মানুষের মঙ্গলের জন্যে সবাইকে বিনা মূল্যে জানিয়ে দিয়েছিল। তারা পেটেন্টে বিশ্বাস করতো না। অ্যালকেলি তৈরির সেই ফর্মুলা নিয়েই তো ইংলণ্ড অত জাঁকিয়ে বসলো। তারপর এলো জার্মানরা। আর আমেরিকানদের সম্বন্ধে যত কম বলা যায় তত ভাল।"

মার্কিন বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব মতামতও দিগম্বর বনার্জি একটু পরেই দিয়েছিলেন। কমলেশকে বলেছিলেন, "অপরের আবিষ্কার কিনে নিয়ে এবং অন্য দেশের বৈজ্ঞানিক ভাঙিয়ে এনে নিজের ব্যবসা ফাঁদায় ওই জাতের জুড়ি নেই। আপনি গত পঁচাত্তর বছরের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ইতিহাস দেখুন। মোটর গাড়ি আবিষ্কার করলো ইউরোপীয়রা, কিন্তু বিশ্বজোড়া মোটর ব্যবসা হলো আমেরিকানদের। ইস্পাত গবেষণার প্রধান প্রধান অগ্রগতি অন্য দেশে, কিন্তু তা কাজে লাগালো আমেরিকান ইস্পাত কোম্পানিগুলো। কেমিক্যাল ইনডাসট্রিতে আপনাকে ডজন ডজন উদাহরণ দিতে পারি। আর আমেরিকানদের আণবিক গবেষণার ব্যাপারটা পৃথিবীর সবাই জানে—আগাগোড়া জার্মান নামে বোঝাই।"

কমলেশ সত্যি সেদিন বিস্মিত হয়েছিল। দিগম্বর বনার্জি পাইপ টানতে টানতে বলেছিলেন, "আমেরিকানদের বিরুদ্ধে আমার কোনো রাগ নেই। বহু বৈজ্ঞানিককে তারা সাধনার-সুযোগ দিয়েছে। জ্ঞানকে মানুষের কাজে লাগানোর ক্ষেত্রেও মার্কিনীরা অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু আমার মনে হয় আমাদের দেশও এই পথে নামতে পারে। এবং আমরা যদি তেমন মন দিয়ে কাজ শুরু করি, দুনিয়ার কেউ আমাদের সঙ্গে পেরে উঠবে না। জাপানী, জার্মান, আমেরিকান, ইংরেজ সবাই মাথায় হাত দিয়ে বসবে।"

"আপনি সত্যিই বিশ্বাস করেন সে-কথা ?" কমলেশ প্রশ্ন করেছিল।

দিগম্বর বনার্জি দৃঢ়তার সঙ্গে উত্তর দিয়েছিলেন, "নিশ্চয় করি। আমাদের কী নেই বলুন ? আমাদের অজস্র মেধাবী ছেলেছোকরা আছে, কোটি কোটি পরিশ্রমী শ্রমিক আছে, অন্য অনেক দেশের তুলনায় আমাদের নানা প্রাকৃতিক সম্পদ আছে, আর অন্য দেশের মতো আমাদের পঞ্চাশ বছরের বস্তাপচা কারখানা নেই। আমরা নতুন ভাবে আরম্ভ করতে যাচ্ছি। আমরা বুঝেসুঝে যা সর্বাধুনিক, যা কাজের, তাই যদি গ্রহণ করি তাহলে আমাদের কলকারখানায়

সঙ্গে কে পেরে উঠবে বলুন ?”

কিন্তু কিছুই হচ্ছে না কেন ? এই প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলো কমলেশ।

দিগম্বর বনার্জি নিজেই সে প্রসঙ্গ তুললেন। “হচ্ছে না, এই জন্যে যে আমরা ভাবছি বাইরের লোকজন এসে আমাদের কলকারখানা বসিয়ে দেবে। আমরা ঘুমিয়ে থাকবো আর রাতারাতি অসংখ্য কারখানা গজিয়ে উঠবে। আসলে আমরা এখনও নিজের ওপর নির্ভর করতে শিখলাম না—পরনির্ভরতা না ঘুচলে আমাদের মুক্তি হবে না।”

একটু থেমে দিগম্বর বনার্জি বলেছিলেন, “এখনও সময় আছে। আত্মবিশ্বাস নিয়ে আমরা যদি উঠে পড়ে লাগি তাহলে অনেক গর্বিত দেশের মাথা আমাদের কাছে নিচু হয়ে যাবে।”

দিগম্বর বনার্জি তারপর নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলেছিলেন। “ফার্টিলাইজার ক্যাটালিস্টের কথা ধরুন না সার কারখানায় প্রতি একশ' টাকায় তিন টাকা খরচ হয় এই ক্যাটালিস্টে। এ-জিনিস যে বিদেশ থেকে আনা ছাড়া আর কোনো পথ আছে তা আমাদের চন্দনপুর কারখানার কর্মকর্তারা বিশ্বাসই করতেন না। ক্যাটালিস্ট কথাটার বাংলাটাংলা আছে নাকি ?' দিগম্বর বনার্জি প্রশ্ন করেছিলেন।

কমলেশ হেসে বলেছিল, “আজকাল ‘অনুঘটক' কথাটা চালু হয়েছে—যেন পদার্থ অন্যান্য পদার্থের রাসায়নিক ক্রিয়া দ্রুততর করে, অথচ নিজে ওই রাসায়নিক ক্রিয়ায় কোনোরকম অংশগ্রহণ করে না।”

দিগম্বর বললেন, “চন্দনপুর সার কারখানায় হঠাৎ একবার আমদানি করা সমস্ত ক্যাটালিস্ট বিষাক্ত হয়ে গেল। কিছুতেই কাজ করে না। মাথায় হাত দিয়ে বসলেন সবাই, কারণ নতুন জিনিস জাহাজে আনাতেও অনেক সময় লেগে যাবে। কর্তারা তখন বাধ্য হয়ে আমাদের বললেন, কারখানা তো বন্ধ হতেই চলেছে, দেখ তোমরা যদি কিছু করতে পারো। আমাদের ওই খুদে ল্যাবরেটরিতে একশ' কুড়ি ঘণ্টা টানা পরিশ্রমের পর ঈশ্বর আশীর্বাদ করলেন। অকেজো পুরানো ক্যাটালিস্টগুলো আবার বাঁচিয়ে তোলার একটা পথ বেরিয়ে পড়লো। সেই শুরু। তারপর হয়তো কাগজে পড়ে থাকবেন, চন্দনপুরে আমরা কয়েক ধরনের ক্যাটালিস্ট আবিষ্কার করেছি। এই ক্যাটালিস্ট এখন আমরা ইচ্ছে করলে বিদেশের বাজারেও বিক্রি করতে পারি।”

দিগম্বর বনার্জির মধ্যে একটু রুক্ষভাব ছিল, কিন্তু সেই সঙ্গে কোথায় প্রচণ্ড আকর্ষণও ছিল। বিদেশ যাবার পরিকল্পনায় ইস্তফা দিয়ে কমলেশ রায়চৌধুরী

তাই শেষ পর্যন্ত এইচ-এ-সিতেই চাকরির আবেদন করেছিল।

চন্দনপুরের মতো অখ্যাত জায়গায় যে এমন গবেষণাগার আছে তা না দেখলে কমলেশের বিশ্বাসই হতো না। দিগম্বর বনার্জি বলেছিলেন, "এই তো সবে শুরু। আরও বাড়াবো। তোমরা মন দিয়ে কাজকর্ম আরম্ভ করে দাও।"

বেশ উৎসাহ বোধ করেছিল কমলেশ। কিছুদিনের মধ্যে সে নিজেও ল্যাবরেটরিতে কাজের নেশায় মেতে উঠেছিল। পদোন্নতিও হয়েছিল দ্রুত। সিনিয়র সায়েন্টিফিক অফিসার থেকে রিসার্চ ম্যানেজার।

তারপর দিগম্বর বনার্জি একদিন কমলেশকে ডেকে বললেন, "তোমাকে এবার অন্য জায়গায় সরাবো ভাবছি। নিষ্কাম গবেষণাব বড়লোকী এই গরীব দেশের মানুষরা সহ্য করতে পারবে কেন? দেশের পক্ষে এখন যা দরকার তা হলো বিজ্ঞানের বিদ্যেগুলো চটপট কলকারখানায় উৎপাদনের কাজে লাগানো। তাই প্রসেস ডিজাইন ডিপার্টমেন্টের ওপব আমি এখন জোর দিতে চাই— যাতে কম খরচে আমরা নতুন নতুন কারখানা বসাতে পাবি। হরিপুরে যে সার কারখানা হচ্ছে তার জন্যে বিদেশী নকশা কিনলাম। মহারাষ্ট্রে আমাদেব কোম্পানি যে সার কারখানা করলো সেখানেও পরনির্ভব হয়ে থাকতে হলো। অনেকগুলো টাকা বাইবের দেশকে দিতে হচ্ছে। অথচ আমাদেব তত বৈদেশিক মুদ্রা নেই। ম্যানেজিং ডিরেকটর তো জানুয়ারী মাসে আমাকে আমেরিকা নিয়ে গেলেন। সামান্য কিছু ধার পাবার জন্যে থার্ড ক্লাস লোকদের কাছে ওঁকে যেভাবে মাথা নিচু করে থাকতে হলো, তা দেখে আমার বিরক্তি ধরে যাচ্ছিলো।"

"ওরা বুঝি অপমান করে?" কমলেশ প্রশ্ন করেছিল।

"যে-দেশ জিনিস কিনতে চায় অথচ নগদ টাকা দিতে পাবে না, তাকে পৃথিবী কেন খাতির করবে কমলেশ? আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলবার সময় ওরা নিশ্চয় মনে মনে হাসে। ধার দিচ্ছে তার জন্যে সুদও নেবে—অথচ খবরের কাগজে লিখবে 'এড' অর্থাৎ সাহায্য দিচ্ছে। তা ছাড়া, ধার করলেই ডবল খরচ হয়। দশ বছরের পুরানো পদ্ধতি তোমার ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা করবে। একশ' টাকার জিনিসের জন্যে দেড়শ' টাকা দাম চাইবে। তোমাকে দিতেও হবে। আগেকার দিনে বলতো, ভিখিরিদের কোনো পছন্দ-অপছন্দ নেই। এখন বিদেশ ভ্রমণ করে বুঝলাম, ধারের চালও কাঁড়া আর আকাঁড়া।"

দিগম্বর বনার্জি বলেছিলেন, "আমি মনস্থির করে ফেলেছি। এবার নিজেদের জানা পদ্ধতিতেই এক আধুনিক কেমিক্যাল সার কারখানা চালু করতে

হবে। আমরা সাড়ে-তিনশ' লোক গবেষণার নাম করে ঠাণ্ডা ঘরে বসে মাইনে নেবো, আর আমাদের ম্যানেজিং ডিরেকটর বিদেশে গিয়ে বলবেন, ওগো, তোমরা এসে আমাদের কারখানাগুলো বসিয়ে দিয়ে যাও, আমার ভাল লাগছে না।"

কমলেশ রায়চৌধুরী সেই থেকে প্রসেস ডিজাইন বিভাগে বদলি হয়েছিল। স্মৃতপাদি রসিকতা করে বলতেন, "কী ব্যাপার কমলেশ? নন্দ ঘোষের নন্দগোপাল বলতে এখন নাকি তোমাকেই বোঝাচ্ছে?"

"মানে?" কমলেশ সহাস্যে প্রশ্ন করেছে।

"মানে দিগম্বর বনার্জির প্রধান চেলা নাকি তুমি? কমলেশ বলতে ভদ্রলোক একেবারে ইগনরেণ্ট অর্থাৎ অজ্ঞান!"

কমলেশ বলেছিল, "উ.। স্মৃতপাদি, অন্য কোনো বিষয় তুলুন। ছাত্রাবস্থায় শুনেছিলাম, কারখানা কলোনিতে যারা থাকে তারা পৃথিবীর কোনো খবর রাখে না, দিনরাত অফিসের কর্তাদের সম্পর্কে আলোচনা করে।"

শুভাশিসদা বলেছিলেন, "অফিসে, ল্যাবে, বাথরুমে, বাসায়, মাঠে, বাজারে, ড্রইংরুমে এমনকি বিছানায় পর্যন্ত এই অফিস সম্পর্কে আলোচনা।"

"অন্য কোনো প্রসঙ্গ তুলুন তাহলে," কমলেশ বলেছিল।

শুভাশিসদা বললেন, "আমার জানাশোনা এক পদার্থবিদ্ বন্ধু চুম্বন সম্পর্কে রিসার্চ করছে। সে বলছে, চুম্বন জিনিসটা সোজা ব্যাপার নয়—এর ওজন পঞ্চাশ গ্রাম থেকে বারোশ' গ্রাম পর্যন্ত হতে পারে।"

আইবুড়ো ছেলের সঙ্গে চুম্বন সম্পর্কে আলোচনার জন্যে স্মৃতপাদি স্বামীকে প্রচণ্ড বকুনি লাগালেন। ফলে, কথাবার্তা ঘুরে ফিরে আবার রিসার্চ ল্যাবে ফিরে এলো। শুভাশিসদা বললেন, "দিগম্বর বনার্জি এখন দুজনের ওপর সন্তুষ্ট। নগেন বসু এবং কমলেশ রায়চৌধুরী। এদের মধ্যে কে ডান হাত এবং কে বাঁ হাত তা অবশ্য জানি না।"

দিগম্বর বনার্জির বাংলোয় যাবার পথে টুকরো টুকরো এইসব পুরানো কথা কমলেশের মনে পড়তে লাগলো। বনার্জি সায়েবের সঙ্গে একটা ভালবাসার সম্পর্ক আছে বলেই তো কমলেশ টেলিগ্রামটা অবজ্ঞা করতে পারলো না।

অনেকখানি জমির মধ্যে ছোট একটা বাংলো। গেট খুলে লাল কাঁকর বিছানো রাস্তা ধরে একটু এগোতেই দিগম্বর বনার্জিকে দেখতে পেলো কমলেশ।

লনের মধ্যে একটা বেতের ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে ভদ্রলোক বসে রয়েছেন। সামনে একটা টেবিল। দূর থেকে সামান্য একটু আলো ভেসে আসছে।

এই অন্ধকারে দিগম্বর বনার্জি যে অনেকক্ষণ একা একা বসে থাকেন এ-খবর চন্দনপুরে অনেকেই জানে। কর্মব্যস্ত জীবনের বাইরে ভদ্রলোকের যতটুকু সময় থাকে তা আঁধারের রূপ দেখতে দেখতেই কেটে যায়। বনার্জির ব্যক্তিগত জীবনটাও রহস্যাবৃত। কেউ বলে চিরকুমার। কেউ বলে মোটেই নয়, কোনো এক পাঞ্জাবী মহিলাকে বিবাহ করেছিলেন। পরে সংসারযাত্রা অসহ্য হওয়ায় ভদ্রমহিলা বিবাহবিচ্ছেদ করেছেন। দিগম্বর বনার্জির মা আগে এখানেই থাকতেন। তিনি যতদিন বেঁচে ছিলেন, প্রতি রবিবার ভোরবেলায় দুজনে বেরিয়ে পড়তেন গীর্জায় প্রার্থনা করতে। চার্চ এখান থেকে প্রায় মাইল পনেরো দূরে। মায়ের মৃত্যুর পরে দিগম্বর বনার্জিকে চার্চে যেতেও দেখা যায় না। যতক্ষণ পারেন, ল্যাবরেটরিতেই কাটিয়ে দেন, তারপর ফিরে এসে অন্ধকার লনে আরাম কেদারায় একলা বসে থাকেন।

বাঙালীদের জীবনযাত্রার বিস্তারিত খবরাখবর দিগম্বর বনার্জির জানা নেই। তিনপুরুষ পাঞ্জাবে কেটেছে। দিল্লীতে পড়াশোনা করেছিলেন। কিছুকাল আর্মিতে ছিলেন। পরে হঠাৎ বিদেশে বেপাত্তা হয়েছিলেন। তারপর অজ্ঞাত কারণে আবার স্বদেশে ফিরে এসেছেন।

কমলেশকে দেখেই উৎফুল্ল দিগম্বর বনার্জি বললেন, "এসো। শুনলাম ট্রেন দেরি করেছে?"

"হ্যাঁ, স্যার," কমলেশ নিষ্প্রাণভাবে কিন্তু পোশাকী-ভদ্রতার সঙ্গে উত্তর দিলো। সে একটু দূরত্ব রাখতে চায়। ডিরেক্টরকে বুঝিয়ে দিতে চায়, আপনার সামনে যে বসে রয়েছে, তাকে আপনি বিনা নোটিশে ফুলশয্যা থেকে তুলে এনেছেন।

নোয়েল দিগম্বর বনার্জি ওদিকে ভ্রূক্ষেপ করলেন না। বললেন, "ভালভাবে সব কাজ হয়েছে তো? হাউ ডিড ইট গো?"

"তেমন কিছু গোলমাল হয়নি," কমলেশ কোনো রকমে ভদ্রতা রক্ষা করলো।

"তোমাদের দুজনকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। তোমাদের জন্যে একটা উপহারও কিনে রেখেছি।" দিগম্বর বনার্জির কথায় খুব খুশী হতে পারলো না কমলেশ।

"কোনো প্রয়োজন ছিল না। শুধু শুধু হাঙ্গামা করতে গেলেন কেন?" কমলেশ ঠাণ্ডাভাবে বললে।

"তোমাদের বউভাত অ্যাটেণ্ড করবো বলে ট্রেনের টিকিটও কিনে রেখেছিলাম, কিন্তু—"

কমলেশ এবার দিগম্বর বনার্জির মুখের দিকে তাকালো।

বনার্জি বললেন, "সমস্ত ব্যাপারটা তোমাকে জানাতেই হবে, কমলেশ। স্টেশনে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছি, এমন সময় কৃষিনগর পাইলট প্রোজেক্ট থেকে খবর এলো নগেন বসুর একটা ছোটখাট হার্ট অ্যাটাক হয়ে গিয়েছে। অসুখটা খুবই সামান্য, এ-খবরও কৃষিনগর হাসপাতালের ডাক্তার সেনের কাছে পেলাম।"

একটু থামলেন দিগম্বর বনার্জি। তারপর শান্তভাবে বললেন, "তুমি জানো, নগেনের ওপর আমি কতখানি নির্ভর করেছিলাম। কৃষিনগরে আমরা যে ছোট্ট পাইলট কারখানা করছি তার ওপরেই আমাদের রিসার্চ ডিপার্টমেন্টের মান-সম্মান নির্ভর করছে।"

একটু থেমে বনার্জি আরও চাঞ্চল্যকর সংবাদ পরিবেশন করলেন। বললেন, "সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার, নগেন বসু কিছুদিন থেকেই বিব্রত আছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সি-বি-আই ওর পিছনে লেগে রয়েছে। আমার পক্ষে বিশ্বাস করা শক্ত, কিন্তু সি-বি-আই-এর অফিসার বলে গেল, ওদের কাছে নিশ্চিত প্রমাণ আছে নগেন নাকি গতবারে যখন ইউরোপ গিয়েছিল তখন বিদেশী কোনো কোম্পানির কাছে ঘুষ নিয়েছে। সি-বি-আই ওকে কৃষিনগর থেকে সরিয়ে নেবার কথা বলেছে। আমি দ্বিধা করছিলাম, ঠিক সেই সময় ওর অসুখের খবর এলো।"

দিগম্বর বললেন, "বাধ্য হয়ে তোমার কথাই আমাকে ভাবতে হলো, কমলেশ। আই অ্যাম স্যরি, তোমার হনিমুন নষ্ট করলাম। কিন্তু কৃষিনগর প্রোজেক্টের পুরো ভার আমি আর কাকে দিতে পারি বলো? নগেনকে আজই কৃষিনগর থেকে কলকাতার হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছে। প্রোজেক্ট ম্যানেজার পদে তোমার পোস্টিং অর্ডার আমি সই করে রেখেছি। কাল সকালেই রওনা হয়ে যাও।"

দিগম্বর বনার্জি এবার উঠে দাঁড়ালেন। তার পর গম্ভীরভাবে বললেন, "নগেন আমার আশাভঙ্গ করেছে। তুমি আমার মুখ রক্ষে কোরো।" দিগম্বর বনার্জি এবার তাঁর প্রিয় সহকারী কমলেশ রায়চৌধুরীর ডান হাত নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে বললেন, "আই উইশ ইউ গুড লাক, মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ড।"

খুব ভোরবেলাতেই কমলেশের জীপ চলতে শুরু করেছিল। চন্দনপুর থেকে কৃষিনগর একশ' মাইলের পথ। দিগম্বর বনার্জি অনেক দেখেশুনে এই জায়গা নির্বাচন করেছিলেন তাঁর পরীক্ষামূলক কারখানার জন্যে। আগে নাম ছিল দরিয়াপুর। দিগম্বর বনার্জি বলেছিলেন "বলা যায় না, এই নতুন জায়গা একদিন সারশিল্পের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকতে পারে। তাই অনেক ভেবেচিন্তে নতুন নাম দিয়েছি কৃষিনগর।"

কৃষিনগর এখন সত্যিই একটা ছোট শহর হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বছরখানেক আগে দিগম্বর বনার্জির সঙ্গে কমলেশ প্রথম এখানে এসেছিল। দিগম্বর বনার্জি বলেছিলেন, "চন্দনপুরের পাশে যে-জমি পড়ে রয়েছে সেখানেই আমাদের এই নতুন পরীক্ষা চালানো যেত। কিন্তু আমার ছেলেদের আমি চন্দনপুর কারখানার পরনির্ভরশীল বাবুদের থেকে একটু দূরে রাখতে চাই। চন্দনপুর কারখানায় সাদাচামড়া সায়েবদের এখনও বড় সুনাম। এইচ-এ-সির রিসার্চ ডিপার্টমেন্টের ওপর ওরা নির্ভর করতে পারে না। নিজের পায়ে না-দাঁড়িয়ে ওরা পরের লাঠি ধরতে ভালবাসে!"

স্পিডোমিটারের কাঁটা তিরিশ পেরিয়ে চল্লিশ ছুঁই-ছুঁই করছে। ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়া কমলেশের দেহে মধুর ঝাপটা দিচ্ছে। এমন অবস্থায় কলকাতায় ফেলে-আসা সেই মিষ্টি মেয়েটার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। চন্দ্রমল্লিকা বেচারা সারারাত নিশ্চয় ছটফট করেছে। এতক্ষণে বিছানা থেকে উঠে সে নিশ্চয় আবার স্বামীর কথা ভাবতে আরম্ভ করেছে। আজ সকালেই তার বাপের বাড়ি ফিরে যাবার কথা। কৃষিনগর পৌঁছেই একটা খবর করতে হবে।

গত রাত্রেই কমলেশ চটপট গিন্নিকে একটা চিঠি লিখে ফেলেছে। তাতে বলেছে, "মাইডিয়ার বউ, স্ত্রীভাগ্যে স্বামীদের উন্নতি হয় যারা বিশ্বাস করে না, তারা যেন তোমার কথা মনে রাখে। বিয়ের রাত্রি থেকেই প্রমোশন। দিগম্বর বনার্জি আমাকে নতুন চাকরি দিয়ে কৃষিনগরে পাঠাচ্ছেন। নতুন পদের সঙ্গে যেমন বাড়তি সম্মান আছে, তেমনি বাড়তি দায়িত্ব ঘাড়ে চাপলো। এ-সম্বন্ধে সাক্ষাতে বলবো। প্রথম কয়েকটা সপ্তাহ বিশেষ মূল্যবান। কারণ তারপরেই বনার্জি সায়েব কিছুদিনের জন্যে বিলেত যাচ্ছেন। উনি চন্দনপুরে থাকতে থাকতে কৃষিনগরের সমস্ত ব্যাপারটা বুঝে নিতে হবে।"

দূর থেকে কৃষিনগর এলাকা দেখা যাচ্ছে। রাস্তার ওপর মস্ত বড় একটা সাইনবোর্ডে নোটিশ লেখা আছে: সংরক্ষিত এলাকা। ভারতরক্ষা আইনের কোনো এক ধারা অনুযায়ী বিনা অনুমতিতে এই এলাকায় প্রবেশ নিষেধ।

নতুন ম্যানেজারের আগমন সংবাদ গতকালই কৃষিনগরে ছড়িয়ে পড়েছে। এইচ-এ-সি এলাকায় প্রবেশমাত্র অন্যদিক থেকে আরেকটা জীপ আসতে দেখা গেল। গাড়ি থামিয়ে জীপ থেকে নেমে পড়ে নতুন ম্যানেজারকে এক ভদ্রলোক লম্বা স্যালুট ঠুকলেন। বললেন, "আমি হরগোবিন্দ দাস, সিকিউরিটি অফিসার।"

আর একজন নেপালী দারোয়ান এসে কমলেশের গলায় মালা পরিয়ে দিলো।

দাস বললেন, "পিছনের গাড়িতে আপনার সেক্রেটারী মিস সুজাতা দাস এবং আমাদের অ্যাডমিনিসট্রেটিভ অফিসার সুদর্শন সেন আছেন।"

টাকমাথা গোলগাল চেহারা মিস্টার সেনের। দেখলেই বোঝা যায় অনেকদিনের অভিজ্ঞ অফিসার। জীপ থেকে নেমে হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে এসে হাতজোড় করে নমস্কার করলেন। বললেন, "ওয়েলকাম টু কৃষিনগর। আমাদের সমস্ত অফিসার আপনাকে স্বাগতম জানাবার জন্যে প্রোজেক্ট অফিসে অপেক্ষা করছেন।"

সুদর্শনবাবুর পিছন পিছন সুজাতা দাসও সলজ্জভাবে এগিয়ে এলো। দুটি হাত তুলে সে আলতোভাবে কমলেশকে নমস্কার করলে। শ্যামবর্ণা তন্বী সুজাতার বড় বড় চোখদুটো দেখে কমলেশের অকস্মাৎ কাব্যলোকের সেই মহিলাটির কথা মনে পড়ে গেল, কবি জীবনানন্দ দাশ যাঁর নাম দিয়েছিলেন বনলতা সেন। সুদর্শনবাবু বললেন, "আপনার সেক্রেটারীর আসবার খুব ইচ্ছে অথচ লজ্জা পাচ্ছিলো। আমি জোর করে ধরে নিয়ে এলাম।"

প্রতিনমস্কার জানিয়ে কমলেশ বললে, "এই ভোরবেলায় কষ্ট করে আপনারা এসেছেন, তার জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ।"

সুজাতা দাস যে কমলেশকে দেখে একটু অবাক হয়ে গিয়েছে, তা সুদর্শন ও কমলেশ দুজনেই লক্ষ্য করলে। সুজাতাও কারণটা বলতে সাহস করলে না। কারণটা সুজাতার ব্যাগে পড়ে রয়েছে। কয়েকদিন আগে, কলকাতা থেকে ডাকে 'শুভবিবাহ' মার্কা একটা চিঠি এসেছে। বান্ধবী রজনীগন্ধার বোন চন্দ্রমল্লিকার বিয়ে জনৈক কমলেশ রায়চৌধুরীর সঙ্গে।

কমলেশকে ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করতে সুজাতার সাহস হলো না। হাজার

হোক বড় অফিসার, আর সুজাতা সামান্য শর্টহ্যাণ্ড টাইপিস্ট। যতদূর মনে পড়ছে, একদিন আগে মল্লিকার ফুলশয্যার দিন। কিন্তু তাহলে, ভদ্রলোক এখানে হাজির হলেন কী করে? তাহলে অন্য কোনো কমলেশের সঙ্গে মল্লিকার বিয়ে হয়েছে। সুজাতা ভুল করছে। ব্যাগ থেকে চিঠি বার করে তারিখটা মিলিয়ে দেখলে হতো। কিন্তু সুজাতা ভরসা পেলো না। বন্ধুর ছোট বোনের স্বামী হিসেবে যতই রসিকতার সম্পর্ক হোক, অফিসাররা কর্মক্ষেত্রে ওসব তোয়াক্কা করে না। শুধু শুধু অপমান ডেকে আনতে চায় না সুজাতা দাস।

আর একপ্রস্থ ধন্যবাদ জানিয়ে কমলেশ সবাইকে বাড়ি ফিরে যেতে অনুরোধ করলো। তারপর নিজের জীপে এসে বসলো।

ড্রাইভারের পাশের সীটে বসে কমলেশ সামনের দিকে তাকিয়ে রইলো। গাড়িটা একটু উঁচু জায়গায় উঠেছে। ছোট্ট একটা টিলার ফাঁক দিয়ে কৃষিনগর কারখানা এবার দেখা গেল। খোলা আকাশের নিচে কোনো এক ময়দানব ইস্পাতের খেলাঘর সাজিয়ে বসেছে। বিচিত্র বর্ণ এবং আকারের ধাতুস্তম্ভ সে নিজের খেয়ালখুশী মতো সাজিয়ে যাচ্ছে। কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর নানা গোপন রহস্য এবং সার কারখানার এত খুঁটিনাটি জেনেও কমলেশের মনে হলো, খোলা আকাশের নিচে কোনো, দুর্বোধ্য অথচ প্রখ্যাত আধুনিক শিল্পীর প্রদর্শনী দেখছে সে। গোল, লম্বা, বেঁটে, সরু, মোটা নানা আকারের ইস্পাত স্তম্ভের মধ্যে কোথায় যেন আপাত উদাসীন স্রষ্টিকর্তার সযত্নলালিত ছন্দবোধ ফুটে উঠেছে।

প্রোজেক্ট অফিসে দায়িত্ব বুঝে নিয়ে কমলেশ ছুটেছিল নগেন বসুর স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। কিন্তু তাঁরা ইতিমধ্যে বাংলো ছেড়ে দিয়েছেন। মিসেস নবনীতা বসু অসুস্থ স্বামীর সঙ্গে কলকাতা রওনা হয়েছেন, বাড়ির অন্য সবাই মালপত্তর নিয়ে চন্দনপুরে গিয়েছে। চন্দনপুরের কোয়ার্টার ওরা ছাড়েনি, নগেন বসু সাময়িকভাবে এখানে চলে এসেছিলেন।

সমস্ত দিন ঘুরে ঘুরে কমলেশ প্রোজেক্টের কাজ দেখেছে। এমন কিছু বড় নয়, ছোট একটা পরীক্ষামূলক কারখানা তৈরি হচ্ছে বলা যায়। কিন্তু তাতেই কয়েক কোটি টাকার প্রয়োজন। কম পয়সায় পৃথিবীতে আজকাল কোনো কাজ হয় না। কমলেশ ভাবলো, এই জন্যেই পৃথিবীতে যেসব দেশের টাকা আছে কেবল তারা এগিয়ে যাচ্ছে। যাদের সঙ্গতি নেই তারা খরচের এই

প্রতিযোগিতায় পেরে উঠছে না।

কৃষিনগর পাইলট প্রোজেক্টের কাজ বুঝতে কমলেশের বেশী সময় লাগবে না। কারণ এই কারখানার নকশা দিগম্বর বনার্জি যখন নিজের হাতে করছিলেন, তখন কমলেশ সর্বদা তাঁর পাশে পাশে ছিল। প্রসেস ডিজাইন ডিপার্টমেণ্টের প্রতিটি কর্মচারী তখন অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করেছে। তারাও কীরকম উৎসাহ পেয়ে গিয়েছিল।

দিগম্বর বনার্জি বলেছিলেন, "সিনথেটিক অ্যামোনিয়া এবং ইউরিয়া উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমবা যা কবতে চাইছি তা যদি সফল হয়, তাহলে ফার্টিলাইজার জগতে একটা ছোটখাট বোমা পড়বে। পেটেণ্টের পাঁচিল তুলে ছ'টা-সাতটা কোম্পানি পৃথিবীতে এমন অবস্থা করে রেখেছে যে দুনিয়ার বুভুক্ষু সব লোকদের তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে হচ্ছে। এইসব কোম্পানিব হাতে রয়ালটির টাকা না দিয়ে, চড়া দামে তাদের যন্ত্রপাতি না কিনে, কেউ রাসায়নিক সার তৈরি করার কথা ভাবতেই পারে না। ইণ্ডিয়াব নিজস্ব বিদ্যা আয়ত্তে এলে, অন্তত একটা প্রধান বিষয়ে আমবা আত্মনির্ভর হবো। তেমন ভাগ্য হলে ওদের কাছেও আমাদের বিদ্যে বিক্রি করা যাবে।

কমলেশের তৈরি ডিজাইন সংক্রান্ত সব কাগজপত্তর নিয়ে দিগম্বর বনার্জি হেড অফিসে গিয়েছিলেন। যাবাব আগে বলেছিলেন, "আমার মুশকিল, আমার ওপর হিন্দুস্থান অ্যাগ্রো-কেমিক্যালস্-এর অগাধ বিশ্বাস। আমি যা চাই, তাতেই হাঁ বলে ফেলেন ওঁরা।" এবারেও ওঁরা পরামর্শ দিয়েছিলেন, ইউরিয়া তৈরির যে নক্শা হয়েছে, দিগম্বর বনার্জি তা ছোটখাট একটা পাইলট কারখানায় পরীক্ষা করে নিন। কারণ, যদি আমাদের নিজস্ব পদ্ধতি কার্যকর হয়, তাহলে পরবর্তী যোজনায় সমস্ত নতুন কারখানাগুলিকে এই ছকে ফেলা যাবে। আর যদি দেখা যায় এই পদ্ধতি নির্ভুল নয়, তাহলে এখন থেকেই আমাদের আন্তর্জাতিক বাজারে খোঁজখবর করে দেখতে হবে কোন কোম্পানির কাছ থেকে কী নেওয়া যায়।

মাত্র দু সপ্তাহ সময় নিয়েছিলেন হেড অফিসের ম্যানেজিং ডিরেকটর। তারপর টেলেক্সে বনার্জিকে জানিয়ে দিয়েছিলেন, এগিয়ে যান। খরচের যে আন্দাজ দিয়েছিলেন দিগম্বর বনার্জি তাও বিনা আপত্তিতে তাঁরা মেনে নিয়েছিলেন।

সেই থেকেই কৃষিনগর প্রকল্পের উৎপত্তি। বাইরে ব্যাপারটা বিশেষ প্রচার করা হয়নি। শুধু বলা হয়েছে, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পদ্ধতির গুণাগুণ যাচাই

করবার জন্যে এই ছোট্ট পাইলট প্রোজেক্টের জন্ম। তাছাড়া, নতুন যৌগিক সার, যার নাম দেওয়া হয়েছে 'উর্বরা', সে-সম্পর্কেও এখানে গবেষণা করা হবে। তবে পরিকল্পনা এমনভাবে করা হয়েছে যে, কিছু কিছু উৎপাদনও হবে, তার ফলে ঘরের পয়সা দিয়ে কৃষিনগর প্রকল্পকে পুষতে হবে না—মাছের তেলেই মাছ ভাজা যাবে।

দিগম্বর বনার্জি দিল্লীর অনুমতি পেয়েই নগেন বসুকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। প্রিয় শিষ্য নগেন বসু তখন সবে ইউরোপের পাঁচটা দেশ ঘুরে ফিরেছেন। ওঁরা গিয়েছিলেন বড় বড় কোম্পানির সঙ্গে দেখা করতে, খোঁজখবর করে জানতে কার সঙ্গে কারিগরী জ্ঞানের গাঁটছড়া বাঁধলে পরের কারখানাগুলো একটু কম খরচে ভারতের বিভিন্ন অংশে বসানো যাবে। প্রচণ্ড উৎসাহে টগবগ করতে করতে নগেন বসুকে দিগম্বর বলেছিলেন, "আমরা মস্ত সুযোগ পেয়ে গিয়েছি, নগেন। এবার তুমি হাতে-কলমে দেখিয়ে দাও এইচ-এ-সির গবেষণা ডিপার্টমেন্টের ছেলেরা দেশের জন্যে কী করতে পারে।"

নগেন বসু নিজের হাতে কৃষিনগরের গোড়াপত্তন করেছিলেন। প্রথমে কয়েকটা দৈত্যাকৃতি বুলডোজার এলো। বেপরোয়া মেজাজে কৃষিনগরের এবড়ো-খেবড়ো জমিকে কয়েক সপ্তাহে তারা সমান করে ফেললো। ছোটখাট একটা পাহাড়কে পর্যন্ত ঠিকাদারের লোকরা ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দিলো। তারপর এলো নানা ধরনের মানুষ। কেউ এইচ-এ-সির কর্মী, কেউ দিনমজুর, কেউ ঠিকাদারের প্রতিনিধি। ছোট ছোট বাড়ি তৈরি হয়েছে অনেকগুলো। ক্যাম্পও পড়েছে বেশ কয়েকটা। সবার চোখের সামনে কারখানা ক্রমশঃ মাটি থেকে আকাশের দিকে উঠতে আরম্ভ করেছে। আশেপাশে অনেকগুলো বাড়িও তৈরি হয়েছে। তার কোনোটায় অফিস, কোনোটায় টেস্টিং ল্যাবরেটরি। একটা বিরাট গুদাম তৈরি হয়েছে—কারখানা চালু হলে ওইখানে সার থাকবে। এখন সিমেন্ট, লোহা এবং প্রোজেক্টের অন্য জিনিস-পত্র বোঝাই করে রাখা হচ্ছে।

দূরে একেবারে নদীর ধারে উঠেছে প্রোজেক্ট হাসপাতাল। সেখানে সাধারণ চিকিৎসা ছাড়াও অপারেশনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে—কারখানা তৈরির সময় কর্মীদের আহত হবার আশঙ্কা বেশী।

রেললাইন পাতার কাজও বেশ এগিয়েছে। অনেক মাল ইতিমধ্যেই ওয়াগনে আসতে শুরু হয়েছে। ওসব আগে পাঁচ মাইল দূরে রেল স্টেশন পর্যন্ত আসতো—তারপর ট্রাকে চড়িয়ে মাঠে আনতে হতো। এবার সোজা রেলেই

কারখানার ভিতর পর্যন্ত চলে আসবে।

এসব তো কারখানার বাহ্যিক দিক। প্রসেস ডিজাইন সম্পর্কে কমলেশ দু-একদিনের মধ্যেই ডিরেকটরকে একটা রিপোর্ট পাঠাতে চায়। সে-সম্পর্কে খবরাখবর যোগাড় করবার জন্যে কমলেশ প্রোজেক্ট অফিসারদের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা করলো। সুজাতা মেয়েটি বেশ কাজের। চটপট কমলেশের কয়েকটা চিঠি টাইপ করে দিলো। চা খাবে কিনা খোঁজ করলো।

কর্মক্লান্ত দিনের শেষে নিজের কোয়ার্টারে ফিরে এসেছে কমলেশ। এখানে একজন চাকর আছে। একটা খাট আছে। আর আছে টেলিফোন।

শাওয়ারে স্নান সেরে বাথরুম থেকে এসে বউকে একটা চিঠি লেখার কথা ভাবছিল কমলেশ। এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠলো। ওপাশ থেকে স্বতপাদির গলা ভেসে এলো কলকাতা থেকে। "হ্যালো কমলেশ, বেশ ছেলে যা হোক! বউ ফেলে পালালে। একটা খবর পর্যন্ত নেই।"

"একটা চিঠি তো সকালেই পোস্ট করেছি," কমলেশ জানালো।

স্বতপাদি বকুনি দিলেন, "এসব কি চিঠির কাজ—টেলিগ্রাম করা উচিত ছিল, যদিও বউকে টেলিগ্রামে প্রেম জানানো চলে না।"

"এখানে যে এসেছি খবব পেলেন কি করে?" কমলেশ একটু আশ্চর্য হলো।

"তোমার বউ-এব শুকনো মুখে হাসি ফোটাবার জন্যে প্রথমে চন্দনপুরে ফোন করলাম। ওখান থেকেই সুখবরটা পেলাম। তারপর তোমার গিন্নির তর সইলো না, বাধ্য হয়ে ফোন করলাম। নাও এখন গিন্নির সঙ্গে কথা বলো। আমরা এখান থেকে এমন জায়গায় সরে যাচ্ছি যেখান থেকে তোমার বউ-এর কথাবার্তা শোনা যাবে না।"

ওপাশ থেকে চন্দ্রমল্লিকার গলা ভেসে এলো। "এই, স্বতপামাসির কথা বিশ্বাস কোরো না। ট্রেনে তোমার কষ্ট হয়নি তো?"

"কষ্ট হয়েছে, কিন্তু সে কষ্ট কাকে বোঝাবো?" কমলেশ খুব মিষ্টি করে বললে।

"তুমি সাবধানে থেকো, বুঝলে?" চন্দ্রমল্লিকা এই ক'ঘণ্টার মধ্যেই স্বামীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে চিন্তা শুরু করে দিয়েছে।

"তুমিও খুশীতে থেকো। আমার জন্যে ভেবে ভেবে শরীর নষ্ট কোরো না।" কমলেশ অনুরোধ করলো।

"রাখি। কেমন?" চন্দ্রমল্লিকার কথায় কমলেশ টেলিফোন রাখতে যাচ্ছিলো কিন্তু স্বতপাদি আবার ফোন ধরলেন। "শোনো শ্রীমান, যে ক'দিন

বনবাসে থাকবে বউকে রোজ ফোন করবে।”

“ওরে সর্বনাশ, রোজ ট্রাঙ্ককল করার মানে বুঝতে পারছেন? সরকারী চাকরি করে অত টাকা কোথায় পাবো?” কমলেশ জানতে চাইলো।

“অতশত বুঝি না। আমাদের মেয়ের সুখদুঃখ বলে কোনো জিনিস নেই বুঝি? হয় ফোন করবে, না হয় বউকে কাছে নিয়ে যাবে!” এই বলে স্বতপাদি ফোন নামিয়ে দিয়েছিলেন।

একটু পরে ফোনটা আবার বেজে উঠেছিল। প্রোজেক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার সুদর্শন সেন ফোন করেছেন। “মিস্টার রায়চৌধুরী, গৃহিণীর খুব ইচ্ছে, আজ আমাদের এখানে আপনি দুটো অন্নগ্রহণ করুন। যদি আপত্তি না থাকে একটু পরেই আপনাকে নিয়ে আসবো।”

অমত করেনি কমলেশ। ভদ্রলোক একটু পরেই এলেন। বেশ হাসি খুশী মানুষ এই সুদর্শন সেন। বললেন, “যদিও আপনি মস্ত বড় অফিসার, কিন্তু বয়সে আমার ছেলের মতো। কোনো ব্যাপারে প্রয়োজন হলে দ্বিধা করবেন না।”

সুদর্শন সেন গৃহিণী বেশ মিশুকে। আদর করে কমলেশকে বসতে দিলেন।

সুদর্শন সেন বললেন, “ডাস্টেড হাণ্ডলেগ বলতে যা বোঝায় আমরা তাই! একেবারে ঝাড়া হাত-পা! দুই মেয়ে—দুজনেই বিবাহিতা, দুজনেরই প্রথম সন্তান হয়ে গিয়েছে। সুতরাং গ্যারান্টি পিরিয়ডের দায়িত্ব শেষ। পুত্রের লেখাপড়া কমপ্লিট, চাকরিতে ঢুকেছে। বিবাহ দিয়ে রাউরকেল্লায় কোয়ার্টারস্থ করেছি। এখন কোনোরকমে হাতের নোয়া এবং সিঁথির সিঁদুর অক্ষয় রেখে এইচ-এ-সি থেকে রিটায়ারের চিঠিটা আদায় করতে পারলেই নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।”

সুদর্শন-গৃহিণী স্বামীকে বকুনি লাগালেন, “তোমার কথা ছাড়ো—যেদিন থেকে বিয়ে হয়েছে, সেদিন থেকেই শুনছি তোমার চাকরি গেল, চাকরি গেল।”

নিরুৎসাহ না-হয়ে সুদর্শনবাবু এবার কমলেশকে বললেন, “কী আর বলবো স্যার। তবিলদারির চাকরি থেকে বিপজ্জনক কাজ পৃথিবীতে নেই—এর থেকে মিলিটারি সার্ভিস পর্যন্ত নিরাপদ। ওখানে প্রাণে মারা যেতে পারেন, কিন্তু কেউ ধনে হাত দেবে না। কিন্তু আমাদের এই কাজে শ্রমিকরা যে কোনো দিন জান নিতে পারে, আর কোম্পানি সুযোগ পেলেই প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের জমানত জব্দ করবেন।”

সুদর্শন সেনের কথা শুনে কমলেশ হেসে ফেললো। সে বললে, "আমরা তো শুনেছি. স্বাধীন ভারতবর্ষে প্রথমে ছিল উকিলরাজ, তারপর এসেছে গোমস্তারাজ। এখন বড় বড় কোম্পানির বড় কর্তা হচ্ছেন অ্যাকাউনটেণ্টরা। যাঁরা জিনিস আবিষ্কার করেন, তৈরি করেন, বিক্রি করেন, মেরামত করেন তাঁদের মাথায় উঠতে দেওয়া হচ্ছে না, সব ক্ষমতা হিসেবরক্ষকের।"

সুদর্শন সেন বললেন, "ওসব আপনারা রসিকতা করে বলেন। অনেক পাপ করলে লোক আমাদের লাইনে আসে। যেমনি শুনি নতুন কোনো কারখানা হচ্ছে, অমনি আমি গিন্নিকে বলি, তোমার স্বামীর মতো আর এক অভাগা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসারের ঘুম বন্ধ হলো। নতুন প্রোজেক্ট মানে দেশের উন্নতি নয়—চোর-জোচ্চোরদের পোয়াবারো, আর গোমস্তার সর্বনাশ। কনট্রাক্টর ঠকাবার চেষ্টা করবে, সাপ্লায়ার খারাপ মাল দেবে, কর্মচারীরা মিথ্যে টি-এ বিল করবে, ভাঁড়ার থেকে চুরি হবে, হিসেব মিলবে না—এই হলো প্রোজেক্ট। আপনারা আমাকে পাগল ভাবতে পারেন। কিন্তু আমার ছ'মাস চাকরি আছে, রিটায়ারের বিল্বিপত্তর হাতে পেলুম বলে, রেখে-ঢেকে কথা বলবার প্রয়োজন নেই।"

কমলেশ বললে, "আপনি বেশ মজা করতে পারেন, মিস্টার সেন।"

সুদর্শন-গৃহিণী বললেন, "ওর কথাবার্তাই এইরকম। বাড়িতে, রাস্তায়, আপিসে সব সময় উল্টো বকছেন।"

গম্ভীর মুখে সুদর্শন সেন বললেন, 'স্বীকার করছি, উল্টোরথের দিন আমার জন্ম। সার কোম্পানিতে কাজ করে প্রাণ ধারণ করছি, কিন্তু স্যার, সোজা কথা বলছি, ইণ্ডিয়াতে আপনারা কেন জমিতে ফসল বাড়াবার বৃথা চেষ্টা করছেন ?"

হেসে ফেললে কমলেশ। বললে, "বলছেন কি মিস্টার সেন ? ভারতবর্ষে জমির পরিমাণ তো আর বাড়বে না, তাই ফসলের পরিমাণ বাড়িয়ে আমাদের দেশের লোকের মুখে অন্ন দিতে হবে।"

করুণভাবে সুদর্শন সেন জানিয়ে দিলেন, "পারবেন না স্যার। আপনি এবং আমাদের ডিরেকটর দিগম্বর বনার্জি যতই চেষ্টা করুন, হেরে যাবেন। দেশে যে কি হারে বাচ্চা বেড়ে যাচ্ছে সে খবর তো আপনারা রাখছেন না। আমাদের স্যার গোড়ায় গণ্ডগোল। বার্থ কণ্ট্রোলের ব্যবস্থা হলো না, তার আগেই গভরমেণ্ট 'ডেথ্ কণ্ট্রোল' করে বসলেন। যারা আগে কলেরা, বসন্ত, টাইফয়েড, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বরে আট দশ বছরের মধ্যে টেঁসে যেত তারা

এখন সাবালক হচ্ছে, বে-থা করছে, ছেলেপুলের বাপ হচ্ছে। পঞ্চাশ ষাট বছরের আগে ডজন দুয়েক নাতিনাতনীর মুখ না দেখে কেউ দুনিয়া থেকে নড়ছে না।"

"সেটা কি খাবাপ মিস্টার সেন ?" কমলেশ জিজ্ঞেস করে।

সুদর্শনবাবু জিভ কেটে বললেন, "মোটেই না। কিন্তু বাবা, একটু বুঝে-সুঝে চলো। মা ষষ্ঠীকে অত মাথায় তুলো না। উনি সন্তুষ্ট হয়ে নিজের খেয়ালখুশী মতো কাজ চালালে হাজার দশেক দিগম্বর বনার্জি এদেশের কিছু করতে পারবে না! তোমরা ব্যাটাচ্ছেলে অবুঝের মতো ছেলেপুলে আনবে, আর তার ঠেলা সামলাবার জন্যে বুড়ো বয়সে সুদর্শন সেনকে এই বনজঙ্গলে ক্যাম্প খাটিয়ে সার কারখানাব তদারকী করতে হবে, এ কেমন কথা ?"

কমলেশ নিজের হাসি চেপে রাখতে পারলো না। সুদর্শন সেন স্ত্রীর রক্ত-চক্ষু অবজ্ঞা করে বললেন, "বৈজ্ঞানিক হিসাবে আপনাদের যতই আত্মবিশ্বাস থাকুক, পারবেন না স্যার। এক জায়গায় পড়েছি, যীশুখৃষ্ট যখন জন্মালেন তখন গোটা পৃথিবীতে তিরিশ কোটি লোক ছিল। দেড়-হাজার বছর পরে পেটের দায়ে কলম্বাস যখন ভারতবর্ষ আবিষ্কারে বেরুলেন তখন পৃথিবীর লোক-সংখ্যা দাঁড়িয়েছে পঞ্চাশ কোটি। তারপর মাত্র সাড়ে-চারশ' বছরে সেই পঞ্চাশ কোটি হয়েছিল তিনশ' কোটি! ১৯৫১ থেকে ১৯৬১ সালের মধ্যে ইণ্ডিয়ার লোকই বেড়েছে প্রায় আট কোটি! ডি ডি টি, পেনিসিলিন এবং সাবান এই তিনটে জিনিস চালু করে সরকার যে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করেছেন তা সামলাতে এখন শয়ে শয়ে সার কারখানা লাগবে।"

কমলেশ জিজ্ঞেস করলে, "যারা এখানে কাজ করে, তারা কি জানে কত বড় কাজে তারা সাহায্য করছে ?"

হা-হা করে হেসে উঠলেন সুদর্শন সেন। "কিস্যু জানে না। ওসব জানবার আগ্রহ নেই কারুর। সবাই এসেছে নিজের পেটের দায়ে, কিংবা টু-পাইস কামাবার ধান্দায়। আপনি এখানকার শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে দেখবেন। যে-লোক মাটি কেটে রোজ পাচ্ছে তার কোনো আগ্রহ নেই জানবার, কেন মাটি কাটা হচ্ছে। সে শুধু চাল কেনবার টাকা চায়। পাঞ্জাবী যে-ঠিকাদার বাড়ি তৈরি করছে তার কোনো আগ্রহ নেই জানবার, সেই সব বাড়িতে কে থাকবে এবং কেন থাকবে। সে শুধু জানতে চায় বিলের টাকাটা কবে পাবে এবং কবে আবার টেণ্ডার ডাকা হবে। আমার অফিসের কেরানিরা জানতে চায়, মাগ্গি ভাতা কেন বাড়ছে না। আপনার মেশিনে সার তৈরি

হলো কি হলো না সে-সম্পর্কে তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। সংসার বড় কঠিন জায়গা স্যার। আপনি এবং দিগম্বর বাঁড়ুজ্যে যা আশা করছেন তা নাটক নভেলের চরিত্র ছাড়া ভারতবর্ষের কোথাও পাবেন না।"

কমলেশ চুপ করে সুদর্শন সেনের কথা শুনছিল। সেন বললেন, "হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন কেন? কী ভাবছেন স্যার?"

"ভাবছি, দায়িত্ব পালন করতে পারবো কিনা? সব কাজকর্ম শেষ করে নির্ধারিত দিনে কারখানা চালু করতে পারবো কিনা।"

সুদর্শন সেন সান্ত্বনা দিলেন, "ভাববেন না স্যার। কপালে যা আছে, তাই হবে। নির্ধারিত দিনে ইণ্ডিয়াতে কোনো কিছু হয়েছে এ পর্যন্ত? আমাদের ডিপার্টমেণ্টে এক ফড়ফড়ে কেরানিবাবু আছে। তাকে একদিন বকুনি লাগাতে মুখের ওপর বললে, মানুষ তো ছার, ভগবানও আজকাল নির্ধারিত দিনে কাজ করতে পারছেন না! নির্ধারিত দিনে পেটের ছেলে ভূমিষ্ঠ হচ্ছে না, নির্ধারিত দিনে বর্ষা নামছে না; নির্ধারিত দিনে গাছে ফুল ফুটছে না। সুতরাং নির্ধারিত দিনে অফিসের কাজ হবে কী করে?"

সুদর্শন সেনের কথায় চিন্তা বাড়লো কমলেশের। সে বললে, "আমাদের ডিরেকটর নির্ধারিত দিন ছাড়া কিছুই বোঝেন না। তাঁকে আমি একরকম কথা দিয়ে এসেছি।"

সুদর্শনবাবুর ওখান থেকে নিজের কোয়ার্টারে ফিরে এসে একজনের কথা কমলেশের আবার মনে পড়ে গেল। তাকেও কথা দেওয়া ছিল যত শীঘ্র সম্ভব দেখা হবে। সে এখন কলকাতায় বাপের বাড়িতে পুরানো বিছানায় নিঃসঙ্গ রাত্রির দুঃসহ বিরহ ভোগ করছে। কী আশ্চর্য বিধাতার নিয়ম। মাত্র এক সপ্তাহ আগে যার সম্বন্ধে কোনো দায়িত্ব ছিল না, এখন সেই কমলেশের সমস্ত ভাবনা-চিন্তা গ্রাস করে বসে আছে। চন্দনপুরে ক্যাটালিস্ট ডিপার্টমেণ্টের গোবিন্দবাবু বলতেন, "বৈজ্ঞানিকরা যতই ক্যাটালিস্ট আবিষ্কার করুন, জেনে রাখবেন বিবাহের মতো ক্যাটালিস্ট এখনও বেরোয়নি। দুটো মন্ত্র পড়া হলো, দুটো ওং ভোং হলো, আর জলজ্যান্ত অজানা-অচেনা একজোড়া ছেলেমেয়ে কেমিক্যাল অ্যাকশনে এক হয়ে গেল।"

এই ক্যাটালিস্টের কথা কমলেশ বেশ গুছিয়ে বউকে লিখেছিল। চন্দ্রমল্লিকা তার উত্তরে লিখলো, "সুতপা মাসি তোমার চিঠি পড়ে ফেলেছেন। বললেন, বরকে লিখবে বিজ্ঞানের কথা অত না ফেঁদে প্রেমের কথা লিখতে। প্রেম নাকি

অত অনুঘটনের ধার ধারে না। তবে শোনো, এখানে আর এক মুহূর্তও আমার ভাল লাগছে না। দিন যেন কাটতেই চায় না। বই পড়তে চেষ্টা করি কিন্তু শুধু বরের মুখ ভেসে ওঠে; গান শুনতে আরম্ভ করি শুধু বরের কথাগুলো মনে পড়ে যায়। দিনে যদি এমন অবস্থা হয়, তাহলে রাত্রির কথা নিশ্চয় আন্দাজ করতে পারছো। লোকে বলছে, আমি নাকি শুকিয়ে যাচ্ছি; আমার রঙ কালো হয়ে যাচ্ছে। কবে আসছো?"

যাবার ইচ্ছে হয় খুব। কৃষিনগর থেকে কলকাতা আর কত দূর? ভাল ট্রেনও আছে কয়েক মাইল দূর থেকে। কিন্তু কৃষিনগর ছেড়ে এখন যাবার প্রশ্নই ওঠে না। কাজ চলছে পুরোদমে। জাপানী কোম্পানির প্রতিনিধিরা এসে গিয়েছে। কিছু যন্ত্রপাতি কেনা হয়েছে ওদের কাছ থেকে। সেগুলো তারা বসাবে। দুজন জার্মান ইতিমধ্যে কাজ শুরু করে দিয়েছে। ওদের কাছ থেকেও ইউরিয়া প্লান্টের দু-একটা মেশিন কেনা হযেছে। এসব যন্ত্র এখনও এদেশের কোনো কারখানায় তৈরি হয় না। ইনজিনীয়ারিং-এর কাজও চলছে পুরোদমে। এখন একদিনের জন্যেও কৃষিনগর ছেড়ে কলকাতায় যেতে হলে দিগম্বর বনার্জির অনুমতি প্রয়োজন হবে। অন্য কোনো ব্যাপার হলে ডকটর বনার্জিকে ফোন করা যেত, কিন্তু এখন ছুটি চাইলেই ভদ্রলোক অন্য কিছু ভেবে বসবেন। কলকাতায় যাওয়া প্রায় অসম্ভব।

মাসখানেক পরে অধৈর্য বউ লিখেছে, "কলকাতায় তোমার কোনো কাজ পড়ে না? কত লোকের তো কলকাতায় মিটিং থাকে। আমার বন্ধু বকুল, তারও বিয়ে হয়েছে মাত্র ছ'মাস আগে। এতদিন বরের কাছেই ছিল। সবে দু সপ্তাহ বাপের বাড়ি এসেছে, এব মধ্যে স্বামী দুবার কলকাতায় অফিসের কনফারেন্স করে গিয়েছে।"

বেচারা চন্দ্রমল্লিকা বিয়ের আগে অফিসের কোনো খোঁজখবরই রাখতো না। এখন বাধ্য হয়ে নানা খবরাখবর নিচ্ছে।

কমলেশ নিজেও আজকাল চিঠিতে অফিসের খবরাখবর পাঠায়। দিগম্বর বনার্জির সংবাদ যেমন থাকে, তেমনি কৃষিনগরের অনেক নতুন ঘটনা। সুদর্শন সেনের কথা চন্দ্রমল্লিকার অজানা নেই। এতদিন সে অ্যামোনিয়া প্লান্টের সুপারভাইজার ঘনশ্যাম দাস, ভিজিলান্স অফিসার নরহরি পাত্র, মেডিক্যাল অফিসার ডঃ সেনকে চিনে গিয়েছে। নরহরিবাবু সম্পর্কে কমলেশ লিখেছিল, "কাজের সঙ্গে নামের এমন নিকটসম্পর্ক বড় একটা দেখা যায় না। নরকে হরণ করে চুরি-জোচ্চুরি বন্ধ করাই এঁর কাজ। তোমার বাবাকে চেনেন।

কোনো এক সময় তোমার বাবার অধীনে কাজ করেছেন।"

পরের চিঠিতে কমলেশ লিখেছিল, "আমার সেক্রেটারীর কথা তোমাকে জানানো হয়নি। সুজাতা দাস। ভদ্রমহিলা খুবই কাজের। বড় বড় শহরে মহিলা সহকারিণীর এত চাকরি থাকতে কেন এই পাণ্ডববর্জিত কৃষিনগরে হাজির হলেন জানি না।"

চন্দ্রমল্লিকার উত্তর এসে গিয়েছিল দ্রুত। "তোমার লেডি সেক্রেটারীর খবর সুতপা মাসিকে বলায়, উনি যেসব ইঙ্গিত করলেন তাতে বেশ ভয় পেয়ে যাচ্ছি। তোমার চিঠি পেয়ে মনে হয়েছিল, সেক্রেটারীরা চিঠিপত্তর টাইপ করে, সায়েবের কাগজপত্তর গুছোয়, কিন্তু এখন শুনছি, লেডি সেক্রেটারীকে কাছে পেলে অনেক সায়েব বেমালুম বউ-এর কথা ভুলে যায়। তার থেকেও চিন্তার কথা, তোমার একান্ত সচিব সম্পর্কে এত কথা লিখেছে, কিন্তু ভদ্রমহিলা মিস না মিসেস তা জানাওনি।"

লেডি সেক্রেটারী সুজাতা দাস অফিসের কাগজপত্তর নিয়ে সায়েবের ঘরে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো। সায়েব নীল রঙের খাম থেকে নীল রঙের চিঠি বার করে মন দিয়ে পড়ছেন। সুজাতা দেখলো, পড়তে পড়তে সায়েবের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে; কখনও আপন মনে মুখ টিপে হাসছেন। সুজাতা বুঝতে পারে, সায়েব বিরহিণী বধূর সঙ্গে পত্রপ্রেমে ব্যস্ত রয়েছেন! খামের ওপর ভদ্রমহিলার হাতের লেখার সঙ্গে সুজাতা এখন বেশ পরিচিত, কারণ সপ্তাহে দু-তিনখানা চিঠি ওর হাতেই প্রথম এসে হাজির হয়। সায়েব ওই চিঠি পেলেই পড়বার জন্য ছটফট করেন, কোনো একটা ছুতোয় সেক্রেটারীকে ঘর থেকে বিদায় করে দেন।

কুমারী সুজাতা দাস এই ধরনের অভিজ্ঞতা এখনও পায়নি। তাই কৌতূহলের মাত্রাটা বোধহয় বেশী। প্রেমপত্র পড়তে ইচ্ছে করে খুব। সায়েবের সব গোপন পত্রাবলীর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তার, কিন্তু এসব চিঠি ভুলেও কমলেশ টেবিলের ওপর ফেলে রেখে যান না। একই চিঠি দু-তিনবার পড়ে, পকেটে পুরে ফেলেন। নববিবাহিতের এই কাণ্ডকারখানা দেখে সুজাতা দাস মিটমিট করে হাসে।

সায়েবের কাজের চাপও প্রচণ্ড। অনেকদিন সময়মতো দুপুরের লাঞ্চ পর্যন্ত জোটে না। কিন্তু সায়েব যে আজ রাত জেগে বউকে প্রেমপত্র লিখবেন একথা সুজাতা জোর করে বলতে পারে। আগামী কাল সকাল সাড়ে-আটটা নাগাদ সায়েবের স্বহস্তলিখিত একটা ভারী নীল খাম সুজাতার হাতে আসবে। তার

কাজ সামান্য, কোণের দিকে একটা ডাকটিকিট লাগিয়ে পোস্টাপিসে পাঠিয়ে দেওয়া।

এক একবার সুজাতার লোভ হয়েছে খুব সাবধানে সায়েবের চিঠিটা খুলে পড়ে ফেলে। কিন্তু শেষপর্যন্ত লোভ সংবরণ করেছে সে। কেবল সায়েবের স্বহস্তলিখিত নামটা, চন্দ্রমল্লিকা রায়চৌধুরী, বেশ কয়েকবার খুঁটিয়ে দেখেছে।

চিঠিটা খুললেও সুজাতা দাস তেমন কিছু পেত না। দেখতো ওখানেও কারখানা প্রসঙ্গ উঠেছে। এরপব সুজাতার কথাও উঠেছে। কমলেশ লিখেছে, "তুমি এবং স্বতপাদি যা ভয় পাচ্ছ, তাই। যেখানে বাঘের ভয়, সেখানে সন্ধ্যা হয়! সুজাতা দাস কুমারী। বয়সটাও বিপজ্জনক, ত্রিশের সীমান্ত পেরোয়নি। এখানে একলা থাকেন। স্বভাব মধুর, দেখতে বনলতা সেনের মতো, পাখির নীড়ের মতো চোখ দুটি তুলে সবিস্ময়ে কথাবার্তা বলেন। বাড়ি শ্রীরামপুরে।"

শ্রীরামপুরের খবর পেয়ে মল্লিকা লিখেছিল, "সুজাতা দাস এবং শ্রীরামপুর যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে। জিজ্ঞেস কোরো তো ডায়োসেশান স্কুলে পড়তো কিনা?"

কয়েকদিন পরে কমলেশ আবাব চিঠি লিখলো: "কাবখানাব কাজ বেশ এগিয়ে যাচ্ছে। নিজের ছোট্ট কোয়ার্টাবেও গুছিয়ে বসেছি। কিন্তু যে-গৃহে লক্ষ্মী বিরাজ করেন না তা গৃহই নয়, এ-কথা বলছে কেউ কেউ। বিয়ের পর কোথা দিয়ে তিনটে মাস পেরিয়ে গেল, ভাবতে আশ্চর্য লাগে। একটা কিছু হেস্তনেস্ত করে ফেলবো ভাবছি। দিগম্বর বনার্জি আবার আসছেন ইনসপেকশনে, তখন কথাটা পাড়বো। ছুটি চাই-ই। হ্যাঁ, লেডি সেক্রেটারী সুজাতা দাস ডায়োসেশান স্কুলের কথা তুলতেই অবাক হয়ে গেলেন। বনলতা সেন কায়দায় বিস্ফারিত চোখ দুটি তুলে বললেন, ঠিকই ধরেছেন। কেমন করে জানলেন? বললাম, আমার স্ত্রী লিখেছেন। তারপর উচ্ছ্বাস: চন্দ্রমল্লিকা চ্যাটার্জি আপনার স্ত্রী! আমার থেকে তিন বছরের জুনিয়র ছিল। আপনার বিয়ের নেমন্তন্ন পর্যন্ত পেয়েছিলাম; কিন্তু তখন বুঝিনি সেই কমলেশ এবং আপনি এক। দেখুন পৃথিবীটা কত ছোট। সুজাতা দাস এখন আমার খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে খোঁজ করছেন। অফিসের চায়ের কাপটা পরের দিনই চকচকে হয়েছে। বেয়ারাগুলো অফিসঘর পরিষ্কার না রাখার জন্যে মেমসায়েবের কাছে বকুনি খাচ্ছে।"

চিঠি শেষ করে কমলেশ আর একবার পড়লো। বউ ভারি মিষ্টি বাংলা লেখে—তাই তাকেও একটু সাবধানে কলম ধরতে হয়। বউকে আগেই জানিয়েছে, "হাতের গোড়ায় বাংলা অভিধান নেই। সুতরাং বানান বিভ্রাট নিয়ে হাসাহাসি কোরো না।"

ব্রেকফাস্ট শেষ করে চিঠির খামটা হাতে নিয়ে কমলেশ বাড়ির বাইরে এসে দাঁড়ালো। আলো ঝলমল শরতের ভোরবেলা স্নিগ্ধ কৃষিনগরকে বিরল মাধুর্য দান করেছে। সাহিত্যিক না হয়েও শরৎ ঋতুর অরুণ আলোর অঞ্জলির কথা বিরহী কমলেশের মনে পড়ছে। জীপের ওপর উঠে বসলো কমলেশ। সকালবেলায় ড্রাইভারের ওপর নির্ভর করে না সে।

সামনে চওড়া কালো রাস্তা একে-বেঁকে নিজের খেয়ালে নেমে গিয়েছে প্রথমে নদীর ধার পর্যন্ত, তারপর ডান দিকে মুখ ফিরিয়ে কালো রাস্তা সোজা চলে গিয়েছে প্রোজেক্ট সাইটের দিকে। ডানদিকে না বেঁকে বাঁদিকের পথ ধরলেই রেল স্টেশন। তারপর ন্যাশনাল হাইওয়ে। সে পথ ধরে মাইল তিরিশেক গেলেই বড় শহর ধর্মপুর।

টিলা থেকে নামার পথে উল্টোদিক থেকে একটা অপরিচিত নতুন গাড়ি আসতে দেখে জীপের গতি কমিয়ে দিয়েছিল কমলেশ। মনে হলো গাড়ির মধ্য থেকে হাত বাড়িয়ে কে যেন তার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছে।

জীপ এবং প্রাইভেট অ্যামবাসাডর গাড়ি প্রায় মুখোমুখি এসে একসঙ্গে থমকে দাঁড়ালো। প্রাইভেট গাড়ির সুদর্শন মালিক-ড্রাইভার তৎক্ষণাৎ দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন। কমলেশকে নমস্কার জানিয়ে বললেন, "আর একটু হলেই আপনাকে ধরা যেত না।"

চন্দ্রমল্লিকাও ততক্ষণে পিছনের সীট থেকে বেরিয়ে এসেছে। ভোরের আলোয় শিশিরভেজা তাজা শিউলি ফুলের মতো সেও ঝলমল করছে।

কমলেশ একেবারে তাজ্জব। গাড়ির ভেতরে নজর দিলেও চন্দ্রমল্লিকাকে সে প্রথমে চিনতে পারেনি। পারবে কী করে? এখানে এইভাবে তার হাজির হওয়াটা অকল্পনীয়।

পিছনের সীট থেকে আর এক সুবেশিনী বিবাহিতা সুন্দরী বেরিয়ে এলেন। সপ্রতিভভাবে কমলেশের দিকে তাকিয়ে এই যৌবনবতী বললেন, "কেমন সারপ্রাইজ দেওয়া হলো?"

ভদ্রমহিলা যে সুরসিকা এবং সাহসিকা তা কমলেশ অচিরেই বুঝতে পারলো। কমলেশের খুব কাছে এগিয়ে এসে সুন্দরী বললেন, "আমি চন্দ্রমল্লিকার মামাতো বোন কনকলতা। আর এই লোকটি মিস্টার সমরেন্দ্র

রায়—আমার আদমি! আপনার বিয়ের সময় আমরা যেতে পারিনি। তখন ওঁর সঙ্গে বিলেতে ছিলাম। আমরাও এই পাড়াতে থাকি। ধর্মপুরে ব্রিটিশ এক্সপ্লোসিভ লিমিটেডে কর্তাটি গোমস্তাগিরি করেন।"

অপ্রত্যাশিত আনন্দে উৎফুল্ল কমলেশ দু-এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে বউ-এর দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর মল্লিকাকে বললে, "একটা টেলিগ্রাম করে দিলে না কেন?"

মল্লিকা কিছু বলবার আগেই ভদ্রমহিলা চোখ পাকিয়ে জানতে চাইলেন, "কেন করবে? তিন মাস বিয়ে করে বউকে যখন বনবাসে ফেলে রেখেছেন তখন সে কেন আপনাকে খবর পাঠাবে?"

সহাস্য সমরেন্দ্রবাবু এবার মুখ খুললেন। বললেন, "কমলেশবাবু সমস্ত ব্যাপারটাকে সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র বলতে পাবেন। আমরা গাড়ি নিয়ে কলকাতায় গিয়েছিলাম। ফেরবার সময় শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে জানাজানি হলো আপনি এত কাছাকাছি থাকেন। তখন সবাই মিলে ফন্দি আঁটলো, আপনাকে একেবারে অবাক করে দেওয়া হবে।"

"মেঘ না চাইতে জল, একে বলে! বুঝলেন মশাই?" সমরেন্দ্র-পত্নী মন্তব্য করলো। "ভাবছেন, অবলা বধূ অ্যাডভেঞ্চার করতে পারবে না, তাই এখানে যা-খুশী তাই চালিয়ে যাবেন। এবার বুঝুন! ইণ্ডিয়া এখন মেয়ে-মদ্দদের খপ্পরে, এটা আপনি এবং এই ভদ্রলোক দুজনেই মনে রাখবেন।" মল্লিকার বোন আঙুল দিয়ে নিজের স্বামীকেও সাবধান করে দিলো।

সমস্ত পরিবেশটা হাল্কা করে দিয়ে সমরেন্দ্রবাবু বললেন, "আপনার গৃহিণী, অর্থাৎ, আমাদের ঝুমু কিন্তু খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছিল, স্বামীর কাছে না পৌঁছে আমরা অন্য কোথাও চলে যাবো কিনা। যাক সেসব কথা। ঝুমুর মা এবং আপনার বাবাকে এখনই খবর পাঠাতে হবে। তার আগে আপনি ডেলিভারি চালানে সই করে দিন: রিসিভড্ ওয়ান বউ কমপ্লিট—ইনট্যাক্ট কনডিশন!"

"হ্যাঁ, সমরেনদা, পুরো গতটাই লিখিয়ে নিন, রেলের চালানে যেমন লেখা থাকে।" চন্দ্রমল্লিকা হাসিমুখে স্বামীর বিরোধীপক্ষে যোগ দিয়ে বললে।

"তাহলে আরও লেখাতে হয়, ইন ফুল অ্যাণ্ড ফাইন্যাল স্যাটিসফ্যাকশন।" সমরেন্দ্রবাবু মন্তব্য করলেন।

"স্যাটিসফ্যাকশন যে হয়েছে তা তো ভদ্রলোকের মুখ দেখেই বুঝতে পারা যাচ্ছে!" মল্লিকার বোন কমলেশকে একটু বিব্রত করবার জন্যেই যেন বলে উঠলো। কনকলতা কী যেন ভাবলো। সে এবার বললে, "উঁহু, বউ আমরা

ডেলিভারি দিচ্ছি না। নিতান্ত আমার বোন মুষড়ে পড়েছিল, তাই বরকে চোখের দেখা দেখিয়ে দিলাম। এবার নিয়ে যাবো ধর্মপুরে এবং সেখান থেকে কলকাতায়।"

কমলেশ খুশিতে উচ্ছল হয়ে বললে, "ব্যাপারটা নিয়ে যখন গোলমাল এবং মতদ্বৈধ রয়েছে, তখন বাড়িতে চলুন।"

চন্দ্রমল্লিকা আবার জামাইবাবুর প্রাইভেট গাড়িতে উঠতে যাচ্ছিলো, কিন্তু বোন কনকলতা গম্ভীর মুখ করে কমলেশকে বললে, "এইটুকু পথ স্ত্রীকে গাড়িতে রাখবার অনুমতি দিচ্ছি!"

চন্দ্রমল্লিকা এসে স্বামীর পাশে বসলো। কমলেশ এবার জীপ গাড়িটা ঘুরিয়ে নিলো। তারপর জীপ এবং অ্যামবাসাডর গাড়ি টিলার দিকে চলতে লাগলো।

পিছনে গাড়ি না থাকলে কমলেশ এখানেই স্ত্রীকে একটা চুমু খেত। আলতোভাবে সে কেবল মল্লিকার হাতে একটু হাত ঠেকালো। হাতটা প্রবলভাবে চেপে ধরলো চন্দ্রমল্লিকা। কয়েকমুহূর্ত পরে শান্ত হয়ে সে বললে, "তোমাকে বেশ বিপদে ফেলে দিলাম তাই না?"

"প্রত্যেকটি স্বামী প্রতিদিন এমন বিপদে পড়তে রাজী আছে। এমন যে একটা সম্ভাবনা আছে, আমি কল্পনাও করতে পারিনি," কমলেশ গাড়ি চালাতে চালাতে বললে।

চন্দ্রমল্লিকা বললে, "আমার সাহস হচ্ছিলো না। তোমাদের বাড়িতে গেলাম। বাবা খুব উৎসাহ দিলেন, বললেন, হতভাগাটা যখন একবারও এলো না, তখন বউমা একটু শিক্ষা দিয়ে এসো।"

"বাবাকে তুমি একেবারে হাত করে ফেলেছ," কমলেশ বললে।

"ফুলশয্যার পরদিন থেকেই স্বামী যার হাতছাড়া হয়ে গেল, তার আর উপায় কী?" চন্দ্রমল্লিকার সাহস বেড়ে গিয়েছে। বেশ চটপট উত্তর দিচ্ছে।

মালপত্তর নামিয়ে কমলেশ বললে, "আমার চাকর শ্রীমান একটু বাজারে বেরিয়েছে।"

কনকলতা এবার অফিসের কথা তুললে। সোজা প্রশ্ন করে বসলো, "অফিস থেকে আপনাদের ক'জন চাকর দেয়?"

"কোম্পানি থেকে একজনও নয়। নিজের মাইনে থেকে যতজন খুশী রাখতে পারেন," কমলেশ জানালো।

স্ত্রীর প্রশ্নে সময়েন্দ্রবাবু একটু অস্বস্তি বোধ করলেন। বললেন, "ওসব কথা

থাক। এখন তোমরা দুই বোনে দুই স্বামীর জন্যে সটাসট চা তৈরি করে ফেলো।"

কনকলতা কপট রাগ দেখিয়ে কমলেশকে প্রশ্ন করলে, "আপনাকে বউ পুরস্কার দিয়ে এই আমার লাভ হলো ?"

কমলেশ বললে, "এখানকার যন্ত্রপাতি বুঝতে আপনাদের একটু সময় লাগবে। সুতরাং প্রথম রাউণ্ড চা আমিই করে খাওয়াচ্ছি।"

ওরা আপত্তি করেছিল। কিন্তু কমলেশ শোনেনি। সিলিণ্ডার গ্যাস জেলে চটপট জল গরম করে ফেলেছিল।

কনকলতা চায়ের কাপে মুখ দিয়ে স্বামীকে খোঁচা দিয়ে বললে, "শেখো, বউকে কেমন করে সেবাযত্ন করতে হয়।" কমলেশের দিকে মুখ ফিরিয়ে কনক জিজ্ঞেস করলে, "এমন সুন্দর চা করতে শিখলেন কেমন করে ?"

কমলেশ হেসে বললে, "আমাদের ডিরেকটর দিগম্বর বনার্জির পাল্লায় পড়ে। ল্যাবরেটরিতে যখন-তখন হুকুম করবেন, কমলেশ চা করো।"

আঁতকে উঠলো কনকলতা। "অ্যাঁ! আপনাদের কোম্পানিতে এটা অ্যালাউড ? ডিরেকটর চায়ের হুকুম করবে ? কেন ? বেয়ারা নেই ?"

কনকের প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ কমলেশ গায়ে মাখলো না। বললে, "অনেক সময় গভীর রাত পর্যন্ত ল্যাবরেটরিতে কাজ হয়। তখন কোথায় বেয়ারা ? থাকার মধ্যে আমরা কয়েকজন এবং ডকটর বনার্জি ! উনি তো বলেন, চায়ের কেমিস্ট্রি যার আয়ত্তে এলো না সে ফার্টিলাইজারের জটিল রসায়ন কী করে বুঝবে ?"

কমলেশ এবার অফিসে ফোন করে দিলো। "মিস দাস, আমার যেতে একটু দেরি হচ্ছে। অ্যামোনিয়া প্লান্টের কোঅর্ডিনেশন মিটিংটা এক ঘণ্টা পিছিয়ে দিন। সাইকেল পিওন দিয়ে সবাইকে প্লান্টে খবর পাঠাতে হবে, না হলে কাজ বন্ধ করে প্রোজেক্ট অফিসে ওঁরা অপেক্ষা করবেন।"

"তুমি মিটিং সেরে এলেই পারতে।" চন্দ্রমল্লিকা বললে। আমরা ততক্ষণ গল্প-গুজব করতাম।"

"রাখ রাখ", বোনকে মিষ্টি মুখ-ঝামটা দিয়ে উঠলো সুরসিকা কনকলতা। "তিন মাস পরে বউ এসেছে, এখন মিটিং ! আমার কর্তার অফিসেও মিটিং হয় —কিসসু নয়। পট পট কফি আসে, প্যাকেট প্যাকেট কোম্পানির সিগারেট ধ্বংস হয় এবং আলোচনার ছদ্মবেশে আড্ডা চলে। অফিসের মিটিং এবং লেডিজ কফি মিট-এর মধ্যে কোনো তফাত নেই।"

মুখ টিপে হাসতে লাগলো সবাই। কমলেশ আর একটা ফোন করলে

সুদর্শন সেনকে। "দুটো খাট ভাড়া করতে চাই, মিস্টার সেন।"

"এখানে আর কোথায় ভাড়া পাবেন। দুটো লোহার কট পাঠিয়ে দিচ্ছি।" সেন বললেন।

কনকলতা বললে, "শুনুন রায়চৌধুরী মশাই। আমরা দুজনে পিঠোপিঠি বোন—এক সপ্তাহের ফারাকে। একই হাসপাতালে দুজনে ভূমিষ্ঠ হয়েছি। আমাব দাদামশায়, অর্থাৎ আপনার গিন্নির দাদু ছিলেন পুষ্প প্রেমিক। আমাদের নাম রাখলেন চন্দ্রমল্লিকা এবং কনকলতা। বিয়েটা আমার এক বছর আগেই হয়েছে। সুতবাং বোনকে আপনার সংসারে চালু করে দেবার দায়িত্ব আমাকেই নিতে হবে।"

নতুন বউকে চালু করে দেওয়া কথাটা কমলেশের বেশ ভাল লাগলো। কনকলতাকে সে বললে, "আমাদের প্রোজেক্টে যারা মেশিন বিক্রি করে, তাদের সঙ্গেও ওইরকম চুক্তি থাকে। মেশিন চালু করে দেবার দায়িত্ব প্রয়োজন হলে তাদের ঘাড়ে চাপানো যেতে পারে।"

চাকর ফিরে আসতেই কমলেশ তাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলো। তারপর ওদের অনুমতি নিয়ে একবার কর্মস্থলে চলে গেল। পর পর কয়েকটা মিটিং ছিল। বিভিন্ন বিভাগের প্রধানদের সঙ্গে সপ্তাহে দুবার মুখোমুখি বসার ব্যবস্থা কমলেশই চালু করেছে। যার যা সমস্যা থাকে সামনাসামনি আলোচনা হয়ে যায়। অন্য সবাই জানতে পারে কাজ কতখানি এগোলো। দিগম্বর বনার্জির মতো কমলেশ রায়চৌধুরীও যে অনাবশ্যক চিঠি লেখায় বিশ্বাস করেন না তা সবাই জেনে গিয়েছে।

কমলেশ বললে, "আপনারা জানেন, আমরা ডঃ বনার্জির কাছে প্রতিশ্রুতি-বদ্ধ যে সাতই ডিসেম্বরের মধ্যে কারখানা পুরো চালু করে দেবো। সেই অনুযায়ী ডঃ বনার্জি হেড অফিসে এবং অন্যত্র নানা ধরনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আমাদের একজন কাজে পিছিয়ে পড়লে অন্য সকলের পরিশ্রম বিফলে যাবে। জন্যে আমি চাই যার ওপর যতটা দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ততটা যেন নির্ধারিত সময়ের আগেই শেষ হয়ে যায়।. যেসব ঠিকাদার আপনার কাজ করছে তাদের ওপর প্রতিদিন নজর রাখবেন। প্রতিদিন তদারক করলে বড়, রকমের ভুল হবার সম্ভাবনা কম।"

কমলেশ. জিজ্ঞেস করলে, "মিস্টার হাজরা, আপনার পাইপ লাগানোর কাজ কেমন এগোচ্ছে?"

"প্রগ্রেস রিপোর্ট আমি আজই পাঠিয়ে দিচ্ছি," হাজরা উত্তর দিলেন।

কমলেশ বললে, "মনে রাখবেন, পাইপ হলো কেমিক্যাল ফ্যাকটরির শিরা উপশিরা—সেখানে থম্বসিস হলে কারখানা বাঁচবে না।"

হাজরা বললেন, "সিনথেটিক অ্যামোনিয়া প্লাণ্টের পাইপ বসানো শেষ। আমরা এখন ঢালগুলো চেক করছি।"

"ওয়েল্ড করে জোড়া পাইপ সম্পর্কে ডঃ বনার্জি একটু খুঁতখুঁতে সেকথা আপনি তো জানেন। ওয়েলডিং ঠিক না হলে বিপদ।" কমলেশ বললে।

হাজরা উত্তর দিলো, "তা যা বলেছেন স্যার। তার ওপর দেশী ঠিকাদার। সায়েব কোম্পানিকে কাজটা দিলে চিন্তা থাকতো না। হরিয়ানা ফার্টিলাইজারে পাইপ বসিয়েছিল হল্যাণ্ডের ওভারসিজ পাইপ কোম্পানি। ছবির মতো কাজ। সায়েবটা আমাদের বলে দিলো, তোমরা নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমোতে যাও, ঘুম থেকে উঠে পাইপ লাইন পেয়ে যাবে।"

কমলেশ হাসলো। তারপর বললে, "ডকটর বনার্জির ওইখানেই আপত্তি। আমাদের ঘুম পাড়িয়ে রেখে সায়েববা কাজ করে দেবে সে-যুগ এদেশে উনি আর থাকতে দেবেন না। সুতরাং আমাদের স্বদেশী পাইপ কোম্পানিকে দিয়েই কাজ করাতে হবে। আপনি পাইপ-লাইনের প্রত্যেকটা বড় বড় জোড়ের জায়গা এক্স-রে করার ব্যবস্থা করুন। চন্দনপুর ল্যাবে এক্স-রে ইনচার্জ মিস্টার আয়ার রয়েছেন, ওঁর সঙ্গে এখনই ফোনে কথা বলুন।"

ইউরিয়া প্লান্টে পাইপের ইনচার্জ পাণ্ডের স্ত্রী সন্তানসম্ভবা। স্ত্রীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে খোঁজখবর নেবার পর কমলেশ বললে, "মিস্টাব পাণ্ডে, আপনি চিন্তা করবেন না। চন্দনপুব হাসপাতালে ধাত্রীবিদ্যার প্রধান ডাঃ সেনগুপ্ত আমার বন্ধু। আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলেছি। কাজ কী রকম চলছে বলুন?"

পাণ্ডে বললেন, "টারগেট থেকে সামান্য একটু পিছিয়ে আছি আমরা। এই শনি-রবিবারে কাজ চালিয়ে সেটা মেক-আপ করতে রাজী ছিল কণ্ট্রাক্টর সিং। কিন্তু পাইপ এখনও পেলাম না, স্যার।"

"সে কী?" কমলেশ এবার সুদর্শন সেনের দিকে তাকালেন। সুদর্শন সেন বললেন, "জামসেদপুরে দুবার টেলিগ্রাম পাঠিয়েছি। রোজই শুনছি পাইপ এসে যাবে।"

কমলেশ বললে, "ওখানকার মিস্টার সুন্দরম্ আমাদের ডকটর বনার্জির বিশেষ বন্ধু। আজই আপনি লোক পাঠিয়ে দিন জামসেদপুরে। পরশু সকালে আমরা আবার পরিস্থিতি পর্যালোচনা করবো।"

দ্বিতীয় মিটিংয়ের পরেই কমলেশ একবার বাড়িতে ফোন করেছে। চাকর

ফোন ধরলো। মাঈজীকে ফোন দিতে বলায় জানালো মেমসাব গোসল করছেন। সমরেন্দ্রবাবু ফোন ধরে বললেন, "আপনি চিন্তা করবেন না। সব ঠিক হয়ে যাবে। রান্নাঘর থেকে যেরকম গন্ধ-টন্ধ ভেসে আসছে তাতে মনে হয় মধ্যাহ্ন-ভোজন খারাপ হবে না।"

সেক্রেটারীকে অনেকগুলি চিঠি ডিকটেশন দিলো কমলেশ। তারপর সুদর্শন সেনের কাছে গেল। "মিস্টার সেন, একটু পরামর্শ দিন কিছু কাঁচের থালাবাসন দ্রুত কিনতে চাই।"

"একি আর কলকাতা, যে টাকা ফেললেই সব জিনিস পাবেন। ধর্মপুরে লোক পাঠাতে হবে।" সুদর্শন সেন এবার একটু কৌতুহলী হয়ে উঠলেন। এবং প্রশ্নোত্তরে জানলেন মিসেস রায়চৌধুরী বিনা নোটিশে হঠাৎ হাজির হয়েছেন।

"একটু বিপদে পড়া গেছে, বাড়িতে অতগুলো বাসন আছে কিনা সন্দেহ।" কমলেশ জানায়।

"বিপদে ফেলার জন্যেই তো স্যার এগুলো করা হয়। আমার অভ্যাস আছে, ভিজিল্যান্স-এর লোকেরা এইভাবে মাঝে-মাঝে সারপ্রাইজ ভিজিট দেয়।" সুদর্শন সেন কিছুতেই শুনলেন না। বললেন, "আমার বাড়ি থেকে কিছু বাসন দিচ্ছি। ছাবা-দেবীর সংসার হলেও, আমার গিন্নি রাবণের ফ্যামিলিকে আপ্যায়নের মতো বাসন জমা করে রেখেছেন। ওটাই ওঁর হবি—চিনেমাটি, পেতল, কাঁসা, তামা, এলুমিনিয়াম, এনামেল, স্টেনলেস ষ্টিল, হিন্দালুমিন কিছুই বাদ দেননি।"

বাসনপত্তর নিয়ে বাড়িতে হাজির হয়ে কমলেশ অবাক হয়ে গেল। টেবিলে বেশ কয়েকটা ডিশ সাজানো রয়েছে।

কমলেশের হাতে ডিশগুলো দেখে কনক সকৌতুকে বললে, "মিটিংয়ের নাম করে বাসন জোগাড় করতে গিয়েছিলেন নাকি?"

কমলেশ বেচারা একটু অস্বস্তিতে পড়ে গেল। স্বামীর এই অবস্থা দেখে চন্দ্রমল্লিকা হাসতে আরম্ভ করলো।

কনক বললে, "ছেলের দোষে বৌমা যাতে কষ্ট না পান তার জন্যে আপনার বাবা এবং মা অনেক জিনিস গুছিয়ে দিয়েছেন। সঙ্গে যে অতগুলো ট্রাঙ্ক এবং প্যাকিং বাক্স নামলো কী জন্যে?"

বেশ হৈ-চৈ করে সকলে খেতে বসে গেল। রান্নার স্বাদটা যে আজকে অন্যরকম লাগছে তা কমলেশ জানিয়ে দিলো। কনকলতা সঙ্গে সঙ্গে সুযোগের

সদ্ব্যবহার করলো। বললে, "লাগবেই তো। আপনার বউ-এর হাতে একটু হলুদ দিয়ে সেই হাতধোয়া জল তরকারিতে ঢালা হয়েছে—মিষ্টি তো হবেই!"

চন্দ্রমল্লিকা বললে, "রিংকির কথা বিশ্বাস কোরো না। ও নিজেই রেঁধেছে।"

শোবার ঘরে ঢুকে অবাক হয়ে গেল কমলেশ। এরই মধ্যে সাজিয়ে-গুছিয়ে সমস্ত ঘরে শ্রী ফিরিয়ে এনেছে চন্দ্রমল্লিকা। বিছানা আর অবিন্যস্ত নেই। খাটের ওপর নতুন একটা বেড কভার টান টান করে পাতা রয়েছে। মাথার গোড়ায় র‍্যাকে বইগুলো সুন্দর করে সাজানো। পেন এবং লেখার প্যাড যথাস্থানে যোগ্য সমাদর পেয়েছে। সিগারেটের ছাইদানি একেবারে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। টেবিলের কোণে একগ্লাস জলও আছে—কিন্তু আঢাকা নয়, মাথার ওপর একটা ডিশ উল্টে দেওয়া রয়েছে।

কনকলতা ড্রইংরুমে বসে ম্যাগাজিন পড়ছিল। চন্দ্রমল্লিকা ওকে ধরে নিয়ে এলো। চাপা হেসে কনক এবার কমলেশকে আক্রমণ করলে। "খুব তো নিজের দেশকে আত্মনির্ভরশীল কথে তোলার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন; সেই জন্যে ফুলশয্যার বউকে পর্যন্ত ফেলে রেখে চলে এসেছেন। কিন্তু বাড়িতে ঢুকেই বুঝলাম বউনির্ভর হওয়া ছাড়া আপনার গতি নেই!"

"আমার ছবি তুলে রাখার ইচ্ছে ছিল। বউ আসিবার পূর্বে ঘরের অবস্থা; বউ আসিবার পরের অবস্থা; দেখুন, বউরা আপনাদের জীবনে কী ভূমিকা পালন করে।" কনকলতা নির্দ্বিধায় শুনিয়ে দিলো।

"আপনার প্রত্যেক কথা বিনা প্রতিবাদে মেনে নিচ্ছি," কমলেশ সহাস্যে সারেণ্ডার করলো।

কনকলতা বললে, "শুধু মেনে নিলেই হবে না, বউদের আরও দায়িত্ব দিতে হবে। বুঝলেন রায়চৌধুরী সাহেব?"

"পুরো দায়িত্ব তো দিতে চাই আমরা" কমলেশ উত্তর দিলো।

কনকলতা তার অল্পবয়সী সুন্দর চোখ দুটো আরও টানা টানা করে বললে, "রাখুন রাখুন। পুরুষমানুষরা এ-দেশে বউকে রাঁধুনি এবং বিছানা-সঙ্গিনী করে রাখতে চায়। জীবন-সঙ্গিনী হবার সুযোগ মেয়েরা পায় না।"

কমলেশ বললে, "দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বিছানায় বসুন!"

ঠোঁট উল্টে কনক বললে, "কোন দুঃখে? আমার কী কর্তা নেই?" উনি ওখানে একলা বসে আছেন।"

"আপনারা দুজন বরং এই ঘরে বিশ্রাম করুন" কমলেশ অনুরোধ করে।

আবার ঠোঁট উল্টে চোখে অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত করে কনক বল্লে, "থাকেন তো বনবাসে। কিন্তু কবে বউ এসে পড়বে এই আশায় নিজের ঘরটিতে ডবলসাইজের খাট পেতে রেখেছেন। অন্য কারুর তো ব্যবস্থাই দেখছি না।"

কমলেশ হেসে বললে, "এটা অতিথিদের জন্যেই। আরও দুটো সিঙ্গল খাট আধঘণ্টার মধ্যেই এসে পড়ছে দেখবেন।" ঘড়ির দিকে তাকালো কমলেশ। বললে, "আমি আব একবার সাইট থেকে ঘুবে আসি। আপনারা ততক্ষণ একটু গড়িয়ে নিন। ফিরে এসে অনেক রাত্রি পর্যন্ত গল্পগুজব চলবে।"

কনক আবাব ভ্রূধনু ভঙ্গ করলো। "চলবে, তবে আমার সঙ্গে নয়। এঁর সঙ্গে। আমি এবং আমার বব ততক্ষণ ধর্মপুবে আমাদের কোয়ার্টারে।"

অনেক অনুনয় বিনয় কবেছিল কমলেশ। কিন্তু ওবা শোনেনি। বলেছিল বিকেলের চা খেয়েই তাবা বওনা দেবে। সন্ধ্যে সাড়ে-ছ'টাব মধ্যে নিজেদের আস্তানায় পৌঁছে যাবে।

কমলেশ বলেছিল, "সমবেনবাবু, আমি সাইটে যাবো আব ফিরবো। ততক্ষণ, স্ত্রী ও শ্যালিকা দুজনেবই সেবাযত্ন আপনি উপভোগ করুন।"

স্তব্ধ দুপুরে দুই বোন এক বিছানায় শুযে পড়েছে। মল্লিকা বলছে, "সমরেন-বাবুর ওপর সুবিচার হচ্ছে না। তোবা দুজনে এখন বিশ্রাম নে। আমি অন্য ঘরে সোফাতে একটু গড়িয়ে নিই!"

"বাজে বাজে বকিস না, ঝুমু," মুখ ঝামটা দিলো কনকলতা। "একটু বিরহ ব্যথা ভোগ করুক না—আখেরে ফল ভাল হবে।"

"তুই ভারি অসভ্য রিংকি," চিমটি কাটলো চন্দ্রমল্লিকা।

দুষ্টু হাসিতে মুখ ভরিয়ে চুলেব খোঁপাটা আলগা করতে করতে কনক বললে, "বিয়ে হয়ে যাবাব পরে সভ্যতা-অসভ্যতা বলে কোনো জিনিস থাকে না, বুঝলি বোকচন্দ্র? ইতিহাস মুখস্থ করলি, মনোবিজ্ঞান তো জানলি না।"

বোনের ডান হাতটা ধরে মল্লিকা দুটো আঙুল মটকে দিলো। কনক বললে, "আমার হাত ধরে আর কী হবে? কয়েক ঘণ্টা পরে আসল লোকের আঙুল টিপবি।"

"উঃ! রিংকি, বিয়ের আগে তো তুই এমন ঠোঁটকাটা ছিলিস না," মল্লিকা

লজ্জা ঢাকবার ব্যর্থ চেষ্টা করলো।

একটু পরে নিজের পা নাড়তে নাড়তে কনক বললে, "ঝুমু!"

"বল!"

"তোর মনের অবস্থাটা এখন কেমন?" কনক জানতে চাইলো।

মল্লিকা বললে, "তোকে ঠিক বোঝাতে পারবো না রিংকি। তবে খু-উ-ব ভাল লাগছে।"

"এই ভাল-লাগাটাই বিবাহিত জীবনের সব, বুঝলি ঝুমু। যেদিন বরের কথা ভেবে বুকের কাছটা চনমন করে উঠবে না, যেদিন সংসারের অর্থহীন খুঁটিনাটির মধ্যে মধুর কৌতূহল খুঁজে পাওয়া যাবে না, সেদিন বিবাহিত জীবনটা ডবল সেদ্ধকরা চায়ের পাতার মতো বিষাক্ত হয়েগিয়েছে বুঝতে হবে।"

"এখন ওসব ভাববার মতো ক্ষমতাও আমার নেই, রিংকি, তোকে সত্যি কথা বলছি। শুধু খুউব ভাল লাগছে।"

একটু পরে রিংকি জিজ্ঞেস করলে, "ঝুমু, তুই ঘুমিয়ে পড়লি নাকি? রাত্তিরের নাটকের জন্যে তৈরি হচ্ছিস?"

রাত্রের কথাই ভাবছিল ঝুমু। ধরা পড়ে গিয়ে লজ্জায় মুখটা লাল হয়ে উঠলো। বোনের দিকে মুখ না ফিরিয়ে সে কোনোরকমে বললে, "না রে জেগে রয়েছি।"

"জীবনে একদিন মাত্র যাকে একলা পেয়েছিস, সে তোকে এমনভাবে সর্বস্বান্ত করলে কী করে?" রিংকি এবার বোনকে চিমটি কাটলো।

"সত্যি রিংকি। কেমন করে এমন হয় বল তো? মল্লিকা চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলে।

ঘরের সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে কনক বললে, "আমরা এইভাবে পুরুষ-মানুষদের জন্যে আই-ঢাই করি, অথচ ছেলেরা কেমন নিস্পৃহ ত্থাখ। বউকে ফেলে রেখে তোর বর কেমন চলে গেল মাঠে গোরু চরাতে।"

"গোরু না চরালে জরুকে খাওয়াবে কী করে?" স্বামীকে সমর্থন করে মল্লিকা। নতুন পদোন্নতি হয়েছে বেচারার।"

"হ্যাঁরে, তোর বরের এখন কী পোস্ট?"

"প্রোজেক্ট ম্যানেজার।"

"মাইনে কত পাচ্ছে তোর বর?"

"জানি না।"

মল্লিকার উত্তর শুনে কনক আঁতকে উঠলো। জিজ্ঞেস করলো, "ফুলশয্যায়

শুয়ে সারা রাত ধরে করলি কী ?"

"বা রে, প্রথম রাতে এসব কথা কেউ জিজ্ঞেস করে নাকি ?"

"জিজ্ঞেস করে না। স্বামীরা নিজেই বলে। আমার স্বামী তো বলেছিল।"

মল্লিকা একটু ঘাবড়ে গেল। তারপর বললে, "ও একবার অফিসের কথা তুলেছিল। ওর সাধনার কথা—কী সব আবিষ্কারের চেষ্টা করছে।"

"তুইও গলে গেলি—ভাবলি আইনস্টাইনের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে তোর।" রিংকি মুখ ঝামটা দিলো।

"দিগম্বর বনার্জি ওদেব বিসার্চ ডিরেকটর। খুব ভালবাসেন ওকে।"

"নিজের কাজ হাসিল হলে সব ডিরেকটব তার কর্মচারিদের ভালবাসে," কনক অবিশ্বাসের স্বরে বললে।

"তুই তো অনেক খবব রাখিস," মল্লিকা বললে।

"তুই কি ভাবছিস, বিয়ে মানে শুধু পাখির মতো বরের ঠোঁটে ঠোঁট ঠেকিয়ে বসে থাকা ? স্বামাদের ঠিক মতো চালানো শিক্ষিত মেয়েদেব একটা মস্ত দায়িত্ব।"

"ওরে বাবা !

"ওরে বাবা নয়," আবার চিমটি কাটলো কনকলতা। "অনেক ছেলে থাকে, একেবাবে হাঁদাগঙ্গারাম। অফিসে খেটেই মরে, মালিকরা ঠকায়।"

মল্লিকা বললে, "প্রাইভেট কোম্পানিতে মালিক থাকে। ওদের গভরমেণ্ট অফিস।"

রিংকি খিলখিল করে হেসে উঠলো। বললে, "দুনিয়ার সব মালিকই এক, কিবা প্রাইভেট কিবা গভরমেণ্ট। ভাবছিস গভরমেণ্ট ঠকাতে পারে না ? সুযোগ পেলে ভগবান পর্যন্ত ঠকাতে ছাড়ে না ! যাক গে ওসব কথা। এখন একটু ঘুমিয়ে নে ! না হলে রাতে বর বিরক্ত হবে।"

ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে কমলেশ বাংলোর বাগানে এসে বসেছিল। মল্লিকা খালি পায়ে ঘাসের ওপর এসে দাঁড়িয়েছিল। কমলেশের নজর পড়ায় টুক করে ভিতর থেকে হাওয়াই চটি এনে হাজির করলো। বললে, "পরে ফেলো। এখানকার শিশিরভেজা ঘাসগুলো সহজেই ঠাণ্ডা লাগিয়ে দেয়।"

পূর্ব আকাশের সূর্য সাত সকালে তাঁর ডিউটি শুরু করে দিয়েছেন। ভোরের

আলোতে বাংলোর এই উঁচু জায়গা থেকে কৃষিনগরের প্রায় সবটা দেখা যাচ্ছে। আশপাশে আর কোনো বসতি নেই। শালকাঠ আর কাঁটা তারের বেড়া কৃষিনগরের পাঁচশ' একর জমি ঘিরে রয়েছে। বেড়ার ধারে ধারে ছোট ছোট একতলা কোয়ার্টাব তৈরি হয়েছে অনেকগুলো। পশ্চিম দিকে কিছু বড বড় বাড়ি। ওগুলো সুপারভাইজারদের কোয়ার্টার। তার পাশে অফিসারদেব কলোনি এবং আরও দূরে গেস্ট হাউস। মূল কারখানাকে কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে শহরটা বৃত্তাকাবে গড়ে উঠবে। কাবখানা ঘিরে রিং রোডেব মতো রাস্তা। আরও অনেকগুলো চওডা রাস্তা বিভিন্ন দিক থেকে এসে রিং রোডে মিশেছে।

ফুলের নামে কৃষিনগবে রাস্তার নাম দেবেন এই ঠিক করেছেন দিগম্বর বনার্জি। গোলাপ অ্যাভিন্যুতে থাকবে শুধু গোলাপ গাছ, লোকের চিনতে অসুবিধে হবে না। কৃষ্ণচূড়া সরণিতে থাকবে কৃষ্ণচূড়া ফুলের সারি, পলাশ পথ-এ কেবল পলাশ গাছ। তাব পবেই রজনীগন্ধা বোড—যে রাস্তায় দু ধারে শুধু রজনীগন্ধার চাষ হবে।

কমলেশ দেখলো রূপসী মল্লিকা পটে আঁকা ছবিব মতো এক মনে সুদূরের দিকে তাকিয়ে আছে। কারখানাটা প্রকৃতির ক্যানভাসে শেষ-না-করা ছবির মতো অস্পষ্ট হযে বযেছে। ফুলেব মতো তাজা এবং পবিত্র মল্লিকাকে বার বার দেখছে কমলেশ। পাতলা টেরিনকটন শাড়ি পডেছে মল্লিকা। ব্লাউজের রঙ লাল। সেই লালের ওপর এসে পড়েছে স্নিগ্ধ ভোবের সোনালি আলো। বধূর হাতে সোনার কাঁকন এবং লাল শঙ্খেব বালা। চুলটা ভোববেলায় নিখুঁতভাবে গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করেনি মল্লিকা। খোলাই রয়েছে বেণী। বাডন্ত লাউডগাব মতো দু-একটা কোঁকড়া চুল কপাল পেরিয়ে মুখে এসে পড়েছে।

সামনের টেবিল থেকে লাইটার এবং সিগারেট তুলে নিলো কমলেশ। হাতের কাছে ক্যামেরা থাকলে এই মিষ্টি মুহূর্তের একটা ছবি সে অবশ্যই তুলে নিত।

সুন্দর হরিণচোখ দুটো বিস্ময়ে বড় বড় করে চন্দ্রমল্লিকা জিজ্ঞেস করলে, "ঐ যে দূরে যা-কিছু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, এসবের কর্তা তুমি ?"

কমলেশ ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো।

"এখানে যত লোক কাজ করে তারা সবাই তোমার হুকুম শুনবে?" চন্দ্রমল্লিকা বেশ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে।

"তা এখন হাজারখানেক লোক প্রতিদিন এখানে কাজ করছে।" একটু থামলো কমলেশ। তারপর কারখানার দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে বললে, "সেইটাই তো দুশ্চিন্তা। এতগুলো লোককে ঠিক মতো কাজ করিয়ে নির্ধারিত দিনের মধ্যে এই কারখানা চালু করতে হবে।"

চন্দ্রমল্লিকার বিস্ময়ের শেষ নেই। জিজ্ঞেস করে, "প্রত্যেকটা লোক কী কাজ করছে তুমি জানো?"

"তা জানি বৈকি। আমাদের নকশায়, আমাদের প্রোজেক্ট রিপোর্টে সব খুঁটিনাটি লেখা আছে। সেই রিপোর্ট তৈরি হয়েছে চন্দনপুর রিসার্চ ল্যাবে দিগম্বর বনার্জির নির্দেশ মতো। আমরা এখানে যা করতে যাচ্ছি, পৃথিবীতে তা এখনও পর্যন্ত হয়নি।"

"পৃথিবীতে হয়নি। বলো কি? তোমার ভয় করে না?" সুপুষ্ট বুকের ওপর আঁচল টানতে টানতে চন্দ্রমল্লিকা জিজ্ঞেস করে।

কনুইটা টেবিলে এবং চিবুকের ভার হাতের ওপর রেখে কমলেশ বললে, "ভয় পাবারই কথা। কিন্তু দিগম্বর বনার্জি কাউকে ভয় পান না। নিজের হাতে তিনি কৃত্রিম অ্যামোনিয়া এবং ইউরিয়া বিকভাবির নতুন পথ বার করেছেন।"

"তাহলে বিজ্ঞানের ইতিহাসে ভদ্রলোকের নাম লেখা থাকবে তো?" ছোট্ট মেয়ের মতো সরল বিস্ময়ে মল্লিকা জিজ্ঞেস করে।

বউ-এর দিকে তাকিয়ে প্রসন্ন কমলেশ বললে, "ইতিহাসে ক'জনের আর নাম থাকে? প্রতিদিন শত শত আবিষ্কারের আবেদন তো বিভিন্ন দেশের পেটেন্ট অফিসে জমা হচ্ছে। তবে দিগম্বর বনার্জির স্বপ্ন সফল হলে আমাদের এই হতভাগা দেশের কিছু উপকার হবে। অন্তত একটা বিষয়ে আমরা পর-নির্ভর থাকবো না।"

মল্লিকা চায়ের জল চাপিয়ে এসেছিল। এবার চা ভিজিয়ে টিপট এনে টেবিলে জমা করলো। কমলেশ ওকে সাহায্য করতে গেল। কিন্তু মল্লিকা সাবধান করে দিলো, বউ-এর কাজ যেন বউকে করতে দেওয়া হয়। চায়ের চামচের সঙ্গে মল্লিকার চুড়িগুলোও মিষ্টি সুরে বাজতে লাগলো।

কমলেশ বললে, "তোমাকে একদিন কারখানার সাইটে নিয়ে যাবো। ইতিহাসের ছাত্রী তুমি, মালমসলা যোগাড় করে নতুন ভারতবর্ষের একটা ইতিহাস লিখে ফেলতে পারো।"

"ওরে বাবা! এখন পড়াশোনার নাম শুনলেই, আমার হাই ওঠে। বাপীর

বন্ধু ডকটর সিন্‌হা বলেছিলেন, তুই আমার আণ্ডারে রিসার্চ কর। বিষয়ও ঠিক করে দিয়েছিলেন : মীরজাফর ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ।"

কমলেশ হাসলো। বললে, "বৈজ্ঞানিকদের দুঃখ—রাজা-রাজড়া এবং রাষ্ট্রপ্রধানদের জীবন ও সময়ের ইতিবৃত্ত নিয়েই ঐতিহাসিকরা ব্যস্ত। কিন্তু সমাজের বড় পরিবর্তন বৈজ্ঞানিকরাই এনে থাকেন। এমন কি দেশের স্বাধীনতা এবং নিরাপত্তাও এখন বিজ্ঞাননির্ভর। কিন্তু বিজ্ঞানের এই অমোঘ শক্তি সম্পর্কে সাধারণ মানুষ আজও কিছুই জানে না। তুমি এবিষয়েও কাজ শুরু করে দাও। তোমার গোরু খোঁজার (গো+এষণা=গবেষণা) বিষয় হোক : কমলেশ রায়চৌধুরী ও তৎকালীন বৈজ্ঞানিক সমাজ!"

মল্লিকা বললে, "বাবার খুব দুর্বলতা ছিল বৈজ্ঞানিকের ওপর। এক জামাই ডাক্তার, এক জামাই আই-এ-এস, এক জামাই চার্টার্ড অ্যাকাউনটেণ্ট। বৈজ্ঞানিক ছোট জামাই-এর খবর যখন সুতপামাসি দিলেন, বাবা তখনই লাফিয়ে উঠলেন। এক কথায় রাজী।"

"আর বাবার ছোট মেয়ে?" প্রশ্ন করতে গিয়ে কমলেশ হেসে ফেললো।

"আমি ওসব বুঝি না। আমার ধারণা ছিল সায়েনটিস্ট মানে দিন রাত একটা উঁচু টেবিলের সামনে চশমা পরে দাঁড়িয়ে থাকে। অসংখ্য কাঁচের জার থাকে সেই টেবিলে। একটা বুনসেন বার্নার সারাক্ষণ জ্বলে, আর লোকটা টেস্টটিউবে নানা রঙের কেমিক্যাল মেশানো ছাড়া কিছুই জানে না।"

"এখন দেখছো তো বৈজ্ঞানিক মানেই ঐরকম নয়। বৈজ্ঞানিকরা কাজও করে এবং বউকেও ভালবাসে!"

এবার দুজনেই এক সঙ্গে হেসে উঠলো এবং যুগল হাসির সেই কোমল ঝঙ্কার পাখির ডাকের সঙ্গে মিশে দূরদূরান্তে প্রেমের মাদকতা ছড়িয়ে দিলো।

মল্লিকা এবার খুঁটিয়ে স্বামীর মুখ দেখতে লাগলো। তারপর বললে, "আইনস্টাইনের মতো গুঁফো বৈজ্ঞানিক হলে তোমাকে কিন্তু কিছুতেই বিয়ে করতাম না!"

"ওপেনহাইমার-এর মতো কদমছাঁট চুল হলে বিয়ে করতে?" কমলেশ পাল্টা প্রশ্ন করলে।

সজোরে মাথা নেড়ে আপত্তি জানালো মল্লিকা। কমলেশ বললে, "নোবেল পুরস্কার পাওয়া বৈজ্ঞানিক রিচার্ড ফেনম্যানের ছবি দেখাবো তোমায়—একেবারে সিনেমার হিরো, তোমাদের কলেজের মেয়েরা বিয়ে করতে আপত্তি করবে না, যদিও এটম বোমার অপকর্মের পিছনে তাঁর হাত ছিল।"

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে তড়াং করে লাফিয়ে উঠলো কমলেশ। এখনই ছুটতে হবে কাজে। ইউরিয়া প্লাণ্টের রি-একটরে আজ ভোরবেলাতেই কাজ-কর্ম শুরু হবে।

"আধঘণ্টা বসো। কিছু জলখাবার বানিয়ে দিই।" চন্দ্রমল্লিকা অনুরোধ করলো।

রাজী হলো না কমলেশ। বউকে বুঝিয়ে বললে, "বোঁ করে জীপ গাড়ি চালিয়ে গেলেও তিন মিনিট দেরিতে পৌঁছবো। তুমি বরং লক্ষ্মীটি খাওয়া-দাওয়া করো, ইচ্ছে হলে আরও একটু গড়িয়ে নাও। আমি প্লাণ্টে কিছু খেয়ে নেবো।"

বুশ শার্ট প্যাণ্ট পরে, মাথায় ষ্টিল হেলমেট লাগিয়ে বেরিয়ে যাবার আগে কমলেশ বউকে একবার দ্রুত আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলো।

অপস্রিয়মাণ জীপগাড়িটাব দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়েছিল মল্লিকা। খুব ভাল লাগছে তার। কমলেশেব এই যে কর্মনিষ্ঠা তার প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা রয়েছে মল্লিকার। স্বামীর সাধনা এবং আশা আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সে নিজেকেও জড়িয়ে নেবে, মল্লিকা মনে মনে ভাবলো।

ঘড়ির দিকে তাকিয়েই মল্লিকার সময়টা কেটে গেল। টাইমপিসের ছোট কাঁটাটা বেজায় কুঁড়ে, কিছুতেই নডতে চান না। অনেক কষ্টে তিনি একটার ঘরে ঢুকলেন। তারপর যখন দুটো ছুঁইছুঁই করছেন, তখন বাইরে জীপের আওয়াজ পাওয়া গেল। স্নান সেরে এলোচুলে বসেছিল চন্দ্রমল্লিকা।

কমলেশ মিলিটারি গতিতে বাথরুমে ঢুকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে স্নান সেবে টেবিলে এসে বসলো। তারপর গিন্নিকে বললে, "আমাকে দেখছি ক্যামেরা কিনতেই হবে।" তারপর ফিসফিস করে বললে, "সাগর জলে সিনান করি সজল এলো চুলে বসিয়াছিলে উপল উপকূলে।"

খুব খুশী হয়ে গিন্নি বললে, "সবটাই কল্পনা।"

"অর্ধেক মানবী এবং অর্ধেক কল্পনা," কমলেশ উত্তর দিলো।

খাবারে মুখ দিয়েই কমলেশ বুঝতে পারলো যে গৃহিণী নিজেই রান্না করেছে। প্রশংসা করে কমলেশ বললে, "বনার্জি সায়েবের ধারণা, রান্নার রহস্য যারা আয়ত্ত করেছে তাদের পক্ষে কেমিস্ট হওয়া সহজ।"

খাওয়া শেষ করে বসতে পারলো না কমলেশ। বললে, "বেচারা গুরুনাম সিংকে সাইটে দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছি। আমি ফিরলে সে বাড়ি যাবে।"

ঝড়ের মতোই কমলেশ আবার উধাও হয়ে গেল। আর অনিচ্ছুক ঘড়িটা আবার সেই পুরানো কায়দায় খোঁড়াতে খোঁড়াতে সামনের দিকে এগিয়ে চললো।

লনের সামনে এসে চন্দ্রমল্লিকা কিছুক্ষণ বসেছিল। দূরে সাইটে কয়েকটা জীপ এবং লরিকে যাতায়াত করতে দেখা যাচ্ছে। উঁচু টাওয়ারের ওপর সোঁ সোঁ করে একটা প্ল্যাটফরম উঠছে এবং কিছুক্ষণ পরে সশব্দে নেমে যাচ্ছে। দূর থেকে এইসব দেখতে চন্দ্রমল্লিকার বেশীক্ষণ ভাল লাগলো না।

শোয়ার ঘরে এসে বসলো চন্দ্রমল্লিকা। কমলেশের বিছানায় মাথার গোড়ায় একটা ফ্রেমে মল্লিকার ছবি আটকানো ছিল। পুরানো একক ছবিটা খুলে ফেলে ওদের দুজনের একটা ছবি লাগালো মল্লিকা। তারপর বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলো।

স্বামীর কথা ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল চন্দ্রমল্লিকা। ঘুম ভাঙলো মৃদু ধাক্কায়। "ঝুমু, ঝুমু।"

হুড়মুড় করে উঠে মল্লিকা দেখলো, কমলেশ ফিরে এসেছে। বাইরে সূর্য অস্ত গিয়েছে। সন্ধ্যা নেমেছে। স্ত্রীর কপালে হাত বুলিয়ে দিয়ে কমলেশ জানতে চাইলো, "শরীর খারাপ নাকি?"

আঁচল দিয়ে নিজের বুকটা দ্রুত ঢেকে মল্লিকা বললে, "না।"

ওরা দুজনে আবার লনে বসলো। চাকর চা দিয়ে গেল। দূরে ফ্যাকটরি সাইটে নীলাভ এইচ-পি-এল বাতিগুলো জ্বলে উঠেছে। রাত্রির সঙ্গে ওদের মোটেই বনিবনা নেই। অন্ধকার দেখলেই অ্যালসেসিয়ান কুকুরের মতো তাড়া করে দূরে হটিয়ে দেয়।

একটু শীত শীত লাগছে মল্লিকার। কেমন একটা স্যাঁতসেঁতে ভাব। স্বামীর কাপে দ্বিতীয়বার চা ঢেলে দিয়ে মল্লিকা জানতে চাইলো, "এই সময় এখানকার লোকেরা কী করে?"

প্রশ্নটা মন দিয়ে শুনে কমলেশ সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়লো। ওই ধোঁয়াটাই যেন তার উত্তর। কমলেশ এখনই বউকে ভয় পাইয়ে দিতে চায় না। একটু ভেবে বললে, "ভারতবর্ষের সব প্রান্তের লোক এখানে জড়ো হয়েছে। এরা কাজের সময় কাজ নিয়ে মেতে থাকে; তারপর কে যে কী করে বলা শক্ত।"

স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো মল্লিকা। কলকাতায় আত্মীয় এবং বন্ধু পরিবৃত মেয়েরা যে এই ধরনের জীবনযাত্রার সঙ্গে পরিচিত নয় তা কমলেশ বুঝতে পারছে।

আরও একটু ব্যাখ্যা করলে কমলেশ। বললে, "দৈত্যের মতো বিশাল দেহ সর্দারজীরা এখানে পাইপলাইন বসাচ্ছে। কাজের সময় এদের দেখলে মনে হয় ওয়েলডিং ইলেকট্রোডের সাহায্যে পাইপ জোড়া দেওয়া ছাড়া জীবনের আর কিছুই এরা জানে না। কিন্তু সন্ধ্যা হলেই সর্দারজীরা দল বেঁধে ট্রাকে চড়ে ধর্মপুরে চলে যায়। বেপরোয়াভাবে মদ খায়। নিজেদের মধ্যে রসরসিকতা করে, তারপর গভীর রাতে কৃষিনগরে ফিরে আসে।"

"ওদের কেউ নেই?" মল্লিকা জিজ্ঞেস করে।

"আছে নিশ্চয়। কিন্তু কোথায় কে জানে। লোকগুলোর হাবভাব দেখলে তো মনে হয় বত্রিশ ইঞ্চি ডায়ামিটার পাইপের মধ্যেই এদের জন্ম এবং পাইপ জোড়া দিতে দিতে হঠাৎ নিজেরাই একদিন পাইপ হয়ে যাবে!"

"বেচারা!" মল্লিকা সহানুভূতি প্রকাশ করে। "ওদের বউদের আনতে বলো না কেন?" মল্লিকা জিজ্ঞেস করে।

"ওরা ঠিকাদারের লোক। আজ বিহারে, কাল মহারাষ্ট্রে, পরশু তামিলনাডুতে পাইপ ঝালাই করবে। সুতরাং বউকে কোথায় রাখবে সেটা ঠিক করার দায়িত্ব আমাদের নয়।"

মল্লিকা খুশী হতে পারলো না। "বারে! ঠিকেদারের লোক বলে ওদের বুঝি সুখ-দুঃখ নেই?"

কমলেশ গম্ভীরভাবে বললে, "তুমি যা বলতে চাইছ তা বুঝেছি, ঝুমু। কিন্তু সকলের সাধ-আহ্লাদ পূরণ করতে হলে আমাদের এই কারখানা কোনোদিন তৈরি হবে না।"

মল্লিকা এবার অন্য সব শ্রমিকদের খোঁজখবর করলে। কমলেশ জানালো, "স্থানীয় শ্রমিকরা এতক্ষণে কাজ শেষ করে হাঁটতে আরম্ভ করেছে। দশ মাইল বারো মাইল হেঁটে ওরা ক্যাজুয়াল শ্রমিকের চাকরি করতে আসে। বাড়িতে কতক্ষণ থাকতে পায় জানি না। কারণ অনেকে ভোর চারটের সময় বেরোয় এবং রাত দশটার আগে ফেরে না। আসবার সময় গামছায় ভাত বেঁধে নিয়ে আসে।"

কমলেশ বললে, "অফিস ক্লার্কদের অনেকে সন্ধ্যেবেলায় তাস খেলে। আজকাল আবার থিয়েটারের রিহার্সাল দেয়। নাটক হয়তো কোনোদিন মঞ্চস্থ হবে না। কারণ স্ত্রীচরিত্রের লোক নেই। তবে মহড়া চলছে। সুপারভাইজাররা বাড়ি ফিরে স্ত্রীর সঙ্গে গল্পগুজব করেন, একটু-আধটু তাস-পাশাও চলে। শুনেছি, হুইস্কিও আসে মাঝে-মাঝে।"

"তার মানে, প্রত্যেকটি লোক অবসর পেয়ে জানে না কী করবে। তারা শুধু আবার পরের দিনের কাজের জন্যে অপেক্ষা করে।" মল্লিকার প্রশ্নের ধরণ থেকেই ওর অস্বস্তির ইঙ্গিত পাওয়া গেল।

"অনেকটা তাই," কমলেশ উত্তর দিলো। "এখানে একটা অফিসারস ক্লাব মতো হয়েছে। খেলাধুলোর ব্যবস্থা আছে। যাবে নাকি?" কমলেশ জিজ্ঞেস করে।

মল্লিকা রাজী হলো না। স্বামীর সঙ্গে একান্তে সে থাকতে চায় একটু।

ভোরবেলায় বেশ কুয়াশা নেমেছিল। ওয়েলডিং সেটের আগুন দিয়ে অভিজ্ঞ এবং সুদক্ষ সূর্য ক্রমশ কুয়াশা সরিয়ে দিচ্ছেন। অসমাপ্ত কারখানাটা আবার দিগন্তে অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে।

মল্লিকা তার আনন্দ উচ্ছ্বাস ফিরে পেয়েছে। দুপুরবেলায় যেন ভাঁটায় টান লেগেছিল, মনটা খারাপ হয়ে যাচ্ছিলো। রাত্রি আবার জোয়ার এনেছে। নিবিড় সান্নিধ্যে স্বামীকে সে নানাভাবে আবিষ্কার করতে আরম্ভ করেছে। মল্লিকা এখন জোয়ারে ভরা নদীর মতো টলমল করছে।

চায়ের ব্যবস্থা করে স্বামীকে বিছানা থেকে টেনে তুলে দিলো মল্লিকা। "এই, আর দেরি নয়। শেষে কালকের মতো না-খেয়ে অফিস ছুটতে হবে।"

ওরা দুজনে আবার এসে বসল দক্ষিণের লনে। মল্লিকা চা এগিয়ে দিলো। কমলেশ এক মনে কারখানার দিকে তাকিয়ে আছে। মল্লিকার মনে হলো সম্রাট সাজাহান এমনিভাবেই তাঁর সাধের তাজমহল তৈরির সময় তাকিয়ে থাকতেন।

মল্লিকা বললে, "তোমাদের এই সারের ব্যাপারে বইপত্তর নেই?"

"অজস্র বই আছে—কিন্তু সে সব চন্দনপুর লাইব্রেরিতে। তুমি কি আমাদের সম্বন্ধে পড়াশোনা করবে?" কমলেশ কৌতূহল প্রকাশ করে।

"স্বামী সারাদিন কীসের তপস্যা করেন, সহধর্মিণীর তা জানতে ইচ্ছে করে বৈকি!" মল্লিকা বললে।

কমলেশ বললে, "সোজা বাংলায়, যে-মাটি পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে খাইয়ে-পরিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে আমরা সেই মাটির খাদ্য যোগাবার চেষ্টা করছি।"

"মাটি আবার খাবে কী ?" মল্লিকা সন্দেহ প্রকাশ করে।

"মা বলে কি খিদে লাগবে না ?" কমলেশ হাসলো। "মাটিতে যে সার দেবার দরকার একথা আড়াই হাজার বছর আগেও মানুষ জানতো। কিন্তু গাছ কী করে বড় হয় তা জানবার কোনো পথ বের হচ্ছিলো না। চারশ' বছর আগে ভ্যান হেলমণ্ট নামে এক আধপাগলা ভদ্রলোক পাঁচ বছর ধরে এক আজব গবেষণা করলেন। দু'শ পাউণ্ড মাটির ওপরে তিনি পাঁচ পাউণ্ড ওজনের একটা উইলো গাছ পুঁতে দিলেন। পাঁচ বছর ধরে চারা গাছের ওপর তিনি কড়া নজর রাখলেন। তারপর মাপ-জোখ করে দেখলেন গাছের ওজন হয়েছে ১৬৯ পাউণ্ড, কিন্তু মাটি কমেছে মাত্র দু আউন্স। এর থেকে তিনি ধারণা করলেন, জলই গাছের খাদ্য এবং প্রাণশক্তি। তাহা ভুল, কিন্তু বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক নবযুগ আরম্ভ হয়ে গেল।"

নিজের চুল সামলে মল্লিকা বললে, "লোকটার বউ বকুনি দেয়নি ?"

কমলেশ হেসে বললে, "বউ বিরক্ত হলে উইলো গাছের চারা পাঁচবছর ধরে বাড়তেই পারতো না!

একটু থেমে কমলেশ বললে, "জন উডওয়ার্ড নামে এক ইংরেজ বিভিন্ন রকম জলে—যেমন বৃষ্টির জল, টেমস নদীর জল, হাইড পার্কের নর্দমার জল—আলাদা আলাদাভাবে চারা গাছের চাষ করলেন। উডওয়ার্ড দেখলেন জলে কাদা থাকলে গাছগুলো তাড়াতাড়ি বাড়ে। এইভাবে প্রায় দু'শ বছরের সাধ্যসাধনায় উনিশ শতাব্দীর শেষ দিকে মানুষের কাছে মাটির রহস্য ধরা পড়লো। জানা গেল, মাটি এবং বায়ুমণ্ডলে যে নব্বই রকমের মৌলিক পদার্থ আছে তার মধ্যে ষোলটি গাছের পক্ষে অপরিহার্য। এর মধ্যে তিনটি আসে হাওয়া থেকে—কার্বন, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন। বাকি তেরটা মাটি থেকে। এদের মধ্যে তিনটি—নাইট্রোজেন, ফসফরাস এবং পটাশ সবচেয়ে দরকারী।"

সিগারেট ধরালো কমলেশ। হেসে জিজ্ঞেস করলে, "নিশ্চয় কলেজের লেকচারের মতো শোনাচ্ছে ?"

মল্লিকা উৎসাহ দিলো। "বলো না। রেডিও শুনি না ভাবছ ? কৃষিকথার আসরে রোজ চীৎকার করছে নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশ। তখন মন দিয়ে শুনিনি—কী করে জানবো যে সারওয়ালার সঙ্গে বিয়ে হবে ?"

কমলেশ হাসলো। "ঝুমু, আমাদের দেশের লোকেরা কৃষি সম্বন্ধে এত কম জানে যে ভাবলে দুঃখ হয়। চাষ-আবাদের দেশ ভারতবর্ষ—এক বছর ধান

ভাল না হলে লাখ লাখ মানুষ না খেয়ে মারা যাবে। তবু শিক্ষিত ছেলেরা গাছের পরিপুষ্টি কী করে হয়, সে সম্বন্ধে কোনো খোঁজখবর রাখে না। চন্দনপুর ল্যাবে আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি, এক একর জমিতে একবার গম হলে মাটি থেকে ৫০ পাউণ্ড নাইট্রোজেন, ২১ পাউণ্ড ফসফরাস আর ৬০ পাউণ্ড পটাশ কমে যায়। ওই জমিতে যদি পাটের চাষ হয় নাইট্রোজেন এবং পটাশ কমে ৬০ পাউণ্ড করে। আবার তামাক চাষ হোক : নাইট্রোজেন কমবে ৮৪ পাউণ্ড। তার মানে…"

কপট গাম্ভীর্যের সঙ্গে মল্লিকা বললে, "তার মানে সিগারেট খেয়ো না! সবাই মিলে সিগারেট খেলে জমিতে নাইট্রোজেন একটুও থাকবে না।" মল্লিকা এবার হেসে ফেললে।

কমলেশ প্রতিবাদ জানালো। "উঁহু, নাইট্রোজেন ফিরিয়ে দেবার জন্যে তো আমরা রয়েছি। এই কাজে আগে লোকে গোবর সার, এমন কি গোচোনা পর্যন্ত ব্যবহার করতো। এ-সম্বন্ধেও দিগম্বর বনার্জির রিপোর্ট আছে। একটা গোরু গড়ে প্রতি বছর ১৫ টন গোবর এবং ৯০০ গ্যালন গোচোনা দেয়। আর গোবরে আছে ০'৩% নাইট্রোজেন।"

কাল্পনিক দুর্গন্ধে মল্লিকা নাক কুঞ্চিত করলো। "অ্যা! এর নাম তোমাদের রিসার্চ! আগে শুনলে বাবা আমার বিয়েই দিতেন না। গোবরে আমার ভীষণ ঘেন্না।"

হেসে ফেললো কমলেশ। "ঠিক হ্যায়! সেই জন্যেই তো গোরুকে বাদ দিয়ে আমরা রাসায়নিক সারের দিকে যেতে বলেছি। বছরে লক্ষ লক্ষ টন কেমিক্যাল যে-জমি থেকে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, তা আবার ফেরত দেওয়া হোক। এই আমাদের দাবি।"

"ফেরত না দিলে?" মল্লিকা জিজ্ঞেস করলে।

"ফেরত না দিলে জমিও ফসল দেবে না। গাছের চেহারা দেখলেই আমাদের অফিসের লোকরা বলে দিতে পারে কোন মাটি কী খাদ্যাভাবে ভুগছে। নাইট্রোজেন কম থাকলে গাছ বাড়বে না, হলদে মেরে যাবে, ডালপালা গজাবে না। পটাশ কম থাকলে পাতার ওপর ছিটে ছিটে সাদা দাগ পড়বে, পাতার ডগাগুলো শুকিয়ে যাবে।"

"তোমরা তাহলে গাছের ডাক্তার?" মল্লিকা বলে।

"ডাক্তার অন্য লোক—আমরা গাছের কমপাউণ্ডার। কোন ফসলের জন্যে কোন মাটিতে কী সার লাগবে সেইটাই বিরাট বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজ।

এঁরা খোঁজখবর করে যেসব রাসায়নিক সার চাইবেন আমরা তাই তৈরি করে দেবো। যতরকম কেমিক্যাল আছে এখন তার মধ্যে নাইট্রোজেনের চাহিদা সবচেয়ে বাড়ছে।"

"তাহলে উপায় ?" মল্লিকা চিন্তিত হয়ে পড়ে।

"বিজ্ঞানীরা সমস্ত দুনিয়া তোলপাড় করে বেড়াচ্ছেন নাইট্রোজেনের সন্ধানে। সৌভাগ্যক্রমে ওই জিনিসটা পৃথিবীতে অঢেল রয়েছে। বাতাসের আশিভাগই তো নাইট্রোজেন। অর্থাৎ আমাদের এই এক মাইল চত্বরে বায়ুমণ্ডলে কুড়ি লক্ষ টন নাইট্রোজেন জমা হয়েছে।"

"তাহলে তোমাদের অত ভাবনা কেন ? দিগম্বর বনার্জি দিনরাত অত লেখালেখি করছেন কেন ?" মল্লিকা সোজা জিজ্ঞেস করলো।

হাসলো কমলেশ। "নাইট্রোজেন মশাই আছেন তো আকাশে। কিন্তু তাঁকে পাকড়াও করে বস্তায় পুরে জমি পর্যন্ত আনতে হবে তো ? এই পাকড়াও করবার কাজেই তো ব্যস্ত রয়েছি আমরা।"

মল্লিকা বললে, "যা সর্বত্র রয়েছে তাই ধরতে মানুষ এত নাস্তানাবুদ হচ্ছে ?"

কমলেশ বললে, "প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের লুকোচুরি খেলা চলেছে, মল্লিকা! আমরা তো কিছুই তৈরি করি না, যা আছে তাই খুঁজে বার করি, মেলাই, মেশাই, কাটি, ছাঁটি, নিজের মতো করে নিই। এইটুকুই তো মানুষের সাধনা —এতেই আমরা গলদ্‌ঘর্ম। প্রকৃতি যদি সত্যিই কোনোদিন মুখ ফিরিয়ে নেন তাহলে আমরা কেউ বেঁচে থাকবো না।"

একটু থেমে কমলেশ বললে, "অ্যামোনিয়া থেকে আমরা নানা পদ্ধতিতে নানারকম নাইট্রো সার তৈরি করি। চন্দনপুরের কারখানা থেকে আমরা পাই অ্যামোনিয়াম সালফেট এবং অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট। কৃষিনগরে তৈরি হবে ইউরিয়া। ইউরিয়াতে নাইট্রোজেনের ভাগ খুব বেশী : শতকরা পঁয়তাল্লিশ ভাগ।"

মন দিয়ে শুনছে মল্লিকা। বললে, "অত পরিশ্রম করো কেন তোমরা ? একবার অ্যামোনিয়া তৈরি হলো, তারপর তাকে আবার বুঝিয়ে-সুজিয়ে ইউরিয়ায় চেঞ্জ করো।"

হেসে ফেললে কমলেশ। "একেবারে কেউ কী ধরা দিতে চায় ? হাঁটি হাঁটি পা পা করে আমরা এগোই। অ্যামোনিয়া জিনিসটা কিছুই নয়—নাইট্রোজেনের সঙ্গে হাইড্রোজেনের রাসায়নিক বিয়ে। দুজনে মুখোমুখি এসেও মালা বদল

করতে চায় না। তাই আমরা ঘটক অ্যাপয়েন্ট করি : ক্যাটালিস্ট সাধারণ পরিবেশে অ্যামোনিয়া এক ধরনের গ্যাস, কিন্তু চাপে এবং ঠাণ্ডায় পড়ে তিনিও জল হয়ে যান। আমরা বলি লিকুইড অ্যামোনিয়া।"

"চাপ দিলে কেউ জল হয় না, বরং তেতে ওঠে," মল্লিকা প্রতিবাদ করলে।

মৃদু হেসে কমলেশ বললে, "অ্যামোনিয়ার মেজাজ ভাগ্যে মানুষের মেজাজের মতো নয়!" একটা সিগারেট ধরালো কমলেশ। "জানো ঝুমু, ১৯ ৩ সালের আগে কেউ কৃত্রিম অ্যামোনিয়া তৈরি করতে জানতো না। জার্মানরা উপায়টা বার করে—তবে সার তৈরির জন্যে নয়, বোমা বানাবার জন্যে। যুদ্ধের শেষে বোমার যখন চাহিদা রইলো না, তখন চাষেব কাজে অ্যামোনিয়া লাগানো হলো। দেখবে অনেক বিস্ফোবক কোম্পানি সার তৈরি করে। যেমন সমরেন্দ্রবাবুদের ব্রিটিশ এক্সপ্লোসিভ কোম্পানি।"

মল্লিকা এবার স্বামীব দাডি কামাবার সবঞ্জামগুলো বাইরে নিয়ে এলো। এবং জানতে চাইলো, "অ্যামোনিয়া বাবাজীকে জল করে তারপর কী করো?"

মুখে সাবানের ফেনা ঘষ‍ে ঘষতে কমলেশ বললে, "আমাদের যা কাজ। আবার বিয়ে দেবাব চেষ্টা কবি।"

"এ মা! কী অসভ্য তোমবা, একবার তো বিয়ে হয়েছে।"

"সে তো প্রথম পক্ষ—হাইড্রোজেনেব সঙ্গে নাইট্রোজেনের। এবার দ্বিতীয়-পক্ষে তরল অ্যামোনিয়াব সঙ্গে শ্রীমতী কার্বন ডাই-অক্সাইডের। কিন্তু অনিচ্ছুকদের মধ্যে বিয়ে! তাই প্রচণ্ড গবম এবং প্রচণ্ড চাপ না পড়লে পাত্র-পাত্রী রি-অ্যাকট করেন না। এই বিয়ে বড় কঠিন ব্যাপার। সাতরকমের মন্ত্র আছে এবং সাতটি বিদেশী কোম্পানি তা পেটেন্টের আড়ালে গোপন করে রেখেছে। দিগম্বর বনার্জি এখানে এলে কয়েকটা নাম শুনতে পাবে: ডুপন্ট পদ্ধতি; মন্টিকাটিনি পদ্ধতি, ইনভেন্টা প্রসেস, মিৎসুই প্রসেস ইত্যাদি। এঁরা কেউ আমেরিকান, কেউ ইটালিয়ান, কেউ সুইস, কেউ জাপানী। এর মধ্যে আমরাও এখন নতুন মন্তর নিয়ে ঢোকবার চেষ্টা করছি সামনের ঐ ফ্যাকটরিতে। নাম হওয়া উচিত বনার্জি পদ্ধতি। কিন্তু ডকটর বনার্জি নিজের প্রচার একেবারেই চান না। তাই এখনও পর্যন্ত বলা হচ্ছে: এইচ-এ-সি পদ্ধতি। আমাদের সুদর্শনবাবু রসিকতা করে বলেন, দিগম্বর পদ্ধতি এবং আমাদের নাম দিগম্বর সম্প্রদায়!"

"দিগম্বর মন্ত্রে লাভ?" মল্লিকা জিজ্ঞেস করে।

"পুরুতের আবার লাভ কী? অ্যামোনিয়া বিয়ে করে ইউরিয়া গোত্র

নেবে। ভারতবর্ষ নিজের পায়ে দাঁড়াবে—বস্তা বস্তা টাকা অন্য দেশকে দিয়ে আসতে হবে না।"

"পুরুতের চাল কলা?" মল্লিকা জিজ্ঞেস করে। কিন্তু উত্তর দেবার আগেই অ্যালার্ম ঘড়িটা সজোরে বেজে উঠলো। আর কমলেশ দ্রুত বাথরুমে ঢুকলো।

সেই ভিজে স্যাঁতসেঁতে একাকীত্ববোধ ঘন কুয়াশার মতো আবার নেমে আসছে এই দুপুরবেলায়। চন্দ্রমল্লিকার জীবনধারা স্তব্ধ হয়ে আসছে। রান্নাঘরে চাকরটা মাঝে-মাঝে ঠনঠন আওয়াজ করছিল। এখন তাও বন্ধ। শুধু টেবিল ঘড়িটা তার রুটিনমাফিক মন্তর আউড়ে যাচ্ছে।

স্বামীর জন্যে অপেক্ষা করা ছাড়া চন্দ্রমল্লিকার কোনো কাজ নেই। কয়লা এবং ন্যাপথার মধ্য থেকে অ্যামোনিয়ার প্রাণরস নিষ্কাশন করছেন স্বামী, আর মল্লিকার ভয় হচ্ছে মধ্যযৌবনেই সে শুকিয়ে যাচ্ছে। শরীর নয়—মনে। অথচ এখনও তো হনিমুন চলছে—যুগল জীবনের সবচেয়ে তাজা, সবচেয়ে সবুজ সজীব অধ্যায়, যখন কোনো সারের প্রয়োজন হওয়া উচিত নয়।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মল্লিকা মাঝে-মাঝে ভয় পেয়ে যাচ্ছে। এইভাবে কতদিন, কতমাস, কত বছর কাটাতে হবে? প্রাণোচ্ছল সুন্দর স্বাস্থ্যবান স্বামী ফার্টিলাইজারের রহস্য উন্মোচনের জন্যে অফিসে, ল্যাবরেটরিতে, খোলা মাঠে, কারখানার সামনে ব্যস্ত থাকবে, আর বন্দিনী মল্লিকা অপেক্ষা করবে কখন প্রিয়তমের ঘরে ফেরার সময় হবে। কখন দুজনে কাঁচের প্লেটে ভাত নিয়ে মুখোমুখি বসবে, দু-চারটে কথা হবে। আধঘণ্টা পরে জীপটা আবার গর্জন করে এসফল্ট দিয়ে মোড়া কালো রাস্তা ধরে অদৃশ্য হয়ে যাবে। মল্লিকার প্রতীক্ষা শুরু হবে আবার।

রাতে শুয়ে শুয়েও অফিসের চিন্তা কমলেশকে ছাড়ে না। সেই বিখ্যাত সার প্রকল্পের গল্প বলে—যেখানে এক বছর পরে দেখা গেল ম্যানেজার প্রীতম সিং বারো মাসের মধ্যে নিজের মহিলা সেক্রেটারীকে ফার্টিলাইজ করা ছাড়া কিছুই পারেননি। খুব হেসেছিল মল্লিকা। কিন্তু তারপরেই গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল কমলেশ। কারখানা চালু করার নির্ধারিত দিনটা আর মাত্র তিন মাস দূরে—৭ই ডিসেম্বর বড্ড তাড়াতাড়ি কাছে চলে আসছে।

কমলেশ কথা দিয়েছে, আজ রাত্রে জীপে চড়ে বেড়াতে বেরুবে। সঙ্গে স্লিপিং ব্যাগও থাকবে। বলেছে, ইচ্ছে করলে মল্লিকা যেখানে খুশী শুয়ে পড়তেও পারে। স্বামী বিজ্ঞানে পণ্ডিত হলেও অনেক সহজ ব্যাপার জানে না। মেয়েরা কি ইচ্ছে করলেই যেখানে-সেখানে শুয়ে পড়তে পারে? কমলেশ বলেছে, তাতে কী হয়েছে? আমরা পাহারা দেবো। কিন্তু মল্লিকার বিশ্বাস নেই, স্বামীর যা ঘুম! মল্লিকা জানিয়ে দিয়েছে, রাস্তায় শোওয়া-টোয়ার মধ্যে সে নেই। কিন্তু স্বামীর হাত ধরে একটু ঘুরে বেড়াবে।

বৃদ্ধ মালগাড়ির মতো চলতে চলতে ঘড়ির কাঁটা এবার দেড়টার জংশনে ঢুকে পড়েছে। কিন্তু কমলেশের দেখা নেই। টেলিফোন করবে কিনা ভাবছে, এমন সময় স্বামীদেবতার প্রবেশ।

দরজা বন্ধ করবার ফুরসত পর্যন্ত দিতে চায় না কমলেশ। বউকে প্রায় কোলে তুলে ড্রইং রুমে নিয়ে এলো।

অনেক কষ্টে ছাড়ান পেয়ে মল্লিকা স্বামীর জামার বোতামগুলো খুলে দিলো। তারপর কমলেশ পাঁচ মিনিটের মধ্যে স্নান পর্ব শেষ করে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলো।

কমলেশ বললে, "আজ যা ফ্যাসাদে পড়েছিলাম, মনে হলো দুপুরের খাওয়া বন্ধ।"

"সে কি?" মল্লিকা ভয় পেয়ে যায়। "কেমিস্ট্রির কোন সমস্যা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো? অত চিন্তা কিসের? তুমিই তো বললে কুড়ি লক্ষ টন নাইট্রোজেন মাথার ওপর ভেসে বেড়াচ্ছে।"

হেসে ফেললো কমলেশ। "রাসায়নিক নয় মানবিক সমস্যা।" একটু ভরসা পেলো মল্লিকা। এখানে তাহলে মানুষ আছে! ওর কীরকম ধারণা, যন্ত্রের সঙ্গে সর্বদা বসবাস করে এখানে সবাই যন্ত্র হয়ে যাচ্ছে।

বউ-এর পাতে ডাল ঢেলে দিয়ে কমলেশ বললে, "একেবারে আদিম মানব-মানবীর সমস্যা বলতে পারো। বেশ ফ্যাসাদে পড়া গেল। আমাদের অফিসের কয়েকজন কর্মচারী এখানকার আদিবাসী মেয়েদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন। কৃষিনগরের গোড়াপত্তনের সময় এই ক'জন এসেছেন। আদিবাসীগুলো বোকা, সভ্য মানুষদের লোভের কথা জানতো না। সর্বস্ব দিয়ে ঠকে গিয়ে এখন যুবতীরা কান্নাকাটি করছে।"

বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে মল্লিকা জিজ্ঞেস করলো, "তারপর?"

কমলেশ বললে, "কোথায় আমি ৭ই ডিসেম্বরের ভয়ে ছটফট করছি, আর

কোথায় এই সব বিশ্রী সমস্যা। আদিবাসীরা নাকি বেজায় খাপ্পা—খুনোখুনী বেধে না যায়। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এসেছিলেন—বলছেন আমাদের ছেলেগুলোকে জেলে পুরবেন। জেলে পোরা মানে, আমাকেও ওইসব স্টাফকে সাময়িক বরখাস্ত করতে হবে। এ কি কেলেঙ্কারী বলো তো? সুদর্শনবাবু ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট দীপক সান্যাল আই-এ-এসকে গেস্ট হাউসে রেখে চলে এলাম দুটো মুখে গোঁজবার জন্যে। ফিরে গিয়ে আবার বৈঠক বসবে। প্রেমিক-প্রবরদেরও ডাকা হয়েছে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আজই অ্যাকশন নিতে চান। সুদর্শন সেন এবং আমি হিমসিম খাচ্ছি।"

"কী করবে ভাবছো?" মল্লিকা জিজ্ঞেস করলে।

"সুদর্শনবাবু বলছেন, হাত-পা বাঁধা। সাময়িক বরখাস্ত ছাড়া উপায় নেই। অথচ ছেলেগুলোও কান্নাকাটি করছে। আমার ইউরিয়া রি-একটরের কাজও বন্ধ হয়ে যাবে।"

মল্লিকা কী একটু ভাবলো। তারপর মিষ্টি হেসে বললে, "গোলমাল না বাড়িয়ে, আদিবাসী প্রেমিকাদের সঙ্গে ওদের বিয়ে দিয়ে দাও।"

প্রস্তাবটা কমলেশের মনে ধরে গেল। মল্লিকার পিঠে হাত দিয়ে উল্লসিত কমলেশ বললে, "ইউরেকা। বেশ ভাল পথ দেখিয়েছ ঝুমু! এমন সহজ সমাধান কারও মাথায় আসেনি। সুদর্শনবাবু হয়তো বলবেন, কোনো কর্মচারীকে বিয়েতে বাধ্য করার ক্ষমতা কোম্পানির নেই। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট সাহায্য করতে পারেন। হয় বিয়ে, না হয় জেল।"

বিকেলবেলায় কমলেশ ফোন করে মল্লিকার ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছিল। বেশ উৎসাহের সঙ্গে উৎফুল্ল কণ্ঠে বলেছিল, "তোমার বুদ্ধিটা খুব কাজে লেগেছে। ছ'জন প্রেমিকের মধ্যে পাঁচজনই বিয়ে করতে রাজী হয়েছে। একজন একটু গড়িমসি করছে। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট এবং সুদর্শনবাবু এখনও তার সঙ্গে একান্তে কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছেন। ফলাফলে সবাই তাজ্জব। আদিবাসী সর্দারও আমার ওপর সন্তুষ্ট।"

সন্ধ্যেবেলায় বেড়ানোর পরিকল্পনাও বানচাল হয়ে গেল। বড় আশা করে মল্লিকা তৈরি হচ্ছিলো। কিন্তু টেলিফোনে সুদর্শনবাবু জানালেন, ডিরেকটর দিগম্বর বনার্জি হঠাৎ অফিসে হাজির হয়েছেন। এক সপ্তাহের জন্য বিদেশে গিয়েছিলেন দিগম্বর বনার্জি। গতকাল বিলেত থেকে ফিরে আজই চলে এসেছেন রুক্মিনগরে। কমলেশের সঙ্গে তিনি এখন কারখানা দেখছেন; রাত্রে এখানেই খাবেন।

অনেক আশা করে মল্লিকা ঘরদোর দ্রুত সাজিয়ে ফেলেছিল। বাগান থেকে কিছু ফুল তুলে এনে ফুলদানিতে রেখেছিল। নিজের আঁকা একটা ছবি শোয়ার ঘর থেকে খুলে এনে ড্রইংরুমে টাঙিয়ে দিয়েছিল। দিগম্বর বনার্জি সম্পর্কে শ্রদ্ধামিশ্রিত একটা ছবি মল্লিকা মনের মধ্যে এঁকে রেখেছিল।

কিন্তু মল্লিকাকে হতাশ করলেন ভদ্রলোক। গোমড়া মুখে দিগম্বর বনার্জি কমলেশের সঙ্গে বাড়িতে ঢুকলেন। কমলেশ পরিচয় করিয়ে দিতে তিনি মল্লিকাকে ঠাণ্ডা একটা নমস্কার জানালেন। কমলেশকে প্রশ্ন করলেন, "বউকে এখানে কবে আনলে? আমাকে বলোনি তো?"

কমলেশ বললে, "না স্যার, বেশীদিন নয়।"

দিগম্বর বনার্জি ওসব কথা কানেই তুললেন না। একটু বিরক্তভাবেই বললেন, "মনে রেখো, সামনের কয়েকটা মাস আমাদেব অগ্নিপরীক্ষা। জাপান, জার্মানি কেন এগিয়ে গেল জানো? ওরা কাজটা সিরিয়াসলি নিয়েছে। এক একটা প্রকল্প যেন এক একটা যুদ্ধ। ওয়ারে হেরে গিয়েও যুদ্ধের মনোবৃত্তিটা ওরা কাজে লাগিয়ে যাচ্ছে, জানো কমলেশ। আমরা মুখে বলি ওয়ার ফুটিং—কিন্তু কথাটার অর্থ বুঝি না।"

ঘরের মধ্যে আরেকটা প্রাণী যে উপস্থিত রয়েছে দিগম্বর বনার্জি তা লক্ষ্য করলেন না। মল্লিকা নিজের হাতে চা আনলো। একটা প্রাণহীন ধন্যবাদ জানিয়ে দিগম্বর বনার্জি আবার কমলেশের সঙ্গে আলোচনায় ডুবে গেলেন। বললেন, "রি-একটর ট্যাঙ্কের ক্ষয় সম্পর্কে এবার খবরাখবর নিয়ে এসেছি। আমরা এতদিন জারকোনিয়াম লাইনিং ব্যবহার করেছি—পরের বার টাইটে-নিয়াম অ্যালয় লাইনিং-এ চলে যাবো। মিৎসুই-টোটসু প্রসেস, খরচ কম লাগবে।"

তৃতীয় কোনো ব্যক্তি ঘরে বসে ওঁদের কথাবার্তা শোনে তাও বোধহয় দিগম্বর বনার্জির মনঃপূত হচ্ছে না। এবার মল্লিকার দিকে মুখ ফিরিয়ে দিগম্বর বনার্জি প্রশ্ন করলেন, "কত দিন থাকবেন ভাবছেন?"

অপ্রস্তুত হয়ে পড়লো মল্লিকা। কমলেশ রক্ষে করলো। বললে, "এখনও ঠিক হয়নি।"

দিগম্বর বনার্জি এরপর নানা জটিল অথচ আপাত অর্থহীন ইংরিজী শব্দের মধ্যে ডুবে গেলেন। মিক্সার, হিটার, রি-একটর, কনডেনসার, ফিডপাম্প, সলিউশন ট্যাঙ্ক, ক্রিস্টালাইজার, ব্লোয়ার, রিমেলটার, প্রিলার ইত্যাদি অসংখ্য শব্দ, দিগম্বর বনার্জি ওর দিকেই ইটের মতো ছুঁড়ে মারছেন, মল্লিকার মনে হলো।

কী করবে বুঝতে না পেরে মল্লিকা কিছুক্ষণের জন্যে রান্নাঘরে চলে গিয়েছিল। কিন্তু দিগম্বর বনার্জি আরও একঝাঁক শব্দ তার পিছনে লেলিয়ে দিলেন। কয়লা, হাইড্রোকারবন, ন্যাপথা, ফিড অ্যামোনিয়া, অ্যামোনিয়া সিনথেসিস ইত্যাদি শব্দ রান্নাঘরেও চন্দ্রমল্লিকার দিকে তেড়ে আসছে।

ডিনারের ব্যবস্থা করে দুজনকে ডাকতে এসে মল্লিকার মনে হলো ভদ্র-লোকের খাবার আগ্রহ নেই। দিগম্বর বনার্জি এই মুহূর্তেই ভারতবর্ষকে রাসায়নিক শিল্পে আত্মনির্ভর না করে ছাড়বেন না। দিগম্বর বনার্জি বলছেন, "৭ই ডিসেম্বরের জায়গায় ৩০শে নভেম্বর কারখানা চালু করে দাও।" কমলেশ বলছে, "সিনথেটিক অ্যামোনিয়া প্লান্ট তো এক সপ্তাহের মধ্যে চালু হয়ে যাবে। কিন্তু ইউরিয়া কারখানা—এখনও বুঝতে পারছি না স্যার।"

কিছুই খেলেন না দিগম্বর বনার্জি। বললেন, "এত আয়োজন কার জন্যে করেছেন মিসেস রায়চৌধুরী?" সামান্য একটু স্যুপ মুখে দিয়ে, আবার কারখানা সম্বন্ধে কথা তুললেন তিনি। তারপর গৃহবধূর দিকে একটা দায়সারা ধন্যবাদ ছুঁড়ে দিয়ে দিগম্বর বনার্জি নিজের গাড়িতে উঠলেন। আজ রাত্রেই তিনি চন্দনপুর ফিরে যাচ্ছেন।

দরজা বন্ধ করে ফিরে এসে কমলেশ দেখলো, মল্লিকা বিছানায় বসে আছে। বেচারা বেশ গম্ভীর।

"কী ভাবছো?" কমলেশ জিজ্ঞেস করলো।

"বউকে নিজের কাছে রাখতে হলে তোমাদের অফিসে বুঝি অনুমতি নিতে হয়?" মল্লিকা বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলে।

"মোটেই না। পাগল হয়েছো নাকি?" কমলেশ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়।

"তাহলে তোমার ডিরেকটর ঐভাবে জিজ্ঞেস করলেন কেন?" মল্লিকা থমথমে মুখ করে জানতে চাইলো।

"ভালবাসেন বলেই জিজ্ঞেস করলেন। চন্দনপুর রিসার্চ ল্যাবরেটরিতে আমরা একটা পরিবারের মতো। ডঃ বনার্জি আমাদের হেড অফ দি ফ্যামিলি।"

"হেড অফ দি ফ্যামিলি বুঝি বাড়ির বউকে জিজ্ঞেস করেন স্বামীর কাছে কতদিন থাকবে?" মল্লিকা কিছুতেই অপমান ভুলতে পারছে না।

"তুমি কিছু মনে কোরো না, ঝুমু।" স্ত্রীকে বোঝাবার চেষ্টা করলো কমলেশ। তার কাছে ক্ষমা চাইলো।

ঝুমু আজ বিছানায় শুয়ে গল্প করলো না। সে ঘুমিয়ে পড়েছে। কমলেশ

জানে আজকালকার কমবয়সী লেখাপড়া-জানা মেয়েদের আত্মসম্মানবোধ প্রখর হয়। স্যার নিজেই সে কথা কতবার বলেছেন অথচ আজ ঝুমুর সঙ্গে অযথা খারাপ ব্যবহার করলেন।

দিগম্বর বনার্জিকে এবার একটু রোগা-রোগা দেখালো। বিলেত থেকে ফিরে বেশ পাল্টে গেছেন। আগে এরকম খিটখিটে ছিলেন না। এরপর আবার বলছেন, কারখানা চালু করার নির্ধারিত দিন এক সপ্তাহ এগিয়ে নিয়ে এসো।

দিগম্বর বনার্জিকে কমলেশ শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে। তাঁর জন্যে সব করতে রাজী আছে। কিন্তু ভদ্রলোকের এই অতিরিক্ত ব্যস্ততার জন্য দুঃখও হয়।

ঘুম আসছে না কমলেশের। বনার্জির সঙ্গে যে সব আলোচনা হয়েছে সেগুলো এখনও মাথার মধ্যে ঘুরছে। ৩০শে নভেম্বরের ওপর জোর দিয়ে দিগম্বর বনার্জি নতুন বিপদ ডেকে আনলেন। এ-বিষয় কমলেশেরও যে কিছু বলার থাকতে পারে তা বনার্জি বুঝলেন না। কিন্তু কমলেশ যদি এতই বিরক্ত, তাহলে প্রতিবাদ করলো না কেন? কেমন করে প্রতিবাদ করবে কমলেশ? কমলেশ দেখতে পাচ্ছে এলিজাবেথীয় যুগের স্যার ওয়াল্টার র‍্যালের মতো বিচিত্র বেশবাস পরে দিগম্বর বনার্জি স্টেজে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর হাতে একটা ছোট লাঠি। দিগম্বর বনার্জিকে দেখে দর্শকরা হর্ষধ্বনি করে উঠলো। চার্লি চ্যাপলিন ভঙ্গীতে দিগম্বর বনার্জি লাঠিটা দু হাতে ধরে নাটকীয় ভঙ্গীতে আবৃত্তি আরম্ভ করলেন: *"Urea is a white odourless prismatic crystaline solid containing 46. 1% of nitrogen with cool saline taste."*

বনার্জি এবার কমলেশের খুব কাছে সরে এলেন। তার মুখের ওপর সার্চলাইটের মতো দৃষ্টি নিক্ষেপ করে জিজ্ঞেস করলেন: "স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি?"

মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে কমলেশ। আশ্চর্য! ইউরিয়ার স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি মনে করতে পারছে না চন্দনপুর রিসার্চ ল্যাবরেটরির উজ্জ্বল রত্ন কমলেশ রায়চৌধুরী। বিরক্ত দিগম্বর বনার্জি আবার চিৎকার করে উঠলেন: "স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি?" কমলেশকে যেন শেষ সুযোগ দিচ্ছেন তিনি।

এবার আচমকা ঘুম ভেঙে গেল কমলেশের। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল সে। উত্তেজনায় দেহ ঘেমে উঠেছে। মল্লিকাও পাশ ফিরলো। কাছে সরে এসে স্বামীকে জিজ্ঞেস করলো, "তুমি ঘুমোওনি?"

"ঘুমিয়েছিলাম। হঠাৎ স্বপ্ন দেখলাম ইউরিয়ার স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি মনে করতে পারছি না। অথচ সবাই জানে ১.৩৩৫।"

"তুমি কী ঘুমিয়েও ইউরিয়া দেখ?" মল্লিকা জিজ্ঞেস করলো।

কখনও দেখিনি। আজ কী রকম গোলমাল হয়ে গেল," কমলেশ শান্ত-ভাবে বললে। তারপর আবার চোখ বন্ধ করলো।

"জীপটা ধর্মপুরে যাচ্ছে। ওখানে কিছু কাজ আছে। যাবে নাকি একবার বোনের কাছে?" কমলেশ জিজ্ঞাসা করে।

"তুমি?" মল্লিকার ইচ্ছে স্বামীও সঙ্গে যায়।

"সে পরে একদিন হবে। আজকে অনেকগুলো জরুরী মিটিং রয়েছে। মেশিন বসাতে যে জাপানীগুলো এসেছে তাদের কাজ বুঝে নিতে হবে। প্রিলিং টাওয়ারে জার্মানরা কাজ করছে। সেখানেও একটু কথাবার্তা আছে।"

ব্রিটিশ এক্সপ্লোসিভ কোম্পানির অফিসে সমরেন্দ্রবাবুকে টেলিফোনে পাওয়া গেল। তিনি খুব উৎসাহিত হয়ে উঠে আশ্বাস দিলেন, "কোনো চিন্তা নেই। রিংকি শুনলেই লাফাতে আরম্ভ করবে। ভাল কথা, ঝুমুর হাতে আপনাদের একটা যুগল ছবি পাঠাতে ভুলবেন না। রিংকির দরকার আছে।"

টেলিফোন নামিয়ে রেখে কমলেশ এবার বউকে ছবির কথা বললে।

মল্লিকা হাসলো। "রিংকি ছবি নিয়ে কী করবে?"

"কী আর করবে? অ্যালবামে রেখে দেবে," কমলেশ বললে।

বিশ্বাস করলো না মল্লিকা। "তুমি রিংকিকে জানো না। ওর মাথায় নিশ্চয় কোনো মতলব আছে।"

কমলেশ হাসলো। মল্লিকা বললে, "সমরদা যখন হুকুম করেছেন তখন নিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু ওদের একটা ছবি না পেলে কিছুতেই দেবো না।"

"অফিসের কাজ সেরে গাড়িটা চারটে নাগাদ তোমাকে আবার তুলে নেবে", কমলেশ মনে করিয়ে দিলো।

যাবার পথে কমলেশকে প্রোজেক্ট অফিসে নামিয়ে দিয়ে গাড়িটা বেরিয়ে গেল।

কমলেশ অফিসে না ঢুকে সাইডের দিকে হাঁটতে লাগলো। এই ভোরবেলায়

পুরোদমে কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। কয়েকজন শ্রমিক অবশ্য জটলা পাকাচ্ছিল, সায়েবকে দেখে তারা যে যার কাজে মন দিলো। অনেকে ম্যানেজার সায়েবকে সেলাম জানাচ্ছে। প্রতিনমস্কার জানাতে জানাতে কমলেশ এগিয়ে চললো।

ইউরিয়া রি-একটরের কাছে এসে জাপানীদের দেখতে পেলো কমলেশ। ছোট ছোট খাকি হাফপ্যান্ট এবং গেঞ্জি পরে লোকগুলো যন্ত্রের মতো কাজ করে যাচ্ছে। সুদর্শন সেন কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। ভদ্রলোক ফিসফিস করে কমলেশকে বললেন, "কী জিনিস দিয়েই যে ভগবান এদের তৈরি করেছিলেন! কাজ ছাড়া কিছু বোঝে না। ভোরবেলা থেকে ডিউটিতে আসে, কারুর সঙ্গে কথা বলে না; এমনকি নিজেদের দলের লোকের সঙ্গে নয়। মাঝে-মাঝে পকেট থেকে একটা সিগারেট ধরিয়ে সুখটান মারে—সোনা বাঁধানো দাঁতগুলো চকচক করে ওঠে।"

"জানেন স্যার, অনেক ব্যাটা লোকাল সুপারভাইজার ফরেন সিগারেট খাবার লোভে ওদের কাছে আসে। কিন্তু সে গুড়ে বালি। পয়সা বাঁচাবার জন্যে ওরা সস্তা দামের কাঁচি সিগারেট, না হলে চারমিনার ফোঁকে।"

সুদর্শন বললেন, "অথচ এদের সমস্ত কাগজপত্তর তো আমি দেখি। বিদেশে থাকবার সব খরচ জাপানী কোম্পানি দেবে। একদিন আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, ছোকরা এক জাপানীকে। বাপু, কোম্পানিই যখন খরচ দেবে তখন অত হাতটান কেন? তখন ব্যাটা ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে বললে, 'আমি যদি কম খরচ করি তাহলে আমার কোম্পানির বেশী লাভ হবে। আর বেশী লাভ হলে কোম্পানি আমাকে বেশী বোনাস দেবে। ইউ ফলো?' বুঝুন ব্যাটাদের মনস্তত্ত্ব।"

সুদর্শনবাবুর কথায় কমমেশ হেসে ফেললো। বললে, "ওইরকম নিষ্ঠা আছে বলেই জাপানীরা দেশ গড়তে পেরেছে।"

সুদর্শনবাবু বললেন, "জার্মানীরাও তো স্যার দেশ গড়েছে। কাজ এবং ফুর্তি কোনোটাতেই ফাঁকি নেই। ওদেরও তো দেখছি। দামি সিগারেট, মদ, ভাল খাবার না হলে চলে না। তিরিশ বছরের মধ্যে দু-দুটো যুদ্ধে ফেঁসে গিয়ে জার্মানরা বুঝেছে, ক'দিনের জন্যে আর এই পৃথিবীতে আসা। কাজের ফাঁকে ফাঁকে তাই জীবনটা উপভোগ করতে ওরা ছাড়ে না।"

"এদের সকলকে রেখেছেন কোথায়?" কমলেশ জিজ্ঞেস করে।

"গেস্ট হাউসে। ইস্ট উইং-এ জাপানীদের আর ওয়েস্ট উইং-এ জার্মানদের।"

"দেখবেন আদর-আপ্যায়ন যেন ভাল হয়, হাজার হোক অতিথি।"

কমলেশের কথায় সুদর্শন সেন হেসে ফেললেন। "সে আপনি ভাববেন না স্যার। আট-দশটা সায়েব এই অধমের কাছে নস্যি! চন্দনপুর যখন তৈরি হলো তখন আড়াইশ' সায়েবের সেবাযত্ন করেছে ইওরস্ ফেথফুলি। তখন কী সব বাঘা বাঘা সায়েব! পান থেকে চুন খসলে লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে বসতো। সায়েবদের প্রত্যেক ঘরে পায়রার বাক্স বসাতে হয়েছিল চার দিনের নোটিশে।"

"এয়ার কুলার?" কমলেশ জিজ্ঞেস করলে।

একগাল হেসে সুদর্শনবাবু বললেন, "ঠিক ধরেছেন।"

কমলেশ বললে, "তবে একটা ব্যাপাব। জাপানীরা যেন নিজের কাজটুকু নিয়েই ব্যস্ত থাকে। অন্য কোথায় আমবা কী কবছি তা যেন না দেখে।"

চোখদুটো পাকিয়ে বিচক্ষণ সুদর্শন সেন উত্তর দিলেন, "সে আর বলতে। জানি না ভাবছেন যে, বৈজ্ঞানিক প্রসেস টুকলিফাই করতে জাপানীদের তুলনা নেই। জার্মানগুলোব ওসব দোষ নেই। তবে স্যার, ওরাও খাটতে পাবে। যেমন দেবতার মতো দেখতে, তেমন হাতের কাজ।"

সুদর্শন সেন এবার কমলেশের কাছে সরে গিয়ে ফিসফিস করে বললেন, "জাপানীদের যোগাড়ে হিসেবে সিকিউরিটির দুটো লোক ভিড়িয়ে দিয়েছি। ওরা বলছিল হেল্পার দরকাব নেই, কিন্তু আমরা রাজী হইনি। ওয়াচার দুটোকে সাবধান করে দিয়েছি, ঘুণাক্ষরেও বলবে না যে তোমরা সিকিউরিটিব লোক।"

কমলেশ বিদায় নিচ্ছিলো। সুদর্শন সেন বললেন, "আপনার সঙ্গে জরুরী দরকার।"

"বলুন," কমলেশ অনুমতি দেয়।

"ওই আদিবাসী মেয়েদের সঙ্গে আমাদের স্টাফদের ঘটকালির যে দায়িত্ব দিয়েছেন—এরকম ডেঞ্জারাস কাজ আমার হোল লাইফে করিনি!"

"কেন? ওরা সবাই তো রাজী হয়েছে বিয়ে করতে।" সুদর্শনবাবুকে ভরসা দেবার চেষ্টা করে কমলেশ।

"হ্যাঁ স্যার, কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট বলছেন শুভস্য শীঘ্রম! পরে বিগড়ে গেলে কাউকে নাকি চাপ দিয়ে বিয়ে দেওয়া যাবে না!"

"তাড়াতাড়ি বিয়ে দিতে অসুবিধে কী?" কমলেশ জানতে চাইলো।

"আমার তো মাত্র তিনটে ইনসপেকটার। একজনকে পাঠিয়েছি জামসেদপুরে, পাইপের তদারক করতে। একজন গিয়েছে ধানবাদ, হারিয়ে-

যাওয়া ওয়াগনের খোঁজে। আর একজন কোর্টকেসে ধর্মপুর গিয়েছে—স্টোর থেকে এক ব্যাটা ক্যাজুয়াল লেবার আড়াই কিলো সিমেন্ট চুরি করেছিল। কেস চলছে। এই অবস্থায় বিয়ে দিই কী করে?"

হেসে ফেললো কমলেশ। বললে, "বিয়ে তো আপনি দেবেন না।"

"আপনি স্যার নতুন এসেছেন এ-লাইনে, চেনেন না এঁদের। বাবুরা ফূর্তিও করেছেন, শ্রীঘরের ভয়ে বিয়ে করতে রাজী হয়েছেন, কিন্তু বিয়েব জন্য কোম্পানির কাছ থেকে ধার চাইছে।"

"কিছু আগাম দিয়ে দিন। উপায় কী?" কমলেশ হেসে প্রয়োজনীয় অনুমতি দিলো।

আপনি যখন বললেন, দিচ্ছি। কিন্তু এর পরে কী আসছে, তা শুনে রাখুন। কোয়ার্টার চাইবে স্ত্রীর সঙ্গে বসবাসের জন্যে। আর ঐ পাজী মেয়ে, যারা কুঁড়েঘরে থাকতো, তারাই লিখতো পিটিশন করবে ইলেকট্রিক আলো, পাখা, এসব ছাড়া এক মুহূর্ত চলছে না!"

সুদর্শন সেন এবার অফিসের দিকে এগোলেন। কিন্তু জীপে চড়ে ড্রাইভারকে বললেন, "চল বাবা, বাড়িতে—একটু ঘোল খেযে আসি। পেট ঠাণ্ডা না রাখলে মাথা ঠাণ্ডা থাকবে না।"

সুদর্শন-গৃহিণী স্বামীকে দেখে বললেন, "ঘোলের বোতলটা ফেলে রেখেই আপিসে চলে গেলে? তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না।"

"ঘোল অফিসেই যথেষ্ট খাচ্ছি গিন্নি," দুঃখ প্রকাশ করলেন এডমিন ম্যানেজার সুদর্শন সেন।'

"কাজ করছে তো ইঞ্জিনীয়াররা। তুমি এত ব্যস্ত কেন?" মুখ ঝামটা দিলেন সুদর্শন-গৃহিণী।

"এত বড় কথা বললে গিন্নি? ইঞ্জিনীয়ারদের সাধ্য আছে কারখানা তৈরি করে মাইনাস অ্যাডমিনিসট্রেশন ডিপার্টমেন্ট?" সুদর্শন সেন গভীর আত্ম-বিশ্বাসের সঙ্গে বললেন, "এটা জেনে রেখে দাও গিন্নি, এই শর্মা ছাড়া তোমার দিগম্বর বনার্জি এবং কমলেশ রায়চৌধুরীর তাজমহল স্বপ্নেই থেকে যাবে।"

গৃহিণী ঘোল এগিয়ে দিলেন। ঘোলের গেলাসে একটা লম্বা চুমুক দিয়ে সুদর্শন বললেন, "এখন অবশ্য আমার সন্দেহ হচ্ছে সুদর্শন সেন থেকেও তরী শেষ পর্যন্ত তীরে ভিড়বে কিনা।"

"কেন?" ভয় পেয়ে যান গৃহিণী।

সুদর্শনবাবু যে-কথা অফিসে বলতে সাহস করেন না, সেটাই বলে ফেললেন।

"তখন সায়েবরা ছিল। দায়িত্ব যদি নিয়ে নিলো—আর তোমার কোনো ভাবনা নেই। কারখানা বসিয়ে, চালু করে, হাতে চাবিটি দিয়ে বলতো, এই নাও তোমাদের টার্ন-কি ফ্যাকটরি। এখন দিগম্বর বনার্জি বারফট্টাই মারছে, কম বয়সের ছোকরাদের তাতাচ্ছে—তোমরা নিজেরা কারখানা বানাও।"

"ভালই তো" গৃহিণী বললেন। "এরাও তো হীরের টুকরো ছেলে।"

"তুমি তো বলে খালাস। এই যে কমলেশ রায়চৌধুরী নকশা দেখে দেখে ডিরেকটরের সঙ্গে কথা বলে বলে লোহার তাজমহল বানাচ্ছে, তারপর যদি ইউরিয়া না বেরোয় ?"

"অ্যাঁ!" গৃহিণী ভয় পেয়ে গেলেন।

"অফিসের সব সমস্যার কথা তোমাকে তো বলি না, ভয় পেয়ে যাবে। অথচ জলের মতো টাকা খরচ হচ্ছে। আমার হাত দিয়েই তো চেক যাচ্ছে। কত লাখ টাকা যে এরই মধ্যে এই ছোট্ট পাইলট প্লান্টের জন্যে বেরিয়ে গিয়েছে তা ভাবলে মাথা ঘুরে যায়। আরও কয়েক লাখ না হয় সায়েবরা নিত। আমার তাতে কাজ বাড়তো, কিন্তু সে করা যেত। আগে তো দেশ, তারপর তো নিজের সুখ।"

"তোমার তাহলে কাজই থাকতো না," গিন্নি সন্দেহ প্রকাশ করলেন।

"বটে! ছোটখাট জিনিস নিয়ে সাদা সায়েবরা যে কী ধরনের হট্টগোল বাধায় তাতো জানো না। চন্দনপুর ফ্যাকটরি যখন তৈরি হচ্ছে—পঁচাত্তরটা সায়েব এসে পড়েছে। কিন্তু প্রোজেক্ট ধসে পড়ে আর কী! সায়েবদের কলঘরে টয়লেট পেপার দেওয়া হয়নি। সে হৈ-হৈ ব্যাপার। শেষ পর্যন্ত এই শর্মাই রাতারাতি কলকাতায় গিয়ে সায়েবদের টয়লেট পেপার নিয়ে এলো।"

"আগে তো বলোনি এটা," কাল্পনিক ঘেন্নায় গিন্নি মুখ বিকৃত করলেন।

"অফিসের সব কথা বলা যায় না, গিন্নি। অনেক ব্যাপার টপ-সিক্রেট থাকে।"

ঘোলের গেলাস শেষ করে সুদর্শন সেন আবার উঠলেন। নিজের মনেই বললেন, "আমার কত যে কাজ। অথচ ফ্যাকটরি চালু হলে নাম হবে শুধু ইঞ্জিনীয়ারদের। ছবি বেরুবে শুধু বৈজ্ঞানিকদের। ঠাকুমা বলতেন, ছেলে পেটে ধরা এক জিনিস আর সেই ছেলেকে মানুষ করা আরেক জিনিস।"

।

প্রোজেক্ট ম্যানেজারের স্টেনো মিস দাসের ঘরে উঁকি মেরে সুদর্শন সেন জিজ্ঞেস করলেন, "সায়েবকে কোথায় পাঠালে ?" সুদর্শনবাবুকে দেখেই সুজাতা

দাসের গম্ভীর মুখে হাসি ফুটে উঠলো। টাইপরাইটারের বোতাম টেপা বন্ধ রেখে সুজাতা বললে, "পাঠাবার মালিক কি আমি! সায়েব নিজেই .চরকির মতো ঘুরে বেড়াচ্ছেন।"

সায়েব যে কেন চরকির মতো ঘুরে বেড়াচ্ছেন তা সুদর্শনবাবু এবং সুজাতা দাসের অজানা নয়। সুজাতা বললে, "আমাদের এখানকার কাজকর্ম তো ভালই চলছিল। কিন্তু এবার বিলেত থেকে ফিরে ডঃ বনার্জির মাথায় ভূত চেপেছে—কৃষিনগরের উৎপাদন চালু করবার তারিখ এক সপ্তাহ এগিয়ে দিতে বলে গেলেন।"

ছিপছিপে শ্যামলী চেহারা সুজাতা দাসের। বছর আটাশ বয়স। মুখে চোখে স্নিগ্ধতা থাকলেও দেহে যৌবনের সমৃদ্ধি নেই। দেখলেই মায়া পড়ে যায় —বোঝা যায় গেরস্ত ঘরের মেয়ে। কোনো পাকে পড়ে চাকরির লাইনে এসেছে। প্রথম দিন একে দেখেই সুদর্শন সেন বলেছিলেন, "আর জায়গা পেলে না মা! এই কৃষিনগরে কাজ করতে এলে?"

প্রথমে কোনো উত্তর দেয়নি সুজাতা দাস। তারপর বলেছে, "পাকা চাকরির বয়স পেরিয়ে গিয়েছে; তাই টেমপোরারি চাকরির পিছনেই ছুটতে হয়।"

সুদর্শন সেন অনেক চেষ্টা করে নার্স কোয়ার্টারের পাশে একটা কোয়ার্টার সুজাতাকে পাইয়ে দিয়েছিলেন। একলা মেয়েমানুষ এখানে কোথায় থাকবে?

"কোয়ার্টার বড় সহজ জিনিস নয়," সুদর্শন সেন বউকে বলেছিলেন। কেরালার তিনটে নার্স অমন অখাদ্য দেখতে—কিন্তু টপাটপ ভাল ভাল বিয়ে হয়ে গেল। বুদ্ধিমান ছেলেরা দেখলো সাধারণ পথে কোয়ার্টার পেতে অনেক দেরি। তার থেকে রেডিমেড কোয়ার্টার, সেই সঙ্গে বউ। সুদর্শন সেনের যদি ক্ষমতা থাকতো এসব শিখে ফেলতেন। কমলেশকেও বলেছেন, কিন্তু সে বিশ্বাস করে না, শুধু হাসে।

কমলেশ বলে, "তাহলে তো সুজাতারও এতদিন বিয়ে হয়ে যাওয়া উচিত ছিল।"

মিস দাসের বিয়ে না হওয়ার কারণটা অবশ্য মিস দাস ছাড়া এখানকার কেউ জানে না। ইণ্ডিয়ান ছেলেদের ওপর মোটেই বিশ্বাস নেই সুজাতার। একটা জাতক্রোধ দাঁড়িয়ে গিয়েছে দেশী ছেলেদের ওপর। তাছাড়া ওর হার্টে একটু গোলমাল আছে। স্বাস্থ্য পরীক্ষা তেমন খুঁটিয়ে হয়নি বলেই সুজাতা দাস চাকরি পেয়েছে।

সুদর্শনবাবু ও সুজাতার মধ্যে প্রায়ই সুখ-দুঃখের আলোচনা হয়। সুদর্শনবাবুও জানেন বড় কর্তার সেক্রেটারীর সঙ্গে আলাপ রাখাটা বিশেষ প্রয়োজনীয়। তাই সময় পেলেই একবার সুজাতার সঙ্গে দেখা করে যান।

চিঠির খাম টাইপ করতে করতে সুজাতা বললে, "সায়েবরা থাকলে এই কৃষিনগরের রূপই পাল্টে যেত, মিঃ সেন।"

"সে কথা বলে," সায় দেন মিস্টার সেন। "সত্যি কথা বলতে কি, সায়েব দেখলে কাজে অনুপ্রেরণা পাওয়া যায়," সুদর্শন সেন দুঃখ করলেন।

"তাছাড়া ওরা দায়িত্ব নিতে জানে," সুজাতা বলেছিল।

"সেটা ঠিক। নিজে দোষ করে শ্যামবাবুকে ঠেকিয়ে দেওয়ার বদ্ অভ্যাসটি ওদের নেই," সুদর্শন সেন বললেন।

"ওরা কাজও জানে," সুজাতা বললো। "দেখুন ওই জার্মান ছোকরাদের। সারাদিন পাগলের মতো খাটছে, অথচ মুখে হাসি লেগে আছে।"

"তা সত্যি। সায়েব দুটো খুব হাসে," সুদর্শন সেন একমত হলেন।

কালো হরিণ চোখ দুটো বড় করে সুজাতা এবার সুদর্শনবাবুর দিকে তাকালে। তারপর টাইপ বন্ধ রেখে প্রশ্ন করলে, "সায়েবরা কেন বড় হয়েছে বলুন তো?"

খুবই দামী কোশ্চেন, কিন্তু এ-বিষয়ে সুদর্শনবাবু কখনও মাথা ঘামাননি। তাই তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ঝটিতি উত্তর দিতে পারলেন না। কিছুক্ষণ টাকে হাত বুলিয়ে বললেন, "রাজার জাত বড় তো হবেই।"

"জার্মানরা তো রাজা ছিল না," সুজাতা মনে করিয়ে দেয়।

"ছিল ছিল। ইংলণ্ডেশ্বরের সঙ্গে কাইজারের খুব নিকট সম্পর্ক ছিল—মামাতো-পিসতুতো ভাইটাই এরকম একটা কি," সুদর্শনবাবু ঠিক মনে করতে পারলেন না।

সুজাতা বললে, "ওসব জানি না। তবে মেয়েমানুষকে সম্মান করতে জানে বলেই ওরা বড় হয়েছে।"

"মেয়েমানুষকে তো এখানেও মা বলা হয়।" সুদর্শনবাবু মৃদু আপত্তি জানালেন।

সুজাতার মুখে অভিমানের চিহ্ন ফুটে উঠলো। বেশ বিরক্তির সঙ্গেই বললে, "ওসব মুখে! মিস্টার রেমার্ক কিংবা মিস্টার শীলার যখন এখানে আসে দেখবেন। কী অপূর্ব ব্যবহার। ইণ্ডিয়ানরা সাত জন্ম চেষ্টা করলেও শিখতে পারবে না।"

ঘড়ির দিকে তাকালেন সুদর্শন সেন। দুঃখের সঙ্গে বললেন, "বৈজ্ঞানিক সমস্যা ছাড়া আর কিছু নিয়ে আমাদের সায়েব মাথা ঘামাচ্ছেন না। অনেকগুলো অফিসের সমস্যা জড়ো হয়ে রয়েছে, কিন্তু ওঁকে ধরতেই পারছি না।"

"কিছু বলতে হবে?" সুজাতা জিজ্ঞেস করে।

টাক চুলকে সুদর্শনবাবু বললেন, "সায়েবের সঙ্গে মুখোমুখি আলোচনার দরকার। এমন ব্যাপার যে লিখিত নোট দেওয়াও নিরাপদ নয়। ওই আদিবাসী মেয়েমানুষদের কেস।"

"বজ্জাত ছোঁড়াগুলোর কেস বলুন," সুজাতা দাস প্রতিবাদ করলে। সরল মেয়েগুলোর সর্বনাশ করে বকাটে ছোঁড়াগুলো কেমন কেটে পড়ছিল। আর বলিহারি যাই মেয়েগুলোকে। ওদেরই আবার বিয়ে করছে।"

সুদর্শন সেন দুঃখ করলেন, "রায়চৌধুরী সায়েব আমাকে যে কি বিপদেই ফেললেন। পরে অডিট আপত্তি না তোলে। জেলে না ঢুকিয়ে বদ্ ছোকরাগুলোকে বাসরঘরে পাঠাচ্ছেন। জামাইবাবু হতে চলেছেন জেনে এরাও আশকারা পেয়ে গেছেন। আগাম টাকা চাইছেন। সায়েব দিতে বললেন। এখন জামাইবাবুরা বলছেন, ছুটি চাই। একটা ছোঁড়ার ক্যাজুয়াল লিভ পর্যন্ত পাওনা নেই। কামাই করলেই মাইনে কাটা যাবে। এখন সিক লিভ একমাত্র ভরসা। অথচ অসুখের কথা লিখে ছুটি চাইতে সাহস পাচ্ছে না। অফিসের চাপে পড়েই তো বিয়ে হচ্ছে।"

কমলেশকে এবার ফিরে আসতে দেখা গেল। বেচারা ঘামে নেয়ে উঠেছে। হাতে অনেকগুলো নকশা এবং কাগজপত্র।

সুদর্শনবাবুর সমস্যা শুনে কমলেশ জানতে চাইলে, "কী করা উচিত?"

সুদর্শনবাবু বললেন, "আগেকার সময় হলে আপনার কাছে আসবারই দরকার হতো না। সত্যি কথা বলতে কি, আমার নিজের বিয়েও তো বেআইনী পথে। আমি ছাঁদনাতলায়, কিন্তু অফিসের খাতায় লেখা সিরিয়াস পেটের গোলমাল! অবশ্য এখন ভাবি, খুব মিথ্যে লেখা হয়নি—বিয়েটা এক ধরনের সিরিয়াস ডায়েরিয়াই!"

অফিসের অন্য কাগজপত্তর সই করতে করতে কমলেশ বললে, "ওকে স্পেশাল ছুটি উইথ মাইনে দিয়ে দিন। তারপর দেখা যাবে।"

সুদর্শন সেন ভয় পেয়ে যান। "অডিট আপত্তি হলে?"

"হলে হবে। আমাদের ডিরেকটর বলেন, অডিট হাজার চিঠি লিখুক, তোমার অন্তর থেকে যদি কোনো আপত্তি না থাকে, তাহলে মাভৈঃ।"

টিলার উপর কমলেশের জীপ থামতেই বাড়ির দরজা খুলে গেল। জীপের চালককে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে মল্লিকা তার বোন রিংকির সঙ্গে বেরিয়ে এলো।

চোখ পাকিয়ে, বেণী নাচিয়ে, কোমর দুলিয়ে কনকলতা ভগ্নীপতিকে বললে, "আপনি তো লোক খুন করতে পারেন কমলেশবাবু!"

"সে কি!" সহাস্য কমলেশ এ-হেন মন্তব্যের কারণ খুঁজে পাচ্ছে না।

"হনিমুন পিরিয়ডে কেউ বউকে একলা ছেড়ে দেয়, কখনও শুনিনি।" কনকলতা মুখের ওপর বললে।

"ঝুমুটা নরম মেয়ে, মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে না। তাই আমি এলাম বোনের হয়ে ঝগড়া করতে," কনক জানিয়ে দিলো।

"খুব ভাল করেছেন। কর্তাটিকে সঙ্গে এনেছেন তো?" কমলেশ জানতে চায়।

মল্লিকা বললে, "শনিবার সমরদার ছুটি। তাই দুজনকেই ধরে এনেছি।"

সোফায় বসে সমরেন্দ্রবাবু বললেন, "শনিবার আপনারও তো অর্ধেক ছুটি?"

"কোথায় ছুটি? কাজকর্ম এখন পুরোদমে চলছে," কমলেশ দুঃখ প্রকাশ করলো।

কনক বললে, "ওঁদের ছুটি মানে এই নয় যে, ব্রিটিশ এক্সপ্লোসিভের কারখানা বন্ধ। কিন্তু কাজ তো করবে শ্রমিকরা, তার সঙ্গে অফিসারদের সম্পর্ক কী? হাতে কাজ করা আর মাথা ঘামিয়ে কাজ করা তো এক জিনিস নয়।"

হাসলো কমলেশ। তারপর সমরেন্দ্রবাবুকে একটা সিগারেট দিয়ে এবং নিজে একটা সিগারেট জ্বালিয়ে বললে, "মাথা ঘামানোর ব্যাপারটা তো চন্দনপুর ল্যাবরেটরি আগেই সেরে ফেলেছে—এখন আমরা হাতেই কাজ করছি। আপনার বোনের স্বামীকে একজন মজদুর বলতে পারেন।"

ছেড়ে কথা বলবার মেয়েই নয় কনকলতা। সঙ্গে সঙ্গে ভগ্নীপতিকে শুনিয়ে দিলো, "রাখুন ওসব সৌখীন মজদুরীর কথা।" কোনোরকম মায়া-দয়া না-দেখিয়েই কনক বললে, "কিছু মনে করবেন না, লোকে তো জানে সরকারী প্রতিষ্ঠানে কাজই হয় না। কোটি কোটি টাকা লোকসান দিয়েও সরকারী কোম্পানির নির্লজ্জ বড়কর্তারা বুক ফুলিয়ে সমাজে ঘুরে বেড়ায়। বলে

নেশনের সেবা করছি।"

কমলেশ চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললে, "বেশ মজার কথা বলেছেন আপনি। প্রাইভেট কোম্পানি, সরকারী কোম্পানি, সৎ লোক, অসৎ লোক, এমন কি জালজোচ্চুরির জন্যে যারা ভারতবিখ্যাত, সবাই দাবি করছে যে তারা নেশনের সেবা করছে। স্বাধীনতা দিবসের ক্রোড়পত্র দেখে আমাদের ডিরেক্টর ডঃ দিগম্বর ব্যানার্জি তো অবাক। একটা চোরা কোম্পানি, যাদের বিরুদ্ধে আমরা লোক-ঠকানোর রিপোর্ট দিয়েছি সি-বি-আইকে, তারাও বুক ফুলিয়ে বিজ্ঞাপন দিয়েছে যে নেশনের সেবা করছে। আবার সেই পাতাতেই লেখা রয়েছে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ কীভাবে জাতির সেবা করেছিলেন।"

কনকলতা বললে, 'নেশনের সেবা আপনি যত ইচ্ছে করুন, কিন্তু আমার বোনের কথাও মনে রাখতে হবে। অগ্নিসাক্ষী রেখে অনেকগুলো প্রতিশ্রুতি কিছুদিন আগে করেছেন।"

সমরেন্দ্রবাবু হাসতে হাসতে মন্তব্য করলেন, "কমলেশবাবু, আমাদের এখন থেকে সাবধান হতে হবে—মেয়েরা এদেশে জেগেছে।"

স্বামীকে পরোয়া না করেই কনক বললে, "জাগেনি, তবে জাগছে। ছাঁদনাতলায় মন্ত্র পড়ে বিনা পয়সায় একটি দিনে-ঝি এবং রাতে-শয্যাসঙ্গিনী যোগাড় করার মজা চিরকাল থাকবে না।"

বোনের বাক্‌চাতুর্যে মল্লিকাও অবাক হয়ে গেল। মুখ টিপে হাসতে হাসতে বললে, "বিংকি, তোকে আমরা মেয়েদের প্রতিনিধি করে লোকসভায় পাঠাবো।"

স্বামী এবং ভগ্নীপতিকে শুনিয়ে কনক বললে, "আমাদের অধ্যাপিকা এবং লেখিকা সুলোচনা সান্যালের সাম্প্রতিক উপন্যাসটা আপনাদের পড়াবো। সুলোচনা সান্যাল যা বলেছেন, তাতে অনেকের মাথা ঘুরে যাচ্ছে। কিন্তু ভদ্রমহিলা ১১০% খাঁটি সত্য কথা লিখেছেন।"

"আজকালকার বাংলা নভেল পড়া বেশ শক্ত কাজ, বিংকি। তার থেকে সুলোচনা দেবী কী লিখেছেন শুনিয়ে দাও।" অনুরোধ করলেন সমরেন্দ্রবাবু।

স্ত্রী বললেন, "লেখিকা দেখিয়েছেন পতিতাবৃত্তির সঙ্গে এদেশের সাধারণ গৃহবধূবৃত্তির কোনো পার্থক্য নেই। পতিতারা পয়সার জন্যে দেহ দেয়, আর এদেশের লক্ষ লক্ষ মেয়ে নিরাপত্তা এবং ভরণপোষণের বদলে স্বামীদেবতার কাছে দেহ বন্ধক রাখে।"

"সর্বনাশ! এ যে একেবারে বিপ্লব।" এই কথা বলতে যাচ্ছিলো কমলেশ।

কিন্তু তার আগেই টেলিফোন বেজে উঠলো।

চন্দনপুর থেকে দিগম্বর বনার্জি ফোন করছেন। অতিথিরা শুনতে পেলো কমলেশ বলছে, "হ্যাঁ স্যার, আপনি চিন্তা করবেন না। এক্স-রে টেস্টে পাইপের কয়েকটা জোড়ে গোলমাল পাওয়া গিয়েছে। সেগুলো আবার ওয়েলডিং হচ্ছে। হাইড্রলিক টেষ্টিং না করে আমরা এগোচ্ছি না।···ঠিক আছে, নর্মাল, প্রেসারের দেড়গুণ চাপেই আমরা পরীক্ষা করবো।"

আরও যেসব বিচ্ছিন্ন কথা মল্লিকা শুনলো তার মধ্যে ৭ই ডিসেম্বর এবং ৩০শে নভেম্বর অনেকবার কানে এলো। কারখানা চালু কবার তারিখ যে এক সপ্তাহ এগিয়ে আনতে দিগম্বর বনার্জি বদ্ধপরিকর মল্লিকা তা বুঝতে পারছে। কমলেশেরও দোষ আছে। বললেই পাবে, তা সম্ভব নয়। কিন্তু দিগম্বর বনার্জি সম্পর্কে ওর কোথাও যে প্রচণ্ড দুর্বলতা আছে তা মল্লিকাব কাছে ধবা পড়ে গেছে।

রাত্রে পাশাপাশি ঘরে দুই দম্পতি শুয়েছিল। জানলা দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়েছে কমলেশ ও মল্লিকার বিছানায়। মল্লিকা জিজ্ঞেস করলো, "পর্দা টেনে দেবো?"

"থাক না," কমলেশ বললে। "নতুন বিয়েব সঙ্গে নতুন চাঁদেব নিকট-সম্পর্কের কথা সব দেশেই চলে আসছে।" কিন্তু মল্লিকা তেমন উৎসাহ বোধ কবছে না। ধর্মপুর থেকে ফিবে ও বেশ পাল্টে গিয়েছে।

কমলেশ বললে, "কলকাতায় কিছু টাকা পাঠাতে হবে, একটু মনে করিয়ে দিও তো।"

মল্লিকা রাজী হলো। তারপর কী ভেবে জিজ্ঞেস করলো, "হ্যাঁগো, তুমি, কী রকম মাইনে পাও?"

মাইনের পরিমাণ আশানুরূপ নয়। তার থেকে আবার ট্যাক্স, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড বাদ যায়।

মল্লিকার মন খাবাপ হয়ে গেল। এত লোক যার তলায় কাজ করে, এত যার দায়িত্ব, তাকে তেমন মাইনে দেয় না এরা।

"তোমাকে কিন্তু ওরা খুব খাটিয়ে নেয়।" মল্লিকা আস্তে আস্তে বললে।

"সরকারী কোম্পানিতে মাইনে বেশী নয়, মল্লিকা। দিগম্বর বনার্জি নিজেই মাসে তিন হাজারের কম পান।" কমলেশ বললে।

"রিংকির ধারণা, তুমি কিন্তু অনেক টাকা পাও," মল্লিকা এবার বলে ফেললো।

"প্রাইভেট অফিসে মাইনেটা গোপন ব্যাপার, কিন্তু আমাদের এখানে নয়। যে-কেউ খোঁজ করলেই জানতে পারে," কমলেশ বললে।

মল্লিকা বললে, "সমরবাবুর বেশ রুচি আছে। ওদের বাংলো দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।"

"যাবো, একবার দেখে আসবো," কমলেশ আগ্রহ প্রকাশ করে।

"ঠিক যেন ছবির মতন সাজানো রয়েছে," মল্লিকা আবার জানালো। পর্দার কাপড় নাকি কোম্পানি বোম্বাই থেকে স্পেশাল অর্ডার দিয়ে তৈরি করিয়েছে।"

"বিলিতী অফিসে ঐটাই হয়তো ধারা," কমলেশ বললে "ইউরোপীয়ানরা সুখে থাকতে না পারলে কেন নিজের দেশ ছেড়ে ওই গোবিন্দপুরে আসবে?" কমলেশ স্ত্রীকে বোঝাবার চেষ্টা করে।

"সমরেন্দ্রবাবু তো আর ইংরেজ নয়। আমি ঝিংকির ফ্ল্যাটের কথা বলছি," মল্লিকা বললে।

'সায়েবদের সমান পদে যারা আছে, তারা ইণ্ডিয়ান বলে কি চাকরের মতো থাকবে? স্বাধীন ভারতে সেটা কোনো গভরমেণ্ট সহ্য করবে না ঝুমু।"

পাশের ঘরে স্বামীর কাছে সরে এলো ঝিংকি। তারপর ফিসফিস করে জানতে চাইলো, "তোমার খুব অস্বস্তি হচ্ছে, তাই না?"

সমরেন্দ্র বললে, "না, তেমন কিছু নয়। আমাদের সুদর্শন চোপরা এক মাসের ছুটি নিয়ে দেশে গিয়েছিল। কিন্তু এক সপ্তাহের মধ্যে পালিয়ে আসতে পথ পেলো না। রাত্রে এয়ারকুলার চালু না থাকলে ওদের ঘুম আসে না।"

ঝিংকি বললে, "চোপরার আর দোষ কি? রবারের বিছানায় শুয়ে এমন অভ্যেস হয়ে গিয়েছে আমারই অন্য কোথাও রাত কাটাতে অস্বস্তি হয়।"

"মনে করো পিকনিকে এসেছ," সমরেন্দ্র সান্ত্বনা দেয়।

ঝিংকি বললে, "গভরমেণ্টের নজর বড় নীচু। ঝুমুর বর এত ব্রাইট, এত খাটে, ভারত সরকার তবু এদের একটু সুখে রাখবার চেষ্টা করে না।"

সমরেন্দ্র বললে, "আদর্শের নাম করে দিগম্বর বনার্জি ওকে ঠকাচ্ছে। লোকটা পিক্যুলিয়র।"

"তোমরা চেনো নাকি?" ঝিংকি জিজ্ঞেস করে।

"শোনা যায়, এক সময় দিগম্বর বনার্জি আমাদের অফিসে চাকরির চেষ্টা করেছিল। তেমন স্মার্ট নয় বলে সায়েবরা সিলেকসন করেননি। সেই থেকে ফরেন কোম্পানির ওপর লোকটার জাতক্রোধ। ওকে 'স্বদেশী' দিগম্বর বনার্জি

বলে ডাকেন আমাদের দিল্লীর রেসিডেন্ট ডিরেকটর দেব সাহেব। লোকটার এত বড় আস্পর্ধা, বলে কিনা, ব্রিটিশ এক্সপ্লোসিভকেও একদিন চন্দনপুরের কারিগরী বিদ্যে কিনতে হবে।"

স্বামীর বুকের কাছে সরে গিয়ে কনক জিজ্ঞেস করে, "তোমাদের কোম্পানি কী বলছে?"

যুবতী স্ত্রীর উষ্ণ এবং কোমল সান্নিধ্য উপভোগ করতে করতে সমরেন্দ্র বললে, "ব্রিটিশ এক্সপ্লোসিভ থোড়াই তোয়াক্কা করে ইণ্ডিয়াকে। বেশী বেগড়বাই করলে ওরা সিঙ্গাপুরে চলে যাবে। ব্রাজিলে কারখানা খুলবে।"

"বলো কী?" কনক ভয় পেয়ে যায়।

সমরেন্দ্র শয্যাসঙ্গিনীকে আশ্বাস দিলো, "ভয় নেই। কিছুই হবে না। ব্রিটিশ এক্সপ্লোসিভ ধর্মপুরে যেমন আছে তেমন থেকে যাবে। আমরা তো চুরি করছি না, লোক ঠকাচ্ছি না—আমরাও তো খেটে খাই। সরকারী কোম্পানির ফড়েগুলোর মুখে বড় বড় কথা—কাজে অষ্টরম্ভা। যাদের উপর দায়িত্ব চাপিয়েছে তাদের সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে না রাখার বিপদ অনেক!"

"কেন?" আলিঙ্গনশৃঙ্খলে বন্দিনী রিংকি স্বামীর পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে জিজ্ঞেস করে।

"কমলেশের আগে যে ভদ্রলোক এখানকার ম্যানেজার ছিলেন তাঁর নাম নগেন বসু। আমাদের ধর্মপুর ক্লাবেও কয়েকবার বেড়াতে গিয়েছেন। দিগম্বর বনার্জির ডান হাত। দৈত্যের মতো পরিশ্রম করতেন, কিন্তু টাকা পেতেন না। ভদ্রলোক লোভ সামলাতে পারলেন না। ঘুষ খেলেন। ধরাও পড়লেন।"

"অ্যা!" রিংকি একটু ভয় পেয়ে গেল। "গভরমেণ্ট আপিসে সবাই তো ঘুষ খায়, তার জন্যে কেউ ধরা পড়ে নাকি?"

সমরেন্দ্র বললে, "এখন সি-বি-আই কিছু লোককে ধরে। মিস্টার বসু, ইউরোপে বিদেশী কোম্পানির কাছ থেকে টাকা নিয়েছিলেন। বড় হোটেলে হোস্টেসদের সঙ্গে ফুর্তির লোভ সামলাতে পারেননি। ঠিকাদারের কাছে পয়সা এবং সুযোগ সুবিধে প্রাইভেট কোম্পানির লোকেরা কম নেয় না। কিন্তু ধরা পড়ে গভরমেণ্টের লোকেরা। বাজারে গুজব, কনট্রাক্ট না পেয়ে বিরক্ত বিদেশী কোম্পানি নিজেই সি-বি-আইকে খবরাখবর দিয়েছে।"

পাশের ঘরে মল্লিকা বললে, "ধর্মপুর জায়গাটা বেশ। ব্রিটিশ এক্সপ্লোসিভের অফিসাররা বেশ সুন্দরভাবে আছে।"

কমলেশ স্ত্রীর পিঠে হাত রেখে বললে, "কৃষিনগরও একদিন মাঝামাঝি

একটা শহর হয়ে উঠতে পারে। যদি আমাদের আবিষ্কারটা শেষ পর্যন্ত ধোপে টেঁকে।"

"এই আবিষ্কারের পিছনে তোমারও তো অনেক দান আছে।" মল্লিকা জিজ্ঞেস করে।

"তা বলতে পারো," কমলেশ উত্তর দেয়। "কিন্তু আজকালকার আবিষ্কার সাধারণত একটা দলের কাজ। সিমফনি অর্কেস্ট্রার মতো, সে-দলের একজন নেতা থাকেন।"

গুঁফো দিগম্বর বনার্জির মুখটা মনে পড়তেই মল্লিকার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। সেই রাত্রে ভদ্রলোকের ব্যবহার এখনও পর্যন্ত সে ক্ষমা করতে পারেনি। এমনভাবে কথা বললেন, যেন বউরা স্বামীদের কাজ ভণ্ডুল করে। কমলেশ রায়চৌধুরীর সঙ্গে এই কৃষিনগরে তার নববিবাহিত বধূ না থাকলেই যেন তিনি সন্তুষ্ট হতেন।

মল্লিকার মনের অবস্থা কমলেশ বুঝতে পারছে। মুখ ফুটে না বললেও, ওদের যুগলজীবনে আশানুরূপ আনন্দ আসছে না, কোথায় যেন ছন্দপতন হচ্ছে, কিছু ত্রুটি থেকে যাচ্ছে। অথচ ভারি মিষ্টি মেয়ে মল্লিকা। ওর লোভ নেই, স্বামীকে পুতুল করে রাখবার স্বভাব ওর নয়।

ভোরবেলায় আবাব হৈ-হৈ আরম্ভ হলো। কনকলতা চোখ রগড়াতে রগড়াতে বোনকে বললে, "পাশের ঘরে সারারাত কপোত-কপোতীর বকুম-বকুম হলে, ঘুম আসবে কী করে?"

লজ্জা পেয়ে গেল মল্লিকা। কিন্তু বোনের কাছে হার মানলো না। বললে, "ঠিক উল্টো! তোর গুঞ্জনের উৎপাতে চোখের পাতা বোজাতে পারলাম না।"

সমরেন্দ্রবাবু হাসতে হাসতে মনে করিয়ে দিলেন, "ছি ঝুমু, আমরা তোমাদের অতিথি।"

"আপনি অতিথি—আপনাকে তো কিছু বলিনি। কিন্তু বোনকে ছেড়ে কথা বলবো না।"

মল্লিকা চায়ের টেবিল গোছাতে গোছাতে বললে, "চিরকাল রিংকির বকবক করা অভ্যেস! মামার বাড়ি গেলে এক বিছানায় সারারাত বকে যেত।"

রিংকি বোনকে সাহায্য করতে করতে বললে, "বরকে বনবাসে পাঠিয়ে কান্নাকাটি হচ্ছিলো, আমি চেষ্টাচরিত্র করে মিলন ঘটিয়ে দিলাম—এখন আমার বিরুদ্ধে বলবিই তো।"

"তুই বোনে এমনভাবে ঝগড়া বাধালে আমাদের পালাতে হবে," সমরেন্দ্র-বাবু বললেন।

অমনি আপস হয়ে গেল তুই বোনে। স্বামীর বিরুদ্ধে রণরঙ্গিণী মূর্তি ধরলো কনক। "দড়ি ছেঁড়ার চেষ্টা করে ছাখো না। আমাদের এখনও চেনোনি!" এই বলে সে হুমকি ছাড়লো। মল্লিকা বললে, "আমার কর্তাটিরও প্রাণের ইচ্ছা তাই। ওদের অফিসের অনেকেই তো আদিবাসী মেয়েদের সঙ্গে সম্পর্ক করে রেখেছেন।"

"সিজ ফায়ার! গোলাগুলি ছোঁড়া থামাও! আমবা ক্ষমা চাইছি।" সমরেন্দ্রবাবুর বিনাশর্তে আত্মসমর্পণে নারীপক্ষ শান্ত হলো।

এর পরেও সারাদিন হৈ-চৈ চলেছিল। কিন্তু কমলেশ থাকতে পারেনি। কারখানায় গিয়েছিল। তারপর অফিসে। অফিস থেকে আবার কারখানায়, সেখানে জার্মান তুজন কাজ কবছেন। স্নজাতা দাসই খবর দিয়েছিল, মিস্টার শীলার দেখা করতে এসেছিলেন।

তরুণ শীলার প্রতিদিনই কোনো এক সময়ে স্নজাতার সঙ্গে দেখা করে যায়। জার্মানদের চিঠিপত্তর প্রোজেক্ট ম্যানেজারের ঠিকানাতে আসে। মোটা মোটা অক্ষরে লুড্উইগ রেমার্কের নামলেখা এয়ারমেল খামগুলো স্নজাতাই টেবিলের একপাশে রেখে দেয়। ম্যাক্স শীলারের নামে চিঠি কিন্তু বেশী আসে না। অথচ ম্যাক্সই চিঠি সংগ্রহ করতে আসে।

রাজপুত্রের মতো চেহারা ম্যাক্স শীলারের। সাতাশ-আটাশের বেশী বয়স হবে না। সাড়ে ছ'ফুট লম্বা—ইটালিয়ান মার্বেল পাথরের মতো গায়ের রঙ। পাথর থেকে খোদাই করা অলিম্পিক দৌড়বীরের মতো নিটোল ধারালো দেহ।

স্নজাতা লক্ষ্য করেছে, মেয়েদের কি করে সম্মান দেখাতে হয় সায়েবরা জানে। করিডরে তুজনের দেখা হয়ে গেল। শীলার শুভপ্রভাত জানালো স্নজাতাকে, বিনয়ে মাথা নিচু করলো। তারপর নিজে এগিয়ে এসে স্নজাতা দাসের অফিস-ঘরের দরজাটা খুলে দাঁড়ালো।

চিঠিপত্তরের ভিড়ের মধ্যে দ্রুত চোখ বুলিয়ে একখানা এয়ারমেল খাম তুলে নিলো স্নজাতা। তারপর মিষ্টি হেসে সহানুভূতি জানিয়ে বললে, "স্যরি, একখানা মাত্র চিঠি; তাও তোমার বন্ধু মিস্টার রেমার্কের নামে।"

ইংরিজী ভাষা শীলারের তেমন সড়্গড় নয়, অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে সে যা বললে তার অর্থ, "কী করা যাবে! সবাই তো আর লুডয়ের মতো ভাগ্যবান নয়!" কোন স্নদূর বিদেশ থেকে বেচারা এসেছে এই ঈশ্বরপরিত্যক্ত রুবিনগরে

যন্ত্র বসাতে। এরা না-জানে এখানকার ভাষা, না-পারে এখানকার মানুষদের সঙ্গে মিশতে। সুজাতা বললে, "মিস্টার শীলার, আমি উইশ করছি দেশ থেকে যেন তোমার নামে অনেক মিষ্টি মিষ্টি চিঠি আসে।"

ম্যাক্স সহজেই সুজাতার ইঙ্গিত বুঝলো। তারপর হেসে উত্তর দিলো, "অসংখ্য ধন্যবাদ, সুন্দরী মিস দাস। না-চাইতেই তুমি নিশ্চয় অনেক চিঠি পাও। তোমার পাওয়া উচিত—তোমার মতো একজন চার্মিং তরুণী ইণ্ডিয়ান মহিলা প্রতিদিন এক লেটারবক্স বোঝাই চিঠি পাওয়ার যোগ্য!"

মেয়েদের প্রতি সায়েবদের স্বাভাবিক সৌজন্যবোধ সুজাতা দাসের খুব ভাল লাগে। ইণ্ডিয়ানদের এই ভদ্রতা শিখতে আরও দেড়শ' বছর লেগে যাবে। নাও শিখতে পারে কোনোদিন। বাঙালী পুরুষদের ঔদ্ধত্য দিন দিন বাড়ছে। খাতায়-কলমে সমান অধিকার দিলেও মেয়েদের স্বাধীনতা এরা মোটেই স্বীকার করে না। মেয়েদের সম্পর্কে ওরা যা-বোঝে তা হলো গায়ের রঙ, সৌন্দর্য আর বাপের পয়সা। এই তিনটেই যাদের নেই, সেই সব সুজাতা দাসরা সহজেই পুরুষমানুষদের অবহেলা এবং অপমান বুঝতে পারে। তার ওপরে কোনো সুন্দরী বাঙালী মেয়ের যদি আত্মসম্মান জ্ঞান এবং ব্যক্তিত্ব থাকে, তাহলে তার যন্ত্রণার শেষ নেই।

সায়েবরা মেয়েমানুষদের মঙ্গলের জন্যে অমুক করেছি তমুক করেছি বলে ঢাক পিটিয়ে ভণ্ডামি করে না। কিন্তু নারীদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সৌজন্যবোধ ওদের কথাবার্তা চালচলন ও ভাবভঙ্গীর অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মেডিক্যাল কোয়ার্টারের বিয়ে-হ্যাংলা নার্সগুলো সুজাতার কথা বিশ্বাস করে না। মাইনে এবং ফ্রি কোয়ার্টারের লোভ দেখিয়ে যদুমধু স্বামী পাকড়াও করতে পেরেই ওরা বর্তে যাচ্ছে। মেয়েগুলো লেখাপড়া শিখে আধুনিকা হয়েও মধ্যযুগের মনোবৃত্তি নিয়ে বসে আছে। একটা বর যোগাড় হলেই ইহকাল পরকালের হিল্লে হয়ে গেল। সুজাতা সভ্য ইংরেজ সমাজে মিশেছে, কিছু কিছু ইংরিজী গল্প উপন্যাস পড়েছে। যে-বিয়েতে পুরুষ ও নারীর পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ভালবাসা নেই তেমন মিলনে রাজী হবার কথা সে ভাবতেই পারে না।

বর-হ্যাংলা নার্স মেয়েগুলোকে সুজাতা বিদেশীদের গল্প বলে। "সায়েবদের সঙ্গে অনেক কাজ করেছি। ওরা ইণ্ডিয়ান পুরুষদের মতো মেয়েমানুষের খিদেয় সারাক্ষণ জ্বলে পুড়ে মরে না। ওরা মেয়েদের সমান বলে মনে করে। না-করেও উপায় নেই, কারণ ওদেশে মেয়েরা পুরুষমানুষের দেওয়া ভাত-

কাপড়ের থোড়াই তোয়াক্কা করে।" সুজাতা দাস অনেক দেখেছে। দেখে দেখে এখন তার ঘেন্না ধরে গিয়েছে। যে-মেয়েকে বিয়ের কথা ভাবতে পারে না, সুযোগ পেলে ফুসলে-ফাসলে তারই সর্বনাশ করবার জন্যে এদেশের ছোঁড়াগুলো সবসময় উঁচিয়ে আছে। এদেশের পুরুষমানুষদের সঙ্গে সুজাতার কথা পর্যন্ত বলতে ইচ্ছে করে না।

অফিসে ফিরে এসে অনেকগুলো কাগজপত্র দেখলো। তারপর চন্দনপুরের সঙ্গে ফোনে মিনিট দশেক কথা বললে। দিগম্বর বনার্জির সঙ্গে এই সময় বিস্তারিত আলোচনা হয়।

কমলেশ সম্পর্কে সুজাতার কোনো অভিযোগ নেই। ভদ্রলোক আদর্শবাদী এবং কাজকর্ম বোঝেন। অমানুষিক খাটতেও পারেন কিন্তু খাটছেন বলে মেজাজ বিগড়ে থাকে না, সর্বদা হাসিমুখ। কমলেশের মঙ্গল হোক, এই কারখানা চালু করে দিয়ে আরো উন্নতি করুন তা সুজাতা মনেপ্রাণে চায়।

সুজাতা বুঝতে পেরেছে, কমলেশ প্রাণখোলা মানুষ। বউ আসবার পর দু-একবার সুজাতাকে সে বাড়িতে যেতেও বলেছে, বিশেষ করে মল্লিকা এবং সুজাতা যখন একই ইস্কুলের ছাত্রী। সুজাতা কিন্তু এড়িয়ে গিয়েছে। যে-মল্লিকা ইস্কুলে তার থেকে জুনিয়র ছিল, বিয়ের ম্যাজিকে সে এখন সুজাতার সিনিয়র। সুজাতা দাস এখন সামান্য একজন স্টেনো, আর মল্লিকা বড় সাহেবের বউ। যিনি সুজাতার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, তাঁর মাথাটাই একরত্তি মেয়েটার কাছে বাঁধা।

সুজাতা জানে মল্লিকার সঙ্গে এখন সে সমানভাবে মিশতে পারবে না। মল্লিকা যদি ওপরের মহলে মিশে একেবারে অমানুষ না হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে সেও চক্ষুলজ্জায় ভুগবে এবং অস্বস্তি বোধ করবে।

সিঁদুরের অলৌকিক শক্তি দেখে সুজাতা মাঝে-মাঝে অবাক হয়ে যায়। ইস্কুলে যে ছোট মেয়েটাকে সুজাতা একদিন শাসন করেছে, সিঁথিতে সিঁদুর চড়িয়ে সে-ই এখন সুজাতার অনেক ওপরে উঠে গেল। সাধে কি আর এদেশের সমস্ত মেয়েমানুষ এত অত্যাচার এবং অপমান সত্ত্বেও সিঁদুরের নেশায় বুঁদ হয়ে আছে!

কমলেশের গলার স্বর শুনতে পেলো সুজাতা। "মিস দাস, আমার বাড়িতে একটু লাইন দেবেন?"

লাইন ট্যাপ করে সুজাতা দু-একবার নববধূর সঙ্গে কর্তার কথাবার্তা শুনেছে। কিন্তু যা আন্দাজ করেছে তাই। ইণ্ডিয়ান পুরুষমানুষদের মধ্যে

প্রেম জিনিসটা নেই। কমলেশ রায়চৌধুরীও বউকে শুধু স্তোকবাক্য দিয়ে ভুলিয়ে রাখতে চায়।

কমলেশ ফোনে বউকে জানালো, জার্মানদের সম্পর্কে তার একটু দুশ্চিন্তা ছিল। কিন্তু তাদের কাজও প্রায় শেষ। একজনকে রেখে দ্বিতীয় জার্মান এবং পাঁচজন জাপানী কয়েকদিনের মধ্যে কৃষিনগর ছেড়ে চলে যাবে। কমলেশের ইচ্ছে ওদের একদিন আপ্যায়ন করে।

মল্লিকা উৎসাহভবেই রাজী হলো। কমলেশ জানতে চাইলো সেই সঙ্গে সুদর্শনবাবু ও তাঁর স্ত্রী সুজাতা দাসকে বলবে কিনা।

'ভালই তো, বলো না." মল্লিকা জানালো।

শনিবার রাত্রেই কনক এবং সমরেন্দ্রবাবু নিজেদের গাড়িতে ধর্মপুরে ফিরে গিয়েছিলেন।

একটা দিন তবু মল্লিকার মন্দ কাটলো না। রিংকি যতই মুখরা হোক ওর প্রাণচাঞ্চল্য আছে। নব-যৌবনের অস্থির আনন্দ সে অপরের মধ্যে ছড়িয়ে বেড়ায়। নিজেও আনন্দ খুঁজে নিতে জানে। যাবার আগে বোনকে বলেছিল, "গুডি গুডি মেয়েদের যুগ চলে গেছে, ঝুম্! শরৎবাবুর নভেলের নায়িকা হলে এ-যুগে ফ্যাসাদে পড়তে হবে। তুই হাত গুটিয়ে বসে থাকবি না। স্বামীকে নিজের বিদ্যেবুদ্ধি মতো চালাবি।"

পুরুষ-পরিচালনায় অনভিজ্ঞ ও দুর্বল মল্লিকা হতাশভাবে হেসেছিল। ওর চিবুক নেড়ে দিয়ে কনক বলেছিল, "পুরুষমানুষের মাথা খাবার মতো চেহারাটি তো করেছিস, কিন্তু ফোঁস নেই কেন? পাওনা আদায় করতে হয়, কেউ নিজে থেকে দেয় না। বরকে সোজা বলবি, কৃষিনগরে তাজমহলই বানাও আর পিরামিডই গড়ো, বউকে কিছুটা সময় দিতে হবে এবং ভালবাসতে হবে।"

মল্লিকার দাবি করতে ইচ্ছে হয়, কিন্তু কিছুতেই বোনের মতো মুখ খুলতে পারে না। রিংকির স্বভাবে যেমন মিষ্টতা আছে, তেমনি বোতল থেকে সদ্য-ঢালা কোকাকোলার মতো কামড়ও আছে। রিংকি যেখানে যায় সেখানে সবাইকে চাঙ্গা করে তোলে। আর মল্লিকা বেচারা ভয়েতেই অস্থির। মুখ ফুটে নিজের ন্যায্য পাওনাটুকু চাইতেও লজ্জা পায়

কিন্তু তার থেকে বড় কথা, বিয়ে সম্বন্ধে মল্লিকার ধারণা পাল্টে যাচ্ছে। সিঁথিতে সিঁদুর পরেই অনেক মেয়ে কেমন আনন্দের হাটে হারিয়ে যায়, অথচ সে পারছে না। নিঃসঙ্গ দুপুরে মল্লিকা চিঠি লেখে। বাবা মা, শ্বশুর শাশুড়ী, সুতপামাসি সবাইকে বড় বড় চিঠি পাঠায়। বাবা, মা এবং কমলেশের বাবা ছোট ছোট উত্তর দেন। সুতপামাসি বসিযে রসিয়ে সুদীর্ঘ চিঠি লেখেন, নানা অন্তরঙ্গ অথচ অস্বস্তিকর প্রশ্নের উত্তর চান। তাঁর কৌতুহল মিটিয়েও মল্লিকার হাতে অনেক সময় পড়ে থাকে। হাতের কাছে যত পত্র-পত্রিকা এবং বই আছে তা পড়ে, যত কাজ আছে তা শেষ করে, যত ভাবনা আছে তা ভেবেও অনেক সময় পড়ে থাকে। শুয়ে কিংবা বসে মল্লিকাকে তখন চুপচাপ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়। ঘড়িটা বোধহয সব বোঝে, গৃহবধূকে অধৈর্য হতে দেখলেই নিজের গতি কমিয়ে দেয়, শুধু টিক টিক আওয়াজ হয় কিন্তু কাঁটাগুলো এগোয় না। অন্তহীন এই প্রতীক্ষাপর্বে মল্লিকার ভয় ধবে যায়। সুতপামাসি লিখেছেন, যুগল-জীবনেব প্রথম বছরটা চোখের পলকেই ফুরিয়ে যায়। কিন্তু দুপুরবেলায় মল্লিকা যেমনভাবে স্বামীর জন্যে অপেক্ষা করে তেমনভাবে তিরিশ দিন গেলে তবে এক মাস হবে। এমনি বারোটা মাস সহ্য করতে পারলে তবে তো এক বছর।

কমলেশের আর কী! কৃষিনগর সফল হলে, হলদিয়া না কোথায় যাবার পরিকল্পনা আছে; কিংবা বিশাখাপত্তম। সেখানে এর থেকে শত গুণ বড় কারখানা তৈরি হবে। বিশাখাপত্তম শেষ হলেও ছুটি নেই। আরো অনেক জায়গায় ততদিনে সার কারখানার পরিকল্পনা হবে। সেইসব জায়গায় কাজ-পাগল কমলেশ রায়চৌধুরীদের প্রয়োজন হবে। স্বামীর জন্যে অপেক্ষা করতে করতে মল্লিকা একদিন আবিষ্কার করবে সে বুড়ী হয়ে গিয়েছে—যার জন্যে এত অস্থিরতা, এত উত্তেজনা এবং উত্তাপ সেই যৌবন কখন নিঃশব্দে বিদায় নিয়েছে। দেহের মালিক পর্যন্ত জানতে পারেনি।

কমলেশ এসব ভাবার সময় পাচ্ছে না। কৃষিনগরের জটিল দায়িত্ব ক্রমশ তাকে গ্রাস করেছে। অ্যামোনিয়া প্লাণ্ট চালু করে সাহসও বেড়ে গিয়েছে। একেবারে অঙ্কের মতো স্টার্ট-আপ হলো। মাত্র একুশ দিনে ওরা যা করলো, ভারতবর্ষে আগে তা কখনো হয়নি, একথা দিগম্বর বনার্জি নিজেই জানালেন।

দিগম্বর বনার্জি একবার নিজে তাঁর সাধের অ্যামোনিয়া প্লাণ্ট দেখতে আসবেন আশা করেছিল কমলেশ। কিন্তু আজকাল চন্দনপুরের বাইরে তিনি

বিশেষ যেতে চান না। কথায় কথায় বিনা নোটিশে যিনি প্লান্টে হাজির হতেন, তিনি এখন টেলিফোনেই কাজ সারেন।

তবে টেলিফোনে কথা বলেও খুব উৎসাহ পেয়েছে কমলেশ। বনার্জি বলেছিলেন, "বুড়োদেব কাছ থেকে আমি কিছু প্রত্যাশা করি না, কমলেশ। ছোকরাদের যদি আশা-আকাঙ্ক্ষা থাকে তবেই এদেশ নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে। শুধু মিছিল করে এবং স্লোগান তুলে কোনো দেশের দুঃখ দূর হয় না। কমলেশ, তোমবা হাতে-কলমে দেখিয়ে দাও, দেশকে বড় করতে হলে কল-কারখানায় জিনিসপত্তর এবং ক্ষেতখামারে ফসল ফলাতে হবে।"

কমলেশ শুনেছে, অনেক লোককে ডিঙিয়ে তাকে কৃষিনগরের দায়িত্ব দেওয়ায় কোনো কোনো মহলে বনার্জি সায়েবের বিরুদ্ধে মৃদু গুঞ্জন উঠেছিল। তাঁরা কমলেশেব কম বয়সের কথা তুলেছিলেন। বনার্জি কিন্তু তোয়াক্কা করেননি। সোজা বলেছিলেন, "লে ব্লাঙ্ক যখন অ্যালকেলি তৈরির পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন, তখন কত বয়স ছিল তাঁর? ছাব্বিশ বছর বয়সে আইন-স্টাইন কেন আপেক্ষিকতত্ত্বের কাজ শুরু করেছিলেন? ডারউইন যখন বিবর্তনবাদের সন্ধান করছেন তখন কেন তাঁর বয়স মাত্র সাতাশ? মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে জেমস্ ওয়াট যখন স্টিম ইঞ্জিনের রহস্য উন্মোচনে হাত দিয়েছিলেন তখন কথা ওঠেনি কেন? স্যামুয়েল কোল্ট একুশ বছর বয়সে কীভাবে রিভলবারের পেটেন্ট নিয়েছিলেন?"

বয়সের ব্যবধানে বিশ্বাস করেন না বনার্জি। তিনি শুধু বলেন, "বিজ্ঞানের এই নবযাত্রাকে তোমরা চাকরি হিসেবে নিও না। চাকরির সঙ্গে আমাদের দেশে চাকরের মনোবৃত্তি মিশে থাকে। ভারতবর্ষের ভাল ভাল ছেলেরা সবাই যদি নির্ঝঞ্ঝাট চাকরি চায়—তাহলে বিজ্ঞান এক-পা এগোবে না।"

কমলেশ বুঝতে পারে, বনার্জি যা বলেছেন তার মধ্যে অনেক সত্য রয়েছে। হাজাব হাজার বিজ্ঞানী এবং ডজন ডজন গবেষণাগার থাকা সত্ত্বেও আমরা নির্লজ্জের মতো পরনির্ভর হয়ে রয়েছি। বিদেশের উচ্ছিষ্ট কারিগরী বিদ্যা দিয়ে আমরা দেশে শিল্পবিপ্লব আনবার অলীক স্বপ্ন দেখছি।

কমলেশের মনে আছে চন্দনপুর ল্যাবরেটরিতে খবরের কাগজ পড়তে পড়তে দিগম্বর বনার্জি একদিন ভীষণ রেগে উঠেছিলেন। চীৎকার করে বলেছিলেন, "কমলেশ, দেশটার কী হলো? শার্ট, জাঙিয়া, বডিস, পেনের কালি, পাউডার, স্নো তৈরির জন্যেও বিদেশ থেকে আমরা কারিগরী বিদ্যে আনাচ্ছি—আবার গর্ব করে সেগুলো বিজ্ঞাপন দিয়ে লোককে জানাচ্ছি।"

"এসব সামান্য ব্যাপার," দিগম্বর বনার্জিকে শান্ত করবার জন্যে কমলেশ বলেছিল।

"মোটেই সামান্য ব্যাপার নয়, কমলেশ।" বিরক্ত দিগম্বর জানতে চেয়েছিলেন, "জাপানীদের কথা আমাদের খবরের কাগজে ফলাও করে বেরোয় না কেন বলো তো? ওদের প্রাকৃতিক সম্পদ নেই, নিজেদের বাজারও নেই। বাইরে থেকে লোহা আনিয়ে, পেট্রল কিনেও বড় বড় দেশকে নাস্তানাবুদ করছে।"

দিগম্বর বনার্জির ধারণা, জাপান যা পারে তা আমরা দশ গুণ ভাল পারবো —যদি আমাদের বিজ্ঞানীরা একটু আত্মনির্ভর হন; যদি আমাদের কমবয়সী গবেষকরা দশটা বছর মনে করে তারা চাকরি করছে না, দেশের অবজ্ঞা অপমান অত্যাচারের উত্তর দিচ্ছে।

একটু থেমে বনার্জি বলেছিলেন, "আমি বুঝি, দেশসেবা কথাটা স্বাধীন ভারতবর্ষে বড় সস্তা হয়ে গিয়েছে। ঠিক আছে, দেশসেবা কোরো না, কিন্তু বিজ্ঞান এবং টেকনলজির সেবা করো। বিজ্ঞানের অলিম্পিক দৌড়ে সামান্য পুঁজি এবং সামান্য অভিজ্ঞতা নিয়েও যে বাঘা-বাঘা জাতদের কাছাকাছি যাওয়া যায় তা দেখিয়ে দিক আমাদেব ছেলেরা।"

সুতপাদি বলতেন, "ভদ্রলোকের মস্তিষ্কে দু-একটা স্ক্রু আলগা আছে। স্বনির্ভরতার মন্ত্র এমন জপতে লাগলেন যে বউ পর্যন্ত ওঁর ওপর নির্ভর করতে পারলো না! পালিয়ে বাঁচলো।"

দিগম্বর বনার্জি মাঝে-মাঝে আরও বড় কথা তোলেন। "কবে কোন দূর শতাব্দীতে প্রাচ্যের মানুষ আমরা পৃথিবীকে কয়েকটা বৈজ্ঞানিক সত্য উপহার দিয়েছিলাম। অঙ্কে শূন্য আবিষ্কারের গৌরব নাকি আমাদের। রসায়নও আমরা শুরু করেছিলাম। আমাদের দেশ থেকে সেসব আবিষ্কার আরব দেশে চালান হলো। আরব দেশ থেকে ইউরোপীয়রা সেই জ্ঞান নিয়ে গেল স্বদেশে। তারপর উর্বরতার কি বিচিত্র উৎসব! পশ্চিমী জগতে বিজ্ঞানের নবজন্ম হলো। এবং তখন থেকে আমরা শুধু নিয়েই চলেছি। নির্লজ্জ বেহায়ার মতো আমরা পশ্চিমের বিদ্যে গ্রহণ করছি; কেউ প্রশ্ন করলে বলছি, আমরা এতদিন পরের অধীনে ছিলাম, আমরা কী করবো?. আমাদের নাকি পুঁজি নেই, যন্ত্রপাতি নেই। এসব কথা আমার আর শুনতে ইচ্ছে করে না, কমলেশ। পৃথিবীকে আমাদের কিছু দেবার সময় এসেছে। অন্যলোক না বুঝুক, আমাদের দেশের শিক্ষিতদের লজ্জাবোধের যথেষ্ট কারণ আছে।"

কথাগুলো ভাবলে কমলেশের মনেও ঘেন্না আসে। আমাদের দেশের লোকেরা দারিদ্র্যের দোহাই দিয়ে দু'শ বছর পিছিয়ে থাকবে'; জনসংখ্যা বাড়িয়ে চলবে ; আব আমরা শিক্ষিত ভদ্রলোকরা বড় বড় শহরে পায়ের ওপর পা তুলে সুখভোগ করবো ; বড় জোর একটু রাজনীতি করবো ; আর বিদেশের বৈজ্ঞানিকবা আমাদেব জনসমস্যা, খাদ্যসমস্যা, স্বাস্থ্যসমস্যাব সমাধান করবে এটা আত্মসম্মানে লাগবারই কথা। বিদেশের ল্যাবরেটরিতে ডি-ডি-টি আবিষ্কার হলো আমরা ম্যালেরিয়া মুক্ত হলাম : বিদেশের ল্যাববেটরিতে পেনিসিলিন আবিষ্কাব হলো আমাদের মৃত্যুদিন পিছিয়ে গেল, বিদেশের ল্যাবরেটরিতে ইউরিয়া বার হলো, আমরা পেটের জ্বালা থেকে বাঁচবার পথ খুঁজে পেলাম ! এসব কতদিন চলবে ? এই নির্লজ্জ নির্ভবতা কোনো আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন জাতের পক্ষে স্বাস্থ্যকব নয়।

কিন্তু কে এর ঝিহিত করবে ? ভাবতবর্ষেব শিক্ষিত মানুষরাই তা সবচেয়ে বেশী নেবার জন্যে উঁচিয়ে আছে। তাবাই তো সবচেয়ে বেশী পরনির্ভর। বিজ্ঞানের যা-কিছু আশীর্বাদ তারাই ভোগ কবে। অজস্র গ্রামবাসী এখনও বিদ্যুৎ কাকে বলে জানে না। একমাত্র এই কৃষি সারের সংবাদ গ্রামে পৌঁছেছে। চাষীরা এখন রাসায়নিক সাবেব মূল্য বুঝতে আরম্ভ করেছে।

কমলেশের চিন্তায় বাধা পড়লো। মল্লিকা ওব মুখেব দিকে তাকিয়ে বসে আছে। স্বামী গভীব কোনো বৈজ্ঞানিক সমস্যাব সমাধান কবছে ভেবে এতক্ষণ সে জ্বালাতন করেনি।

হাতেব গোড়ায় কয়েকটা নুড়ির মতো ছোট জিনিস নিয়ে খেলতে খেলতে কমলেশ বউ-এর দিকে তাকালো। মল্লিকা বেচারা মুখ ফুটে কিছু বলে না। ঝিংকির মতো মুখরা হলে ভাল হতো কমলেশের পক্ষে। বুঝতে পারতো কোন দিকে ওর মন যাচ্ছে। ও শান্ত হয়ে চুপচাপ বসে থাকে।

মল্লিকার দিকে আবার তাকালো কমলেশ। তারপর জিজ্ঞেস করলো, "কী ভাবছো ?"

"কই ? ভাবছো তো তুমি।" মল্লিকা উত্তর দেয়।

মল্লিকা শান্ত হয়ে গেল। কমলেশ বললে, "আমি ভাবতে চাই না মল্লিকা। কিন্তু ভাবনাগুলো আমাকে ঘিরে ধরে।"

টেলিফোন বেজে উঠলো। কারখানা থেকে কেউ ফোন করছে। এই এক মুশকিল। স্বামীকে বাড়িতেও ঠিকমতো পাওয়া যায় না। সময়ে-অসময়ে টেলিফোন বেজে চলেছে। কমলেশের যেন বিশ্রামের প্রয়োজন নেই ; প্রোজেক্ট

ম্যানেজারের যেন ঘর সংসার নেই।

পনেরো মিনিট ধরে টেলিফোনে কী সব কথাবার্তা বলে কমলেশ আবার মল্লিকার সামনে বসলো। বিরক্তভাবে বললে, "অ্যামোনিয়া রিকভারি ডিপার্টমেণ্টে একটা মেশিন চালিয়ে দেখার কথা ছিল। কিন্তু যন্ত্র চালালেই অস্বাভাবিক আওয়াজ হচ্ছে, সেই সঙ্গে ভিত পর্যন্ত নড়ছে। আমি বললাম, ডায়ালগেজ দিয়ে অ্যালাইনমেণ্ট চেক করতে।"

অফিসের অত খুঁটিনাটি শোনবার কোনো আগ্রহ নেই মল্লিকার। বিরক্তি চেপে রেখে সে গম্ভীর হয়ে রইলো। মল্লিকার মনের অবস্থা বুঝতে পেরে কমলেশ বললে, "দুজন ছোকরা ইঞ্জিনীয়ার মেশিন বসাচ্ছে। কোনো অভিজ্ঞতা নেই, তাই ভয় পেয়ে ফোন করছিল।"

কথা শেষ হতে-না-হতে আবার ফোন বেজে উঠলো। লিক টেস্টিং-এর ইনচার্জ মিস্টার দাস ফোন করছেন। বিভিন্ন প্রেশার সারকিটে কিছু অ্যামোনিয়া ঢুকিয়ে ওরা পরীক্ষা করে দেখছে। দু-একটা পাইপের জোড়ের মুখে সন্দেহ জাগছে। কমলেশ বললে, "আগে তো কথাই ছিল, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দিয়ে জোড়গুলো আমরা পরীক্ষা করবো।"

স্ত্রীর কাছে আবার ক্ষমা চাইলো কমলেশ। বললে, "জানো মল্লিকা, এই যে আমরা কারখানা চালু করবার আগে ছোটখাটো খুঁতগুলো খুঁজে বার করছি, এতে আসল সময়ে কাজ কমে যাবে।"

স্বামীর কথা মল্লিকা শুনলো, কিন্তু বিশ্বাস করলো কিনা সে সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ রয়ে গেল কমলেশের মনে।

মল্লিকা জিজ্ঞেস করলে, "এখানে তোমার বন্ধু নেই? এত ফোন আসে, কিন্তু কেউ তো তোমার সঙ্গে গল্পগুজব করে না।"

"বন্ধু বলতে তুমি, মল্লিকা। আর সবার সঙ্গে হয় স্বার্থের, না-হয় কাজের সম্পর্ক। আমি এদের ম্যানেজার—সব ব্যাপারে আমাকে জড়িয়ে রাখতে চায়। আমি ওদের থেকে বেশী জানি বলে নয়; ওদের থেকে আমার চাকরি উঁচু বলে। তাছাড়া ওরা ভয় পায়। ভুল হলে দায়িত্ব কে নেবে?"

"তার মানে, যত দায়িত্ব সব তোমার? কিছু গোলমাল হলে তোমার ঘাড়ে দোষ চাপবে?" মল্লিকা একটু ভয় পেয়ে যায়। ব্যবস্থাটা মোটেই পছন্দ হচ্ছে না তার।

"তাই তো নিয়ম, ঝুমু। যারা সাধারণের থেকে বড় হতে চায়, তারা অনেক বেশী কষ্ট পায়," কমলেশ ইতিহাসের একটা সাধারণ সত্য স্ত্রীকে

মনে করিযে দিলো।

মল্লিকা ভাবছে ধর্মপুরে বিংকিদের সংসারের কথা। ওখানকার কোম্পানিও তো এতদিন বিস্ফোরক তৈরি করে এসেছে। ধর্মপুরের কাছে বিরাট ফার্টি-লাইজার কারখানা ওরাও তো তৈরি করছে। কিন্তু সেখানে তো একজনের ওপর এমন নির্ভরতা নেই—সেখানে লোক অনেক বেশী নিশ্চিন্ত এবং স্বাধীন। তারাও খাটছে, কিন্তু একজন খেয়ালী ভদ্রলোকের নির্ধারিত দিন রাখতে গিয়ে ওখানকার বিজ্ঞানীরা নিজেদের ঘরসংসার ভাসিযে দিচ্ছে না।

কমলেশ নিজেও ঝুমুর সঙ্গে গিয়ে কিছুদিন আগে কনকলতার সংসার দেখে এসেছে। নতুন ভগ্নীপতিকে বিংকি খুব আদর-যত্ন করেছিল। বলেছিল, "এত কাছাকাছি বোন-ভগ্নীপতি থেকে লাভ কী হলো?"

"এই তো এলাম আমরা," কমলেশ বলেছিল।

"কিন্তু কতবার সাধ্যসাধনার পরে? এর মধ্যে আমাদের তো ছ'-সাতবার যাওযা হযে গেল," বিংকি বলেছিল।

"ওরে বাবা, আপনি এত হিসেব রাখেন?" কমলেশ বিস্ময প্রকাশ করেছিল।

"গোমস্তার বউ আমি, কেন হিসেব করবো না।" বিংকি জবাব দিযেছিল।

"স্বামীর পেশার কথা তুলবেন না, তাহলে আপনার বোনকে রসায়ন জানতে হবে," কমলেশ বলেছিল।

"হবে মানে? আমাকে একলা পেলে ঝুমু তো লেকচার দিয়ে কান ঝালাপালা করে। আপনার ক্যাটালিস্ট, নিজের বউ থেকে যাকে বেশী ভালবাসেন, শুনেছি তার কথা। ঝুমু বলেছে, দিগম্বর বনার্জির ইউরিয়া তৈরির নতুন পদ্ধতির কথা, যার ফলে ভদ্রলোকের বউ পর্যন্ত পালিযে গেল।"

"এই জন্যে বউ পালায়নি। তার আগেই বোধহয় কিছু গোলযোগ হযেছিল," বোনের বক্তব্য সংশোধন করল ঝুমু।

কমলেশকে রিংকি বললে, "খোঁজ করে দেখুন, এই জন্যেই হবে। আপনারা জানবার আগে এই মহিলা নিশ্চয় দিগম্বর বনার্জির আবিষ্কারের ঠেলা সামলেছেন।"

হাসলো কমলেশ। রিংকি বললে, "দিগম্বর বনার্জির সাহসিনী পাঞ্জাবী বউ ছিল। নিজের বউ দুর্বল বাঙালী বলে আপনি ওভারকনফিডেন্ট। ভাবছেন সে পালাতে পারে না।"

"বলতো একটু" বোনকে সমর্থন করেছিল মল্লিকা।

রিংকি ঠাণ্ডা ড্রইংরুমে বসে বোনের স্বামীকে বলেছিল, "শুধু কেমিস্ট্রির বই পড়ে এ-যুগে সামলানো যায় না, রায়চৌধুরী মশাই। দু-চারটে মনস্তত্ত্বের বই, দু-চারটে নভেল এবং মাঝে-মাঝে এক-আধটা সিনেমা দেখতে হয়। দেখবেন, স্বামীকে ত্যাগ করে যেসব বউ পালিয়েছে তারা অভাবের তাড়নায় যায়নি। অনেকক্ষেত্রে স্বামীরা তাদের সোনা-রুপোয় মুড়ে রেখেছিল, কিন্তু সান্নিধ্য দেয়নি। যেখানে এই গোলমাল থাকে সেখানেই নভেল লেখার সুযোগ এসে যায়।"

"আমাদের নিয়ে তুই গল্প লিখবি নাকি, রিংকি?" মল্লিকা জানতে চায়।

কমলেশ বললে, "বেশ সুন্দর আরম্ভটা হয়। তরুণ বিজ্ঞানীর সুন্দরী নববিবাহিতা স্ত্রী মধুযামিনী যাপনের জন্যে স্বামীর কর্মক্ষেত্রে এলো। স্বামী তাকে ভালবাসে, কিন্তু কাজকে আরও ভালবাসে। তারপর··"

রিংকি বললে, "বেশ তো গুছিয়ে প্লট ভাঁজতে শিখেছেন। নভেলটা আপনিই শেষ করুন। বউকে এরপর কোথায় নিয়ে যাবেন?

"তুই তো লিখবি?" মল্লিকা বললে।

"আমি কোন দুঃখে লিখতে যাবো? আমার বর রয়েছে, তাকে সামলাতেই আমার জান যাচ্ছে! আমার কর্তার মতো বর থাকলে আগাথা ক্রিস্টির মতো বহুপ্রসবিনী লেখিকাও একখানা নভেল শেষ করতে পারতেন না।"

"সমরদা বুঝি অফিস থেকে ফিরেই প্রেমালাপ করতে চায়?" মল্লিকা মুখ টিপে হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করেছিল।

"তা নয়। কিন্তু নিজে কোনো কাজ করবে না। নিজের গেঞ্জি পর্যন্ত কোথায় রাখতে হবে জানে না—অথচ এই লোক বিলেতে পাঁচ বছর একলা থেকে চার্টার্ড অ্যাকাউনটেণ্ট হয়েছে। তার ওপর পেটুক। বউ রান্নাঘরে না ঢুকলে মন ভরে না। এ ছাড়া ধর্মপুরে পার্টি লেগেই আছে।"

"সন্ধ্যেবেলায় পার্টিতে গেলে তোর ঘরসংসার কে দেখে?" মল্লিকা জিজ্ঞেস করেছিল।

রিংকি বললে, "কোম্পানি সেখানে মুখ বন্ধ করে রেখেছে। আমাদের জন্যে একটা চাকর, একটা মালি, একটা বাবুর্চি এবং একটা জমাদার দিয়েছে।"

মল্লিকা অবাক হয়ে গিয়েছিল। রিংকি বললে, "একটু সুখের মুখ না দেখলে, বিলেত থেকে লেখাপড়া শিখে কে গোবিন্দপুরে জীবন কাটাবে ভাই?"

"ওদের হেড অফিস থেকে স্টাফ ম্যানেজার এসেছিল। আমরা বলেছি, ধর্মপুরে কী রকম ধুলো নিজের চোখে দেখে যান। একটা জমাদারের পক্ষে

এই বাড়ি পরিষ্কার রাখা সম্ভব? গুজব শুনেছি, আর একটা করে চাকর স্যাংশন হবে।"

সমরেন্দ্রবাবু বললেন, "হয়ে যেত, কিন্তু গভরমেণ্ট আজকাল বাগড়া দিচ্ছে। বিদেশী কোম্পানি স্টাফদের যা-দিচ্ছে তা দিতে দাও, না হলে ওদের লাভ বাড়বে, দেশ থেকে আরও টাকা বাইরে চলে যাবে। দিল্লীতে যাদের কাছে আমাদের কেসগুলো যায়, তাদেব বুক জ্বলে যায়। ডাল রুটি খেতে খেতে অন্য লোকের পরোটা আলুচচ্চড়ি স্যাংশন করতে ইচ্ছে হয় না, তাই যতটা পারে কেটে দেয়। আমাদের কথা—তোমরাও সৎপথে থেকে কাজ করো, লুচি মাংস খাও, আমবা মোটেই হিংসে করবো না, বরং খুশী হবো।"

সমরেন্দ্রবাবুব প্রতিবেশী তরুণ বিজ্ঞানী ডক্টর অমিতাভ সেন এই সময় ওদের সঙ্গে দেখা করতে এসোছলেন। অমিতাভ সেনেব স্ত্রী ইংরেজ। ভদ্রলোক অনেকদিন বিদেশে ছিলেন। অমিতাভ সেন চিন্তিতভাবে বললেন, "দিল্লীর আই-সি-এস এবং আই-এ-এস সোস্যালিস্টরা এদেশের সর্বনাশ না কবে ছাড়বে না। নিজেদের মাইনে না বাড়লে অন্য কাউকে তাবা সুখে থাকতে দেবে না! এদের সঙ্গে তর্ক করেও পারবেন না, কারণ প্রত্যেক কথায় আপনাকে আসমুদ্র হিমাচলের কোটি কোটি আধপেটা গরীবদের দেখিয়ে দেবে। আরে বাবা, গরীবদের জন্যে যদি এতই দুঃখ, তাহলে যা পাচ্ছ তাও তো নেওয়া উচিত নয়। গাড়ি চড়ছো, বড় বাড়িতে থাকছো, প্রতি মাসে রেভিনিউ স্টাম্পের ওপর সই লাগিয়ে তিন-সাড়ে-তিন হাজার পকেটে পুরছো, অশোকা হোটেলে ডিনার খেতে খেতে দেশসেবা সম্পর্কে সেমিনার করছো; কথায় কথায় বিলেত-আমেরিকা যাচ্ছ, তাতে সমাজতন্ত্রের ক্ষতি হচ্ছে না! কিন্তু যারা ঘরের খেয়ে বিদেশ থেকে টেকনলজি আয়ত্ত করেছে, মাথা ও গতর খাটিয়ে দেশে নতুন নতুন জিনিস উৎপাদন করছে, অথচ দু নম্বর টাকার ভল্ট বোঝাই করছে না, দুখানা খাতা রাখছে না, যারা নিজেদের যোগ্যতা দেখিয়ে ধুরন্ধর মালিকদের কাছ থেকে ভদ্রস্থ মাইনে পাচ্ছে তারাই পাপী। আজ এই ধর্মপুরে কিছু গোলমাল হোক তখন ব্রিটিশ এক্সপ্লোসিভ কোম্পানি আমাদের সবাইকে ঘাড় ধাক্কা দেবে; কোম্পানির লাভ কমুক, আমাদের অর্ধেক লোকের চাকরি যাবে। কিন্তু দিল্লীর মাস-মাইনের সোস্যালিস্টদের জন্য অন্য ব্যবস্থা। দেশের সব ইস্কুল বন্ধ হয়ে গেলেও শিক্ষাসচিবের মাইনে বাড়ছে, এক পয়সা রপ্তানি না হলেও বিদেশ-বাণিজ্যসচিবের পদোন্নতি হবে।"

অমিতাভ সেন বললেন, "কিছু মনে করলেন না তো?"

"মনে করার কি আছে? দেশটা তো আমাদের সবারই। সুতরাং সবাইকে ভেবে-চিন্তে পথ বার করতে হবে," কমলেশ উত্তর দিলো।

অমিতাভ সেন দুঃখ করে বললেন, "ভারতবর্ষকে আমরা এক অদ্ভুত জগাখিচুড়ি অবস্থায় এনে ফেলেছি, ডক্টর রায়চৌধুরী। সর্বঘটে কাঁঠালি এই আই-সি-এস আমলাদের নেতৃত্বে আমরা জাপান কিংবা পশ্চিম জার্মানি হতে পারবো না ; চীন অথবা রাশিয়ারও নাগাল পাবো না।"

"এই দোটানায় পড়ে সবচেয়ে ঠকছে দেশের অসহায় গরীব মানুষ। আমাদের মতো টেকনোক্রাটের আর কী? স্বদেশে অসুবিধে হলে কানাডায়, জার্মানিতে এখনও দরজা খোলা আছে।"

কমলেশ শুনলো, অমিতাভর 'হবি' আছে। শনি-রবিবারে সে ছবি আঁকে, বউ-এর সঙ্গে ওয়েস্টার্ন ক্লাসিকাল সংগীতের চর্চা করে। অথচ কমলেশের মতো দায়িত্বপূর্ণ পদেই তো রয়েছে অমিতাভ। ব্রিটিশ এক্সপ্লোসিভের কারখানাও যে চলছে না এমন নয়।

মল্লিকা নিশ্চয় সব লক্ষ্য করছে। সুযোগ পেলেই অমিতাভ সেনের কথা সে তুলবে। কী উত্তর দেবে কমলেশ? একমাত্র যা বলতে পারে, এদের কারিগরী বিদ্যা এবং নকশা বিমান ডাকে লণ্ডন থেকে আসছে। কোনো সমস্যা দেখা দিলে লণ্ডন ডিজাইন অফিসে টেলেক্সে খবর যাচ্ছে। টেলেক্সেই সমাধান আসছে। কমলেশদের ওই সুবিধে নেই। নিজেদেরই পথ খুঁজে বার করতে হচ্ছে।

অমিতাভ সেন বললেন, "রাজধানীর সাড়ে-তিন হাজারী সোশ্যালিস্ট মনসবদাররা এমন মেজাজ দেখাচ্ছেন, যেন ওঁরা ছাড়া কেউ দেশের জন্যে কিছু করছে না। যেন ধর্মপুর কারখানায় আমরা যা তৈরি করছি তা মানুষের কাজে লাগছে না। আমাদের মালিকরা যেন দেশকে লুটেপুটে খাবার জন্যেই ধর্মপুরে কারখানা বসিয়েছে। আরে বাবা, এতই যদি সন্দেহ তাহলে আদর করে এদের ডেকে এনেছিলে কেন? এতই যদি দেশপ্রেম তাহলে মহাত্মা গান্ধীর মতো কষ্ট করো, দেশের লোকের মাথা পিছু যা গড় রোজগার সেই রোজগারের মধ্যে সবাই থাকো। হাঁটুর ওপর গামছা পরে খালি পায়ে ঘুরে বেড়াও।"

"দেশটা যে গরীব সে কথা তো মনে রাখতে হবে, মিস্টার সেন," রিংকি বললে।

"একশোবার রাখতে হবে। কিন্তু দেশ গরীব" বলে আমরা বোয়িং

এরোপ্লেন কিনবো না বলতে পারছি কী? দেশ গরীব বলে পাঁচ-তারা হোটেল তৈরি বন্ধ হয়েছে কি? জানি আপনারা ফরেন ট্যুরিস্টদের কথা তুলবেন। কিন্তু এরাই কি কলকাতা, দিল্লী, বম্বে, মাদ্রাজের সমস্ত হোটেলে সীট বোঝাই রেখেছে?"

কমলেশ তবু বুঝছে না। তার যা বলতে ইচ্ছে করছে তা হলো, আমলাদের সঙ্গে টেকনলজিস্টরা ইজ্জতের লড়াই চালাতে পারে, পরস্পরকে গালিগালাজ করতে পারে, কিন্তু তাতে দেশের অভাগা মানুষদের কিছু সুরাহা হবে না। প্রশ্নটা হলো, আমরা কবে নিজের পায়ে দাঁড়াবো? আমাদের কারখানার মালিক সরকার, না অন্য কেউ সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা, আমাদের কারখানাতে সত্যিই মানুষের কাজে লাগার মতো কিছু উৎপাদন হচ্ছে কিনা।

ধর্মপুরের ছিমছাম চকচকে ভাব মল্লিকাকে আকৃষ্ট করেছে। অমিতাভ সেন এবং সমরেন্দ্রবাবুদের জীবনযাত্রা তাকে ভাবিয়ে তুলেছে। ধর্মপুরের অফিসাররা যখন কারখানায় যান তখন কাজে ফাঁকি নেই; কিন্তু কাজের নাম করে জীবনেও ফাঁকি নেই। যারা কাজ করে, তারা চুলও বাঁধে। তারা পিকনিকে যায়, বিকেলে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে গল্প করে, তাস খেলে এবং ধর্মপুর ক্লাবে কিছুক্ষণ কাটিয়ে আসতে সঙ্কোচ বোধ করে না।

ধর্মপুর ক্লাবের সব কর্তৃত্বই ব্রিটিশ এক্সপ্লোসিভ-এর অফিসারদের হাতে। কিন্তু বাইরের লোক নিতে তাঁদের মোটেই আপত্তি নেই। কাছাকাছি কোলিয়ারির অনেকে সভ্য হয়েছেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিস সুপার, এ-ডি-এম এঁরাও সম্মানিত সভ্য। কমলেশ ইচ্ছে করলে সভ্য হতে পারে। মাত্র ত্রিশ মাইলের পথ। সভ্যদের অনেক সুযোগ-সুবিধে আছে। অতিথিদের ক্লাবে এনে আপ্যায়ন করা যায়। খরচ বেশী পড়ে না। বউদের জন্যে আলাদা চাঁদা নেই।

আজকাল অনেকে আবার খেলাধুলো করছেন। গোপন খবরটা রিংকি ফাঁস করে দিয়ে বললে, "এঁরা সব বেজায় কুঁড়ে মেরে যাচ্ছিলেন। বউদের কথায় হলো না। শেষে হেড অফিস থেকে বড় সায়েব এলেন। তিনি বললেন, টেনিস এবং গলফ্ আধুনিক একজিকিউটিভ কালচারের অঙ্গ। তিরিশের পরেই ধর্মপুর কারখানায় অফিসাররা যে-রকম ওজন বাড়িয়ে ফেলেছে তা তাঁর চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।"

অবাক হয়ে গিয়েছিল কমলেশ। "ওঁরা অত চিন্তা করেন?"

"চিন্তা না করে উপায় কী? ইদানীং হাই ব্লাড-প্রেসার এবং হার্ট অ্যাটাক বাড়ছে ম্যানেজারদের মধ্যে। যেমন একটা পিক্যুলিয়র ব্যাপার, অফিসারদের বউরা সিজারিয়ান ছাড়া সন্তানের জন্মই দিতে পারছেন না!" সমরেন্দ্রবাবু বললেন।

ধর্মপুর ক্লাবে সরকারী কর্মচারীরা আসেন। কিন্তু নিজের খরচে তাঁরা বিশেষ কিছু খান না। প্রয়োজনও হয় না। বহু লোক টানাটানি করে আতিথ্য গ্রহণের জন্যে। রাজশক্তি এবং গুণের সমাদর আছে এই নতুন শিল্প-সংস্কৃতিতে।

ধর্মপুর ক্লাবে কমলেশকে সবাই সমাদর করলো। কমলেশ যে প্রতিভাবান বিজ্ঞানী তা এখানকার অনেকের কাছে অজানা নয়। ক্লাবের সেক্রেটারী বললেন, "আমরা শুধু এখানে ফুর্তিই করি না। সাধ্যমতো দেশের ভাবনা-চিন্তার সঙ্গে পরিচিত হই। প্রতি মাসে প্রথম শুক্রবার রাত্রে আমরা বক্তৃতা শুনি। অনেক মাননীয় মন্ত্রী এখানে পায়ের ধুলো দিয়েছেন। যাদুকর পি সি সরকার, মিসেস অমলাশঙ্কর, আধ্যাত্মিক মিশনের স্বামী অদ্বৈতানন্দজী, আর্মির ব্রিগেডিয়ার হরবচন সিং এখানে বক্তৃতা করে গিয়েছেন। আপনিও একদিন মেম্বারদের অ্যাড্রেস করুন। আপনার পছন্দমতো যে কোনো বিষয়ে বলুন। সমকালীন বাস্তবতা থেকে ধর্মপুর ক্লাবের মেম্বাররা দূরে থাকতে চান না। সুযোগ পেলে আমরা সোস্যালিস্ট, কমুনিস্ট এবং উগ্রপন্থী নেতাদের বক্তৃতা শুনতেও রাজী আছি।"

কমলেশ অবাক হয়ে সেক্রেটারীর কথা শুনছিল। ভদ্রলোক বললেন, "আমাদের মেম্বারদের স্ত্রীরা যেমন ড্রিংক করেন, কলকাতায় রেস-এ যান, ফ্ল্যাশ খেলেন এবং ডান্স-এ অংশ নেন, তেমনি অনাথ ছেলে-মেয়েদের জন্য চাঁদা তোলেন এবং নিজেদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে জওয়ানদের জন্য সোয়েটার বোনেন। ব্রিগেডিয়ার হরবচন সিং প্রতিরক্ষায় আমাদের সাহায্যের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।"

রিংকি বললে, "বাটিকের কাজ, ইকাবেনা এবং চাইনীজ রান্নার স্পেশাল ক্লাস খোলার ব্যবস্থা হচ্ছে। তুই যদি জাপানী প্রথায় ফুল সাজানো কিংবা চাইনীজ রান্না শিখতে চাস, আমাকে জানাস, ঝুমু।"

ধর্মপুর থেকে কৃষিনগরে ফেরার পথে ঝুমু জানতে চেয়েছিল, চাইনীজ রান্নার ক্লাসে ঢুকলে কেমন হয়? প্রতিদিন ত্রিশ মাইল যাবার এবং ফেরবার তেল কমলেশকে কিনতে হবে শুনে সে একটু দমে গেল। মল্লিকা গভীর দুঃখের

সঙ্গে স্বামীকে বললে, "কোম্পানির জন্যে এত করো, আর একটু জীপগাড়িটা নিলেই অপরাধ ?"

কমলেশ শান্তভাবে বউকে বোঝালো, "ঝুমু, সরকারী প্রতিষ্ঠানে জীপগাড়ির একটা লগ বুক আছে। সেখানে লিখতে হয়, কত কিলোমিটাব গেল এবং কাজটা নিজের না অফিসের। নিজের কাজকে অফিসেব কাজ দেখাতে হলে মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়।"

ঝুমু হয়তো বুঝলো, কিন্তু এইচ-এ-সির ওপর তার রাগ বেড়ে গেল। 'নিজের সময়ে যখন অফিসের কাজ করো তখন তো কেউ কথা তোলে না।"

"আইনত নিজের সময় বলে আমাদেব কিছু নেই ঝুমু। চব্বিশ ঘণ্টাই আমরা হিন্দুস্থান অ্যাগ্রো-কেমিক্যালস্-এর কর্মচাবী।"

মল্লিকা বললে, "এ-সব আইন ডিকেন্সের সময় ইংলণ্ডের কলকারখানায় চলতো—এখন অচল।"

কাজের নেশায় আবার মেতে উঠেছে কমলেশ। সবাইকে সে অনুপ্রাণিত করছে। বলছে, এই কৃষিনগরে আমরা যা করছি তা শুধু চাকরি নয়—চাকরির থেকেও কিছু বড়।

বেশীর ভাগ শ্রমিক এবং ইঞ্জিনীয়ারদের সমর্থন ও সহানুভূতি পেয়েছে সে। দু-চারজন লোক কুঁড়েমি করছে, কাজটা পিছিয়ে গেলে কিছু লোকের রোজগারও বেশী হয়, কিন্তু তারা এখন সুবিধে করতে পারছে না। দ্রুত তালের নাটকের মতো এগিয়ে যাচ্ছে প্রতিটি কাজ।

কিন্তু কাজেবও সীমা আছে। দিগম্বর বনার্জি অবুঝের মতো সাত দিন এগিয়ে আনতে চান। চেষ্টার ত্রুটি করছে না কেউ; কিন্তু এখনই প্রতিশ্রুতি দিতে পারেনি কমলেশ। জটিল কাজের মধ্যে কত চোরাবালি থাকে—হঠাৎ কিছু বিগড়ে যেতে পারে। তার জন্যে সময় রাখতেই হবে।

মিস সুজাতা দাসের কাছে কমলেশ খবর করলো, জাপানী এবং জার্মানরা তার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছে কিনা।

মিস দাস বললে, "জাপানীরা সবাই আসছেন। মিস্টার শীলার এবং মিস্টার রেমার্কও আসছেন। আমিও আসছি।"

কমলেশ বললে, "আপনারা ট্রান্সপোর্টের চিন্তা করবেন না। একটা জীপ আপনাকে এবং জার্মানদের তুলে নিয়ে আসবে। জাপানীদের জন্যে মিস্টার সেন আলাদা ব্যবস্থা করেছেন।"

পার্টিতে যাবার জন্যে সুজাতা দাস একটু আগে থেকেই তৈরি হয়েছিল। জার্মানরা জীপ চালিয়ে সেবিকা সদনের সামনে এসে দাঁড়ালো। ঝলমলে একটা শাড়ি পরেছে সুজাতা। জার্মানরা এই সুসজ্জিত যুবতীর সম্মানে হর্ষধ্বনি করে উঠলো।

রেমার্ক বললে, "মিস দাস, তোমার সুন্দর পোশাকের প্রশংসা করবার মতো যথেষ্ট ইংরিজী আমার জানা নেই।"

শীলার বললে, "এই যে ইউরিয়া প্লান্টের প্রিলিং টাওয়ার তৈরি করলাম আমরা, তার থেকেও সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে!"

খুশী হয়ে সুজাতা বললে, "অসংখ্য ধন্যবাদ।"

রেমার্ক বললে, "তোমাদের এই লাভলি শাড়ির লেংথ কত?"

"পাঁচ মিটার," সুজাতা বললে।

"পাঁচ মিটার! তোমরা ইণ্ডিয়ান লেডিরা কেমন করে অত লম্বা কাপড় ম্যানেজ করো? তোমরা সত্যিই রহস্যময়ী, তোমরা ম্যাজিক জানো।" শীলার অবাক হয়ে যায়।

রেমার্ক বললে, "মিস দাস, কালকে এই সময় আমি লুফৎহানসার প্লেনে। আমার নামে যদি কোনো চিঠি আসে আমার বন্ধুর কাছে দিও।"

সুজাতা বললে, "তোমার বন্ধু যদি খবরাখবর নেয়, অবশ্যিই পাবে!"

"ও মিস দাস! চিঠি আসুক না-আসুক তোমার মতো একজন শাড়ি-পরা সুন্দরীর সঙ্গে কথা বলার সুযোগের জন্যে যে-কোনো জার্মান যুবক প্রতিদিন তিন মাইল হাঁটতে পারে।" ম্যাক্স শীলার সিগারেটে টান দিয়ে গাড়ি চালাতে চালাতে মন্তব্য করলো।

"মুখে তোমরা বড্ড মিষ্টি, কিন্তু যা বলো তা মিন করো না।" সুজাতা একই সঙ্গে প্রশংসা ও প্রতিবাদ করলো।

ম্যাক্স বললে, "মোটেই না। যদি কোনোদিন আমাদের দেশে বেড়াতে যাও, দেখবে তোমাকে নিয়ে হৈ-হৈ পড়ে যাবে।"

সুজাতা শাড়ির আঁচল বুকের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে শীলারকে জিজ্ঞেস করলো, "আপনার বন্ধু তো চললেন; আপনি আর কতদিন আছেন?"

রসিক মিস্টার রেমার্ক বন্ধুর হয়ে উত্তর দিলেন, "আমার পিছুটান আছে, একটি নীল চোখের সন্দেহপরায়ণা যুবতী আমাকে প্রতি আটচল্লিশ ঘণ্টা অন্তর চিঠি লিখে যাচ্ছে। ম্যাক্স যতদিন খুশী থাকতে পারে, ওর ওসব টান নেই।"

ম্যাক্স শীলার হাসলো। তারপর বললে, "আমারও দিন হয়ে এলো। বড় জোর চার সপ্তাহ। তারপর ইচ্ছে থাকলেও তোমাদের কোম্পানি থাকতে দেবে না। প্রিলিং টাওয়ারে যন্ত্র চালু করে দিয়েই আমার ছুটি।"

"এরপর কোথায় যাবে?" সুজাতা জিজ্ঞেস করে।

"প্রথমে স্বদেশে। তারপর যেখানে পাঠায়। খুব সম্ভব থাইল্যাণ্ডে।"

সুজাতা মন্তব্য করলো, "তোমরা তো থাইল্যাণ্ড খুব পছন্দ করো।"

"আমরা নই, ক্রযলিন। আমেরিকানরা—যারা বিশ্বাস করে ডলার ফেললেই বালিকা-বান্ধবীর ভালবাসা পাওয়া যায়।"

জীপ এসে থামলো কমলেশ রায়চৌধুরীর বাড়ির সামনে। সুদর্শনবাবু দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়েছিলেন। লাল বেনারসী পরে মল্লিকাও বেরিয়ে এলো। ভারী সুন্দর সেজেছে সে। সুজাতা তা লক্ষ্য করলো। মনে মনে ভাবলে, "এদেশে তো ডলপুতুলদেরই রাজত্ব। উঁচুতলার মানুষরা ডলপুতুল দেখলেই বিয়ে করে মাথায় চড়িয়ে বাড়িতে আনে। মেয়েদের অন্য কোনো গুণের দাম দেয় না কেউ।"

জাপানীরা এসে গিয়েছেন। পরিচয় পর্ব শেষ হবার পর সুদর্শন সেন বললেন, "মিসেস রায়চৌধুরী, আমাদের সুজাতা ভারি ভাল মেয়ে।"

মল্লিকা বললে, "উনি তো খুব প্রশংসা করেন। আমি রসিকতা করে বলেছিলাম, প্রত্যেকটি সাকসেসফুল লোকের পিছনে আগে একটি ভাল বউ থাকতো, এখন সেক্রেটারী থাকে।"

মল্লিকা এবার সুজাতাকে বললে, "আপনি কি ডায়োসেশনে পড়েছেন? ইস্কুলে দেখেছি আপনাকে, আমার থেকে কয়েক বছর সিনিয়র ছিলেন।"

অতিমাত্রায় উৎসাহ না-দেখিয়ে সুজাতা বললে, "হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়ছে বটে।" ডক্টর রায়চৌধুরীর কাছে কথাটা সে যে শুনেছে তা সুজাতা চেপে গেল। মল্লিকা অনেক আগেই তার কোয়ার্টারে গিয়ে আলাপ করবে এবং বাড়িতে একান্তে নিমন্ত্রণ করবে এই আশা করেছিল সুজাতা।

মল্লিকার মাথায় এত বুদ্ধি আসেনি। চাকরিতে ঢুকলে মানুষ যে অত্যন্ত শ্রেণী সচেতন এবং স্পর্শকাতর হয়ে ওঠে তা এখনও সে জানতে পারেনি।

সরল মনে মল্লিকা এবার সুজাতার সঙ্গে গল্প করতে লাগলো। "আপনি এই বনবাসে পড়ে আছেন কী করে? আমি তো হাঁপিয়ে উঠেছি।"

সুদর্শন সেনের পতিব্রতা স্ত্রী হেসে বললেন, "একথা শুনছি না, মা। অমন হীরের টুকরো স্বামী সঙ্গে রয়েছেন। স্বামীরা যেখানে থাকেন মেয়েদের কাছে সেইটাই স্বর্গ।"

"রক্ষে করুন," মল্লিকা বললে। "কিন্তু আমার না-হয় উপায় নেই; কিন্তু আপনি?" সুজাতাকে প্রশ্ন করলো মল্লিকা।

সুজাতা প্রথমে একটু অস্বস্তিবোধ করলে। তারপর সহজভাবে বললে, "কলকাতায় সবাই তো চাকরি পায় না। তা ছাড়া, কলকাতায় এত চেনা-জানা লোক যে হাঁপিয়ে উঠছিলাম। সবার এক প্রশ্ন, বিয়ে করছো না কেন? যেন বিয়ে-করা ছাড়া আইবুড়ো বাঙালী মেয়েদের অন্য কোনো কাজ নেই।"

[illegible] এবার সুজাতার হাতে একটা গেলাস দিয়ে মিষ্টি হেসে একটু চাপা গলায় বললে, "বুঝেছি, হৃদয়ঘটিত ব্যাপার কিছু আছে!"

সুজাতা প্রতিবাদ করলো না। বরং 'হৃদয়ঘটিত' কথাটা বেশ লাগলো। [illegible] গোলমালের জন্যেই তো তার বিয়ে হয়নি—জেনেশুনে কোনো ইণ্ডিয়ান [illegible] আমায় জড়াবে না। অথচ মিথ্যে কথাও বলা যায় না। রোগ [illegible] করেছে জানলে বউকে রাস্তায় ফেলে রেখে স্বামীদেবতা চলে [illegible]।

[illegible] অন্য কোণে, জাপানী-পরিবৃত হয়ে কমলেশ দাঁড়িয়ে রয়েছে। মিসেস [illegible] ডিনার টেবিল সাজাচ্ছেন। মল্লিকা এবার সুজাতাকে জার্মানদের দিকে [illegible] দিলে।

জাপানী অতিথিদের ইংরেজী জ্ঞানের বহর ভয়াবহ। কিন্তু অবস্থা জটিল হয়ে উঠেছে এইজন্যে যে জাপানীদের ধারণা তাঁরা ভালই ইংরেজী জানেন! [illegible] সঙ্গে ভাব বিনিময় করতে গিয়ে সুদর্শনবাবু হাঁপিয়ে উঠছেন।

সুদর্শনবাবু এরই মধ্যে কমলেশকে চাপা গলায় বললেন, "খুব বেঁচে গিয়েছি [illegible]। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এরা জিতলে আমরা ইণ্ডিয়ানরা স্রেফ মারা [illegible]। এদের আণ্ডারে কী করে কাজ করতাম? মালিকদের হুকুমই বুঝতে [illegible] না।"

কমলেশ নিজেও একটু হতাশ হচ্ছে। কাজ ছাড়া এরা কিছুই বোঝে না। [illegible]নায় কমলেশ এদের দেখেছে। তদারকী করবার কেউ নেই; চন্দনপুর [illegible] টেলিফোনে তাগাদা দেবার দিগম্বর বনার্জিও এদের নেই; কিন্তু কাজে

ফাঁকি নেই। ফাঁকি তো দূরের কথা, আট-দশটা লোক যা করছে, এখানে তার জন্যে পঞ্চাশটা লোক প্রয়োজন হতো। এদের মধ্যে পাস-করা ইঞ্জিনীয়ারও কেউ নেই। এরা হাতে-কলমে কাজে বিশ্বাসী। কথায় কথায় গ্র্যাজুয়েট ইঞ্জিনীয়ার চায় না। তরোয়াল দিয়ে পেন্সিল বাড়বার বদ্ অভ্যাস জাপানীদের নেই।

কিন্তু কাজের বাইরে এদেব যেন কোনো অস্তিত্ব নেই। মাঝে-মাঝে দুশ্চিন্তা হয় কমলেশের। ভারতবর্ষেও আমরা এই ধবনের লোক চাইছি—চোখ আর হাত ছাড়া যাদের কিছু নেই। বহু অনুশীলনে হাত-দুটো এমন অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে যে দশভুজের মতো কাজ হচ্ছে। তার সঙ্গে আছে উৎপাদনের লোভ। যত প্রোডাকশন বাড়বে তত পয়সা—তার পরে আবার বোনাস এবং ওভারটাইম। বাড়ির বউরা এই সব যন্ত্রমানব নিয়ে তেমন সুবিধে করতে পারে না। এরা আবার মদের নেশায় পড়ে। প্রচুর প্রোডাকশন দেখিয়ে প্রচুর টাকা রোজগার ছাড়া এদের আর কোনো আশা-আকাঙ্ক্ষা থাকে না। শিল্পে উন্নত পৃথিবীব নানা দেশ এই ধরনের অসম্পূর্ণ যন্ত্রমানুষে বোঝাই হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু যতই সমালোচনা হোক, ভারতবর্ষে এখন এই ধরনের লোক অনেক প্রয়োজন। ক্ষেতে, খামারে, কারখানায়, অফিসে এরাই বিপ্লব আনবে, এরাই এদেশের নব নায়ক এবং পরিত্রাতা।

কমলেশের কাছে এসে সুদর্শন সেন বললেন, "একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করবো ভাবি। আপনারা বলছেন নিজস্ব বিদ্যে দিয়ে এই কারখানা তৈরি করছেন। অথচ, এতগুলো জাপানী এবং জার্মান সায়েবকে দেখছি।"

কমলেশ মুখ টিপে হেসে বললে, "নিজেদের ডিজাইন বটে, কিন্তু যন্ত্রপাতি যে বিদেশ থেকে আনবো না এমন কথা তো ডক্টর বনার্জি বলেন না। বহু যন্ত্রপাতি আছে যা এখনও আমাদের দেশে তৈরি হয় না। সুতরাং এইচ-এ-সিকে বিদেশ থেকে কিছু মেশিন আমদানি করতে হবে।"

সুদর্শন সেন ফিসফিস করে বললেন, "সায়েব হলে কি হবে স্যার, এরা আসলে মিস্ত্রি। এদের সঙ্গে অন্য কিছু আলোচনা করতে হলে একেবারে ঠকে যাবেন। মায় সার-শিল্প সম্বন্ধেও এরা খবরাখবর রাখে না। শুধু ডিজাইন দেখে মেশিনের নাটবল্টু টাইট করতে জানে। তবে খাটতে পারে বটে!"

কমলেশ বললে, "খাটতে আমাদের দেশের লোকও পারে। আপনি আমাদের অভাগা মুটে-মজুর, রিকশাওয়ালা, ঠেলাওয়ালা, মাটি-কাটা মজুরের

কথা ভাবুন। কিন্তু আমরা শিক্ষিত লোকরা তাদের পথ দেখাতে পারছি না। ওদের বাহুবলকে যদি বিজ্ঞানের সাহায্যে কাজে লাগানো যেত তাহলে এদেশও সোনার দেশ হয়ে উঠতো।"

সুদর্শন সেন বললেন, "হাজার হোক আমি বয়োজ্যেষ্ঠ—একটা অ্যাডভাইস শুনবেন? অফিসের কাজে স্বপ্ন দেখবেন না। তাতে জীবনটা নয়-ছয় হয়ে যাবে। কেউ আপনার দাম দেবে না।"

কমলেশ হাসলো। সুদর্শন সেন বললেন, "দিগম্বর বনার্জির একটা খেয়াল মেটাবার জন্যে আপনি কি চেষ্টা করছেন, আমি তো দেখছি। এতে শরীর খারাপ হবে, ডকটর রায়চৌধুরী।"

"দায়িত্ব জিনিসটা যে খারাপ, মিস্টার সেন," কমলেশ বললে।

সুদর্শন বললেন, "দায়িত্ব এদেশে কেউ নেয় না স্যার, শুধু মুখে চীৎকার করে। যতটা পারেন কাজ করে যাবেন—কিন্তু অফিসে আদর্শ দেখাতে যাবেন না।"

"কী বলছেন, আপনি?" কমলেশ প্রশ্ন করে।

"অভিজ্ঞতা তো কম হলো না। প্রথম জীবনে চন্দনপুর প্রোজেক্ট তৈরি হতে দেখেছি। তারপর হরিয়ানা ফার্টিলাইজার। তারপর আসাম প্রোজেক্টের হিসেবপত্তর এই শর্মাই নিজের হাতে রেখেছে। আর শেষ দেখছি কৃষিনগর। আপনি যত চেষ্টা করছেন, দিগম্বর বনার্জি আপনার ঘাড়ে তত দায়িত্ব বাড়িয়ে যাচ্ছে। অন্য যে কেউ প্রোজেক্ট ম্যানেজার হলে কারখানা এক বছর পিছিয়ে যেত। ভদ্রলোক এখন আপনাকে বলছেন, কারখানা চালু করবার দিন এগিয়ে নিয়ে এসো। কেন?"

"কেন বলুন তো?" কমলেশ জিজ্ঞেস করে।

"একটা খেয়াল। কিছু মনে করবেন না, ছোট মুখে বড় কথা মানায় না। তার সঙ্গে একটা নামের মোহ। মিনিস্টার বলবে, বনার্জি তুমি একটা কাজের কাজ করেছো। হয়তো ছাব্বিশে জানুআরি রাষ্ট্রপতি দিল্লীতে ডেকে রায়বাহাদুর করে দেবেন।"

"রায়বাহাদুর, স্যার এসব খেতাব দেশ থেকে উঠে গিয়েছে, সুদর্শনবাবু।"

"ওই হলো—এখন পদ্মকুমার না কী বলে," মিস্টার সেন উত্তর দিলেন।

কমলেশ বললে, "চলুন, জার্মানরা এক কোণে পড়ে রয়েছে, ওখানে একটু যাওয়া যাক।"

রেমার্ক এবং শীলার বেশ খোসমেজাজেই রয়েছে। ওরা বললে, "মোটেই

আমরা 'লোনলি' বোধ করছি না। স্বয়ং মিস ইণ্ডিয়া আমাদের দেখাশোনা করছেন।"

কমলেশ, সুজাতা এবং মিস্টার সেন একসঙ্গে হেসে উঠলো। ম্যাক্স বললে, "ডকটর রায়চৌধুরী আমাদের বিশ্বাসই হচ্ছে না, এই সব খাবার তোমার স্ত্রী নিজের হাতে তৈরি করেছেন।"

কমলেশ বললে, "টেকনিক্যাল কোলাবরেশন দিয়েছেন মিসেস সেন।"

ম্যাক্স বললে, "জার্মানিতে রান্নার এই নো-হাউ বেচেই তোমরা লক্ষ লক্ষ ডয়েটস্ মার্ক রোজগার করতে পারো।"

পার্টির শেষে সুদর্শন সেন জিজ্ঞাসা করলেন, "সুজাতা, তোমাকে কি আমি পৌঁছে দেবো?"

সুজাতা বললে, "কিছু প্রয়োজন নেই। যেভাবে এসেছি, সেইভাবেই চলে যাবো।"

ফেরার সময় ম্যাক্স জীপ চালাচ্ছিল। মধ্যিখানে বসেছিল সুজাতা। ধারে রেমার্ক।

আঁকাবাঁকা উঁচুনিচু পথ পেরিয়ে জীপটা ফ্যাক্টরির কাছে এসে পড়লো। চাঁদের আলো পড়েছে মনুমেণ্টের মতো উঁচু প্রিলিং টাওয়ারের ওপর। জলে ভেজা কাদার মতো থকথকে ইউরিয়া এখানে এসেই মেশিনের ধাক্কা খেয়ে বহু উপরে উঠে যাবে। সেখানে চাকার সাহায্যে বনবন করে ঘুরিয়ে ফেনানো ডালের মতো বড়ি দেওয়া হবে। জল শুকিয়ে শুকনো গরম ইউরিয়া নিচেয় পড়বে।

ম্যাক্স শিস দিয়ে উঠলো। তারপর জীপ থেকে মাথা বার করে ঘাড় বেঁকিয়ে একবার টাওয়ারটা দেখলো। সুজাতাও চাঁদের আলোয় প্রিলিং টাওয়ার দেখার লোভ সামলাতে পারলো না। এতদিন কারখানাকে অবহেলা এবং অবজ্ঞা করে এসেছে সে। পেটের দায়ে সে শিল্পনগরীতে কাজ করতে এসেছে, বিরাট বিরাট যন্ত্রপাতিতে তার কোনো আগ্রহ নেই। কিন্তু অকস্মাৎ সুজাতার মনে হলো, চাঁদের আলোয় নতুন তৈরি প্রিলিং টাওয়ারটা ভারি সুন্দর। বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানবশিল্পের সহজাত কোনো বিরোধ নেই, এরাও মেড-ফর-ইচ-আদার।

ম্যাক্স জিজ্ঞেস করলেন, "কেমন বুঝছেন, মিস ইণ্ডিয়া?"

এদের সঙ্গে সুজাতা বেশ সহজ হতে পেরেছে। সে খিলখিল করে হেসে বললে, "গ্লোরিয়াস!" ভারত ললনার সদয় মন্তব্যে জার্মান যুবকদ্বয় ধন্য হলো।

সুজাতার কোয়ার্টারের সামনে এসে ওরা তিনজন গাড়ি থেকে নেমে পড়লো। একটা পোশাকী নমস্কার জানিয়ে চলে যাবে ভেবেছিল সুজাতা। কিন্তু রেমার্ক কথা তুললো। গম্ভীর, বিষণ্ণ এবং আন্তরিক কণ্ঠে বললে, "মিস দাস, বোধহয় আমাদের এই শেষ দেখা। সুতরাং অল দি বেস্ট।"

বিদায় জানিয়ে লুডউইগ রেমার্ক হাত বাড়িয়ে দিলো। অপরিচিত যুবকের দেহ স্পর্শ করতে সুজাতা মুহূর্তের জন্যে মানসিক ইতস্তত করলো, কিন্তু পর-মুহূর্তেই কুমারীসঙ্কোচ কাটিয়ে হাত বাড়িয়ে রেমার্কের করমর্দন করলো। ম্যাক্স ইতস্তত করছিল, কিন্তু স্বাভাবিক সৌজন্যবশত সুজাতা বললো, "কাম অন।"

মর্দনে অনভ্যস্ত সুজাতার নরম হাত মুহূর্তের মধ্যে ম্যাক্সের বিরাট হাতের মধ্যে হারিয়ে গেল। সুজাতার মনে হলো দেহে বিদ্যুৎ সঞ্চার হচ্ছে। ম্যাক্স হাতটা দুলিয়ে ছেড়ে দিলো; তারপর শুভরাত্রি জানিয়ে ওরা বিদায় নিলো।

বাড়ির মধ্যে ঢুকতে ঢুকতে সুজাতা বুঝলো তার হাতটা ভিজে উঠেছে, উত্তেজনায় নাক বুক পিঠ ঘামছে।

কৃষিনগরের জীবনযাত্রা আরও দ্রুত তালে চলতে শুরু করেছে। সর্বস্তরের কর্মীদের মধ্যে কমলেশ কাজের অনুপ্রেরণা ঢুকিয়ে দিয়েছে। কাজের নেশায় সে নিজেও মেতে উঠেছে।

শুধু সকালের দিকে চন্দনপুরের টেলিফোনটা তার আজকাল ভাল লাগে না। দিগম্বর বনার্জি পনেরো মিনিট ধরে অজস্র প্রশ্ন করেন, তারপর জিজ্ঞেস করেন তিরিশে নভেম্বরের মধ্যে কাজ শেষ হচ্ছে কিনা।

কাজ সবার বেড়েছে। একজন শুধু বুঝতে পারে না, সময় নিয়ে সে কী করবে। মল্লিকার কাছে কৃষিনগর ক্রমশ সব আকর্ষণ হারিয়ে ফেলছে। অফিসে এবং সাইটে কমলেশ ব্যস্ত থাকে এবং বাড়িতে ফিরে এসে শুধু টেলিফোন ধরে। আজকাল রাত্রেও বিছানার কাছে টেলিফোন নিয়ে শোয়। রাত্রি দেড়টার সময় সেদিন টেলিফোন এলো। মল্লিকার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল।

একদিন ধর্মপুরে ওদের নেমন্তন্ন ছিল। মল্লিকা সাজগোজ করে বসেছিল। কমলেশ অফিস থেকে ফিরলো, জামাকাপড় পাল্টালো। স্বামীর দেহে একটু অডিকোলন ছড়িয়ে দিচ্ছে মল্লিকা। এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠলো।

এখনই আসছি বলে সেই যে কমলেশ জীপ নিয়ে উধাও হলো, আর দেখা নেই। দু-তিন জায়গায় ফোনে খবর করেছিল মল্লিকা। কিন্তু কোথায় কমলেশ ?

অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরে কমলেশ দেখে মল্লিকা গুম হয়ে বসে আছে। বাইরে যাবার জামাকাপড় সে সব ছেড়ে ফেলেছিল। লজ্জিত কমলেশ ওকে আদর করবার চেষ্টা করলো। কিন্তু মল্লিকা এই প্রথম অভিমানে ওর হাত সরিয়ে দিলো।

"আমি অত্যন্ত লজ্জিত ঝুমু," কমলেশ ক্ষমা চেয়েছিল। "জানো ঝুমু, অ্যামোনিয়া প্লান্টের রিফর্মিং চেম্বারে সিনথেটিক গ্যাসের তাপ হঠাৎ বাড়তে আরম্ভ করেছিল। ডিজাইন সীমার বাইরে চলে যাচ্ছিলো। হয়তো ট্যাঙ্ক ফেটে যেত। ডকটর বনার্জিকে ফোন করতে হলো।"

মল্লিকার চোখে জল। "চন্দনপুরে ফোন করলে, আর আমাকে একটা খবর দিতে পারলে না ? আমার বোন ওখানে রান্নাবান্না করে অপেক্ষা করছে। তুমি তাদের মানুষ মনে না করতে পারো, কিন্তু তারাও খেটে খায়।"

ঝুমুর মতো নরম মেয়েও যে এরকম কথা বলতে পারে কমলেশ তা ভাবতে পারেনি। "এসব কী বলছো, ঝুমু ?" কমলেশ আবার ক্ষমা চায়, ধর্মপুরে খবর দেওয়ার কথাটা তার মনেই ছিল না।

অনেক সাধ্যসাধনার পর মল্লিকা শান্ত হয়েছিল। ওরা ফোন করেছিল ধর্মপুরে। কমলেশ বললে, "আমি নিজে ক্ষমা চাইছি।"

মল্লিকা বললে, "না, তোমাকে আর কথা বাড়াতে হবে না। একেই তো রিংকির ধারণা, কাজ নিয়ে তুমি বেশী বাড়াবাড়ি করো।"

মল্লিকা নিজেই বোনকে ফোন করলে, "রিংকি খুব গালাগালি করছিস নাকি ?"

"তুই আমার সঙ্গে কথা বলিস না, ফোন কেটে দে !" রিংকির অভিমানভরা কণ্ঠস্বর ভেসে এলো !

মল্লিকা বললে, "লক্ষ্মী বোনটি আমার, শোন। তোর ওখানে যাবো বলে জামাকাপড় পরে বেরোচ্ছি, ঠিক সেই সময় শরীরটা কি রকম ঘুলিয়ে উঠলো। দু-একবার বমিও হয়েছে। ভাবলুম একটু বিশ্রাম করে দেখি। ও সাহস করলে না। তোকে ফোন করতে যাচ্ছিলো, আমি বললাম, আর একটু দেখি। দেখি দেখি করতে করতে এই দেরি হয়ে গেল।"

রিংকির মেজাজ মন্ত্রবৎ পাল্টে গেল। প্রবল উৎসাহে চড়া গলায় প্রশ্ন করলে, "বমি-টমি ! কী ব্যাপার ? দে তো একবার ভদ্রলোককে। ব্যাপারটা

জিজ্ঞেস করি। এদিকে তো অফিসের কাজে খুব ব্যস্ত থাকেন—তাহলে বউ-এর বমি-টমি কেন ?"

"তুই যা ভাবছিস, তা নয়," মল্লিকা বোনকে বোঝাবার চেষ্টা করলে। কিন্তু বোন বুঝতে চায় না।

ফোন নামিয়ে মল্লিকা বেশ লজ্জায় পড়ে গেল। বললে, "নতুন এক ফ্যাসাদ বাধলো। রিংকি অন্য কিছু সন্দেহ করছে। শনিবারেই চলে আসবে বললে।"

কমলেশ ঠিক করলে, এবার রিংকিদের যথেষ্ট আদর আপ্যায়ন করবে। রাত্রে দু-একজনকে খেতেও বলবে। ঝুমুকে বুঝিয়ে দেবে রিংকিদের সেও ভালবাসে। সেও আড্ডা দিতে জানে।

রিংকি এসে ঝড়ের বেগে বোনকে পাকড়াও করলে এবং জড়িয়ে ধরে আদর করলে। তারপর বললে, "আমি কোথায় ভাবছিলাম, ভগ্নীপতিটি উদাসী বিজ্ঞানী, কাজ-কর্মের নেশায় রয়েছে! বউ-এর দিকে নজর নেই।"

"নেই তো," মল্লিকা বলে।

"তাহলে বমি-টমি হচ্ছে কেন ?" রিংকি বোনকে মৃদু ঠেলা দিলো।

"বিশ্বাস কর, স্রেফ অম্বল। দেরি করে খাওয়া হয়েছিল," মল্লিকা বোনের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছে।

রিংকি বললে, "সেদিন যা রাগ হচ্ছিলো না। কর্তা আবার মিস্টার ডিকসনকে নেমতন্ন করেছিলেন। ওদের ফার্টিলাইজার প্রোজেক্টের ডিরেকটর। দু-তিনটে সিনিয়র বিজ্ঞানী নেবে ওরা। মাইনে চার হাজারের ওপর। তারপর তোরা আসছিস না দেখে আমাদের চিন্তা। ও বললে, দ্যাখো ঝুমুর বর হয়তো ভুলেই গিয়েছে। আমি বললাম, তা হতেই পারে না। ঝুমু ঠিক পাকড়ে নিয়ে আসবে। ঝুমু জানে, আমরা স্পেশাল ব্যবস্থা করছি। তোর ফোন আসায় আমার মুখ রক্ষে হলো। বললাম, পুরুষমানুষের আর কী। যখন যা খুশী করছো। মেয়েরাই বিপদে পড়ে যায়।"

মল্লিকা হাসলো। আর অনন্যোপায় কমলেশ ওদের সামনে মিথ্যে অভিনয় করলো।

রিংকি বোনের জন্যে ইমপোর্টেড কসমেটিক এনেছে। সেগুলো মল্লিকার হাতে দিয়ে বললো, "তোর জন্যে লণ্ডন থেকে আনিয়েছি। আমাদের ওখানে তো হরদম প্লেনে যাচ্ছে।"

কমলেশ বললে, "স্নো, লিপস্টিক, মেকআপ এসব আজকাল শুনি ইণ্ডিয়াতে ভালই হচ্ছে?"

রিংকি বললে, "দোহাই আপনাদের। চাষাদের জন্যে স্বদেশী সার তৈরি করছেন করুন, কিন্তু আমাদের এই চুলের ডেলাগুলো মাখতে বলবেন না।"

"কসমেটিক আমদানি হয় আজকাল?" কমলেশ জিজ্ঞাসা করে।

"সরকারীভাবে হয় না; কিন্তু বেসরকারীভাবে কত চাই আপনার?"

রিংকি বললে, "আমি তো বিলেত থেকে ফেরবার সময় বুক ফুলিয়ে কাস্টমসকে দেখিয়ে সব নিয়ে এলাম। কাস্টমসের একটা ছোঁড়া কোশ্চেন করতে যাচ্ছিলো। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, বিয়ে করেছেন? বেচারা ঘাবড়ে গিয়ে বললে, না। আমি সঙ্গে সঙ্গে শুনিয়ে দিলুম, বিয়ে হলে জানবেন, মেয়েদের চামড়ার স্বাস্থ্য একবার নষ্ট হয়ে গেলে তা আর কখনও ভাল হয় না। ব্যাচেলর ছোকরা ভয় পেয়ে আর কিছু বললে না।"

সন্ধ্যাবেলায় কমলেশ আবার ডুবিয়েছিল। সুদর্শনবাবু, তাঁর স্ত্রী, রিংকি, সমরেন্দ্রবাবু সবাই তৈরি হয়ে বসে আছেন। কমলেশ এলেই খাবার দিয়ে দেবে মল্লিকা। কিন্তু কোথায় কমলেশ? সাড়ে-সাতটা নাগাদ ড্রাইভার এলো সঙ্গে চিঠি। একটা পরিষ্কার গেঞ্জি, জামা এবং প্যাণ্ট পাঠিও। আর সম্ভব হলে কয়েকটা স্যাণ্ডুইচ। তোমরা আমার জন্যে অপেক্ষা কোরো না।

মুখ কালো হয়ে উঠলো মল্লিকার। সুদর্শনবাবু বুঝতে পেরে বললেন, "বয়লার টিউবে একটা গণ্ডগোল চলছিল। ইঞ্জিনীয়ার নীলমণি পট্টনায়কের সঙ্গে রায়চৌধুরী সায়েবও দাঁড়িয়ে ছিলেন।"

রিংকি জিজ্ঞেস করলো, "বয়লার টিউবের গোলমাল যদি না মেটে তাহলে কি কমলেশ আজ বাড়ি ফিরবে না?"

"কিছুই বলা যায় না," সুদর্শনবাবু উত্তর দিলেন। "রায়চৌধুরী সায়েব বলেন, এখন তো সাধারণ সময় না। কোথাও একটু পিছিয়ে গেলে সময়মতো কারখানা চালু করা যাবে না। উনি নিজে তাই দাঁড়িয়ে থাকেন, পথ বাতলে দেন। অনেক সময় বনার্জি সায়েবকে ফোন করেন।"

"বনার্জি সায়েব নিজে এখানে এসে থাকলেই পারেন," রিংকি বিরক্তভাবে বলে।

"তাহলে আমাদের আর আস্ত থাকতে হবে না," সুদর্শনবাবু আঁতকে উঠলেন। "তবে এবার কেন যে ঘন ঘন আসছেন না, জানি না। গুজব শুনছি শরীরটা তেমন সুবিধে যাচ্ছে না।"

স্বামীকে কিছু খাবার পাঠিয়ে দেবে ভাবছিল মল্লিকা। সুদর্শনবাবু বারণ করলেন। বললেন, "ওঁর যা স্বভাব, সবাই না খেলে, উনি খাবেন না।"

অনেক রাত্রে ফিরেছিল কমলেশ। রিংকি বললে, "যুদ্ধের সময় চার্চিল দুপুরবেলায় কিছুক্ষণ গড়িয়ে নেবার এবং রাত্রে ডিনারের সময় করে নিতেন।"

খুব লজ্জা পেয়ে কমলেশ বললে, "শেষ পর্যন্ত সেকেণ্ডারি রিফরমারের ওপর দিকটা খুলতে হলো। ওদের একলা ছেড়ে দিয়ে চলে আসতে সাহস হলো না। তাছাড়া, পট্টনায়কের বিবাহ-বার্ষিকী, তাকেই আটকে রাখলাম, আমি চলে আসবো কী করে?"

সমরেন্দ্রবাবু কিছুই বললেন না। মল্লিকার মনে হলো, তিনি একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছেন। রাত্রে বিছানায় মল্লিকা অভিমানে মুখ ফিরিয়ে রইলো। আর সমস্ত দিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত কমলেশ প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লো।

ধর্মপুরে ফিরে যাবার আগে রিংকি বলেছিল, "এই শেষবার। তোদের আর জ্বালাতে আসবো না। ও-বেচারাকে জোর করে টেনে আনি, তোর কর্তা পাত্তাই দেয় না।"

কমলেশ হাতে ধরে ক্ষমা চেয়েছিল দুজনার কাছে।

রিংকি হঠাৎ বললে, "আমাদের ক্লাবে দম্পতি কমপিটিশনের কথা মনে আছে তো তোদের? টেলিফোনে কথা মতো তোদেরও নাম দিয়ে দিয়েছি। আমরা তো আগেই নাম পাঠিয়েছিলাম। প্রথম পুরস্কার বিনা খরচে স্বামী-স্ত্রীর কাশ্মীর-ভ্রমণ।"

"সঙ্গে তো ছবি দিতে হয়?" মল্লিকা জিজ্ঞেস করলো।

"তোদের একটা ছবি ছিল আমাদের কাছে। সেইটা পাঠিয়ে দিয়েছি। দেখিস, এবার যেন আমাদের মান-সম্মান থাকে।"

ব্যাপারটা কমলেশ বুঝতে পারছিল না। মল্লিকা জানালো, স্বামীর অনুমতি না নিয়েই সে ধর্মপুর ক্লাবের মেড-ফর-ইচ-আদার দম্পতি প্রতিযোগিতায় নাম দিয়েছে। বিয়ের আগে থেকেই ওর ইচ্ছে মেড-ফর-ইচ-আদার হয়। বউকে খুশী করার এমন সুবর্ণ সুযোগ হাত ছাড়া করলো না কমলেশ। উৎসাহের সঙ্গে রাজী হয়ে গেল। শ্যালিকাকে বললে, "আপনারা থাকতে আমাদের যদিও প্রাইজ পাবার কোনো সম্ভাবনা নেই, তবুও আমরা লড়ে যাবো।" কমলেশ বললে, "প্রতিযোগিতার দিন একহাত অন্তর বজ্রপাত হলেও আমাদের ধর্মপুরে দেখতে পাবেন।"

কমলেশকে আড়ালে ডেকে নিয়ে সমরেন্দ্রবাবু বললেন, "আমাদের কার্টি-

লাইজার প্রোজেক্টের ডিরেকটর মিস্টার ডিকসন তোমার সম্বন্ধে খুব ইনটারেসটেড। এই রকম উৎসাহী সায়েনটিস্ট চাইছেন তিনি। চাকরিতে ঢোকবার পর, ছ'মাস এডিনবরায় ট্রেনিং। একটু চাপ দিলে বউকেও নিয়ে যেতে দেবে। তারপর সপ্তাহকয়েক কোম্পানির খরচে কন্টিনেন্ট ঘুরে নতুন প্রোজেক্টে জয়েন করো। তিনবছর লাগবে তৈরি হতে আমাদের নতুন কারখানা।"

মল্লিকার কাছে এসে রিংকি ফিসফিস করে বললে, "দিগম্বর বনার্জি যত মাইনে পায়, তার থেকেও কমলেশকে বেশী দেবে ওরা।"

"একটা অ্যাপ্লিকেশন করো না," মল্লিকা অনুরোধ করলে স্বামীকে।

সমরেন্দ্রবাবু বললেন, "এসব চাকরির জন্যে অ্যাপ্লিকেশন করতে হয় না। তোমার সব পার্টিকুলারস আমি তো জানি। আমিই মিস্টার ডিকসনকে দিয়ে দিতে পারবো। তাছাড়া ডিকসন তোমাকে দেখেছেন।"

"আমাকে? কোথায় দেখলেন?" কমলেশ অবাক হয়ে গেল।

"দিল্লীতে ফার্টিলাইজার সেমিনারে। উনিও তো গিয়েছিলেন, ব্রিটিশ এক্সপ্লোসিভের পক্ষ থেকে। তুমি এবং দিগম্বর বনার্জি দুজনে মিলে কি একটা পেপার দিয়েছিলে।" সমরেন্দ্রবাবু জানালেন।

যাবার আগে সমরেন্দ্রবাবু আরও জানিয়ে গেলেন, দম্পতি প্রতিযোগিতার দিনে ডিকসন ধর্মপুরে থাকবেন।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে স্বামীর সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করবার ইচ্ছে ছিল মল্লিকার। রিংকির কাছে শুনেছে, সমরেন্দ্রবাবুর সঙ্গে প্রেমালাপ করতে করতে সে অনেক সময় ভোর চারটে বাজিয়ে দিয়েছে। কমলেশ কিন্তু বিছানায় পড়ামাত্রই ঘুমিয়ে পড়লো। একটু একটু নাক ডাকছে ওর; মল্লিকার ঘুম আসছে না।

এই অল্পদিনেই বিবাহিত জীবন সম্বন্ধে মল্লিকার আকর্ষণ কমে আসছে। গতকাল মনে হচ্ছিলো গাইগোরুর মতো সারাক্ষণ গোয়ালে বাঁধা রয়েছে সে।

তার ওপর রিংকি আজ দুপুরে মনের মধ্যে ভয় ধরিয়ে দিলো। ঝুমু নাকি স্বামীকে বাগ মানাবার চেষ্টাই করছে না। ভালমানুষ বউরা নাকি চিরদিন কষ্ট পায়। পুরুষমানুষেরা নাকি শান্ত, নরম মেয়েদের বেশী অবহেলা এবং অবজ্ঞা করে। ধরে নেয় হাতের পাঁচ বউ তো ঘরেই রয়েছে। রিংকি বলেছিল, "তোর যে সাধ আহ্লাদ আছে তা মাঝে-মাঝে বুঝিয়ে দিবি—না হলে সারা জীবন দুঃখ পাবি।"

মল্লিকা ঠিক করেছিল স্বামীকে একটু পরীক্ষা করবে। বউ যে খুশী নয়, তা একটু বুঝিয়ে দেবে। কিন্তু কমলেশ সে-সুযোগ দিলো না। নিজেই উৎসাহের সঙ্গে ধর্মপুর দম্পতি প্রতিযোগিতায় যেতে রাজী হলো। ও যে এসব ভালবাসে না তা মল্লিকা লিখে দিতে পারে। কিন্তু বউকে সন্তুষ্ট করবার জন্যেই সে আগ্রহ দেখালো।

ঘুমের ঘোরে কমলেশ পাশ ফিরলো। ধর্মপুরে রিংকি এখনও নিশ্চয়ই স্বামীর সঙ্গে গল্প চালিয়ে যাচ্ছে। মল্লিকা এখন একটু শান্ত বোধ করছে। রিংকি বলছিল, কোনো কিছুকেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলে ধরে নেওয়া যায় না। স্বামী-স্ত্রীর প্রেম যতই অমর হোক, মাঝে-মাঝে ভালবাসার প্রমাণ দরকার। কমলেশ আজ একটা প্রমাণ দিয়েছে। কিন্তু রিংকি যাবার আগে বললে, "এতেই যেন বরের কাছে গলে পড়িস না। মাঝে-মাঝে বরের কাছে অভিমান করবি, গম্ভীর হয়ে থাকবি, ছোটখাট পাওনাগণ্ডা আদায় করবি।"

একেবারে মিথ্যা বলেনি রিংকি। মল্লিকা এখন থেকে প্রমাণ চাইবে। দিগম্বর বনার্জি ছাড়াও আর একটা মানুষ যে তোমার জীবনে এসেছে তার প্রমাণ দিতে হবে কমলেশকে।

কৃষিনগরের বিরাট দায়িত্ব ক্রমশ আয়ত্তের মধ্যে আসছে। রায়চৌধুরী সায়েব যে কাজে খুশী তা সুজাতা দাস নিজের চেম্বারে বসেই বুঝতে পারছে। অনেক-ক্ষণ ধরে নকশা এবং রিপোর্ট পরীক্ষা করবার পরে সায়েব আপনমনে শিস দিচ্ছেন।

দিগম্বর বনার্জি খুবই সৌভাগ্যবান যে কমলেশ রায়চৌধুরীর মতো সহকারী পেয়েছেন। বনার্জিকে রায়চৌধুরী যে কতখানি শ্রদ্ধা করেন তা সুজাতা তো নিজের চোখেই দেখেছে।

সুদর্শন সেন এবার ফাইল হাতে সায়েবের ঘরে ঢুকলেন।

রায়চৌধুরী বললেন, "সমস্ত সেকশনের লোকেরা এখনই আসছেন—কারখানা চালু করা সম্পর্কে জেনারেল মিটিং।"

সুদর্শন সেন পালাবার চেষ্টা করলেন। "টেকনিক্যাল ব্যাপারে আমি আর কী করবো স্যার?"

কমলেশ বললে, "টেকনিক্যাল কাজে আপনার বিংট দায়িত্ব রয়েছে। আপনিই তো বলেন, সম্রাট শাজাহান যখন তাজমহল তৈরি করেছিলেন, তখন তার হিসেব রাখতে গিয়ে কাউকে নাস্তানাবুদ হতে হয়েছিল। অথচ অকৃতজ্ঞ আমরা সেই ভদ্রলোকের নাম পর্যন্ত মনে রাখিনি।"

সুদর্শন বুঝলেন সাহেব আজ বেশ খুশী আছেন। কমলেশ বললে, "সার কারখানার স্টার্ট-আপ বা প্রাণপ্রতিষ্ঠাই সবচেয়ে ইনটারেসটিং। আমরা সমস্ত কারখানা চারভাগে ভাগ করে নিয়েছি। প্রথমে সিনথেসিস এবং অ্যামোনিয়া রিকভারি, দ্বিতীয়—রিসার্কুলেশন এবং ইউরিয়া সলুসন, তিন নম্বর ইউরিয়াকে ক্রিস্টালাইজ এবং চার নম্বর ড্রাইং রিমেলটিং এবং প্রিলিং।"

এইসব টেকনিক্যাল শব্দ শুনলে সুদর্শন সেনের মাথা ঝিমঝিম করে। কিন্তু উপায় কি? সাহেব বলে যাচ্ছেন, "সমস্ত ফ্যাকটরি চল্লিশটা সার্কিটে ভাগ হয়েছে, চালু করবার সুবিধের জন্যে। প্রত্যেক লোকের আলাদা দায়িত্ব। মেশিনের পরীক্ষা আরম্ভ হয়েছে। আগামী কাল ফ্ল্যাশিং শুরু হবে।"

এবার ঘরে অনেক লোক এসে পড়লো। মিটিং শুরু হয়ে গেল।

সুজাতা আশা করেছিল জার্মান যুবক ম্যাক্সকেও দলের মধ্যে দেখতে পাবে। তারপর মনে পড়ে গেল, পুরো কারখানা ইণ্ডিয়ানরাই চালু করবে, সেখানে বিদেশীদের কোনো সাহায্য নেওয়া হবে না।

সেই রাত্রের অভিজ্ঞতার পর থেকে কন্দর্পকান্তি ম্যাক্স সম্পর্কে সুজাতা বেশ দুর্বলতা বোধ করে। রোজ সকালে ম্যাক্স চিঠির খোঁজে আসে; আর পাঁচটা মিনিট সুজাতার অনির্বচনীয় আনন্দে কেটে যায়। সুজাতা যেন ওর খুব কাছাকাছি চলে আসে।

আজ এলো না ম্যাক্স। বেচারা রোজ রোজ কেনই বা আসবে? চিঠিপত্তর তো থাকে না।

তবু মনটা ছটফট করছে সুজাতার। কি সুন্দর হাসে ম্যাক্স। ওর হাসিতে এদেশের ব্যাটাছেলেগুলোর মতো পাপ নেই।

ঘরের মধ্যে মিটিং পুরোদমে চলেছে, সুজাতা উঁকি মেরে দেখলো। হাতে একটা সরু লাঠি নিয়ে, দেওয়ালে টাঙানো ম্যাপ দেখিয়ে কমলেশ বলে যাচ্ছে।

রায়চৌধুরী সাহেব চান যে, প্রত্যেক মজুর এবং কর্মী যেন মোটামুটি জেনে রাখেন কীভাবে এখানে ইউরিয়া তৈরি হবে। মজদুরদের পিছনে অত সময় দিতে অনেক সুপারভাইজার চান না। কিন্তু কমলেশের কথা সুজাতা শুনতে পেলো। কমলেশ বলছে, "এটা খুবই প্রয়োজনীয়। কারখানার পুরো ছবিটা

মনের মধ্যে না থাকলে মজুরদের কাছে নিজের কাজটুকু অর্থহীন হয়ে পড়বে। ভুল হতে পারে, ক্লান্তি আসবে।”

সুজাতার ওসব ভাল লাগছে না। সে এই সুযোগে প্রিলিং টাওয়ারে ফোন করলো। ম্যাক্সকে যদি পাওয়া যায়। কোথায় ম্যাক্স? একটা মজদুর ওই মেছোবাজারী আওয়াজের মধ্যে কী যে বলছে, সুজাতা শুনতে পাচ্ছে না। ম্যাক্স যে আজ কাজে আসেনি, তা শেষপর্যন্ত অনেক কষ্টে সুজাতা বুঝতে পারলো।

সুজাতার চিন্তা বাড়ছে। নাকের ডগায় আবার ঘাম জমছে। প্রথমে ভাবলো ছোকরা সায়েবের খোঁজ করবে না। কেনই বা করতে যাবে? কিন্তু কিছুতেই কাজে মন বসছে না। মন্ত্রমুগ্ধের মতো সুজাতা দাস এবার গেস্ট হাউসে ফোন করলো।

গেস্ট হাউসের ফোনটা ডাইনিং রুমের পাশে। সেখানে কুকবেয়ারা আবদুল ফোন ধরলে। বললে, “শালারসাব? হাঁ। উনকো তবিয়ত আচ্ছা নহি!” সায়েব নাকি ঘুমোচ্ছেন। আবদুল ডেকে দিতে রাজী হয়েছিল, কিন্তু সুজাতা হঠাৎ লজ্জা পেয়ে লাইন কেটে দিয়েছিল।

আচমকা এইভাবে লাইনটা কেটে দেওয়া ঠিক হলো কিনা ভাবছিল সুজাতা দাস। এমন সময় কমলেশ বেল বাজিয়ে সুজাতাকে ডাকলো। “মিস দাস, আপনি একটা ছোট্ট নোট নিয়ে নিন তো। আমি এখানকার ইউরিয়া তৈরির পদ্ধতিটা সোজা ভাষায় বর্ণনা করতে চাই—যাতে প্রত্যেক কর্মীকে আমরা ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিতে পারি।”

সুদর্শন বললেন, “ভীষণ গোলমালে ব্যাপার স্যার। আমার তো গুলিয়ে যাচ্ছে। কী বললেন—তরল অ্যামোনিয়ার সঙ্গে কার্বন ডাইঅক্সাইড আর অনেকরকম সলিউসন মিশিয়ে কোন এক রি-একটরে পাঠাবেন। তারপর সেখানে স্টিমের চাপ কমিয়ে কীসব করবেন। সেখান থেকে মালমসলা চলে যাবে সংশোধন স্তম্ভে।”

“বাঃ এই তো রেকটিফাইং কলমের বেশ ভাল বাংলা বার করেছেন,” কমলেশ উৎসাহ দিলো।

সুদর্শন বললেন, “সত্যি কথা বলছি স্যার, কর্মীরা আপনার ওই হিটার, সেপারেটর, দ্বিতীয় সংশোধনী স্তম্ভ, ৭৫% ইউরিয়া সলিউসন ওসব কিছুই জানতে চাইবে না।”

“তবে তারা কী জানতে চাইবে?” কমলেশ জিজ্ঞেস করলে।

"তাবা জানতে চাইবে, কারখানা চালু হলে মাইনে বা কিনা, বোনাস কত হবে, আরও কোয়ার্টাব তৈবি হবে কিনা, এইসব।"

হেসে ফেললো কমলেশ। বললে, "কাবখানা চললে, এসব তো হবেই। কিন্তু তার আগে তো ইউবিযা বেবনো চাই।"

নোট ডিকটেশন নিয়ে সুজাতা বেবিয়ে এলো। কমলেশ এবাব দিগম্বব বনার্জিকে ফোন বুক কবলো। কমলেশ ভাবছে, বাইবেব অ্যামোনিযা জলে গুলে প্রিলিং সেকশনেব কাজটা এগিযে রাখবে। হাজাব হোক সাকশন পদ্ধতিতে দেড়শ' ফুট উপবে কাদাব মতো ইউরিযাকে টেনে তুলতে হবে, তাবপব স্প্রে-ড্রাইনিং কবাব জন্যে ছডিযে দিতে হবে।

দিগম্বব বনার্জি ওসব শোনবাব পবেই নিজেব প্রসঙ্গে ফিবে আসবেন। তাঁব এখন একটি মাত্র প্রশ্ন, ইউবিযা কাবখানা ৩০শে নভেম্বব চালু হচ্ছে কিনা। ইদানীং ভদ্রলোক একটু পাল্টে গিয়েছেন বিলেত থেকে ফেবা পর্যন্ত, কেবল একই ভাবে গ্রামোফোন বেকর্ডেব মতো জিজ্ঞেস কবে যাচ্ছেন ৩০শে নভেম্বর কাজ শেষ হচ্ছে কিনা।

অথচ সেই অনুপাতে রুবিনগবে আসা কমিযে দিযেছেন দিগম্বব বনার্জি। কিন্তু টেলিফোনে আলাপ-আলোচনা বেড়েই চলেছে। কণ্ঠস্ববে আগেকার প্রসন্নতা ফুটে ওঠে না। কমলেশেব ওপব তিনি কি পুবানো বিশ্বাস বাখতে পাবছেন না? না, সি-বি-আই কমলেশ সম্পর্কেও তাঁব কাছে গোপন বিপোর্ট পাঠিযেছে?

এসব সত্ত্বেও কমলেশেব হৃদযে দিগম্বব বনার্জি আজও আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত।

তখন প্রায সন্ধ্যা। গেস্ট হাউসের ডাইনিং রুমে ফুল বাখতে বাখতে বাবুর্চি-কাম বেয়াবা আবতুল দেখলে একজন সুবেশিনী মহিলা এদিকেই আসছেন। গেস্ট হাউস এখন তো খালি। জার্মান শীলার সাযেব ছাডা আর কেউই নেই। ইনি আবাব কাব খোঁজে আসছেন?

আবতুল একটু সেকেলে ধরনের। একলা যুবতী মেয়ে দেখলে ভয় পেয়ে যায়। বিশ্বযুদ্ধের সময় মিলিটারি অফিসারদের মেসে কাজের অভিজ্ঞতায়

দেখেছে, সায়েবরা একলা বেশ থাকে। কিন্তু মেয়েমানুষ এলেই একেবারে বিগড়ে যায়। কিন্তু আবদুল সামান্য বেয়ারা, কে তার কথা শোনে।

সুজাতা দাস আজ খোঁপায় ফুল গুঁজেছে। জিজ্ঞেস করলে, "শীলার সায়েবের ঘর কোথায়?"

সন্ধ্যাবেলায় ঝকঝকে জামা-কাপড় পরা কমবয়সী মেয়েমানুষকে একলা ঘরে ঢুকতে দিত না আবদুল, কিন্তু মনে পড়লো হেড আপিসে বড়সায়েবের ঘরে এই মেমসায়েবকে সে দেখেছে। তাই সেলাম করলে। তারপর শীলার সায়েবের ঘর দেখিয়ে দিলো।

দরজায় দুটো হাল্কা টোকা দিয়ে সুজাতা অপেক্ষা করলো। ভিতর থেকে আওয়াজ এলো, "কাম ইন।"

ম্যাক্স ভেবেছিল আবদুল। কিন্তু তার পরিবর্তে সুজাতাকে দেখে একেবারে ধড়মড়িয়ে বিছানা থেকে উঠে পড়লো। শীলারের অনাবৃত রোমশ বুকটা দেখা যাচ্ছে। অসংখ্য ক্ষমা প্রার্থনা করে সে বুশ শার্টের খোলা বোতামগুলো লাগিয়ে নিলো। "হোয়াট এ প্লেজেণ্ট সারপ্রাইজ!" মধুর বিস্ময়ে সায়েব বেশ খুশী হয়েছেন।

সুজাতা প্রথমে একটু লজ্জা পাচ্ছিলো। এবার মনোবল সংগ্রহ করে সহজভাবে স্নেহভরা কণ্ঠে অনুযোগ করলে, "অসুখ করেছে, ডাক্তার ডাকেননি?"

ম্যাক্স অপ্রত্যাশিত আনন্দে ইংরাজী ভুলে যাচ্ছে। বললে, "ডকটরকে ডাকবার মতো অসুখ নয়। তবে অসুখকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার বর্তমান সৌভাগ্যের জন্য।"

ম্যাক্সের চোখ দুটো কী সুন্দর। ওর মার্বেল পাথরের মতো শাদা দেহটাও সামান্য জ্বরে ভুগে যেন আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

সুজাতার খোঁপায় বাঁধা ফুল ম্যাক্সের দৃষ্টি এড়ালো না। ইণ্ডিয়ান সুন্দরীদের মাথায় ফুল গুঁজলে স্বর্গীয় মনে হয়। "তোমরা কি দেবতাদের সন্তুষ্ট করবার জন্যে মাথায় ফুল দাও?" ম্যাক্স জিজ্ঞেস করলে।

"গড্-টড্ জানি না, অনেকে দেয়—আমিও দিই।" সুজাতা হেসে বললে।

"ওহো, স্বামী তো ইণ্ডিয়ান মেয়েদের গড্," ম্যাক্সের মনে পড়ে গেল।

সুজাতা বললে, "আমার পতিদেবতা নেই, হবারও কোনো সম্ভাবনাও নেই। সুতরাং ওসব নিয়ে মিথ্যে মাথা ঘামাই না।"

ম্যাক্স জিজ্ঞেস করলে, "দুপুরবেলায় তুমি কি আমাকে ফোন করেছিলে? ঘর থেকে বেরিয়ে ফোনের কাছে যাবার আগেই লাইন কেটে গেল। আবদুল

বললে, মহিলার গলা। আমি একবার ভাবলাম, মিস ইণ্ডিয়া ছাড়া কে হবে? কিন্তু ফোন তুলে জিজ্ঞেস করতে সাহস হলো না।"

"তুমি আমাকে মিস ইণ্ডিয়া বোলো না, ম্যাক্স। লোকে হাসবে। ইণ্ডিয়ান মেয়েদের তুলনায় আমি অনেক নিরেস। আমার গায়ের রঙ কালো।"

ম্যাক্স কোনো কথাই শুনলে না। বললে, "ব্ল্যাক ইজ স্যুইট।"

ম্যাক্স কি ওর দিকে তাকিয়ে আছে? সুজাতা বুঝতে পারছে না। সুজাতার মাথাটা একটু যেন ঘুরতে আরম্ভ করেছে। ত্রিশ বছরের সংযম-শাসিত কুমারী দেহকে সুজাতা ঠিক আয়ত্তে রাখতে পারছে না।

সুজাতা জানে সে বিয়ে করবে না। কিন্তু পুরুষ সম্বন্ধে সেই অনাদি অনন্ত আদিম কৌতূহলকে মন থেকে সম্পূর্ণ তাড়াতে পারেনি। অথচ দিশী পুরুষ-গুলোকে সে সত্যিই ঘেন্না করে। ও-গুলোকে বড় নোংরা মনে হয়।

সায়েবরা হিপক্রিট নয়। ম্যাক্স তো অকপটে বলছে, "সে অবিবাহিত, কিন্তু কুমার নয়।"

দিশীদের এই সততা নেই। সব ব্যাটাই সাধু সেজে সমাজে ঘুরে বেড়াতে চায়।

সব জেনেশুনেও, ম্যাক্সকে ভাল লাগছে সুজাতার। ম্যাক্স বললে, মিস ইণ্ডিয়ার সাময়িক বন্ধুত্ব তার কাছে অমূল্য এবং আশাতীত।

তারপর?

তারপর আর স্মরণ করতে পারছে না সুজাতা দাস। সমস্ত জেনেশুনেও অকস্মাৎ অঘটন ঘটে গিয়েছে। ম্যাক্সকে দোষ দিতে পারে না সুজাতা। সে যে বিয়ে করে ইণ্ডিয়াতে জড়িয়ে পড়তে পারবে না তা খোলাখুলিই বলেছে। সুজাতাও জানিয়েছে, তোমার ইচ্ছে থাকলেও আমি রাজী নই। কিন্তু তারপর কী যে হলো। নভেম্বরের নিভৃত নির্জন সন্ধ্যায় ম্যাক্সের উষ্ণ আলিঙ্গন থেকে নিজের কুমারী দেহকে মুক্ত করেনি।

চরম মুহূর্তের চকিত চমকে সুজাতা বোধহয় কিছুক্ষণের জন্য জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। তার বিধ্বস্ত অবস্থা দেখে ম্যাক্স একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিল। ওর নরম হাতটা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে নাড়ি দেখেছিল। ওকে চাঙ্গা করবার জন্যে মুখে একটু ভারমুথ ঢেলে দিয়েছিল। তারপর পরম স্নেহে সুজাতাকে বলেছিল, "আমি অত্যন্ত দুঃখিত। চলো তোমাকে বাড়ি দিয়ে আসি।"

"না, আমি একাই চলে যেতে পারবো," এই বলে নতুন অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ

অথচ সন্ত্রস্ত সুজাতা দাস রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছিল।

সুজাতা দাস এবার যেন সংবিৎ ফিরে পাচ্ছে। কিছুক্ষণের জন্যে সে কি পাগল হয়ে গিয়েছিল? পাগলামির মাথায় কী একটা করে ফেললো সে। সুজাতা আর ভাবতে পারছে না। কিন্তু সেই সঙ্গে মাঝে-মাঝে এক অনাস্বাদিতপূর্ব প্রশান্তি অনুভব করছে সে।

সুজাতা দাস বাড়ির দিকে এগিয়ে চললো।

সুজাতা দাস নিজেকে আর প্রকৃতিস্থ রাখতে পারছে না। প্রথমে প্রচণ্ড জয়ের আনন্দ অনুভব করছিল সে। তারপর নিজেই বুঝতে পারছে এর মধ্যে প্রতিশোধের প্রবৃত্তিও ছিল। কালো, রোগা, লম্বা, শীর্ণ বক্ষ, ঈষৎ ট্যারা, ডাইলেটেড্ হার্টের সুজাতা দাসকে যেসব স্বার্থপর দিশী পাত্র এবং তাদের ততোধিক লোভী অভিভাবকরা মনোনয়ন করেনি, তাদের প্রত্যেকের অবহেলা এবং অপমানের চরম প্রতিশোধ নিতে পেরেছে সে।

কিন্তু এক অচেনা-অজানা ভয় ওর কুমারীত্বহারা দেহের ওপর ক্রমশ নেমে আসছে। কিছু না-ভেবেই, কোনোরকমে প্রস্তুত না-হয়েই তো সে গেস্ট হাউসে গিয়েছিল। যে-সুজাতা সেখানে গিয়েছিল, সে ফিরে আসেনি।

যত সময় যাচ্ছে সুজাতার ভয় যেন তত বাড়ছে। মেয়েদের নিজস্ব কয়েকটা দিনের কথা মনে পড়তেই অজানা আশঙ্কা ধোঁয়ার মতো তাকে গ্রাস করতে চাইছে। যদি কেলেঙ্কারি হয়?

সেক্রেটারীর ঘরের মধ্য দিয়ে নিজের অফিস ঘরে ঢুকতে ঢুকতে কমলেশ দেখলো, তার সেক্রেটারী যেন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তার চোখের কোলে কালি। কমলেশ বললে, "মিস দাস, রাত্রে কি ঘুমোননি? আপনাকে বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছে।"

হাসলো সুজাতা। কোনোরকমে কমলেশকে বললে, "একটু মাথা ধরা রয়েছে।"

কমলেশ বললে, "সঙ্গে প্রচুর পরিমাণ সারিডন রাখুন। আপনার, আমার এবং এই অফিসের অনেকের এখন মাথাধরার ওষুধ ঘন ঘন দরকার হবে!"

ম্যাপ এবং কাগজ নিয়ে প্রোজেক্ট ম্যানেজার আবার সাইটে বেরিয়ে

গেলেন। সুজাতাব মাথাটা আবার গোলমাল হযে যেতে লাগলো। ম্যাক্স কি আজ আসবে? কেন আসবে? পুরুষমানুষের তো আর আসবার প্রয়োজন নেই। সে তো যা পাবাব পেয়ে গিযেছে। এখন যত উদ্বেগ সুজাতার। ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে কবছে সুজাতার। ঈশ্ববেব ওপর খুব বাগ হচ্ছে, এত দাযিত্বের বোঝা মেযে-জাতটার ওপর চাপিযে তাদেব এমন অসহায়ভাবে সৃষ্টি কববাব কী প্রযোজন ছিল?

একটু পবেই ম্যাক্সকে আসতে দেখলো সুজাতা। সেই হাসি হাসি পবিত্র মুখ। সঙ্গে সঙ্গে মনে ভবসা পেলো সুজাতা। সে লিখে দিতে পারে, দিশী চ্যাংড়াগুলো এই বকম কোনো ঘটনাব পব আর পাড়ামুখো হতো না। সাযেবদের সম্পর্কে সুজাতার বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা আরও দৃঢ় হচ্ছে।

হবিণীব মতো সরল বিস্ময়ে সুজাতা এবাব ম্যাক্সেব মুখেব দিকে তাকালো। শুভ প্রভাত জানালো ম্যাক্স। গতকালেব দুর্ঘটনাকে কত সহজভাবে নিযেছে ম্যাক্স। তার জন্যে কোনো পাপবোধ নেই, লজ্জা নেই অন্য দিনের মতোই সুজাতার সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করলো।

এমন সময় সুদর্শন সেন ঘবে ঢুকলেন। জিজ্ঞেস করলেন, "মিস্টার শীলাব, তোমাব কাজ কতদূর?"

ম্যাক্স বললে, "আমাব কাজ শেষ। দিন চারেকের মধ্যেই প্রিলিং টাওয়ারে ইউবিযা চালান কবা হবে। তারপব আমাব ছুটি।"

"তাই এত খুশী খুশী দেখাচ্ছে তোমায, সুদর্শনবাবু মন্তব্য কবলেন। "এক সপ্তাহেব মধ্যে দেশেব ছেলে দেশে ফিবে যাবে। রাযচৌধুরী সাযেবও তাঁব কাবখানা চালু কবে দেবেন।"

ওরা হাসলো। সুদর্শনবাবু জানালেন, "আমিও মাদার কালীকে একটি কমপ্লিট গোট প্রতিশ্রুতি দিযেছি। কারখানা চালু হলেই, টেক্ মাই বস্তা অ্যাণ্ড গী মাই রাস্তা।"

ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকিয়ে মল্লিকাও দিন গুণছে। স্বামীকে মোটেই বিশ্বাস নেই, শেষ পর্যন্ত ধর্মপুরে দম্পতি প্রতিযোগিতায় যাবে কিনা। হাজার রকম কাজ আছে কমলেশের, সুতরাং একটা ছুতো তুলতে কতক্ষণ? কিন্তু মল্লিকা মনস্থির করে রেখেছে, তাদের প্রেমের ওইটাই অগ্নিপরীক্ষা। কমলেশ যদি এবারও ডোবায়, তাহলে মল্লিকা কিছুদিনের জন্যে কলকাতায় চলে যাবে। স্বামীর কর্মোদ্যোগকে এখনও শ্রদ্ধা করে, কিন্তু তাই বলে ভালবাসার প্রমাণ দেবে না তা চলবে না। হে ঈশ্বর রক্ষা করো, কমলেশ যেন এবার তার কথা রাখে। মল্লিকা এই সুযোগটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছে মনে মনে। দিগম্বর বনার্জিকে লিজ দেবার পর কমলেশের হৃদয়ে স্ত্রীর জন্যে একটু জায়গা পড়ে আছে কিনা তার প্রমাণ নিয়ে ছাড়বে মল্লিকা।

ধর্মপুর ক্লাবের প্রতিযোগিতা বেশ নতুন ধরনের। মেড-ফর-ইচ-আদার নাইট। রিংকি ফোনে বললে, "আমার তো মনে হচ্ছে তোরাই প্রাইজ পেয়ে যাবি। তোদের দেখলেই মনে হয় ভগবান সত্যি জোড় হিসেবে তৈরি করেছেন।"

কমলেশ জিজ্ঞেস করেছে, "ব্যাপারটা কী?"

"আহা, ফিলটার সিগারেটের বিজ্ঞাপন দেখনি। কে না জানে, তামাকের সঙ্গে ফিলটারের রাজযোটক মিল যেন আদর্শ স্বামী-স্ত্রী—মেড-ফর-ইচ-আদার।"

"ইচ-আদার।" কমলেশ বললে, "কথা দুটো হাড়ে হাড়ে জানি। ভুল মানে করায় হিমাংশুবাবু স্যার ইস্কুলে বেঞ্চিতে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন। একজনের সঙ্গে মাত্র আর একজনের সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইচ-আদার; আর একাধিক হলে ওয়ান-অ্যানাদার।"

"মানে?" মল্লিকা জিজ্ঞেস করলে।

কমলেশ বললে, "মানে, সুদর্শনবাবুর ভাষায় আজকালকার প্রত্যেকে স্বামী-স্ত্রী মেড-ফর-ইচ-আদার—নিজের কর্তা বা নিজের গিন্নি ছাড়া সমাজ সংসারে কাউকে চেনে না। সুদর্শনবাবুর যৌবনে ছিল মেড-ফর-ওয়ান-অ্যানাদার। শুধু কর্তাগিন্নি নিয়ে জগৎ নয়, বাবা মা, ভাই বোন, আত্মীয়স্বজন সমাজ সংসার রয়েছে।"

মল্লিকা বললে, "রিংকিটা ভীষণ অসভ্য। জিজ্ঞেস করলাম প্রতিযোগিতায়

কী করতে হবে? রিংকি উত্তর দিলে, "বরের সঙ্গে এমন ভাব করবি, যেন দুজনে চাবি আর তালা, হাঁড়ি আর সরা, কিংবা শিল আর নোড়া। একজন ছাড়া আর একজনের গতি নেই!"

তালিকা বাড়িয়ে দিয়ে কমলেশ বললে, "যেমন ঝিনুক আর বাটি, খল আর গুড়ি, কালি আর কলম, সায়া আর ব্লাউজ, জুতো আর মোজা।"

বেজায় খুশি হয়ে মল্লিকা বললে, "বেশ বানিয়ে যাচ্ছ তো! লক্ষ্মীটি আরও কয়েকটা উদাহরণ দাও।"

মাথা চুলকে কমলেশ বললে, "যেমন ছুঁচ আর সুতো, বোতল আর ছিপি, গাল আর দাড়ি, ঠোঁট আর গোঁফ, সায়েব আর স্টেনো, কোর্ট আর প্যান্ট, মুড়ি আর বেগুনি।"

বউকে খুশী করবার জন্য কমলেশ বাইরে খুব হাসছে। কিন্তু মনে মনে সে প্রার্থনা করছে যেন ইতিমধ্যে কৃষিনগরের কাজটা নির্বিঘ্নে এগিয়ে যায়। ওর নিজেরও ক্লান্তি আসছে। একটু বিশ্রাম পেলে মন্দ হতো না।

মল্লিকা বললে, "ধর্মপুরের মেয়েগুলো স্বামীদের নিয়ে প্রতিদিন মেড-ফর-ইচ-আদার রিহার্সাল দিচ্ছে। তুমি তো বাড়িতেই থাকো না, যে একটু মহড়া দেবো।"

"কিছু ভেবো না তুমি, স্টেজে মেরে দেবো।"

"আগেকার বুড়োবুড়ীরা এইসব কমপিটিশনের কথা শুনলে রেগে যেত," মল্লিকা বললে।

কমলেশ হাসতে হাসতে বললে, "বলা যায় না। আগের যুগেও তো একটা খারাপ কথা ছিল: আহা যেন মাগ ভাতার।"

"মেড-ফর-ইচ-আদার বলতে আজকালকার স্বামী-স্ত্রীরা অন্য রকম বোঝে। সুখে দুঃখে, ভোগে ত্যাগে কেউ কাউকে অতিক্রম করবে না।"

কমলেশ ফিলটার সিগারেটে আর একটা টান দিয়ে বললে, "এক কথায় হরগৌরী। আদর্শ দম্পতি।"

মল্লিকা বললে, "ফিলটার সিগারেটের বিজ্ঞাপনে যেসব ছবি বেরোয় তাতে স্বামীরা খুব সুন্দর দেখতে হয়। দেখলেই বোঝা যায় কোনো অভাব-অনটন নেই। স্বামীর সিগারেট খাওয়ার পুরুষালি অভ্যাসকে বউ একটু প্রশ্রয় দেয়। স্বামীর মধ্যেও আত্মবিশ্বাসের ভাব এবং দুজনের মধ্যে নিবিড় প্রেমের ইঙ্গিত। যে প্রেম বৈধ এবং যে প্রেমে লুকোচুরি নেই।"

কমলেশ স্ত্রীর সূক্ষ্ম দৃষ্টির প্রশংসা করতে যাচ্ছিলো। কিন্তু আবার

টেলিফোন বেজে উঠলো।

আবার সেই কারখানার কথাবার্তা। কথা চলছে তো চলেছেই। কারখানার লোকগুলো যেন ষড়যন্ত্র করে তৈরি হয়ে থাকে। স্বামীর সঙ্গে মল্লিকা একটু গল্প আরম্ভ করলেই ওরা টেলিফোন বাজাতে শুরু করে।

মল্লিকার মনে হচ্ছে, মেড-ফর-ইচ-আদার যদি কেউ হয় সে ওই টেলিফোন এবং কমলেশ।

কমলেশ নিজেও একটু বিরক্ত আজ। কিন্তু কারণটা মল্লিকাকে জানালো না। টেলিফোনের ওদিকে ছিলেন দিগম্বর বনার্জি। এত করছে কমলেশ, তবু দিগম্বর বনার্জি সন্তুষ্ট নন। আবার সেই পুরানো কথা মনে করিয়ে দিলেন, তিরিশে নভেম্বর—সাতই ডিসেম্বর নয়।

কমলেশ মনস্থির করে ফেলেছে প্রতিযোগিতার দিন বিকেলে সে গোপনে বেরিয়ে যাবে ধর্মপুরের দিকে। কোনো কথাই শুনবে না।

নির্ধারিত দিনে কমলেশ ভোর ছ'টায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছে। বিকেলে থাকবে না বলেই, লাঞ্চের সময় বাড়ি ফেরেনি। আপিসে সামান্য কিছু খেয়ে নিয়ে টোটো করে সাইটে ঘুরেছে। স্টার্ট-আপের কাজ বেশ চলছে। কোনো অসুবিধা হবার কথা নয়।

তিনটের সময় বাড়ি ফিরেও অব্যাহতি নেই। ফোনটা বাজছে তো বাজছেই। টেলিফোনের জ্বালায় মল্লিকার মুখে বিরক্তির রেখা ফুটে উঠলো। স্বামীকে বলেই ফেললো, "শেষ পর্যন্ত তোমার যাওয়া হবে না। শুধু শুধু আমাকে কেন সাজতে বলছো?"

স্ত্রীর আক্রমণ কমলেশ গায়ে মাখলো না। হাসিমুখে বললে, "চটপট তৈরি হয়ে নাও। কোনো বাগড়া এসে পড়বার আগেই আমরা বেরিয়ে যাবো।"

"বাগড়াই তো তুমি চাও," মল্লিকা অভিযোগ করলো।

"বটে!" স্ত্রীর মনে কমলেশ আজ কিছুতেই কষ্ট দেবে না।

"বউয়ের কাছে অভিনয় করছো যে কাজের থেকেও তাকে ভালবাস," মল্লিকা বললে।

টেলিফোনটা আবার বেজে উঠলো। কিন্তু কমলেশ যা কোনোদিন করেনি হঠাৎ তাই করে বসলো। মল্লিকা দেখলো, কমলেশ কথা না-বলেই ফোনের রিসিভারটা নামিয়ে রেখে দিলো।

মল্লিকা এরকম অবস্থার জন্যে প্রস্তুত ছিল না। যতই অভিযোগ করুক,

যতই বিরক্তি দেখাক, স্বামীর কাজের প্রতি টানকে মল্লিকা নিজের অজান্তেই কখন শ্রদ্ধা করতে আরম্ভ করেছে। মল্লিকার কেমন যেন আশঙ্কা ছিল আজও স্বামীর শেষ পর্যন্ত যাওয়া হয়ে উঠবে না। টেলিফোনটা স্বামী যখন নামিয়ে রাখলেন, তখন খুশী হলেও গর্বিত হতে পারলো না মল্লিকা। মনে হলো, এটা ঠিক কমলেশ রায়চৌধুরীকে মানায় না। এ এক অদ্ভুত মানসিক অবস্থা —স্বামীকেও চাই, অথচ স্বামীর জন্যে গর্বিত হতেও চাই।" মল্লিকা মনে মনে নিজেকে বকুনি লাগালো।

কমলেশ জীপের গতি বাড়াচ্ছে। সমস্ত কৃষিনগর কোনো আধুনিক চলচ্চিত্রের নয়নাভিরাম দৃশ্যের মতো পর্দার ওপর থেকে ক্রমশ সরে যাচ্ছে। মজদুর কলোনিতে এর মধ্যেই আঁচ পড়েছে। ছোট ছোট কয়েকটা উলঙ্গ ছেলে রাস্তার ওপর খেলা করছে। আদিবাসী পুরুষ ও মেয়েরা কর্মক্লান্ত দিনের শেষে কাঁধে লাঠি ও লাঠির ওপর হাঁড়ি বেঁধে গ্রামের পথে রওনা দিয়েছে।

হাসপাতাল এবং নার্স কোয়ার্টার পেরিয়ে জীপ ছুটে চললো। গেস্ট হাউসও এগিয়ে আসছে। দূরে একজন দীর্ঘদেহী তরুণ বিদেশীকে আপন মনে ঘাসের ওপর দিয়ে হাঁটতে দেখা গেল।

মল্লিকা বললে, "তোমাদের জার্মান সায়েব না?"

কমলেশ বললে, "হ্যাঁ। কাজ পাগলা ম্যাক্স শীলার আমাদের কাজ শেষ করে দিয়েছে আজ সকালে। তাই বোধহয় হাল্কা মেজাজে কৃষিনগর দেখছে। আগামীকাল বিকেলে দেশে ফিরে যাবে।"

আজ কিন্তু কমলেশ যত কৃষিনগরের কথা ভুলে যেতে চাইছে মল্লিকা ততই সে সব মনে করিয়ে দিচ্ছে। হাওয়ায় বিভ্রান্ত আঁচল সামলাতে সামলাতে মল্লিকা বললে, "তোমার সেক্রেটারীর কী খবর? আর একদিনও তো এলো না।"

"তোমাকে এড়িয়ে চলে হয়তো। হাজার হোক সায়েবের বউ।"

"বস্-এর বউ তো কামড়াবে না?" মল্লিকা অভিমানভরা কণ্ঠে বললে।

ষ্টিয়ারিং-এ হাত রেখে কমলেশ বললে, "বেচারার কী যে হয়েছে, ক'দিন বেশ চিন্তায় রয়েছে। আজ তো অফিসেই আসেনি, শরীর খারাপ।"

"শরীর খারাপের জন্য বাবা-মা তো বিয়েই দিলো না," মল্লিকা বললে। "ইস্কুলে একবার অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল।"

মল্লিকার ইচ্ছে হলো, একবার সুজাতার কোয়ার্টারে যায়। বিশেষ করে বেচারা যখন অসুস্থ।

কিন্তু কমলেশ এখন অফিস সংক্রান্ত কোনো কথায় কান দিতে চাইছে না। এমন কি একবার কৃষিনগর কারখানার দিকেও সে তাকালো না। পশ্চিম আকাশের সূর্যালোক পায়রার পালকের মতো সাদা প্রিলিং টাওয়ারের ওপর পড়েছে। ঠিক যেন বরফওয়ালা গুঁড়ো বরফের পুতুল তৈরি করে তার ওপর লাল সিরাপ ছড়িয়ে দিলো।

কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে সেই অপূর্ব দৃশ্য মল্লিকার দেখতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু কমলেশ জীপের গতিবেগ কমালো না। মল্লিকার মনে হলো কমলেশ আজ প্রতিজ্ঞা করেছে বউকে খুশী করা ছাড়া অন্য কিছুই সে করবে না।

কমলেশ আজ আনন্দে উচ্ছল হয়ে ওঠবার চেষ্টা করছে। খোলা রাস্তায় গাড়ির স্পিড অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। গুনগুন করে গানও গাইছে। মল্লিকা এতদিন ধরে যা চেয়েছে অবশেষে তা পেয়েছে, তার আনন্দ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সে কেমন অস্বস্তি বোধ করছে। নিজেকে বোঝাচ্ছে, স্বামীর তপোভঙ্গ করবার মতো স্বার্থপরায়ণা সে তো নয়।

কমলেশকে দেখেই রিংকি আনন্দে চিৎকার করে উঠলো। বললে, "যাক এলেন তাহলে!"

"আসবো না কেন?" শোফায় বসে পড়ে কমলেশ উল্টো প্রশ্ন করলো।

"আজকে যদি না আসতেন, তাহলে আমার বোন আপনাকে ডাইভোর্স করে দিত। আপনার অবস্থাও বউ-পালানো দিগম্বর বনার্জির মতো হতো!" রিংকির কথায় মল্লিকা একটু অস্বস্তি বোধ করলো।

স্বামীর হয়ে মল্লিকা বললে, "বেচারার কাজ খুব বেড়ে গিয়েছে।"

রিংকি ঠোঁট বেঁকালো। "ওরে বাবা। যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর। তোর বর তোকে বনবাসে ফেলে রেখে তাহিতি আইল্যাণ্ডে দশ বছর ধরে কারখানা তৈরি করুক না। আমার কী? পেটে ক্ষুধা মুখে লাজ আমার ভাল লাগে না।"

মল্লিকার লজ্জা লাগছে। কমলেশ হয়তো ভাববে, প্রতিদিন সে রিংকির কাছে স্বামীর বিরুদ্ধে লাগিয়ে যাচ্ছে।

সমরেন্দ্রবাবু বেড্‌রুম থেকে বেরিয়ে এসে শ্যালিকাকে সংবর্ধনা জানালেন। চাপা হেসে বললেন, "ঝুমু, আজ তোমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বেশী বলবো না! তোমরা আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী—দম্পতি প্রতিযোগিতায় আমরা তোমাদের হারাবার চেষ্টা করবো। তোমরা শুধু এখানে জামাকাপড় পাল্টে নাও।"

মল্লিকা বললে, "প্রাইজ না পেলেও, আমার বোন এবং আপনি আদর্শ দম্পতি। দুজনে দুজনকে দু ঘণ্টা না-দেখতে পেলে চোখে অন্ধকার নেমে আসে। আমার বোনের কোনো আর্থিক অভাব আপনি রাখেননি, আমার বোনও আপনার ঘর-সংসার লক্ষ্মীশ্রীতে ভরিয়ে রেখেছে। মেড-ফর-ইচ-আদার একেই বলে।"

"খুব তো ভগ্নীপোতকে তোল্লা দিচ্ছিস। বলে দিলি, পয়সার অভাব রাখেনি। কতদিন থেকে বলছি, একটা মুক্তোর সেট কিনে দাও—কোনো উত্তর নেই। ওঁর নাকি পয়সার অভাব।" রিংকির কথায় সবাই হেসে উঠলো।

কমলেশ জিজ্ঞেস করলে, "সিগারেট কোম্পানি কি ঠিক করে দিয়েছে, আদর্শ দম্পতি বলতে কাদের বোঝায়?"

রিংকি বললে, "ওসব গোপন খবর বিচারকরা জানেন। তবে অনেক আদর্শ দম্পতি দেখতে পাবে আজকে। কেউ বরের সঙ্গে লাঠালাঠি করে, কেউ স্বামীর বাপ-মাকে তাড়িয়ে দিয়েছে, কেউ অন্যের বরের সঙ্গে গোপন অভিসার করছে, এরাই আজ প্রাইজ পাবার লোভে পমেটম পাউডার মেখে সাতপাক-খাওয়া-বরের হাত ধরে পার্টিতে আসবে।"

"মুখাগ্নিটা আর একবার প্র্যাকটিশ করবে নাকি?" সমরেন্দ্রবাবু স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন।

"কী কথা ভরসন্ধেবেলায়!" রিংকি স্বামীকে মুখঝামটা দিলো। তারপর বোনের দিকে তাকিয়ে বললে, "ঝুমু, তুইও বরের সিগারেট ধরিয়ে দেওয়া একটু অভ্যেস করে নে। জোর গুজব, ওতে দশ পয়েন্ট আছে।"

মল্লিকা আঁতকে উঠলো। "ওখানে ওই সব করতে বলবে নাকি?"

"কিছুই বলবে না। তোমার বরকে নিয়ে তুমি যা-খুশী করো! তবে ওরা নজর রাখবে, সেই অনুযায়ী পয়েন্ট পড়বে। তোমরা জোড়ে কেমনভাবে হাঁটো, বরের জামাকাপড়ের সঙ্গে তোমার শাড়ির কীরকম ম্যাচিং হয়েছে, তোমাদের মানিয়েছে কীরকম, তোমরা নিজেদের মধ্যে কেমনভাবে কথা বলো কেমনভাবে হাসো, সব দেখবে।"

বোনের মন্তব্য শুনে বেশ ঘাবড়ে গেল মল্লিকা। সমরেন্দ্রবাবু আরও জুড়ে দিলেন, "আসলে প্রত্যেক স্ত্রীকে নিজের স্বামীর কাছে পরস্ত্রীর মতো মোহময়ী হতে হবে এবং স্বামীকে কথায় বার্তায় এমন ভাব দেখাতে হবে যেন এখনও প্রেমপর্ব চলেছে, বিয়ের কথাটা পাড়া যায়নি।"

এক কাপ চা খাইয়ে, কনক ঘড়ির দিকে তাকালো। এবং বললে, "ঝুমু, তোর এবং আমার বরদুটোকে কারখানার কুলির মতো দেখাচ্ছে। এদের স্নান করতে পাঠানো যাক। সময় বেশী নেই।"

লম্বা-লম্বা পা ফেলে সবুজ ঘাসের ওপর দিয়ে হাঁটছে ম্যাক্স শীলার। এইমাত্র সে সুজাতা দাসের কোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে এসেছে। সুজাতার খোঁজে দুপুরে সে অফিসে গিয়েছিল। সুজাতা অফিসে যায়নি শুনে বাড়িতে দেখা করবে ঠিক করেছিল।

জার্মানিতে ষোলো বছর বয়স থেকে নির্দ্বিধায় বালিকা বান্ধবীদের সঙ্গে ম্যাক্স ডেট করছে, কিন্তু কখনও এমন অসুবিধায় পড়েনি। ইণ্ডিয়া যে রহস্যময়, এ-কথা ম্যাক্স আগে শুনেছিল ; কিন্তু অনাদি-অনন্তকালের অভিজ্ঞতা নিয়েও এদেশের রহস্যময়ী মেয়েরা যে এমন অসহায় তা সে আগে জানতো না। শীলার শুনেছিল, ভারতবর্ষের মেয়েরা আধুনিকা হচ্ছে, তারা ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, বৈজ্ঞানিক, রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব নিচ্ছে। কিন্তু সে এখন দেখছে, এ দেশের কলকারখানার মতো মেয়েরাও আত্মনির্ভর হতে পারেনি।

সুজাতা দাসের সঙ্গে দু দণ্ড দুর্বলতার জন্য ম্যাক্স লজ্জিত নয়। সুজাতারও অত চিন্তিত হবার কী আছে? কিন্তু সেদিন সন্ধ্যার পর কী যে ঘটলো, সুজাতা একেবারে ভেঙে পড়ছে।

শীলার অভদ্র নয়। সুজাতার সঙ্গে অফিসে দেখা করেছে। অসুস্থতার খবর পেয়ে এইমাত্র বাড়িতে ছুটে গিয়েছিল। চাদর মুড়ি দিয়ে বেচারা সুজাতা দাস চুপচাপ শুয়েছিল ; নাইট্রোজেনবিহীন গাছের মতো বিবর্ণ দেখাচ্ছিল সুজাতাকে।

শীলার এর কারণ জানতে চেয়েছিল। সুজাতা কিছুই বলেনি, শুধু ওর চোখের কোণে অশ্রুর রেখা দেখা গিয়েছিল। পুরুষসান্নিধ্যে যেসব বিপদ আসতে পারে তার থেকে নিজেদের রক্ষা করতে প্রতিটি স্বাধীন মেয়েই নিজেদের প্রস্তুত রাখে, এই জানতো ম্যাক্স। সুজাতা যে তার ব্যতিক্রম এবং সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ তা ম্যাক্সের কল্পনায় আসেনি। বিপদের নিশ্চিত কোনো দৈহিক ইঙ্গিত আজও পায়নি সুজাতা, কিন্তু অজানা ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে সে।

পুরুষবন্ধুকে বিপদে ফেলবার চেষ্টা করে কেউ কেউ এমন পিতৃত্বের ফাঁদ পাতে। কিন্তু সুজাতা তেমন নয়, ম্যাক্সের কাছে তার কোনো প্রত্যাশা নেই। কিন্তু ম্যাক্সও দায়িত্বহীন নয়, সুজাতা যতক্ষণ না দৈহিক দিক দিয়ে নিশ্চিত হচ্ছে ততক্ষণ তারও কিছু করবার আছে।

চার-পাঁচটা দিন পরেই নিজের নিরাপত্তা সম্পর্কে সুজাতা নিশ্চিত হতে পারবে। কিন্তু ততদিন শীলার তো ভারতবর্ষে থাকছে না। সুজাতা যেমন শুনলো, ম্যাক্সের বিমান টিকিট কেনা, এখানে কাজ শেষ এবং জার্মানিতে টেলিগ্রাম চলে গিয়েছে, তখন বেচারা শুকনো পাতার মতো কাঁপতে লাগলো।

সুজাতা মুখ ফুটে কিছুই দাবী করছে না। কিন্তু বিদেশে বিপদে-পড়া নিঃসঙ্গ মেয়েটা তার কাছে কী প্রত্যাশা করে তা ম্যাক্স সহজেই বুঝতে পারছে। আরও কয়েকটা দিন ম্যাক্স কাছে থাকলেই সে ধন্য।

কিন্তু ম্যাক্সের তো এখানে আর থাকবার উপায় নেই। কোম্পানি কেন তাকে রাখবে? নিজে থাকতে চাইলেও, এখানকার কর্তারা সন্দেহ করবে। এসব সুজাতার অজানা নয়। ম্যাক্স শীলার চঞ্চল হয়ে উঠলো। আজ ভোর-বেলায় প্রিলিং সেকশনের সব পরীক্ষা শেষ। এইচ-এ-সির ইঞ্জিনীয়াররা খুশী। আজ বিকেলেই ওরা ট্রায়াল ইউরিয়া পাঠাবে প্রিলিং টাওয়ারের ওপর। কোম্পানির নাম লেখা ছোট্ট একটা ফলক ম্যাক্স আজই টাওয়ারের তলায় লাগিয়ে দিয়েছে। অনেকদিন পরে যারা এই কারখানা দেখতে আসবে তারা জার্মান কোম্পানির নাম জানতে পারবে।

সুজাতার মুখের দিকে ম্যাক্স শীলার নীরবে তাকিয়ে আছে। সুজাতা মুখ ফুটে কিছুই বলছে না। কিন্তু ওর রহস্যময় চোখে অসহায় ভীতি এবং করুণ মিনতি ফুটে উঠেছে।

সুজাতার বাড়ি থেকে বেরিয়ে ম্যাক্স শীলার ঘাসের ওপর দিয়ে হাঁটতে শুরু করলো। দু দিন তিনদিন, বড় জোর দু-সপ্তাহের মধ্যে নিঃসন্দেহ হবে মেয়েটা। এখানে আর কয়েকটা দিন কেমনভাবে থাকা যায়?

দূরে হিন্দুস্থান অ্যাগ্রো-কেমিক্যালস্ কারখানার দিকে তাকিয়ে এক বিচিত্র অনুভূতিতে ম্যাক্স শীলারের মন ভরে উঠলো। শীলারের দুঃখ হচ্ছে তার কাজটা এত তাড়াতাড়ি না শেষ করে, আরও কয়েকটা সপ্তাহ টেনে নিয়ে যেতে পারলে লাভ হতো। ওদিকে যে-ভদ্রলোক এইমাত্র জীপ চড়ে সস্ত্রীক বেরিয়ে গেলেন, সেই কমলেশ রায়চৌধুরী নির্ধারিত তারিখের এক সপ্তাহ আগে কাজ শেষ করবার জন্যে কী অদম্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। সময়ের কী বিচিত্র টাগ-

অব-ওয়ার এই অখ্যাত কৃষিনগরে শুরু হয়েছে—কেউ সময় বাড়াতে চায়, আর কেউ কমাতে চায়।

কিন্তু দার্শনিক চিন্তায় বিভোর হয়ে যাবার মতো সময় নেই ম্যাক্স শীলারের। তার লক্ষ্য সহজ। সুজাতার জন্যে তাকে কিছু সময় লুণ্ঠন করতে হবেই। কিন্তু কেমনভাবে? কীভাবে আরও কয়েকটা দিন এই কৃষিনগরের কাজে থাকতে পারা যায়?

ম্যাক্স শীলার দেখলো পশ্চিম আকাশে সূর্য নেমে এসেছে। ভারতের অফুরন্ত সম্পদ ও ঐশ্বর্যের মতো রঙের রাজসভা বসেছে দিকে দিকে। লাল স্প্রে মেশিনে রূপালী টাওয়ারের একদিক যেন ম্যাক্সের বিনা অনুমতিতেই কেউ রঙ করে দিয়েছে। ম্যাক্স কী ভাবলো। মাথায় কোনো পরিকল্পনা এসেছে বোধ হয়। কিছুক্ষণ চিন্তার পর দৌড়ে গেস্ট হাউসে ঢুকে গিয়ে নিজের যন্ত্রপাতির ব্যাগ বার করলো ম্যাক্স শীলার। তারপর জীপগাড়িটা ড্রাইভ করে কারখানার চার নম্বর গেটের দিকে চললো—প্রিলিং টাওয়ারটা যেখানে সব থেকে কাছে।

এইচ-এ-সির নিরাপত্তা বিভাগের নেপালী দারোয়ানটা সায়েবকে প্রতিদিন দেখছে। সায়েব সাধারণত এসময় ফিরে আসেন না। কিন্তু উনিই তো এই বিরাট যন্ত্রটা খাড়া করেছেন। সে সেলাম ঠুকলো, কোনো সন্দেহ করলো না।

বিছানা থেকে উঠে একটা বেতের মোড়ায় বসেছিল সুজাতা দাস। অকারণে এতটা ঝিমিয়ে পড়ার কোনো যুক্তি নেই। যা-হবার তা তো হয়েছেই। এখন শুধু ফলাফলের জন্যে অপেক্ষা। শরীর ও মন তবু বুঝতে চায় না।

শিশি থেকে ভারমুথ বার করে সুজাতা কিছুটা খেয়ে নিলো। বোতলটা ম্যাক্স দিয়েছিল—এতে নাকি নার্ভ শক্ত হয়।

ম্যাক্সের কাছে মাথা নিচু করেনি সুজাতা। সোজা বলেই দিয়েছে, সে নাবালিকা নয়। বুঝেসুঝেই যা করবার করেছে। অবাঞ্ছিত কিছু ঘটে থাকলে তার দায়-দায়িত্ব সে শীলারের ওপর চাপাবে না। কিন্তু ম্যাক্স অসভ্য নয়। সে বুঝতে পারছে, দুটো সপ্তাহ থাকতে পারলে সুজাতা ভরসা পেত। একবার জার্মানিতে পৌঁছলে কোথায় সে হারিয়ে যাবে; হয়তো সেখানেও থাকবে না।

থাইল্যাণ্ড কিংবা ভেনেজুয়েলাতে পাঠিয়ে দেবে।

নিজের এই বিপদে পরামর্শ করবার মতো আপনজন কেউ কাছাকাছি নেই। পুরানো পরিচিতের মধ্যে মল্লিকা। কিন্তু সে তো অফিসারের বউ। সে তো দূরত্ব কমায়নি, সুজাতা অসুস্থ জেনেও একবার খবর নেয়নি। স্বামীর আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়েই সে বুঁদ হয়ে আছে—তার বাইরে তাকাবার মতো উদারতা কোথায়?

বাইরে জীপ গাড়ির আওয়াজ পাওয়া গেল। কলিং বেল বেজে উঠলো এবার। ম্যাক্স আবার ফিরে এলো নাকি? কাল সকালেই তো চলে যাবে বেচারা।

ম্যাক্স নয়। পরিবর্তে সুদর্শনবাবুকে দেখে চমকে উঠলো সুজাতা।

সুদর্শন সেন রীতিমতো উদ্বিগ্ন। মাথার টাকে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম জমা হয়েছে।

হাঁপাতে হাপাতে বললেন, "কিছু মনে কোরো না, বিনা নোটিশেই চলে আসতে বাধ্য হলাম। আমাদের প্রোজেক্ট ম্যানেজারের কোনো খবর রাখো?"

"আজ তো আমি অফিসেই যাইনি," সুজাতা উদ্বিগ্ন হয়ে উত্তর দিলো।

সুদর্শনবাবু মাথায় হাত দিয়ে বললেন, "ভদ্রলোক তো খবর না দিয়ে কোথাও যান না। অথচ যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যে হয়।"

কমলেশ রায়চৌধুরীকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছেন সুদর্শনবাবু এবং প্রোজেক্টের লোকেরা। ওঁরা বাড়িতে ফোন করেছিলেন। সেখানে কেউ ফোন ধরে না। সুদর্শনবাবু নিজেই ছুটেছিলেন বাড়িতে—কিন্তু নো পাত্তা। অফিসে, কারখানার সেকশনে সেকশনে কমলেশ রায়চৌধুরীকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন সুদর্শন সেন।

শেষ পর্যন্ত সুজাতার কাছে চলে এসেছেন। ধর্মপুরে ওঁর কে ভায়রাভাই আছে, সেখানকার টেলিফোন নাম্বার যদি জানা থাকে। অফিসে যদি কোথাও লেখা থাকে, তাহলে সুজাতাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে অফিস খোলাবেন সুদর্শনবাবু। না, অফিসে নেই,—নম্বরটা কমলেশ রায়চৌধুরীর পকেট ডাইরিতে লেখা থাকে।

"ভায়রাভাই ধর্মপুরে কি করেন?" সুদর্শনবাবু জানতে চান। ভদ্রলোককে সুদর্শনবাবু দেখেছেন, কিন্তু নামধাম চাকরি কিছুই খোঁজ করেননি। সুজাতাও ঠিক মনে করতে পারছে না। বোধহয় ব্রিটিশ এক্সপ্লোসিভে কাজ করেন। বউ-এর নাম বোধহয় রিংকি।

ঐ নাম নিয়ে কি করবেন সুদর্শনবাবু? "বউ-এর ডাকনাম তো টেলিফোন এনকোয়ারিতে জানানো থাকে না। ভদ্রলোকের নামটা একটু মনে করবার চেষ্টা করো না।" সুজাতাকে অনুরোধ করলেন সুদর্শনবাবু।

সুদর্শন সেন শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে বললেন, "দেখি, ওঁর বাড়ির এ-মাসের ট্রাঙ্ক টেলিফোন বিলটা অফিসে আছে কিনা। ওখানে নিশ্চয় দু-একটা ধর্মপুর কল থাকবে।"

"ব্যাপারটা কী? ভদ্রলোক যদি একদিন বেরিয়েই থাকেন?" সুজাতা জিজ্ঞেস করে।

"খুব সীরিয়াস ব্যাপার, মা। প্রিলিং টাওয়ারে অ্যাক্সিডেন্ট।" সুদর্শনবাবু গভীর উদ্বেগের সঙ্গে জানালেন।

"অ্যাক্সিডেন্ট! কেউ খুন জখম হয়েছে নাকি?"

"খুন জখম হতে হতে বেঁচে গেছে। এখন বোঝা যাচ্ছে না, দিগম্বর বনার্জির ডিজাইনের দোষ, না অন্য কিছু হয়েছে। রায়চৌধুরী সায়েবকে না পেলে খুব মুশকিল," এই বলে হন্তদন্ত হয়ে সুদর্শনবাবু বেরিয়ে গেলেন।

"ম্যাক্স কোথায়?" সুজাতার একবার ইচ্ছে হয়েছিল জিজ্ঞেস করে। কিন্তু সাহস হলো না তার। একটু ভয়ও লাগছিল সুজাতার।

ভয়টা হঠাৎ ভাল লাগায় রূপান্তরিত হলো। ম্যাক্সকে অকস্মাৎ ভীষণ ভাল লাগছে সুজাতার। মনে হচ্ছে, ম্যাক্সের দায়িত্ববোধ আছে, ম্যাক্সের ওপর নির্ভর করা যায়।

ধর্মপুরে ব্রিটিশ এক্সপ্লোসিভ কোম্পানির অফিসারদের ঘরে ঘরে তখন সুন্দরী মহিলাদের সযত্ন প্রসাধনপর্ব চলেছে। রিংকি এবং ঝুমু ড্রেসিং টেবিলের সামনে রীতিমতো ব্যস্ত রয়েছে। স্বামীরা স্নান সেরে নিচ্ছেন দুটো বাথরুমে।

ফাউণ্ডেশন ক্রিমে মুখসৌন্দর্যের ভিত্তি স্থাপন করতে করতে মল্লিকা বললে, "যে-কষ্ট করে আজ রুবিনগর থেকে বেরিয়ে এসেছি। শেষ পর্যন্ত বাংলোর টেলিফোনটা নামিয়ে রাখলাম।" কেন জানি না টেলিফোন নামিয়ে রাখার দায়িত্বটা স্বামীর ঘাড়ে দিতে সংকোচ বোধ করলো মল্লিকা। ওর মনে হচ্ছে কমলেশ তাতে ছোট হয়ে যাবে।

মুখে গরম জলের ভেপার লাগিয়ে, ফরাসী লোশনের সাহায্যে লোমকূপের অদৃশ্য পথগুলো পরিষ্কার করতে করতে রিংকি বললে, "বেশ করেছিস। এই-ভাবেই বরকে কনট্রোল করতে হয়। ওদেরও তো একটু আনন্দ প্রয়োজন। না হলে খাটবে কী করে?"

মল্লিকা বললে, "নির্দিষ্ট দিনে কারখানা চালু করার জন্যে বেচারা ধনুর্ভঙ্গ পণ করেছে। দেশের উপকার হবে তো।"

রিংকি বিশ্বাস করলে না। নিজের প্রসাধন সারতে সারতে বললে, "বরকে বোঝাবি, দু'শ-আড়াইশ' বছর ধরে যে দেশে গয়ংগচ্ছ করে কাজ চলেছে, সেখানে এক সপ্তাহ দেরি হলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না।"

টেলিফোনটা বেজে উঠতেই রিংকি বললে, "ধর তো একটু। নিশ্চয় মিসেস সাহা। ম্যাচিং রং সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। বুড়োধাড়ি মহিলা। এখনও কোন রঙের শাড়ির সঙ্গে কোন রঙের ব্লাউজ চলে বুঝতে পারে না! আমাকে টেলিফোনে জ্বালাতন করেন। বলে দে, আমি কলঘরে রয়েছি।"

মিসেস সাহা নয়। মল্লিকার মনে হচ্ছে রুবিনগর থেকেই কেউ কথা বলছে। "হ্যালো, হ্যালো, ধর্মপুর? আচ্ছা, আমাদের প্রোজেক্ট ম্যানেজার ডঃ কমলেশ রায়চৌধুরীকে খুঁজছি আমরা। উনি কি ধর্মপুরে আছেন?"

বেশ বিরক্ত হয়ে উঠলো মল্লিকা। এখানেও ধাওয়া করেছে লোকগুলো। এক মিনিট সায়েব ছাড়া কাজ করতে পারে না। মল্লিকা দ্বিধা করলো না, শান্তভাবে বলে দিলো, "উনি এখানে নেই।"

"হ্যালো, হ্যালো···" লোকটা আরও কী বলতে যাচ্ছিলো, কিন্তু তার আগেই মল্লিকা ফোন কেটে দিলো।

"খুব স্টাণ্ট দিলেন! সমরেন্দ্রবাবুকে ধুতি, পাঞ্জাবি এবং চাদরে জামাই সাজিয়ে দম্পতি প্রতিযোগিতায় চললেন," কমলেশ গাড়িতে বসে শ্যালিকার সঙ্গে রসিকতা করলো।

"এখানে যে সবাই প্রচণ্ড সায়েব নয় তা ক্লাবে গিয়েই বুঝবেন," রিংকি আলতোভাবে নাকের ওপর রুমালটা পাফ করতে করতে ভগ্নীপতিকে জানালো।

"আমাদের একটু স্বদেশীয়ানা থাকা ভাল," ড্রাইভ করতে করতে ভায়রা-ভাইকে সমরেন্দ্রবাবু যখন নিজের মতামত জানালেন তখন দুইবোনের দেহ-নিঃসৃত দুষ্প্রাপ্য বিদেশী সেন্টের গন্ধে চারিদিক ভরপুর।

জাপানী হাতপাখাটা একটু নেড়ে রিংকি বললে, "ফর্মাল পার্টিতেও আমার কর্তা ডিনার জ্যাকেটের বদলে গলাবন্ধ প্রিন্সকোট পরে যায়। অফিসের অনেকে তো শুনেই আঁতকে উঠেছিল। কিন্তু সায়েবদের আন্তর্জাতিক ভদ্রতাবোধ আছে। ওরা কিছুই মনে করলে না।"

রিংকি তারপর বোনকে নিয়ে পড়লো। "ঝুমু, তোর বরকে যা সাজিয়েছিস না! লোভ হচ্ছে, কমলেশবাবুর সঙ্গেই প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ি।"

"তোদের ক্লাবের প্রতিযোগিতার আইনে না-আটকালে আমার কোনো আপত্তি নেই," মল্লিকা ঢালা অনুমতি দিয়ে দিলো।

একটু পরে রিংকি জিজ্ঞেস করলো, "কীরে তোর কী হলো? ওরকম গোমড়ামুখীকে কে প্রাইজ দেবে?"

মল্লিকা কিছুই বললে না। শুধু হাসলো। ওর মনটা ঠিক নেই। স্বামী যে এসব ন্যাকা-ন্যাকা প্রতিযোগিতা পছন্দ করবে না, তা সে আন্দাজ করতে পারছে। কিছুক্ষণের জন্যে ছেলেমানুষী করতে মল্লিকার যে আপত্তি আছে তা নয়, কিন্তু ওই টেলিফোনটা এসেই ছন্দ কেটে দিলো।

সমরেন্দ্রবাবু বললেন, "সমস্ত ব্যাপারটাই ছেলেমানুষী। ফিলটার এবং তামাকের সঙ্গে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের তুলনা দেওয়াটা অবাস্তব। কিন্তু জীবনে এত দুঃখ রয়েছে যে, বিজ্ঞাপনের দৌলতে কিছুক্ষণের জন্যে ছেলেমানুষ হতে পারলে মন্দ কী?"

অবাস্তব হিন্দী সিনেমা সম্পর্কেও লোকে ঐরকম কথা বলে, মল্লিকার মনে পড়ে। কিন্তু এখন তর্ক করতে ইচ্ছে করছে না। কমপিটিশন সেরে স্বামীকে নিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কৃষিনগরে ফিরে যেতে চায় সে।

গাড়ি চালাতে চালাতে সমরেন্দ্রবাবু বললেন, "আসলে এও এক ধরনের আধুনিক পুতুলখেলা। ক্যাপিটালিস্ট সমাজে বিজ্ঞাপনদাতারা নরনারীর আশা-আকাঙ্ক্ষাকে স্বপ্নের মোহজালে ধরতে চাইছেন। প্রত্যেকটি স্বামী-স্ত্রী বিশ্বাস করতে চায়, যে তারা মেড-ফর-ইচ-আদার।"

"তোমার কর্তা যেন কী বলেন?" মল্লিকা এবার স্বামীকে প্রশ্ন করলে।

কমলেশ তার স্তব্ধতা ভঙ্গ করে বললে, "দিগম্বর বনার্জির ধারণা, ভারতবর্ষের শিক্ষিত লোকেরা নির্লজ্জ স্বার্থপরের মতো মেড-ফর-ইচ-আদার হয়ে আছে! তারা মেড-ফর-ওয়ান-অ্যানাদার না-হলে দেশ বাঁচবে না।"

"এও আর এক ধরনের পাগলামি," এই বলে রিংকি হেসে উঠলো।

দিগম্বর বনার্জির ওপর নিজের রাগ মেটাবার এমন-সুবর্ণ সুযোগ মল্লিকা

ছাড়তে পারলো না। সোজা বললে, "নিজের বউ পালিয়েছে। তাই বেঁড়ে শিয়ালের মতো ভদ্রলোক সব শেয়ালের লেজ কাটতে চাইছেন।"

কমলেশ গম্ভীর হয়ে রইলো, কোনো উত্তর দিলো না।

প্রতিযোগিতা পুরোদমে চলেছে। মূল্যবান পুরস্কার আছে, কিন্তু সেই লোভে অহেতুক উত্তেজনা নেই ধর্মপুর ক্লাবে। একটা পাইকিরী বাসরঘর বসেছে যেন ক্লাব হলে। নিজেদের খুশী মতো স্বামী-স্ত্রী জোড়ে জোড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, সিগারেট খাচ্ছেন, নাচছেন, গল্প করছেন। আলোয় আলো হয়ে রয়েছে হল ঘরটা। রেকর্ডে মিউজিক বাজছে। শুধু ওয়েস্টার্ন নয়, কিছুক্ষণ সানাই-এ বিবাহের সুরও শোনা গেল।

প্রত্যেক দম্পতির জন্য আলাদা টেবিল। সমরেন্দ্রবাবু একবার নিজের টেবিল থেকে উঠে এসে কমলেশকে বলে গেলেন, "দেখ ব্রাদার, মেয়েদের ব্লাউজের কাট—শ্রীমতীরা কীরকম দ্রুতগতিতে টপলেসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। মিসেস সান্যালের পিঠটা দেখ—ঘাড় এবং কোমর থেকে ব্লাউজের কাপড় ছেঁটে বাদ দিতে দিতে প্রায় ক্রাইসিস পয়েণ্ট এসে গিয়েছে। গভীর নিশ্বাসে সামান্য বক্ষস্ফীতি ঘটলেই জামা ছিঁড়ে বিপদ ঘটবে।"

কমলেশ হাসলো। বউ-এর মন্তব্য আশা করলো। কিন্তু মল্লিকা কিছু বললো না।

কমলেশ বললে, "বিখ্যাত লেখক অমিতাভ চৌধুরী এই ধরনের মিনি ব্লাউজের নতুন নাম রেখেছেন ব্রা-উজ।"

রসিক সমরেন্দ্রবাবু উৎফুল্ল হয়ে বললেন, "চমৎকার। ইংরিজী এবং বাংলা ভাষায় একটা নতুন শব্দ সংযোজন হলো।"

কমলেশ এবার বউকে জিজ্ঞেস করলো, "কী খাবে?" কিছুই খেতে ইচ্ছে করছে না মল্লিকার। স্বামী আজ তাকে সব দিতে চাইছে, কিন্তু সে প্রাণভরে গ্রহণ করতে পারছে না।

বৈজ্ঞানিক কমলেশ কেন অন্যমনস্ক হচ্ছে না? মল্লিকা চাইছে সে বউ-এর দিকে অত নজর না-দিয়ে কাজকর্ম সম্পর্কে একটু ভাবুক। স্বামীর তপোভঙ্গ হোক, সে তো চায়নি। কমলেশ নিজের নেশাতেই বিভোর হয়ে থাক্, দূরদূরান্তে তার প্রতিভার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ুক, দেশের ইতিহাসে তার নাম থাকুক, এই তো মল্লিকার আকাঙ্ক্ষা।

এই সব কথা কিছুক্ষণের জন্যে ভুলে গিয়ে সুখী দম্পতিদের হাটে সম্পূর্ণ

হারিয়ে যেতে পারলে মন্দ হতো না। কিন্তু পারছে কই মল্লিকা? কৃষিনগর থেকে আসা ওই টেলিফোনটা আবার মল্লিকার কানের কাছে বাজছে।

"তোমার কি শরীব খাবাপ লাগছে?" কমলেশ জিজ্ঞেস করে।

মল্লিকা বললে, "না, শরীব খারাপ নয়।"

"তাহলে?"

মল্লিকা আর চেপে রাখতে পারলো না। ভয় পেয়ে স্বামীর হাতে হাত রেখে বললে, "জানো, আমবা যখন রিংকিদের বাড়িতে সাজগোজ করছি, তখন যেন মনে হলো কৃষিনগর থেকে কে তোমাকে খুঁজছে। বুঝতে পারলাম না, লাইনটা কেটে গেল।"

কমলেশ মুহূর্তের জন্যে চমকে উঠলো। ওব চোখ দুটো আবার সেই পুরানো উজ্জ্বলতা ফিরে পাচ্ছে। নিজের স্বামীর মধ্যে আবার সেই কাজ পাগলা বিজ্ঞানীকে দেখতে পাচ্ছে মল্লিকা। অরেঞ্জ স্কোয়াশের গেলাসটা সরিয়ে দিয়ে কমলেশ ছিটকে বেরিয়ে গেল। বউকে যেন দেখতেই পেলো না। তারপর কোথা থেকে টেলিফোন সেরে এসে, ফিসফিস করে বললে, "একটুও সময় নেই মল্লিকা, এখনই চলো।"

বোন এবং সমরেন্দ্রবাবুর কথা তুলতে যাচ্ছিলো মল্লিকা। বলতে যাচ্ছিলো, আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই তো ফলাফল ঘোষণা হবে। কমলেশ ওসব শুনতে রাজী নয়। সমরেন্দ্রবাবুকে সে জানিয়ে দিয়েছে তারা চলে যাচ্ছে, ফোন এসেছে।

রাতের অন্ধকারে ন্যাশনাল হাইওয়ে ধরে কমলেশ রায়চৌধুরীর জীপটা যেন উড়ে চলেছে। মল্লিকার একটু ভয় ভয় করছে। কোথাও না অ্যাকসিডেণ্ট বাধিয়ে বসে। কমলেশের খেয়াল নেই। সময়ের বিরুদ্ধে সাঁতার কেটে যেতে কমলেশ আজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

বাড়িতে মল্লিকাকে ঢুকিয়ে দিয়েই এক লাফে কমলেশ আবার জীপে এসে চড়লো এবং মুহূর্তে রাত্রির অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কারখানার প্রিলিং টাওয়ারের কাছে তখন অনেক লোকের ভিড়। সুদর্শনবাবুও মাথায় হেলমেট লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

কমলেশ আসতেই সকলে সরে দাঁড়ালো। তাদের চোখে প্রচণ্ড উদ্বেগের চিহ্ন, মুখে কোনো কথা নেই। আর সমস্ত যন্ত্রটা তখনও মাঝে-মাঝে আহত পশুর মতো ধোঁয়া ছাড়ছে।

ইঞ্জিনীয়ার হাজরা বললেন, "আজব ব্যাপার। দুপুরে আমরা সব ঠিকঠাক দেখে গেলাম। মিস্টার শীলারের কাছে আমরা দায়িত্ব বুঝে নিলাম। বিকেলে আমাদের পঁচাত্তর পার্সেণ্ট ইউরিয়া মিকস্‌চার ইনজেকশন করে মেশিনকে কাজ করাবার কথা। মেশিনেব মধ্যে ইউরিয়া ফিড করে যেমনি স্বইচ টেপা অমনি একটা ছোটখাট বিস্ফোরণ হলো। টাওয়াবটা থরথর করে নড়ছেও।"

অ্যাকসিডেণ্ট মনে করে ছোটাছুটি হয়েছিল। কমলেশকে কোথাও না পেয়ে ওরা স্বইচ অফ্‌ কবেছে। "কিন্তু ইউরিয়া মিকস্‌চার যে ভিতরে জমে শুকিয়ে সমস্ত মেশিনের সর্বনাশ করে দেবে।" কমলেশ চীৎকার করে উঠলো, "এখনই হোসপাইপ দিয়ে ভিতরে জল চালাবার ব্যবস্থা করুন। এমনিতেই দেরি হয়ে গিয়েছে মনে হয়। স্প্রে ড্রাইং মেশিনটা একবার অকেজো হয়ে গেলে অন্তত তিন মাসের ধাক্কা।"

এখনও পর্যন্ত কেউ ওপরে ওঠেনি। কাবও কথা শুনলো না কমলেশ। নিজের নিরাপত্তার কথা না-ভেবে, সরু সিঁড়ি দিয়ে পাক খেতে খেতে সে ওই উঁচু টাওয়ারে উঠতে লাগলো। তাঁর পিছন পিছন অন্য কিছু লোকও যন্ত্রপাতি নিয়ে পিঁপড়েব মতো উঠতে আরম্ভ করলো। মিস্টার দাস ফ্লাড লাইটগুলো একটু বেঁকিয়ে দিলেন।

এদিকে মল্লিকা জেগে বসে রয়েছে। লন থেকে সে মার্কারি ল্যাম্পের নীলাভ আলোয় উজ্জ্বল প্রিলিং টাওয়ারটা দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু সেখানে যে কী নাটক অভিনীত হচ্ছে তা জানতে পারলো না।

আর কমলেশ তখন সব ভুলে গিয়ে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে অবজ্ঞা করে উপরে উঠে যাচ্ছে।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন এক অস্বস্তিকব অগ্নি-পরীক্ষার সময় গুণছে মল্লিকা।

রাত চারটের সময় কমলেশ যখন ফিরলো তখন তাকে চিনতে পারছে না মল্লিকা। দামী নতুন জামা প্যাণ্ট কালি-ঝুলিতে বোঝাই। মুখে চোখে কপালে হাতে তেলকালি লেগেছে প্রচুর। চুলগুলো শাদা ইউরিয়ার গুঁড়োতে বুড়োদের মতো শাদা দেখাচ্ছে।

বড় দেরি হয়ে গিয়েছে, মনে হচ্ছে কমলেশের। স্প্রে-ড্রাইং মেশিনটাকে

বোধহয় রক্ষা করা গেল না। কিন্তু এখনও স্থিরতা নেই। এখনই জার্মান সায়েবটাকে ডেকে পাঠাতে হবে। ভাগ্যে ম্যাক্স শীলার এখনও কুবিনগরে রয়েছে।

"কী ভাবছো ?" স্বামীর দিকে চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে মল্লিকা জিজ্ঞেস করলো।

"কিছু ভাবছি না, ঝুমু।" কমলেশ বরফের মতো ঠাণ্ডা স্বরে বললো।

স্বামীর কথা মল্লিকা কিন্তু বিশ্বাস করতে পারছে না। কমলেশ ভাবছে, আরও কয়েক ঘণ্টা আগে এসে পড়তে পারলে এমন সঙ্কটে পড়তে হতো না।

মল্লিকার মনে পড়লো, অনেক দিন আগে বাবাকে ঐরকম হতভম্ব অবস্থায় সে বাড়িতে বসে থাকতে দেখেছিল। দিদির অপারেশন দেরি হয়ে গিয়েছিল ; অপারেশন শেষ করে মেডিক্যাল কলেজ থেকে বাড়ি ফিরে রাত তিনটের সময় বাবা ওইভাবেই বলেছিলেন, "ঝুমু, একটু চা কর।"

নিজেকে দোষী মনে হচ্ছে মল্লিকার। নিজের আচরণের জন্যে ধিক্কার দিতে ইচ্ছে করছে। সে এবার স্বামীর হাত ধরলো। বললে, "চলো তোমার হাতে সাবান লাগিয়ে দিই। তেলগুলো না-হলে উঠবে না।"

কমলেশ চুপচাপ বসে রইলো। কিছু বললে না।

মল্লিকা স্বামীর খুব কাছে সরে এলো। গায়ে হাত দিয়ে বললে, "ভেবো না, দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে।"

"সবই তো এক সময় ঠিক হয়ে যায়। কিন্তু সময় তো অপেক্ষা করে না," কমলেশ নিজের মনেই ভাবলো।

স্বীকার করছে না কমলেশ, কিন্তু মল্লিকা বুঝতে পারছে, নিদারুণ আত্ম-গ্লানিতে ভুগছে সে। এবার নিজের মনেই কমলেশ বললে, "হোস পাইপ দিয়ে ওপর থেকে জল ঢালবার সামান্য বুদ্ধিটা কারও মাথায় এলো না।"

মল্লিকা বললে, "ওরা নতুন লোক, অনেক টাকা দামের যন্ত্রপাতি। তোমার মতো সাহস নেই ওদের।"

আরও অনেকক্ষণ কেটে গিয়েছে। চিন্তাক্লিষ্ট কমলেশ এখনও পাথরের মতো বসে রয়েছে। মল্লিকা তার নরম হাতদুটো দিয়ে স্বামীর হাত জড়িয়ে ধরলো।

"চলো, এখন শুতে চলো," মল্লিকা এবার স্বামীকে বিছানায় টেনে নিয়ে এলো। কমলেশের গা দিয়ে বিভিন্ন কেমিক্যালের একটা অপরিচিত কড়া গন্ধ তখনও বের হচ্ছে। সাবানেও গন্ধ যায়নি। মল্লিকা জিজ্ঞেস করলে,

"তোমার গায়ে একটু সেণ্ট ছড়িয়ে দেবো ?"

"দরকার নেই," এই বলে কমলেশ এসে খাটের ধারে বসলো।

স্বামী কি ভাবছে, তা মল্লিকা নির্দ্বিধায় বলে দিতে পারে। ভাবছে, ধর্মপুরে না গেলেই হতো। কিন্তু যা হবার তা তো হয়ে গিয়েছে।

কান্না আসছে মল্লিকার। নিজেকে অপরাধিনী মনে করছে সে। স্বামীর কাঁধে মুখ লুকিয়ে সত্যিই সে এবার কান্নায় ভেঙে পড়লো। বললে, "আমি আর কখনও অবুঝ হবো না।"

স্ত্রীর পিঠে গম্ভীর কমলেশ আলতো চাপড় দিলো। ভরসা দিয়ে বললে, "তুমি ভাবছো কেন ? তোমার তো কোনো অপরাধ নেই।"

স্ত্রীকে শান্ত করে কমলেশ আবার ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকাচ্ছে। বড় আশা ছিল, বনার্জি সায়েবকে অবাক করে দেবে। তিরিশে নভেম্বর ভোর-বেলায় হঠাৎ টেলিফোন করে দিগম্বর বনার্জিকে জানিয়ে দেবে, "আপনার কথা রেখেছি স্যার।"

টেলিফোনটা বাজছে। এই রাতদুপুরে কে আবার ফোন করছে ? কমলেশ ফোন ধরলো। মল্লিকার ঘুমের যাতে অসুবিধা না হয়, তার জন্যে যথাসম্ভব নিচু গলায় সে কথা বলছে। মল্লিকা এখন কাছে না গিয়েও বলে দিতে পারে দিগম্বর বনার্জি ফোন করছেন।

কমলেশ লজ্জিতভাবে বলছে, "খবর পাওয়া মাত্রই ছুটে এসেছি স্যার। হ্যাঁ স্যার, ঠিকই শুনেছেন আজ ওখানে পার্টি ছিল।" দিগম্বর বনার্জি বোধহয় কোনো কড়া মন্তব্য করলেন। কমলেশ বললে, "সাড়ে-চার ঘণ্টা যুদ্ধ করে এই ফিরেছি, স্যার। কাল সকালে আপনাকে আবার খবর দেবো।"

কমলেশ সন্তর্পণে বিছানায় ফিরে এলো। দেখলো স্ত্রী ঘুমুচ্ছে কি না। তারপর বেড-সুইচ টিপে আলো নিভিয়ে দিলো।

কালিঝুলি মাখা অবস্থায় এমনভাবে প্রোজেক্ট ম্যানেজারকে সুজাতা দাস কখনও অফিসে আসতে দেখেনি। বোঝা যাচ্ছে অনেকক্ষণ সাইটে থেকে কমলেশ রায়চৌধুরী অফিসে ফিরছেন।

সুদর্শন সেনও হন্তদন্ত হয়ে সায়েবের ঘরে ঢুকে গোপন পরামর্শ আরম্ভ

করলেন। তারপর সুজাতাকে ডাকলো কমলেশ। সুজাতা লক্ষ্য করলো এত দুশ্চিন্তার মধ্যেও কমলেশ তার স্বাভাবিক সৌজন্যবোধ হারায়নি। আন্তরিক-ভাবে জিজ্ঞেস করলে, "কেমন আছেন মিস দাস? কাল তো শরীর খারাপ ছিল।"

কমলেশের চোখের দিকে সুজাতা তাকাতে পারছে না। ভদ্রলোক এক রাত্রেই যেন দশ বছর বয়স বাড়িয়ে ফেলেছেন। কমলেশ বললে, "মিস দাস, আপনি এক্ষুনি মিস্টার শীলারকে খবর পাঠান! ওর যাওয়া বন্ধ করুন। প্রিলিং টাওয়ারের যা অবস্থা তা ঠিকঠাক করতে কত দিন লাগবে কে জানে! অন্তত পনেরো দিন তো বটে?"

"আমাদের হাতে আর কত দিন সময় আছে?" সুজাতা জিজ্ঞেস করে।

"আমাকে আর লজ্জা দেবেন না, মিস দাস। তিরিশে নভেম্বর মাত্র তিন দিন দূরে," কমলেশ বললে।

"চিন্তা করবেন না, ডক্টর রায়চৌধুরী," সুজাতা শান্তভাবে বললে।

হাসলো কমলেশ, "আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন, মিস দাস? আমি এখন সান্ত্বনারই যোগ্য। কী যে দুর্মতি হলো, কালই চলে গেলাম কৃষিনগরের বাইরে।"

সুজাতা মন্ত্রমুগ্ধের মতো কমলেশের দিকে তাকিয়ে আছে। কমলেশ বললে, "যার যা খুশি রটাচ্ছে। কেউ ভাবছে, প্রিলিং টাওয়ারের ডিজাইনে গোলমাল ছিল। বলবার কিছু নেই, দিগম্বর বনার্জি নিজে এই ডিজাইন করেছেন। সুদর্শনবাবু এইমাত্র আবার সাবোটাজের আষাঢ়ে গল্প ফাঁদছিলেন। কাল বিকেলে মিস্টার শীলারকে নাকি একা-একা টাওয়ারের কাছে যেতে দেখা গিয়েছিল। একেবারে মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে ওঁর। শীলারের কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে আমাদের মেশিন বিগড়ে দেবার? কিছু খারাপ- হলেই বরং ওর অসুবিধে, বেশী দিন থেকে যেতে হবে; অথচ জার্মান কোম্পানি বাড়তি টাকা পাবে না। আমার মাথা খারাপ হয়নি যে এই কেস সি-বি-আইকে পাঠাবো।"

কমলেশ কী ভাবলো, তারপর বললে, "আমাদের ডিজাইনে যে কোনো ভুল নেই, তা নিঃসন্দেহ হয়েছি। এখন শীলার সায়েবকে ধরি, যদি বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারেন।"

শীলাব সাযেব ক'দিন পুবোদমে প্রিলিং টাওয়ারে মেরামতির কাজ করে চলেছেন। আকস্মিক বিস্ফোরণের কারণ খুঁজে পাওয়া গেল না। কোথাও হযতো গ্যাস জমা হযেছিল। উনি বলছেন, চালু হতে ঠিক কত দিন লাগবে, তা এখনও বোঝা যাচ্ছে না।

কমলেশ অফিসে গম্ভীর হযে বসেছিল। সুজাতা দাস জিজ্ঞেস করলেন, "এত কি ভাবছেন?"

কমলেশ মুখ তুলে তাকালো। বেচাবা সুজাতা দাসও অফিসের অবস্থায় বেশ মুষডে পডেছে। লজ্জা হলো কমলেশেব। ক্লান্ত মুখে হাসি ফুটিযে বললে, "মিস দাস, আপনাবা ভাববেন না। নিজেব কাজ কবে যান। যুদ্ধে, বাজনীতিতে, কল-কাবখানায যাবা দাযিত্ব নেয, তাদেব মাঝে-মাঝে একটু বাড়তি কষ্ট ভোগ কবতে হয, মিস দাস।"

সুজাতা কোনো কথা শুনলে না। আবাব বললে, "চিন্তা করবেন না।"

কমলেশ বললে, "স্প্রে-ড্রাযাবটা একেবাবে অকেজো হয়ে যায়নি। তবে ক্যাপাসিটি কমে গিযেছে। প্রিলিং টাওযাবেব তেমন কিছু ক্ষতি হয়নি। কিন্তু সাবাতে জার্মানদেব কত দিন লাগবে কে জানে।"

সুজাতাব মাথাটা মুহূর্তেব জন্যে ঘুবে উঠলো। এব সঠিক উত্তব যদি কারুর জানা থাকে তাব নাম সুজাতা দাস। জার্মান শীলাব আজও গোপনে খোঁজ করে গিয়েছে। সুজাতা কোনো উত্তব দেয়নি।

অফিসেব বাথরুমে দবজা বন্ধ কবে দিযে নিজের ব্যাগ থেকে আযনা বার কবলো সুজাতা। তারপর খিলখিল কবে হাসলো। পুবো রুবিনগরকে কাঁপিয়ে আরও জোবে হাসতে ইচ্ছা করছে সুজাতাব। সুজাতা দাস কি পাগল হয়ে যাবে?

সুজাতা আবাব আয়নাব দিকে তাকালো। আয়নাব মেয়েটা ওকে বকুনি লাগাচ্ছে। বলছে, "লজ্জা করে না? লজ্জা করে না রাক্ষসী?"

উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে সুজাতা দাস। এই ধরনের হাঁপানিকে সে ভয় পায়। অনেক সময় বুকেব ব্যথাটা এর থেকেই দেখা দেয়। সুজাতা দাস এই মুহূর্তে নিজেকে পৃথিবীর সবচেয়ে গর্বিতা মহিলা মনে করছে। সীতা, হেলেন,

ক্লিওপেট্রা ইত্যাদি ইতিহাস সৃষ্টিকারিণী তালিকায় এইমাত্র আর এক নতুন নাম সংযোজিত হয়েছে। সে নামটি সুজাতা দাস, যার ইচ্ছায় বিরাট এই কৃষিনগর অকস্মাৎ গতিহীন হয়ে পড়েছে। বিজয়িনী সুজাতার ইচ্ছে করছে চুম্বনে চুম্বনে জার্মান ম্যাক্স শীলারের ওষ্ঠ ভরিয়ে দেয়। সুজাতার ইচ্ছা হচ্ছে চীৎকার করে ওঠে। দর্পভরে বলে, "তোমরা যারা এত বছর ধরে কুরূপা সুজাতা দাসকে অপমান এবং অবহেলা করে এসেছো তারা দেখ, সুজাতা কী পেয়েছে। ম্যাক্স শীলার তার পাশে থাকবার জন্যে কী বিরাট ঝুঁকি নিয়েছে।"

আরও কিছুক্ষণ একলা থাকলে সুজাতা সত্যিই হয়তো পাগল হয়ে গিয়ে চীৎকার করবে। সুজাতা সভয়ে মহিলাদের টয়লেট থেকে বেরিয়ে এলো।

সুজাতা নিজের ঘরে এসে বসলো। দেখলো, কমলেশ টেলিফোন নামিয়ে রাখলো।

"মিস দাস," কমলেশ ডাকলো। তারপর গম্ভীরভাবে বললে, "ডক্টর বনার্জি কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এসে পৌঁছবেন। লাইন খারাপ ছিল বলে আগে খবর দিতে পারেননি। আপনি গেস্ট হাউসে ফোন করে দিন। শরীরটা ওঁর মোটেই ভাল নয়। ডিনারে শুধু একটু দুধ খাবেন।"

গেস্ট হাউসের ব্যবস্থা করে ফিরে এসে সুজাতা দেখলো কমলেশ তখনও চিন্তা করছে। বিপদের মুহূর্তে দিগম্বর বনার্জি এলেন না। অথচ আজ ৩০শে নভেম্বর, ঠিক সময়েই আসছেন তিনি কৃষিনগর দেখতে। দায়িত্বজ্ঞানহীন এবং ব্যর্থ কমলেশকে বিদ্রূপ করবার জন্যেই দিগম্বর বনার্জি নিশ্চয় কৃষিনগর পরিদর্শনে আসছেন।

"কিছু বলবেন ?" সুজাতা জিজ্ঞেস করলো কমলেশকে।

"হ্যাঁ।" থামলো কমলেশ। "একটা চিঠি টাইপ করে দেবেন ? খুব জরুরী।"

শর্টহ্যাণ্ডের খাতাটা খুলে সুজাতা জানালো, "বলুন।"

একটা পেন্সিল নিয়ে কাগজে আঁচড় কাটতে কাটতে কমলেশ বললে, "হ্যাঁ, লিখে নিন : আমার পদত্যাগপত্র। আই হিয়ারবাই রিজাইন ফ্রম "

সুজাতা দাসকে কেউ হঠাৎ ঠেলে ফেলে দিলেও সে এমনভাবে চমকে উঠতো না।

"ডক্টর রায়চৌধুরী! আমি আপনার ডিকটেশন নেবো না। এসব কী বলছেন ?"

কমলেশ সস্নেহে একবার তার সেক্রেটারীর দিকে মুখ তুলে তাকালো। তারপর নিজের মনেই বললে, "আমাদের ডিরেকটর একটা মাত্র অনুরোধ

করেছিলেন। তা তো রাখতে পারলাম না। তিরিশে নভেম্বরের মধ্যে কারখানা চালু হলো না, এখন মাস খানেকেব মধ্যে কাজ শুরু কবিয়ে দিয়ে আমি চলে যেতে চাই।"

"কী বলছেন আপনি?" সুজাতা বাধা দিযেছিল। "কেউ তো আপনাকে কিছু বলেনি।"

কমলেশ হাসলো। তাবপব বললে, "বাত চাবটেব সময ডঃ বনার্জি ট্রাঙ্ক টেলিফোনে জিজ্ঞেস কবলেন, মেড-ফর-ইচ-আদাব প্রতিযোগিতায় প্রাইজ পেয়েছি কিনা।"

মেযেরা বোধহয একটু বেশী নরম হয়। কমলেশ দেখলো তার সেক্রেটারী সুজাতা দাসেব চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল গড়িযে পডছে। কমলেশের পরাজয ও প্রস্থানে এই অফিসের কেউ কেউ তাহলে অনুভব করবে। সুজাতা দাস মেযেটার মন এখনও নবম বযেছে।

অফিসাবকে অমান্য করার সাহস নেই সুজাতাব। তাই চিঠিটা টাইপ করে এগিয়ে দিতে হলো। কিন্তু কান্নায় ভেঙে পড়ে, সে আবাব কমলেশকে বারণ করলো। বললে, "আপনি কেন নিজের জীবন নষ্ট করবেন? আপনি তো কোনো দোষ করেননি, আপনার চাকরি ছাডবাব কোনো কাবণ নেই।"

বিষণ্ণ কমলেশ পদত্যাগেব চিঠিটা পকেটে পুবতে পুবতে কৃতজ্ঞ কণ্ঠে বললে, "আপনাব সহানুভূতির কথা আমি চিবদিন মনে রাখবো, মিস দাস।"

কমলেশ বেবিযে যেতেই সুজাতা দাস অকস্মাৎ নিজের কপাল টিপে চেয়ারে বসে পড়লো। তার ভুলেব জন্য কৃষিনগরে যে এমন দুর্যোগ হাজির হতে পারে তা সুজাতা এখনও ভাবতে পাবছে না।

টেলিফোন বেজে উঠলো। ওদিক থেকে মল্লিকা কথা বলছে। "হ্যালো সুজাতাদি আপনি কেমন আছেন। সেদিন আপনার বাড়িতে যাবার জন্যে বার বার বলেছিলেন। অনেকদিন আপনার সঙ্গে দেখা হয় না, সুজাতাদি। ওকে বলুন, গাড়িটা পাঠিযে দিতে; আপনার বাড়ি ঘুরে আসবো।"

সুজাতার মাথা ঘুরছে। বেচারা মল্লিকা এখনো জানে না, তার স্বামী চাকরিতে ইস্তফা দিতে গিয়েছেন। মল্লিকাকে আজ বাডিতে না-আসবার জন্যে অনুরোধ করলো সুজাতা। মল্লিকার ওপর সব অভিমান হারিয়ে ফেললো সে।

নিজের ঘরে বসে চোখের জলকে বাধা দিতে পারছে না সুজাতা। হঠাৎ মনে হচ্ছে, পৃথিবীতে তার মতো স্বার্থপর ডাইনী আর একটাও জন্মায়নি। নিজের সুখের জন্য, একটা নিরপরাধ দম্পতির সর্বনাশ করতে চলেছে সে।

অকস্মাৎ ক্যালেণ্ডারের দিকে নজর পড়লো সুজাতার। আজই সেই বহু প্রতীক্ষিত ৩০শে নভেম্বর। কমলেশ রায়চৌধুরীর সাধনায় যেদিনটি উজ্জ্বল হতে পারতো, সুজাতা দাসের কলঙ্কে তাই বিষাক্ত হয়ে উঠেছে।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালো সুজাতা। ম্যাক্সের সঙ্গে একবার দেখা করতে চায় সে।

বাইরে সন্ধ্যা নেমেছে। বনার্জি সায়েবের গাড়ির জন্যে কমলেশ গেস্ট হাউসের বারান্দায় অপেক্ষা করছে। গাড়িটা দেরি করছে।

অভিমান ও আত্মগ্লানির মিশ্রণে মনেব মধ্যে এক অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে কমলেশের।

দিগম্বর বনার্জির গাড়ি এসে দাঁড়ালো পোর্টিকোতে। প্রায় দু মিনিট পরে বেরিয়ে এলেন বনার্জি সায়েব।

একি! এমন চেহারা হলো কবে ওঁর? কমলেশ অবাক হয়ে গেল শুকিয়ে প্রায় অর্ধেক হয়ে গিয়েছেন দিগম্বর বনার্জি।

মন্থর অনিশ্চিত পদক্ষেপে নিজের ঘরে গিয়ে বসলেন নোয়েল দিগম্বর বনার্জি। তারপর কমলেশকে বললেন, “প্লাণ্ট বেঁচেছে।”

মাথা নিচু করে কমলেশ বললে, “তা বেঁচেছে। তবে চালু হতে দেরি পারে। আমাদের কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে।”

বনার্জি সায়েব এর পব যে শিষ্যকে তার অহেতুক স্ত্রীভক্তির জন্যে ব্যঙ্গ করবেন তা আন্দাজ করে রেখে দিয়েছে কমলেশ। কমলেশ তার জন্য প্রস্তুত হয়েই এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে পদত্যাগের চিঠিটা এগিয়ে দিয়ে বনার্জিকে মনে করিয়ে দেবে, মানুষের সাধ্যের সীমা আছে। তবে সেদিন সন্ধ্যায় কৃষিনগর থেকে অনুপস্থিত থাকার দোষটা সে স্বীকার করে নেবে। তার জন্যে ক্ষমা ভিক্ষা করবে।

কমলেশ তৈরি হয়েই আছে বনার্জির উত্তরের অপেক্ষায়। কিন্তু একি হলো আজ? বনার্জি মোটেই ব্যঙ্গ করলেন না। কমলেশের গায়ে হাত দিয়ে বললেন, “কমলেশ, ৩০শে নভেম্বরের পরে তোমরা অপেক্ষা করতে পারবে। তোমাদের সময় আছে। আমার নেই। আমি ১লা ডিসেম্বর কলকাতার হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছি—পেট কেটে ওরা ক্যানসারটার অবস্থা কী রকম, দেখতে চায়। গতবার লণ্ডন গিয়েই ব্যাপারটা জানতে পেরেছিলাম। তোমাদের বলিনি। এই কাজটার জন্যে ৩০শে নভেম্বর পর্যন্ত সময় ভিক্ষে

করে এনেছিলাম।"

কমলেশ অকস্মাৎ আবিষ্কার করলে সে কাঁদছে। সবার যে অপেক্ষা করার সময় থাকে না, এই সামান্য কথাটুকু সে এতদিনে বুঝতে পারছে। অথচ না-জেনে স্যারকে ভুল বুঝেছে সে। ছোট ছেলের মতো কান্না এসে তার কথা বলার ক্ষমতা, এমনকি ক্ষমা চাওয়ার সামর্থ্যও কেড়ে নিচ্ছে। বনার্জির শীর্ণ হাত দুটো জড়িয়ে সজল চোখে কমলেশ বললে, "আর কখনও দেরি করবো না স্যার।"

কমলেশের কাঁধে ভর করে দিগম্বর বনার্জি গেস্ট হাউসের মাঠে বেরিয়ে এলেন। দূর থেকে অনেকক্ষণ ধরে স্বপ্নের অসমাপ্ত তাজমহল প্রাণভরে দেখলেন। তারপর বিষণ্ণ মন্থর গতিতে ঘরে ফিরে এলেন।

অপেক্ষা করার সময় নেই স্যারের। একটু দুধ খেয়ে আবার গাড়িতে গিয়ে বালিশে মাথা রেখে পা মুড়ে শুয়ে পড়লেন। গাড়ি চন্দনপুরের দিকে ফিরে চললো।

আর কমলেশ। দিগম্বর বনার্জিকে এইমাত্র বিদায় জানিয়ে বিজ্ঞানী কমলেশ রায়চৌধুরীর যেন নবজন্ম হচ্ছে। অন্ধকার নির্জন নিঃশব্দ প্রান্তরে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। কিন্তু অসংখ্য অশ্রুতকণ্ঠ যেন তাকে উদ্দেশ্য করেই বলছে, অপেক্ষা করার মতো সময় নেই—নেই। অর্ধচেতন কমলেশ চোখের সামনে নানা অদ্ভুত দৃশ্য দেখছে—সময়ের সীমা ছাড়িয়ে আকাশের তারার দল সময়হীন মহাশূন্যে ছড়িয়ে পড়ছে! আবার মনে হচ্ছে, সীমাহীন সময় নিজেই অসুস্থ, দিগম্বর বনার্জির মতোই দুরারোগ্য ক্যানসারে ভুগছে।

অনুতাপদগ্ধ কমলেশ অবসন্ন দেহে গাড়িতে স্টার্ট দিতে যাচ্ছিলো। এমন সময় উল্টো দিক দিয়ে সুদর্শন সেনের গাড়ি দেখা গেল। কাছাকাছি এসে তিনি চিৎকার করে বললেন, "আপনাকে স্যার সর্বত্র খুঁজে বেড়াচ্ছি। অথচ আপনি মাঝে-মাঝে কোথায় যে উবে যান।" সুদর্শন সেন এবার কমলেশের কাছে এগিয়ে এসে বললেন, "শুনুন স্যার, তাজ্জব ব্যাপার? ওই জার্মান সায়েব, মিঃ মুলার আপনাকে খুঁজছেন। একেবারে ম্যাজিক—প্রিলিং টাওয়ারে যে-গোলমাল হয়েছিল তা সায়েব ম্যাজিকের মতো সেরে ফেলেছেন। ইচ্ছে করলে

আজ রাত্রেই কল চালু করতে পারেন। লোকজন সব রেডি।"

সুদর্শনবাবুকে নিয়েই কমলেশ সাইটে যেতে চাইছিল। কিন্তু তিনি বললেন, "তার কি উপায় আছে? আমাকে এখনই হাসপাতালে ছুটতে হবে। আপনার সেক্রেটারী সুজাতা হঠাৎ সীরিয়াস বুকের ব্যথা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে।" গভীর দুঃখের সঙ্গে সুদর্শন বললেন, "কৃষিনগরে কী যে হচ্ছে বুঝতে পারছি না। তিন-চার ঘণ্টা আগেও মেয়েটা বেশ ভাল ছিল। আপনি অফিস থেকে বেরিয়ে যাবার পর সুজাতার কী দুর্বুদ্ধি হলো। নিজে নাকি প্রিলিং টাওয়ারে জার্মান সাহেবের কাজ দেখতে এসেছিল। সায়েব তখন তিরিশ ফুট ওপরে ওয়েলডিং করছিল। এমন ডানপিটে মেয়ে যে, একলা মই বেয়ে সেখানে উঠে সাহেবের সঙ্গে কীসব কথা বলেছে। তার একটু পরে সায়েব মেশিন সারিয়ে ফেললো।"

অন্য সময়ে কমলেশ নিজেই তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে যেত। কিন্তু এখন সময় নেই। সে শুধু বললে, "আশ্চর্য ব্যাপার তো, একটু আগেই আমার চিঠি টাইপ করলে। কাল আমি হাসপাতালে যাবো, আজকে আপনি মল্লিকাকে সঙ্গে নিয়ে যান।"

সুদর্শনবাবু বললেন, "এখানকার হাল-চাল দেখে সুজাতা একেবারে ঘাবড়ে গিয়েছে। হাসপাতালে অজ্ঞান অবস্থায় ভুল বকছে। আপনাকে বলছে, প্লিজ চাকরি ছাড়বেন না। যত দোষ সব আমার।"

কিছুক্ষণ পরে অফিস থেকে কমলেশ বাড়িতে টেলিফোন করেছিল। "মল্লিকা, আমি বলছি। তুমি খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়ো। আমার জন্যে অপেক্ষা কোরো না।"

হাসপাতাল থেকে সদ্য-ফেরা মল্লিকার গলা কান্নায় ধরে রয়েছে। সুজাতা দাস বাঁচবে কিনা সন্দেহ। এরই মধ্যে সে মাঝে-মাঝে সমস্ত দোষের জন্য ক্ষমা চাইছে। মল্লিকা বললে, "আমারও কাঁদতে ইচ্ছে করছে। বেচারা জানে না, তোমাকে সেদিন দূরে সরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে দায়ী কে।"

অযথা কষ্ট না-পাবার জন্যে স্ত্রীকে সাহস দিলো কমলেশ। মল্লিকা ব[illegible] "ভবিষ্যতে কোনোদিন তোমার অবাধ্য হবো না। কোনোদিন তোমার ব[illegible] বাধা দেবো না।"

টেলিফোন নামিয়ে কমলেশ আবার প্রিলিং টাওয়ারের কাছে দাঁড়ালো।

[illegible] অপূর্ব দৃশ্য। [illegible]

[illegible] হয়ে ফেলেছে।

[illegible] কোথাও কোনো গোলমাল নেই। প্রোডাকশন [illegible] লেন, "ঈশ্বরের আশীর্বাদ নিয়ে তাহলে কাজ শুরু করা যাক।"

কমলেশ সম্মতি দিলো। হুইসল বাজলো, জেকব টেলিফোনে কাকে নির্দেশ দিলেন। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে স্তব্ধ যন্ত্রদানবের গহ্বরে ফিড অ্যামোনিয়া এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড ঢুকিয়ে দেওয়া হলো। রাতের নিস্তব্ধতা চূর্ণবিচূর্ণ করে প্রচণ্ড গর্জনে দানব তার কুম্ভকর্ণ-নিদ্রা থেকে জেগে উঠলো।

কমলেশ এবং সবাই অবাক বিস্ময়ে খোলা মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে সেই গর্জন শুনতে লাগলো।

নানা পথ ঘুরে, কখনও উত্তাপে, কখনও শৈত্যে, বিচিত্র অনুঘটনে বহু জন্ম-জন্মান্তর পেরিয়ে অবশেষে প্রিলিং টাওয়ারে পরম আকাঙ্ক্ষিত ইউরিয়ার জন্ম হলো। যন্ত্রের কাছে সরে গিয়ে কমলেশ দেখলো, শীতের রাতে বরফ পড়ার মতো ইউরিয়ার সাদা গুঁড়ো প্রিলিং টাওয়ারের ওপর থেকে চেম্বারের মধ্যে ঝরে পড়ছে। দিগম্বর বনার্জির আবিষ্কার সফল হয়েছে।

যারা দাঁড়িয়েছিল তারা সকলে জয়ধ্বনি করে উঠলো। খ্রীস্টান জেকব নতজানু হয়ে পরম করুণাময়কে কৃতজ্ঞতা জানালেন। আনন্দে আত্মহারা [illegible] তারকনাথের জয়।" আর কমলেশের মনে [illegible] জন্মমুহূর্তে উপস্থিত রয়েছে। পৃথিবীতে এই [illegible] আদিম মানুষ প্রথম দিনের সূর্য ওঠা দেখেও [illegible]

[illegible] মুঠো সাদা গুঁড়ো হাতের মধ্যে তুলে নিলো [illegible] রয়েছে দিগম্বরের সাধনা। বিজ্ঞানের জয় হয়েছে। [illegible] লো কমলেশ।

[illegible] নি। বাড়িতে মল্লিকাকে সুখবরটা দিয়েই [illegible] সকাল দশটায় দিগম্বর বনার্জি হাসপাতালে [illegible] চড়ে বসবেন। চন্দনপুর স্টেশনেই তাঁকে [illegible]

[illegible] কমলেশ পরম বিস্ময়ে মানুষের সৃষ্টি এই [illegible]। বিচিত্র এক অনুভূতিতে তার মন ভরে [illegible] ট্রেনে যেতে যেতে দূর থেকে